

ভুলসী দাস

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

প্রথম সংস্করণ

সন ১৩২৮ সাল

১৮ই পৌষ

মূল্য ৩/ তিন টাকা

rights reserved to the Publisher.

Published by
Harendra Kumar Seal,
CROWN LIBRARY.
178, Nimoo Gossain's Lane,
Calcutta.

শ্রী হরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য বেদান্ত-শাস্ত্রী-প্রণ

নূতন সামাজিক উপন্যাস

“বোধনবাড়ী”

পুস্তক নিদিষ্ট সংখ্যক ছাপা হইতেছে।

শীঘ্রই পত্র লিখিয়া গ্রাহক

শ্রেণীভুক্ত হউন।

Printed by S. K. SEAL.

SEAL-PRESS

333, Upper Chitpur Road.

CALCUTTA.

পাতা মুড়িবেন না। ভূমিকা

ভারত এত বড় কিসে—কিসে ভারতের খ্যাতি-প্রতিপত্তি—
বহু আবহমানকাল জগতের মধ্যে এত প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল,
ভারত বড় হইয়াছিল কিসে?

ইহার উত্তর দিতে হইলেই বলিতে হইবে—ভারত অধ্যাত্ম
বিজ্ঞানের চরম উন্নতি করিয়াছে বলিয়াই—তাহার সৌরভ-সৌরভ
দিকৃদিগন্তে এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে! যাহার সন্মোহন-সৌগন্ধ্যে
পৃথিবী ভোরপুর! অত্যাধি জগতে এমন কোন দেশ নাই—যাহা
অধ্যাত্মিক উন্নতিতে ভারতের সমকক্ষ হইতে পারে।

“জড়বিজ্ঞান” আজ ভারত ছাইয়া ফেলিয়াছে; বাহ্যিক কে
বিশ্বের অভাব হইলেই জড়ের সাহায্য লইতে হয়; দৈনন্দিন অভাব
অভিযোগেরই জড়ের সাহায্যে প্রতিবিধান আবশ্যক কিন্তু বাহ্যিকের
বাহ্যিক কোন বিষয়ের অভাব নাই, সাংসারিক অভাব-অভিযোগ
যুদ্ধাদিগকে কোনকালে কষ্ট দিতে পারে নাই—এমন কি সংসার-
সিদ্ধি যাহারা ভুলও ভাবিত না; জন্মভূমি মা যাহাদের—জুজলা-
ফুল, শস্ত-শ্রামলা—তাহাদের জীবিকা নির্বাহের কখন কোন
অকাব হয় নাই বলিয়া—দেশবাসী বাহির ছাড়িয়া ভিতরে অধ্যাত্ম
উন্নতির প্রতি আগ্রহ হইয়াছিল এবং সেই উন্নতিবলে ভারত আজ
সকল দেশের মুকুটমণি, দেবগণ ইহার আশ্রয়লাভে সন্তত লাগিয়াই।

অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের উন্নতি ভারতে যত হইয়াছিল—এত আর
কোথাও হয় নাই—ভারতের পবিত্র তপোবন একদিন প্রথম বৃদ্ধারে
বস্তু হইয়া, ঋষি-তপস্বিগণের শ্রামগানে মুখরিত হইয়াছিল, ইহার
গগন-পবন, বন-উপবন সন্মোহিত করিয়া বাহ্যিকের চরণ স্পর্শ
করিয়াছিল। কত সাধক, কত ভক্ত, কত যতি-সন্ন্যাসী যে এই
মাহাকাণ্ড সমলভূত করিয়া একদিন ইহার রেণুকে স্বর্ণ রেণু অপেক্ষাও
গুণিসী করিয়াছিল—তাহার ইয়ত্তা কে করে?

ভগবন্ত সান্থ-সন্ন্যাসিগণের জন্ম এক ভারত ভিন্ন আর কোথাও হয়
নাই—আর কোন দেশ ইহার ক্ষুদ্র আপনাকে অধিতর সৌভাগ্যশাসী
মনে করিতে পারিবে না—ইহা সর্ববাদিসম্মত সত্য। অসাধ্য ভক্ত
সাধকগণের উজ্জল তপস্ক্রোতি বিভূষিত হইয়া একদিন উত্তর পশ্চি-
মাকলের কুটীর-প্রাক্ষণ পবিত্র করিয়াছিলেন—ভক্তকবি—সাধকপ্রগণ্য
মহাত্মা “তুলসীদাস” বান্দা-জেলার পবিত্র ব্রাহ্মণকুল সমুদ্ভাবিত করিয়া
একদিন “রামনাম” মহামন্ত্রের মেঘমন্ত গর্জনে দেশকে অনুপ্রাণিত ও
কীৰ্ত্তিমণ্ডিত করিয়া জগতে রামনামের মহিমা প্রচার করিয়া গিয়াছেন।
সামান্য কুটীরবাসী দরিদ্র, ব্রাহ্মণকূলে জন্মগ্রহণ করিয়া তপঃ-
প্রভাবে দিল্লীশরের আসন পর্য্যন্ত টলাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন
তারপর যোগবলে কত অসাধ্য সাধন করিয়া গিয়াছেন—তাহা
সংখ্যা করা দুঃসাধ্য।

আজ আমরা তাঁহারই পবিত্র জীবন-কাহিনী উপন্যাসাকারে
প্রণীত করিয়া সাধারণে প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছি ; মহাত্মা
জীবনের অলৌকিক সমগ্র ঘটনা সংগ্রহ করিয়া প্রচার করা অসম্ভব
ভাবে যতদূর সম্ভব—এই গ্রন্থে তাহা লিপিবদ্ধ করিতে ক্রটি করি
নাই। ভগবান রামচন্দ্র যে মহাত্মার জীবনজগদ্বির কর্ণধর—তাঁহার
পাদপদ্মে অচলা ভক্তি রাখিয়া তুলসীদাস ভারতে সাধক-শিরোমণি—
তাঁহার জীবনচরিত বোধ হয় ভক্ত পাঠকগণের চিত্ত আকর্ষ
করিতে পারিবে। এক্ষণে পাঠক-পাঠিকাগণ ইহা পাঠ করিয়া যদি
কখনিও তৃপ্তি অনুভব করেন—তাহার কৃতিত্ব আমার মত ক্ষুদ্র
গ্রন্থকারের কিছুই নাই—যাহা কিছু সমস্তই সেই রামগুণ প্রাণ সাধকের
আমার পূর্ব বিরচিত ত্রিশ চল্লিশখানি গ্রন্থ সাধারণের ষড়ই প্রি
হইয়াছে—তাহার কারণ সেগুলি ধর্মমূলক উপন্যাস। এখানিও জীবন-
মূলক সাধকচরিত্র ; এইজন্য আশা করা যায়—ধর্মপ্রাণ হিন্দুগণ
নিকট ইহা অনাদৃত হইবে না।

বিনীত—

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

পাতা মুড়িবেন না।

তুলসীদাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

জন্ম-কথা

বান্দাজেলার অন্তর্গত যমুনাতীরবর্তী রাজাপুর গ্রামে বহুদিন পূর্বে একঘর ব্রাহ্মণদম্পতী বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ ও তদীয় পত্নীর বয়স কিছু বেশী হইলেও তখন তাঁহারা জরা-বার্দ্ধক্যের কবলস্থ হন নাই; অথবা জরা-বার্দ্ধক্য তখন সহজে কাহাকেও আক্রমণ করিতে পারিত না। এখন যেমন স্ত্রীলোক কুড়ি বৎসর হইলেই বুড়ি, আর পুরুষ ত্রিশ চল্লিশ বৎসর যাইতে না যাইতেই নানাবিধ পীড়াগ্রস্ত হইয়া রুগ্ন হইয়া পড়ে, কিছুদিন ঐরূপ পীড়া ভোগ করিতে করিতেই বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হয়; তখন তাঁহা হইত না। তাহার কারণ, তখন দেশে খাদ্যাশস্ত্রের অভাব ছিল না, অতি অল্প বয়স হইতেই মানুষকে সংসার চিন্তায় এত অস্থির হইয়া পড়িতে হইত না। ভারতের কোথাও ভাত-কাপড়ের-কষ্ট কাহাকেও ভোগ করিতে হইত না; সংসার কেমন করিয়া চলিবে ভাবিয়া কাহাকেও এখনকার মত এত ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত না। আর তখন ব্রহ্মচর্য্যও মানুষকে শক্তিসম্পন্ন করিয়া রাখিত।

এখন সংসারের চিন্তা অত্যধিক বাড়িয়াছে বলিয়াই মানুষকে এমন কাবু করিয়া ফেলিয়াছে; দুর্কিসহ চিন্তায় জর জর হইয়া

মানুষ অস্থিচৰ্ম্মসার হইতেছে, অকালবার্দ্ধক্য তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। ব্রাহ্মচর্যাও একপ্রকার অনভ্যাস হইয়া পড়ায়, চিন্তা ও ব্যাধি তাহাদিগকে হাড়ে হাড়ে জ্বালাইতেছে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বান্দাজেলা হিন্দুস্থানী প্রধান দেশ। আনরা যে ব্রাহ্মণদম্পতীর কথা বলিতেছি, তাঁহারা সরোজপারী পরাশর গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক। ব্রাহ্মণের নাম আত্মারাম দ্বিবেদী এবং ব্রাহ্মণীর নাম ছিল—হুলসী দেবী। এতাদিক বয়স হইলেও, তখন তাহাদের কোনও পুত্রাদি হয় নাই। সংসারে পুত্রকন্তা না থাকিলে তাহার কিছুমাত্র শোভা হয় না; সে সংসারে আনন্দের পরিবর্তে নিরানন্দই উপভোগ করিতে হয়। আত্মারাম ও হুলসী দেবী ধর্মোপার্জনে পরম আনন্দলাভ করিলেও পুত্রকন্তা বিহনে—সময়ে সময়ে বড়ই বিমনা হইয়া থাকিতেন। সংসারে অনটন কিছু নাই; ধর্মকর্মেরও তাঁহারা কিছুমাত্র রূপণতা প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু তাহার মধ্যে আনন্দের ঢলাল দুই একটি-পুত্রকন্তা খেলা করিয়া বেড়াইলে অতীব শোভার আশ্রয় হইত; সংসারে তাঁহাদের এইটিরই অভাব ছিল। এবং এই অভাবই সদানন্দময় পতি-পত্নীকে সময়ে সময়ে ত্রিষমান করিয়া রাখিত। পুত্রকন্তা হইবার বয়স প্রায় অতীত হইল, তথাপি সংসারের সারস্বত উহার লাভ করিতে পারিলেন না; শ্রীরামজী বোধ হয়,—এ জন্মে তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন না। এই দুঃখই তাঁহাদের প্রাণে অত্যন্ত যাতনা প্রদান করিত, তাহা ছাড়া পতিব্রতা হুলসী দেবীকে ও শ্রীরামগত প্রাণ আত্মারামকে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারিত না। তাঁহাদের উভয়কে দেখিলে আনন্দের পূর্বদৃষ্টি বলিয়া বোধ হইত। স্বধর্মনিরত ভক্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণদম্পতী দমস্ত

দিবস ধর্মকর্মে রত থাকিয়া অপরাহ্নে আহারাদি করিতেন—অহো-
রাত্র রাম-গুণ-গান করিয়া তাঁহাদের সময় অতিবাহিত হইত, বৃথা
কাজে তাঁহারা কখনও ব্যাপৃত থাকিতেন না। এই আদর্শ ব্রাহ্মণ-
দম্পতীকে রাজাপুর গ্রামের সকলেই ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত, সকলেই
তাঁহাদের অনুজ্ঞা সসম্মানে প্রতিপালন করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিত।

ধর্মকর্মে সর্বদা রত থাকিলে, ঈশ্বরচিন্তায় সর্বদা মতি রাখিতে
পারিলে, তাঁহাদের দৈহিক জ্যোতিঃ ও মানসিক স্মৃতি যেরূপ লাভ
হয়, রাজ-ভাণ্ডারের অতুল ধনসম্পদেও তাহার কণিকামাত্র পাওয়া
যায় না। রাজার আনন্দ—ভোগমূলক, আর ধার্মিকের আনন্দ—
ত্যাগমূলক অতএব পার্থক্য অনেক। আত্মারাম ও তুলসী দেবীকে
দেখিলে, তাঁহাদের সেই তেজোময় তপঃক্লিষ্ট দেহের প্রতি নিরীক্ষণ
করিলে, সাক্ষাৎ দেবদম্পতি বলিয়া অনুমিত হইত, হঠাৎ দর্শন
করিলে তাঁহাদের পদে স্বতঃই মন্তক নত হইয়া পড়িত, জোর
করিয়া কিছু করিতে হইত না। ধর্মের এমনি প্রভাব, ধার্মিকের
এমনি আকর্ষণী-শক্তি।

তাঁহাদের কিছুই অভাব ছিল না। অদৃষ্ট মন্দ হইলেও,
কর্মফলে তাহার মন্দ গঠন হইলেও, সাধক উৎকর্ষ তপস্যায় তাহা
খণ্ডন করিতে পারেন। সকলেই মনে করিয়াছিল;—পুত্রমুখ-নিরী-
ক্ষণ এ দেব-দম্পতির ভাগ্যে বুঝি নাই। ইহাদের অবর্তমানে
বুঝি—ভগবান এ পবিত্র বংশের বিলোপ সাধনই করিবেন। কিন্তু
সাধকের সাধনার ফল কি ব্যর্থ হইতে পারে? আত্মারাম ও তুলসী
দেবীর মনোবাসনা অপূর্ণ রহিল না; সাধনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা
পুত্রধনে ধনী হইবার জন্ত যে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, ভগবান এতদিনে
তাঁহাদের সে সাধ পূর্ণ করিলেন।

হুলসী দেবী একদিন স্বপ্ন দেখিলেন যে, একটি ভক্তচূড়ামণি তাঁহার গর্ভকোষে আশ্রয় লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। এই স্বপ্নদর্শনের পর একদা তিনি শুভ মুহূর্ত্তে গর্ভধারণ করিলেন, দেখিয়া রাজাপুর গ্রামের সকলেই খুসী হইল। দ্বিবেদীর বংশরক্ষা হইলে, গ্রামের অনেক উপকার হইবে। এমন ধার্মিক দম্পতির পুল হইলে সে নিশ্চয়ই ধার্মিক হইবে, উত্তরকালে এ গ্রামে ধর্ম-শিক্ষার কোনও ব্যাঘাত হইবে না, বলিয়া সকলেই আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। নিজে ভাল হইলে, তাহার দুঃখে বা সুখে সকলেই এইরূপ অংশভাগী হইয়া থাকে।

কিন্তু জানি না, ভগবান কি অভিপ্রায়ে এ বৃদ্ধবয়সে তাঁহাদের অভীষ্টসিদ্ধি করিয়াও কেন এরূপ অক্লপা প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার পরীক্ষা যে পদে পদে; সাধককে পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি যে পদে পদে বিপদগ্রস্ত করিয়া ফেলেন। দৃঢ়ব্রত না হইলে কি তাঁহার এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়? আত্মারাম পত্নীকে গর্ভবতী দেখিয়া আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু পরক্ষণে কি জানি কি ভাবিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ নিরানন্দ-অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। আত্মারাম তাহা প্রকাশ করিলেন না। নানাপ্রকার ধর্ম-ভাবে পত্নীর আনন্দ বর্ধন করিতে লাগিলেন। আত্মারামের গুরুদেব নৃসিংহদাস গোষ্ঠামী জ্যোতিষে সুপণ্ডিত ছিলেন, তিনিও শিষ্যের এবাধ্ব সৌভাগ্যে আনন্দিত হইলেন, প্রত্যহ যাতায়াত করিয়া তাঁহাদের ধর্মোপদেশ দিতে লাগিলেন। গুরুই ত জীবের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, গুরুই ত পরমপদ, তখন ত প্রত্যেক হিন্দুগৃহে এইরূপ পরম দেবতার আবির্ভাব হইয়া হিন্দুসংসার উজ্জল করিত, জ্ঞানের প্রতিমূর্ত্তি এইরূপ দেবকল্প, ঋষিতুল্য ব্রাহ্মণই তখন সংসারকে

স্বর্গে পরিণত করিত, ইহপরকালের কৰ্ত্তা, ভবাব্ধবের নাবিক হইত।
হায় ! এখন তাহার স্থানে ভোগের প্রতিমূর্তি রাক্ষস সকল তাণ্ডব-
নৃত্য করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; হিন্দু-সংসারকে স্বর্গের পরিবর্তে
নরকে পরিণত করিতেছে।

একদিন শুভ মুহূর্ত্তে হুলসী দেবী একটা পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন।
রাজাপুর গ্রামে আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল। নৃসিংহদাস আসিয়া
পঞ্জিকা দৃষ্টে গণনা করিলেন, মূলা নক্ষত্রের প্রথম চরণে পুত্রের জন্ম
হইয়াছে বলিয়া উহা পিতামাতার প্রতিপাল্য নহে, শাস্ত্রানুসারে
উহাকে ত্যাগ করাই ধর্ম্মসঙ্গত। গুরুদেবের মুখে এই নির্ঘাতবাক্য
শুনিয়া সকলে হায় হায় করিতে লাগিল। আত্মারাম পরম ধার্ম্মিক,
ধর্ম্মের জন্ত তিনি নিজপ্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারেন, এ সন্তোজাত
শিশু ত কোন ছার ! আত্মারাম গুরুর আদেশে পুত্রকে পরিত্যাগ
করিলেন। কিন্তু তাহাকে একেবারে নয়নের অন্তরালে বিসর্জন
করিতে হইল না। শিশুর পিতা-মাতার দ্বারা প্রতিপালিত হওয়াই
নিষেধ ; এই জন্ত ভক্তদম্পতিকে নৈরাশ্য-সাগরে নিমজ্জিত না
করিয়া গুরুদেব বলিলেন—“বৎস ! পুত্রটিকে একেবারে ত্যাগ করিতে
হইবে না, আমি উহাকে লইয়া প্রতিপালন করিতেছি ; তোমরা
ছয়মাস পরে উহাকে দর্শন করিয়া নয়নের আনন্দ বর্দ্ধন করিও, তাহা
হইলে আর প্রাণে কোন প্রকার অসন্তোষ আসিতে পারিবে না—
অনায়াসে একনিষ্ঠ হইয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে পারিবে, মন আর চঞ্চল
হইবে না।” ধর্ম্মপ্রাণ আত্মারাম তাহাতে কোন দ্বিধাবোধ করিলেন
না, বরং সন্তুষ্টচিত্তে গুরুবাক্যে অমুমোদন করিলেন।

হুলসী দেবী এতক্ষণ গুরুদেবের মর্ম্মভেদী বাক্য শ্রবণ করিয়া বড়ই
কাতরা হইয়াছিলেন ; হায় ! দশমাস দশদিন গর্তে ধারণ করিয়া, এই

বৃদ্ধবয়সে অশেষ যত্ননা ভোগ করিয়া, অবশেষে পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহাকে লালন-পালন করিতে পাইব না ; তাহাকে ছয়মাসকাল দেখিতে পাইব না, প্রাণের শিশুকে এতদিন পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে হইবে ? কোন্ রমণী এরূপ ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে, না হয়, প্রাণ যাইবে—তাহাতে ক্ষতি কি ? শিশুকে ত্যাগ করিতে হইবে, আর দেখিতে পাইব না, শুনিয়া তাঁহার প্রাণ ছটফট করিতে ছিল। সোনার শিশুটিকে কোলে করিয়া এতক্ষণ তিনি মর্ম্মস্তদ রোদনে ধরাতল অভিষিক্ত করিতে ছিলেন ; মনে করিতেছিলেন—এখন শ্রাম রাখি, কি কুল রাখি ; ধর্ম্ম-ত্যাগ করি, কি পুত্রকে ত্যাগ করি ? আবার মনে মনে ভাবিতেছিলেন—আমার না হয়, যাহা হইবার হইবে, কিন্তু ইহাতে আমার স্বামী-দেবতার যদি কোন অমঙ্গল হয় ; এই ভাগ্যহীন শিশুকে লইয়া যদি তাঁহার কোনও অনিষ্ট হইয়া পড়ে, হুলসী দেবী প্রাণের আবেগে কাঁদিতেছিলেন। এমন সময়ে নৃসিংহদাসের শ্রীমুখে উক্ত প্রকার আদেশ শ্রবণ করিয়া কথঞ্চিৎ স্থস্থ হইলেন। একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে না, আবার ছয়মাস পরে গুরুগৃহ হইতে পুত্রকে পুনরায় প্রাপ্ত হইবেন, ভাবিয়া মন আশান্ত হইল। আত্মারাম যখন গুরুসহ আসিয়া পুত্রকে প্রার্থনা করিলেন এবং সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন, তখন তিনি দুঃখে ও আনন্দে কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামিহস্তে প্রাণের পুত্রকে প্রদান করিলেন।

নৃসিংহদাস শিষ্যের মনস্তপ্তির জন্য সদ্যোজাত শিশুটিকে লইয়া গৃহে গমন করিলেন। পুত্রটি গুরুদেবের যত্নে শশিকলার ত্রায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পুত্রটি যখন পঞ্চমমাসে পদার্পণ করিল, নৃসিংহদাস তখন তাহার অন্নপ্রাণন কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া নাম রক্ষা করিলেন—তুলসীদাস। * এই বালক কালে শ্রীরামচন্দ্রের পরম ভক্ত

হইয়াছিলেন, মহাকবিরূপে সাধনার উচ্চস্তরে সমারোহণ করতঃ হিন্দুজাতির গৌরববৃদ্ধি করিয়া অগতে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন।

বালক তুলসীদাস ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। পিতামাতার ইচ্ছাক্রমে গুরুদেব তাহাকে বর্ণমালা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। পিতা-মাতা যদিও তাঁহাকে প্রতিপালন করিতেন না, তথাপি নৃসিংহদাস তুলসীদাসের প্রাণগতিক যাবতীয় কার্য সম্পন্ন সময়ে আত্মারাম ও হুলসী দেবীর পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। পাছে তাঁহারা কোন প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করেন, কোন বিষয় পাছে তাঁহাদের মনোমত না হয়, এই জ্ঞাত্তি তিনি সকল বিষয়েই শিষ্য দম্পতির মতামত না লইয়া কোন কার্য করিতেন না। আত্মারাম বলিতেন—প্রভু! তুলসীদাসের উন্নতি-অবনতির ভার সমস্ত আপনার উপর নির্ভর করিতেছে। আপনি যাহা ভাল বুঝিবেন—তাহাই করিবেন। আমরা যখন আপনার পদানত দাস, আমাদের ইহপরকালের যাবতীয় ভার যখন আপনার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে; তখন আমাদের পুত্রের জীবনোপায় আপনার দ্বারা নির্দ্ধারিত হইলে ভাল ব্যতীত মন্দ হইবে না। সে বিষয়ে আমাদের মতামতের অপেক্ষা না করিয়া আপনার যাহা অভিপ্রেত হইবে—তাহাই করিবেন। নৃসিংহদাস কিন্তু তাহা শুনিতে না, তিনি বালকের সকল কার্য্যেই তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিতেন।

তুলসীদাস পিতামাতার ত প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিলেনই। গুরুদেব সাতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। নৃসিংহদাস মুক্তপুরুষ হইয়াও অবশেষে এই বালকের মায়ায় এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিলার্দ্ধ না দেখিলে থাকিতে পারিতেন না, মায়ামুগ্ধ নৃসিংহ ক্রমশঃ বালকের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া যোগ-তপস্যা সমস্ত একবারে বিস্মৃত হইয়া অনন্ত

চিন্তায় তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তুলসীদাস কোনও দোষ করিলে তিনি শাস্তি দিতেন না, লেখাপড়ায় অমনোযোগী হইলেও সে দিকে দৃষ্টিপাত করিতে ভুলিয়া যাইতেন। তুলসীদাসের সেই নবর অধরের কমনীয় বচন স্বধা পান করিয়া ও তাঁহার সেই নরদুল্লভ স্বন্দর কাস্তি দেখিয়া পথের পথিক যখন তাঁহাকে কোলে না করিয়া থাকিতে পারিত না, তখন পিতামাতা বা গুরুদেবের কথা কি বলা যাইবে? এইরূপ অত্যাধিক স্নেহে তুলসীদাসের প্রথম বয়সে বিজ্ঞাশিক্ষা কিছুই হইল না; তবে ধার্মিক পিতামাতার গুণে এবং পরম ভক্ত নৃসিংহদাসের শিক্ষায় বালক ধর্ম-পথভ্রষ্ট হইল না। নৃসিংহ যখন দেবারাধনা করিতেন, বালক তুলসীদাসও সে সময় গুরুদেবের পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার ধ্যান-ধারণার অহুকরণ করিতেন, ঠাকুর-দেবতার পূজাদি কেমন করিয়া করিতে হয়—তাহা শিক্ষা করিতেন।

তুলসীদাস এই বাল্যকাল হইতে ধর্মকর্মে মতিমান হইলেও বড় একগুঁয়ে বালক ছিলেন, যাহা ধরিতেন, তাহা সম্পন্ন না করিয়া ছাড়িতেন না, ইহাতে তাঁহার প্রাণ যাক্ আর থাক্। তুলসীদাস বড় সৌন্দর্য্যপ্রিয় ছিলেন। কোনও স্বন্দর বস্তু দেখিলে, তিনি তাহাতে এমন ভাবে মজিয়া যাইতেন যে, তাঁহাকে সে বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা এক প্রকার দুঃসাধ্য হইয়া পড়িত। গুরুদেব এই জন্ত তাঁহাকে বড় কাহারও সহিত মিশিতে দিতেন না, তাঁহাদের বাড়ীর পার্শ্বে দীনদয়াল তেওয়ারীর পুত্র দুঃখী তেওয়ারীর সহিত তুলসীদাসের অত্যন্ত সদ্ভাব হইয়া ছিল, দীনদয়াল তুলসীদাসের পিতার নিকট আত্মীয় বলিয়া দুঃখীর সহিত খেলা করিতে কেহ নিবেদন করিত না। দুঃখী তুলসীদাসের স্নমবয়স্ক—খুব ভাল ছেলে।

একটু জ্ঞানবান হইত। নবমবর্ষে তাঁহার উপনয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। তুলসীদাসের ধর্মকর্মে প্রগাঢ় আসক্তি দেখিয়া গুরুদেব তাঁহাকে সেইপ্রকার উপদেশ দিতে লাগিলেন। তুলসীদাসও মনের আনন্দে সেই সকল উপদেশ অমুসারে কার্য করিতে লাগিলেন। বালক অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন, কোন বিষয় একবার শিখাইলে আর দ্বিতীয়বার তাহা শিক্ষা দিতে হইত না। ধর্মবিষয়ে উন্নত হইতে পারিলে মানবের সকল অভাব দূরীভূত হইয়া থাকে ; তুলসীদাস বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষায় কিছু অমনোযোগী থাকিলেও, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মশাস্ত্রে কিছু কিছু ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ক্রমশঃ তাঁহার সে অভাব দূরীভূত হইতে লাগিল। এখন আর তাঁহাকে সহজে কেহ মুর্থ বলিয়া ধরিতে পারিত না, যাহার জন্য বিদ্যাশিক্ষা, সেই বস্তই যদি লাভ হয়, তবে আর বিদ্যাহীনতা-দোষহুঁষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পিতৃবিয়োগ

ক্ষেপিতে দেখিতে বাল্য উত্তীর্ণ হইয়া তুলসীদাস যৌবনে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার দেহের সৌন্দর্য্য-জ্যোতিঃ পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হইল, অপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল পূর্ণতা লাভ করিল। এখন তুলসীদাস একজন সুপুরুষ, তাহার উপর তাঁহার সেই ব্রাহ্মণোচিত আচার-ব্যবহার ও বেশভূষা তাঁহাকে অতীব সৌন্দর্য্যশালী করিয়া তুলিয়াছিল। যুবক যখন বন্ধু দুঃখীরামের সহিত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া

বেড়াইতেন, নদীতীরে স্নান করিতে বাইতেন, তখন সকলে তাঁহার সে রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইত। তুলসীর নম্রতা ও কমনীয়তা প্রভৃতি গুণ, যাহাতে মানবজীবন ধন্য করে, যাহাতে সে লোকসমাজে আদরণীয় হইতে পারে, গুরুদেব তাহার অল্প নানা প্রকার সং-শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। পূর্বে নিয়ম ছিল—যদি পুত্র লেখাপড়া শিক্ষায় পারদর্শী হইতে না পারিত, পূর্ব-জন্মার্জিত পুণ্যবলে যদি বিদ্যার্জনে বালক ক্ষমতাবান না হইত, তাহা হইলে পিতামাতা বা অভিভাবকগণ তাহাকে সংস্কার-সম্পন্ন করিয়া সামাজিক বিষয়ে স্থনিপুণ করিতে চেষ্টা করিতেন। বিশিষ্টভাবে সামাজিক ভাবাপন্ন হওয়াও তখন একটা মহৎ গুণ বলিয়া পরিগণিত হইত; ধর্মভাবের ভাবুক হইয়া সামাজিকতায় পটু হইলেও তখন সংসার পরিচালনের ভাবনা থাকিত না—লেখাপড়া যত হউক আর নাই হউক। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে এ সকল গুণ থাকা একান্ত আবশ্যক হইত, নতুবা অন্যান্য জাতিসকলের নিকট তাঁহার মান-মর্যাদা, খ্যাতি-প্রতিপত্তি বজায় থাকিত না, এইজন্য তাঁহার যত্নে অভিযোগেও কোনপ্রকার সাহায্য পাওয়া মহাদায় হইত। নৃসিংহদাস যখন দেখিলেন—বালকের লেখাপড়ায় তত মতি নাই; তখন যাহাতে সে উত্তরকালে জীবন-সংগ্রামে কোনপ্রকার কষ্ট না পায়, কাহাতে তাহার সংসারযাত্রা ধর্মকর্মের মধ্য দিয়া একপ্রকার সুখে নির্বাহিত হইতে পারে, সেইরূপ দশকর্মস্থিত করিবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল না, যৌবনকালেই, তুলসীদাসের ঘালকত্ব ঘুচিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দশকর্মে বেশ পরিপক্ব হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণের ষট্‌কর্ম একপ্রকার “চলন-সই” রকমে সমাধা করিতে বেশ পারক হইয়া উঠিলে, নৃসিংহদাস

তাহাকে শিষ্ঠ-যজ্ঞমানের গৃহে সময়ে সময়ে কার্য্য করিতে পাঠাইয়া দিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, যুবকও অতিশয় ভক্তির সহিত তাহাদের কাজকর্ম্মে পৌরোহিত্য করিয়া বেশ সুনাম অর্জন করিতে লাগিলেন। পুত্র কাজের লোক হইলে, সে শিষ্ঠশাবক রক্ষায় পারদর্শী হইলে পিতা আত্মারাম দ্বিবেদীও নিজের শিষ্ঠ-যজ্ঞমানের ভার তাঁহার উপর গ্রস্ত করিলেন।

তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন। এখন নিশ্চিন্ত মনে পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া পরকালের পথ পরিষ্কার করিবার জন্ত, নিজের নিতান্ত আপনার জন রাম রঘুনন্দন ইষ্টদেবের পদে মতি স্থির করিতে, পঞ্চাশ বৎসরের পর বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া সংসারের যাবতীয় জঞ্জালজাল কাটাইতে চেষ্টা করিলেন। জননী হুলসী দেবী বড়ই পতি-পরায়ণা ছিলেন, স্বামীকে সংসারে বীতশ্মহ দেখিয়া তিনি অনন্তমনে তাঁহার ধর্ম্মকর্ম্মে, পরকাল চিন্তার পথে সহায়তা করিতে লাগিলেন।

পতির ধর্ম্মকর্ম্মে সাহায্য করিবার জন্তই স্ত্রী চিরকাল সহধর্ম্মিণী-নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। হুলসী দেবী এখনকার স্ত্রীলোকের মত সে নামে অপযশ ঘোষণা না করিয়া যথার্থ ধর্ম্মপত্নীরূপে আত্ম-রাগের মনস্তত্ত্ব করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

স্বামীর যাবতীয় অনুজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া যেটুকু সময় পাইতেন; সেইটুকু সময় সন্তানবৎসলা তাঁহার সন্তানের মঙ্গলের জন্ত দেবদেবীগণের নিকট প্রার্থনা করিয়া কাটাইতেন। জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তুলসীদাস জানিতে পারিলেন কেন, তিনি জনক-জননীর দ্বারা প্রতিপালিত না হইয়া তাঁহাদের কুলগুরু নৃসিংহদাসের দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছেন। পিতা-মাতার কি কর্ম্মভোগ, গ্রহ-বৈগুণ্যে

তাহাদের কি মনঃকষ্ট বুঝিতে পারিয়া ধর্মভীরু বালক সেই মর্মান্তিক দুঃখ ছুরীকরণের জন্য শরীরের যাবতীয় শক্তি প্রদান করিয়া তাহাদের তুষ্টি-সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তিনি নৃসিংহদাস কর্তৃক প্রতিপালিত হইলেও পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শনের ক্রটি করিতেন না। পিতামাতা ও নৃসিংহদাস যুবকের স্থললিত স্বভাব দেখিয়া মনে মনে বড়ই সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। বালক লেখাপড়া শিখিল না—হয়ত কুচরিত্র হইবে, পিতামাতা ও পালনকর্তার নামে কলঙ্ককালিমা মাখাইবে, এই ভয়ে তাঁহারা বড়ই ভীত হইয়াছিলেন কিন্তু হৃদয়দেবতা ভগবান রামচন্দ্র তাঁহাদের সে ভাবনাদূর করিয়াছেন। বালককে সংপথগামী করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে? সংস্বভাব-সম্পন্ন ধার্মিক পুত্রের পিতা হইতে পারা যে দেবতার অতুলনীয় আশীর্বাদ, তাহাকে না স্বীকার করিবে, কয়জনের ভাগ্যে আজকাল এ সৌভাগ্যোদয় হইয়া থাকে?

তুলসীদাস যাহার তাহার সঙ্গে ক্রীড়া করিতেন না, প্রতিবেশীমণ্ডলে কোন বালকের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য না থাকিলেও দুঃখারামের সহিত তাঁহার যেরূপ প্রাণের মিল ছিল, এমন আর কাহারও সহিত ছিল না। একত্র আহার, একত্র ভ্রমণ, একত্র শাস্ত্রাধ্যয়ন প্রভৃতি কার্য্যসম্পাদনে দুইটি যুবক যেন এক হইয়া গিয়াছিল, একটীর অদর্শনে আর একটা যারপর নাই কষ্ট অনুভব করিত। আজীবন সংসর্গের পর মানব এইরূপেই আপনাদেহ হইয়া যায়, ইহাকেই আমরা বন্ধুত্বের আদর্শ বলিয়া ঘোষণা করি।

প্রতিদিন স্নানের পর তুলসীদাস পিতামাতা ও গুরুদেবের চরণবন্দনা করিয়া তবে অন্য কাজে বাহির হইতেন। শিষ্ণু-বয়সমানের

বাটা পূজা করিতে যাইবার সময় তুলসীদাস সকলের অগ্রে এই কাজ সমাধা করিয়া হৃদয় আনন্দ-আপ্নৃত করতঃ তবে অন্য কার্যে গমন করিতেন, ইহাতে তাঁহার দেবার্চনার বেশ মন লাগিত, হৃদয় ভক্তি-রসে ভরিয়া যাইত। যজ্ঞমানের বাড়ীতে বেশী কাজকর্ম পড়িলে তুলসীদাস বন্ধু দুঃখীরামকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন এবং উভয়ে মিলিয়া কাজ সুসম্পন্ন করিতেন। তুলসীদাস কেবল স্বার্থসিদ্ধির দিক দিয়া পূজা করিয়া চালকলা আহরণ, দক্ষিণা গ্রহণ করিতেন না, সাম্বিক ভাব তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল, সেই ভাবেই তিনি পূজা করিতেন, ভাই শিষ্য যজ্ঞমানেরা তাঁহাকে ভক্তি করিত, তাঁহাকে পূজা করিতে আসিতে দেখিলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইত। দুই একটা ঘরের পূজা ভিন্ন যুবক তুলসীদাস দক্ষিণা লাভের জন্য বহু ঘরের পূজায় ব্রতী হইতেন না। পূজা ত আর বালকের ক্রীড়া নহে, যে মন্ত্রহীন পূজা করিয়া যজ্ঞমানের অমঙ্গল করিবেন? এইজন্যই সময়ে সময়ে তাঁহার প্রিয়বন্ধু দুঃখীকে সঙ্গে লইতে হইত।

আত্মারোগের বয়স হইয়াছে, ক্রমশঃ শরীর ভগ্ন হইতেছে; জরা-ব্যাধি ক্রমশঃ বার্কিক্যের বিধানানুসারে তাঁহার দেহপিঞ্জর অধিকার করিতেছে; আর বেশীদিন জীবিত থাকিবার আশা নাই। আত্মারান পুত্রকে নিকটে ডাকিয়া তাহার শারীরিক অবস্থার কথা বলিলেন, গুরুদেব তুলসীকে সে বিষয়ে সতর্ক হইতে বলিলেন; হুলসী দেবী স্বামীর অবস্থা দেখিয়া বড়ই ভাবিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু যখন পুত্র উপযুক্ত হইয়াছে, আর গুরুদেব নিকটে রহিয়াছেন, তখন তাঁহার চিন্তার কারণ কি? এ পাঞ্চভৌতিক দেহ ত একদিন না একদিন কালের কোলে মিশিয়া যাইবে, তথাপি স্ত্রী হইয়া, অর্দ্ধাঙ্গিনী সতী হইয়া কে কবে স্বামীর দেহভাগ কল্পনা করিয়া স্থস্থির থাকিতে পারিয়াছে?

হুলসী দেবী স্বামীকে জরামৃত্যুর কবলস্থ দেখিয়া আহা-নিদ্রা পরিত্যাগ করতঃ সেবা শুশ্রুষায় নিযুক্তা রহিলেন। তুলসীদাস পিতার অস্থিম-সময় উপস্থিত দেখিয়া নয়নজলে ভাসিতে লাগিলেন, গৃহস্থের নিয়মামুসারে চিকিৎসাও করাইলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, ছরস্ত কাল কোন বাধাই মানিল না। একদিন শীতের অপ-রাহ্নে, সূর্য্যোদেব যখন পাটে বসিতেছেন, দক্ষিণায়ণ উত্তীর্ণ হইয়া যখন উত্তরায়ণ আরম্ভ হইয়াছে, ঠিক সেই শুভ মুহূর্ত্তে আত্মারাম আত্মজনে ফাঁকি দিয়া, হৃদয় মধ্যে আত্মারামে আত্মসমর্পণ করিয়া, পার্শ্বব পাঞ্চভৌতিক দেহত্যাগ করতঃ শ্রীরামের পদতলে বিলীন হইলেন।

নৃসিংহদাস প্রিয় শিষ্য আত্মারামের মৃত্যুতে বড়ই কাতর হইয়া-ছিলেন কিন্তু তুলসী ও হুলসীর মুখ চাহিয়া তিনি শোক সঞ্চরণ করিলেন। প্রিয় শিষ্যের ঔর্দ্ধ দৈহিক ক্রিয়া সম্পাদনের জন্ত শাস্ত্রীয় বিধিব্যবস্থা প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার শবদেহ তুলসী-তলায় রাখিয়া সর্কাদ্রে রামনাম অঙ্কিত করিয়া দিয়া “রাম নাম সত্য” শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে শ্মশানে লইয়া গেলেন।

অনেকে বলেন—তখনকার নিয়মামুসারে হুলসী দেবী হাসিতে হাসিতে স্বামীর শবদেহ বক্ষে ধারণ করিয়া সহমৃত্যু হইয়াছিলেন। কিন্তু কোনও পুস্তকে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এজন্ত হুলসী দেবী যে একমাত্র পুত্রের মুখের প্রতি চাহিয়া এবং স্বামীর অমুমতি “তুমি তুলসীকে সংসারী করিয়া তবে আমার নিকট আসিও” এই বাক্য প্রতিপালন করিবার জন্ত আরও কিছুদিন জীবিতা ছিলেন—আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইলাম। শব যথাবিধি সংকার করিয়া সকলে বাড়ী ফিরিলেন। নৃসিংহদাস নিজের অবসামুসারে পালকপুত্র তুলসীদাসকে অশোচ মৃত্ত করাইলেন।

স্বামী স্বর্গগত হইলে হিন্দুস্ত্রী আর তাঁহার জীবনে তত আস্থা স্থাপন করেন না। যাহার জন্ম এ নারীজন্ম, তিনিই যখন চলিয়া গেলেন, তখন আর জীবনে স্মৃতি কি? তবে থাকিতে হয় তাই থাকে, তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বিনী হইয়া যতদিন না দেহের অবসান হয়, ততদিন ত থাকিতেই হইবে, তাই জীবন্মৃত হইয়া পুত্রকন্যা প্রতিপালন করিবার জন্ম এক প্রকার জীবন ধারণ করে। হুলসী দেবীও সেইরূপ মন-মরা হইয়া কালান্তিপাত করিতে লাগিলেন। এখন ভ আর তাঁহার মরণে ভয় নাই, তাই গুরুদেবের আদেশে পুত্রকে নিকটেই রাখিলেন। কিছুদিন পরে জননীর বাৎসল্যে, গুরুদেবের যত্নে, বন্ধুবর্গের সাহসনাবচনে তুলসী পিতার দুর্কিসহ শোক কথঞ্চিৎ বিস্মৃত হইলেন। কিন্তু সংসারবিরাগী, শোক-দুঃখ মোহের অতীত, নৃসিংহদাস পুত্রসম শিষ্য আত্মারামের শোকে দিন দিন বড়ই কাতর, বড়ই মুহূমান হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তিনি ত্যাগী হইয়াও আত্মারামের ন্যায় সাত্ত্বিক প্রকৃতি শিষ্যের জন্য ভোগী-সংসারী হইয়া, এতদিন বান্দাজেলার এই নিভৃত পল্লীতে বাস করিতে ছিলেন, এক্ষণে প্রিয় শিষ্যের অভাবে তাঁহার এ আবাস যেন কণ্টক-ময় বোধ হইতে লাগিল। ক্ষণে ক্ষণে আত্মারামের সেই সৌম্যমূর্তি মনে পড়িয়া নৃসিংহের ন্যায় সংঘমী মহাপুরুষের হৃদয়ও চঞ্চল করিয়া তুলিতে লাগিল। তিনি এইবার মহাপ্রস্থান করিয়া আত্মারামের নিকট উপস্থিত হইবার প্রয়াস পাইলেন, হিমালয়ের পাদদেশে তাঁহার চিরশাস্তিময় আশ্রমে প্রায়েপবেশনে দেহত্যাগ করিবার মনস্থ করিলেন। প্রিয় শিষ্য আত্মারাম ছাড়া নৃসিংহ কখনই এ অন্ধকার পুরে থাকিতে পারিবেন না; এই জন্ম কাহাকেও কোন কথা প্রকাশ না করিয়া, অন্ধদের ইচ্ছা অন্ধদেরই চাপিয়া রাখিয়া নৃসিংহদাস

যুবক তুলসীদাস ও হুলসী দেবীকে সংসারের পথে পাকা করিয়া দিবার জন্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

তুলসীদাস চিরকালই আমোদপ্রিয়, জননী ও গুরুদেবের আদর আপ্যায়নে আপ্যায়িত হইয়া বন্ধু দুঃখী তেওয়ারীর সহিত বেশ স্নখ-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। পুত্রকে নিকটে পাইয়া, আত্মকে আত্মারামের দর্শনলালসা মিটাইয়া, তাঁহার স্মৃতির পূজা করিয়া সতীও একপ্রকার দুঃখ কষ্টে কাল কাটাইয়া দিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহ

উপযুক্ত শিষ্য—পুত্র তপেক্ষাও প্রিয়। নৃসিংহদাস ত্যাগী, ভক্ত, উন্নতমনা, সাধনমার্গে উচ্চাসনপ্রাপ্ত প্রিয় শিষ্য আত্মারামের বিরহে বড়ই কাতর হইলেন। কাহারও কাছে কোন কথা প্রকাশ না করিলেও কার্যগুণে মনের ভাব প্রকাশ হইয়া পড়িত। যাহাকে লইয়া এতদিন তিনি সংসারবিরাগী হইয়াও গৃহস্থের আচারব্যবহার, ক্রিয়া-কলাপে পুনরায় জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন, আজ তাঁহার বিহনে আবার সমস্তই শিথিলতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

স্বামীশোকাতুরা জননীর মলিন বদন এবং মায়ামোহের অতীত, পরম জ্ঞানী উদাসীন শ্রীগুরু নৃসিংহদাসের শিষ্য বিয়োগে সকল বিষয়ে মায়াহীনতা, কাতরতা, তুলসীদাসকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিত। যতক্ষণ বাহিরে বাহিরে দুঃখীর সহবাসে কাল কাটাইতেন, ততক্ষণ শোকের দারুণ বহি তাঁহার অন্তর দগ্ধ করিতে পারিত না। কিন্তু

যখনই গৃহে আসিয়া তাঁহাদের শোকের অবস্থা সন্দর্শন করিতেন, তখনই যেন সেই দেবোপম পিতৃমূর্তি তাঁহার নয়নের সম্মুখে খেলিয়া বেড়াইত। পিতার বিরহ শোক নবীভূত হইয়া, অন্তর কন্দরে দারুণ বৃশ্চিক দংশনের যাতনা আনিয়া তাঁহার ধীর প্রকৃতিকে বিষম বিচঞ্চল করিয়া ফেলিত। তুলসীদাস তখন আর বাটীতে অবস্থান করিতে পারিতেন না, গৃহত্যাগ করিয়া বন্ধুর সহবাস-স্থল উপভোগ করিতে পুনরায় দুঃখীর বাড়ী দৌড়িয়া যাইতেন।

দুঃখীর বাটীতে কেহ ছিল না; অতি গৈশবে পিতৃমাতৃ বিয়োগের পর এক দূর সম্পর্কীয়া মাতুলানী আসিয়া তাহার প্রতিপালনের ভার লইয়াছিল; দীনদয়াল ও তদীয় পত্নীর মৃত্যুর পর দুঃখী ইহারই দ্বারা প্রতিপালিত হইত। পূর্বেই বলিয়াছি—তখন ভারতবর্ষে সংসার পরিচালনের জ্ঞান কাহাকেও কষ্ট পাইতে হইত না। দীনদয়ালের ষে ষৎসামান্য জমীজমা ছিল, তাহারই আয়ে মাতুলানীও ভাগিনেয়ের ভরণ-পোষণ বেশ স্বখে স্বচ্ছন্দে চালাইয়া তাহাকে মাতুল করিয়াছিলেন। তারপর দুঃখী বড় হইলে, তাহার উপনয়ন ক্রিয়া সমাধা হইলে সে তুলসীদাসের সহিত রাজ্য ক্রিয়া করিয়া গ্রামাচ্ছাদনের সহায়তা করিত। এইরূপে স্বখে দুঃখে, দুঃখীর সংসার একপ্রকার হাসি খেলায় চলিয়া যাইত।

তুলসীদাস ও দুঃখী তেওয়ারীতে এক প্রাণ, এক আত্মা। প্রকৃত বন্ধুত্ব হইলে যেক্রপভাবে দুইটি আত্মা একত্র বন্ধহীন হয়; উভয়ে স্থখ—দুঃখ, আপদ—বিপদ অনুভব করে, এই দুইটি যুবকের মধ্যেও ঠিক সেইরূপ প্রাণের প্রণয়ভাব উদ্দীপিত হইয়া উভয়কে এই দারুণ দুঃখের মধ্যে আনন্দের আসন প্রদান করিয়াছিল। তুলসীদাস জননীর করুণ আর্তনাদে গৃহে তিষ্ঠিতে না পারিলেই

হুঃখীর ভবনে পলায়ন করিতেন ; এমন কি, দুই একদিন তথায় রাত্রিবাসও করিতেন। পতি-বিরহ-বিধুরা জননী, রাত্রে পুত্রকে কাছে না দেখিয়া সমস্ত রাত্রি ছট্‌ফট্‌ করিতেন, কিছুতেই শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিতেন না। প্রাতঃকালে অঞ্চলের ধন তুলসী গৃহে আসিলে আবার তবে আহারাদির উত্তোগ করিতেন। তাহার আসিতে বিলম্ব হইলে, জননী গুরুগৃহে দৌড়িয়া যাইতেন এবং “তুলসী কোথায়” বলিয়া কাদিয়া আকুল হইতেন।

নৃসিংহদাস তুলসীর ভাবগতিক দেখিয়া বড়ই কাতর হইলেন, এ সময় যদি সে বিগড়াইয়া যায়, যদি গৃহত্যাগ করে, তাহা হইলে তিনি হুলসীকে লইয়া মহা বিব্রতে পড়িবেন, তাঁহার মনের অভি-
লাষ পূর্ণ হইবে না। তাহাদের মায়ায় পুনরায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সম্মাস গ্রহণের আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইবে। আত্মারাম বেক্রপে তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, হুলসী দেবীও বুদ্ধি তাহাকে সেই-
রূপ বাঁধিয়া রাখে ! অতএব তুলসী যাহাতে আর গৃহত্যাগ করিয়া অস্ত্র-
রজনী যাপন না করে—মায়ের অঞ্চলের নিধি, তাঁহার অঞ্চল ধারণ
করিয়া, তাঁহার অহুগত হইয়া যাহাতে সংসার-ধর্ম প্রতিপালন
করে, সে বিষয়ে আর উদাস থাকিলে চলিবে না। হুঃখিনী হুলসী
দেবী যে বজ্রসম শোক পাইয়াছে, তাহার উপর পুত্রের অদর্শন
তাহার অসহ্য হইলে, কি জানি অভাগিনী কি করিতে কি করিয়া
ফেলিবে। এই সময় তুলসী যাহাতে গৃহে স্থায়ী হয়, সংসারী হইয়া
জননীর সেবা করে—তাহার উপায় করিতে হইবে। নৃসিংহদাস
একুপ উপায় চিন্তা করিয়া গোপনে তুলসীদাসের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির
করিতে লাগিলেন। শিষ্যানী হুলসীর নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপিত
করিলে তিনি অতি সঙ্কট চিন্তে সে বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন

পাতা মুড়িবেন না। তুলসীদাস

করিলেন। পুত্র সংসারী হইবে—একটি সুন্দরী নববধূ আসিয়া তাঁহার গৃহ-প্রাঙ্গণ আলোকিত করিবে, ইহাতে কোন জননী অনভিমত প্রকাশ করেন?

তুলসীদাসের বংশ খুব সম্ভ্রান্ত এবং সে সময়ের হিসাবে সম্পত্তিশালীও কম নহে। গুরুদেবের শিষ্য-বজ্রমানের পাওনা-গণ্ডা তাহার সমস্ত হইয়াছে, আর পিতার ত আছেই, এ অবস্থায় তাঁহাদের সংসার খুব স্বচ্ছলে চলিয়া যায়। তুলসী দশ কর্মেও বেশ সুপণ্ডিত এবং সুকর্মী হইয়া উঠিয়াছে, এমন অবস্থায় তাঁহাকে কন্যাদান করিতে, এরূপ সর্বগুণযুক্ত পাত্রকে জামাতা করিতে কার না ইচ্ছা হইবে? নসিংহদাস গোস্বামী জ্যোতিষ-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, তিনি অনেক স্থানে তুলসীদাসের জন্ম অনেকগুলি কন্যা দেখিলেন কিন্তু কোনটিই তাঁহার মনোমত হইল না, শেষে তাঁহার এক অন্তরঙ্গ ছাত্র শিষ্য দীনবন্ধু পাঠকের রূপবতী কন্যার সন্ধান পাইলেন, দীনবন্ধু দরিদ্রতা প্রযুক্ত কন্যাদায়ে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কন্যা রত্নাবলী অত্যন্ত বয়স্কা হইয়া পড়িয়াছে, আর বিবাহ না দিলে চলে না কিন্তু দীনবন্ধু কোথায় কি পাইবে, কন্যাদায়ে সামান্য অর্থও তা আবশ্যক? ব্রাহ্মণ আকাশ পাতাল ভাবিতে-ছিলেন, এমন সময় নসিংহদাস তাঁহাকে ডাকিয়া তুলসীর সহিত তাহার কন্যার বিবাহ দিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। তুলসীদাসের ন্যায় সংপাত্রে যে তাহার কন্যাদান ঘটিবে—ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই; এজন্য পুলকিত চিত্তে নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করিয়া পাঠক মহাশয় গুরুদেবের কথায় স্বীকৃত হইয়া বলিলেন—প্রভু! আমার ত কিছুই সংস্থান নাই, তুলসীদাসের জননীর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে পারিব কেন?

নৃসিংহদাস কন্যাদায়গ্রস্ত শিশুকে অভয় দিয়া বলিলেন—আগামী শুভলগ্নে বিবাহের আয়োজন কর, হুলসী দেবীকে সম্মত কর। আমার ভার রহিল।

রত্নাবলীর রূপ কাঁচাসোনার মত, দরিত্রের কন্যা বলিয়া তাহার গুণও যথেষ্ট ছিল।

নৃসিংহদাস গণনা করিয়া দেখিয়াছেন—রাজঘোটক মিলন হইয়াছে, উত্তরকালে পতিপত্নী ধর্ম-ধনে বিশেষরূপে ধনী হইবে, তবে আর কালবিলম্ব কেন? গুরুদেব হুলসীদেবীকে সমস্ত কথা বলিলে—তিনি আর তাঁহার কথায় দ্বিক্রান্তি করিতে পারিলেন না।

হুলসী দেবীও পুত্রের বিবাহ দিবার জন্ত বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছিলেন। এই নির্ঝাঙ্কব পুরীতে একটি নববধূ আসিয়া তাঁহার ঘর আলো করিবে, সুখে দুঃখে তাঁহার সহায় হইবে, সেবা শুশ্রূষা করিবে, পাত্রী রূপসী হইলে তাঁহার তুলসীও গৃহবাসী হইবে—সে যে বড় সৌন্দর্য্য প্রিয়। কোন বস্তু সুন্দর দেখিলে সে যে একেবারে মোহিত হইয়া পড়ে; স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, কোন সুন্দর মুখ দেখিলে সে যে সহজেই তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলে, প্রিয় বন্ধু দুঃখীর সুন্দর মুখ দেখিয়াই ত তুলসী তাহার সহিত একরূপ বন্ধুত্ব করিয়া মজিয়া গিয়াছে। গুরুদেব বলিয়াছেন—পাত্রীর রূপ কাঁচাসোনার মত, সর্বস্বলক্ষণ সম্পন্ন, অঙ্গ সৌষ্ঠব ও নিখুঁত, তবে পাত্রীর পিতা অতি দরিত্র, কিছু দিতে পারিবে না। নাই বা দিতে পারিল, যাহার অর্থ নাই, তাহার কি কন্যার বিবাহ হইবে না? জননী গুরুদেবের কথায় তুলসীদাসকে বিবাহবর্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। তুলসীদাস জানিতেন—সংসারধর্ম প্রতিপালন করিতে হইলে সহদর্শিনীর সাহায্য আবশ্যক। এখন

না হয় জননী আছেন কিন্তু পিতার ন্যায় তিনিও যখন ইহসংসার ত্যাগ করিবেন, তখন ত সাহায্যকারিণী একজন পাকা গৃহিণী ত এই সংসার-তরণীর দাঁড় ধরিবার জন্ত আবশ্যক হইবে? যে গৃহে গৃহিণীর নীতল হস্তের স্পর্শ নাই, সে গৃহ ত শ্রীহীন, শোভা সৌন্দর্য্য তাহার কোথায়!

যখন সাক্ষাৎ দেবীসমা জননী ও পরম পূজনীয় পালনকর্ত্তা গুরুদেব এ বিষয়ে অনুরোধ করিতেছেন, তখন আর ভিন্ন মত করা উচিত নহে। দুঃখীরামও এ সময় আসিয়া যোগ দিল, সেও সনির্বন্ধ অনুরোধে বলিল—ভাই তুলসী! ইহাদের কথা অবহেলা করিও না। তুলসীদাস আর কোন কথা কহিলেন না।

একদিন শুভক্ষণে শুভলগ্নে দানবন্ধু পাঠকের রূপবতী কন্যা রত্নাবলীর সহিত তুলসীদাসের শুভ পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল। পুত্র বধুর অলোক সামান্য রূপ-সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া, পুত্রের ভাবী সংসার-অনাশক্তির মূলচ্ছেদ হইল ভাবিয়া হুলসী দেবী ননে মনে স্থখী হইলেন। রূপের মোহে এ জগতে মুগ্ধ নয় কে? আজন্ম রূপ-সৌন্দর্য্যের ভিখারী তুলসীদাস স্থখী হইলেন, বয়স্থা রূপসী অর্দ্ধাঙ্গিণী লাভ করিয়া তিনি পূর্ণমাত্রায় সংসারী হইয়া পড়িলেন। এইবার পুত্রের সংসার ত্যাগের ভাবী আশঙ্কা মাথের মন হইতে বিদূরিত হইল। হুলসী দেবী আবার সকল উৎকণ্ঠা দূরে ফেলিয়া পুত্র ও পুত্রবধু সহ পূর্ব্বের ন্যায় সংসার করিতে লাগিলেন।

নৃসিংহদাস হুলসী দেবীর ভাব দেখিয়া এবং তিনি পুত্র ও পুত্রবধু পাইয়া স্বামী শোক অনেকাংশে ভুলিতে পারিয়াছেন দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি দ্বিবেদীর বংশপরম্পরাগত গুরু, আত্মারাম, সন্ন্যাসীক তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুলসী ও

রত্নাবলীকে দীক্ষিত করিয়া তিনি তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইবেন, এ মায়াময় সংসারে আর থাকিবেন না। যাহার মায়াময় মোহিত হইয়া তিনি সন্ন্যাসী হইয়াও গৃহী সাজিয়াছেন; যাহার প্রীতি উৎপাদনের জন্য তিনি ত্যাগী হইয়াও ভোগ-বিলাসে এত-কাল কাটাইয়াছেন, এখন সেই প্রিয়শিষ্য আত্মারাম ত আর নাই, তবে আর কাহার জন্য এ বন্ধন। এক্ষণে স্বর্গগত আত্মারামের পুত্র ও পুত্রবধূকে দীক্ষিত করা তাঁহার কর্তব্য, কারণ তাহা না হইলে তুলসীর চিত্তস্থির হইবে না; তাহার ভবিষ্যজীবন যে খুব সমুজ্জ্বল, নৃসিংহদাস তাহা পূর্ব হইতে জ্যোতিষের দ্বারা অবগত হইয়াছিলেন।

রত্নাবলী বয়স্কা হইয়াই বিবাহিতা হইয়াছে, তারপর একবৎসর হইল—তাহার কন্যাকালও উত্তীর্ণ হইয়াছে, অতএব এই সময়ে তাহাকেও তুলসীর সহিত দীক্ষিতা করিতে পারা যায়, এইরূপ স্থির করিয়া নৃসিংহদাস তুলসীর নিকট তাহাদের দীক্ষাদানের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। নৃসিংহদাস তাহাদের সকল বিষয়ের কর্তা, তাঁহার কথাই অন্যথা করা কাহার সাধ্য নহে। ধর্মকর্মের বিষয় তিনি যাহা বলিবেন—তাহার উপর আর কথা কি? তুলসী দেবী অতিশয় আগ্রহের সহিত তাহা শিরোধার্য্য করিলেন।

তুলসীদাস বহুদিন হইতেই অন্তরে যন্ত্র গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা পরিপোষণ করিতেছিলেন কিন্তু নানাপ্রকার বাধা-বিপত্তি উপস্থিত হওয়ায় এতদিন তাহা গুরুর নিকট প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এক্ষণে সঙ্গীক দীক্ষিত হইবেন—গুরুদেব ও জননী আদেশ করিয়াছেন শুনিয়া তুলসীদাস বড়ই পুলকিত হইলেন।

শুভদিন স্থির হইলে নৃসিংহদাস তুলসী ও রত্নাবলীর ক

তাহাদের কুলমন্ত্র “রাম নাম” প্রদান করিলেন। তুলসীদাসের কর্ণের মধ্য দিয়া যখন সেই স্বর্গীয় স্বধার আধার কুলমন্ত্র মর্মে প্রবিষ্ট হইল, ভক্তিবান তুলসীদাস তখন পুলকিত চিত্তে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। সিদ্ধ সাধক নৃসিংহদাসের ত্রায় গুরু কর্তৃক দীক্ষিত হইয়া, সেই দ্বিঅক্ষরযুক্ত সিদ্ধ রামমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া তুলসীদাসের দেহ অনবরত ভক্তিরসে কটকিত হইতে লাগিল, ভক্তির অত্যধিক আবেগে তিনি ঘেন বাহুজ্ঞান হারাইবার উপক্রম করিলেন, গুরুদেব যুবকের ভক্তি-ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার বীজ উপযুক্ত ক্ষেত্রে পতিত হইল, কালে এ বীজ হইতে যে ফলবান বৃক্ষের উৎপত্তি হইবে, এক সময়ে স্তাহার দ্বারা পৃথিবীর মহৎ উপকার সাধিত হইবে বুঝিতে পারিয়া তিনি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। সতী রত্নাবলীও গুরুমন্ত্র লাভ করিয়া প্রাণপণে ভক্তিভরে সেই মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। দীনবন্ধু পাঠক কহা—জামাতার দীক্ষার দিন উপস্থিত ছিলেন, তিনিও উভয়ের ভাব দেখিয়া মনে মনে বড়ই পুলকপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। তুলসী দেবীর মনও সে আনন্দে নাচিয়া উঠিল, পুলক-কহা সংপৎগামী হইলে পিতামাতার মন স্বভাবতই এইরূপ হইয়া থাকে।

এইবার নৃসিংহদাসের সকল দিক মুক্ত হইল, তাঁহার সকল কর্তব্য শেষ হইল দেখিয়া কয়েক মাস পরে তিনি তীর্থ ভ্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। চিরকাল একস্থানে বসিয়া কাটাইলে আমার পার্যত্রিক কার্যের বিশেষ ক্ষতি হইবে; তোমরা আর আমাকে এমন করিয়া বাধিয়া রাখিও না; আমি এইবার এ স্থান ত্যাগ করিব। বান্দাবাসী সকলেই তাঁহার শিষ্য না হইলেও এই বোগীস্বরকে সকলেই মান্য করিত, তাঁহার স্থান ত্যাগের কথা

ভূনিয়া সকলেই দুঃখিত হইল। হুলসী, তুলসী ও রত্নাবলী কাদিয়া আকুল হইলেন, দীনবন্ধু পাঠক তাহার গতি কি হইবে ভাবিয়া, গুরুদেবের পদে ধরিয়া কাদিতে লাগিলেন। তিনি সকলকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—চিন্তা করিও না, ধর্মপথে থাকিলে ভগবান রাম-চন্দ্র তোমাদের সর্বাদ্বীন মঙ্গল করিবেন। যে মন্ত্র তোমাদের প্রদান করিয়াছি, নিষ্ঠাভরে, ভক্তিপূত হৃদয়ে তাহা জপ করিলে সকল বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিবে। “রাম নামে” জীবের সকল আপদ-বিপদ বিদূরিত হয়।

নৃসিংহদাস এইরূপে সকলকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া, আগত-অভ্যাগত সকলকে স্নেহাশীর্ষাদ করিয়া একদিন প্রাতঃকালে রাজা-পুর গ্রাম ত্যাগ করিলেন। পাখী মায়ার শিকল কাটিয়া উড়িয়া গেল, পুনরায় ধরা দিবার আশা দিয়া গিয়াছে কিন্তু প্রকৃতির যুক্ত বাতাসে মায়া-শিকল কাটিয়া পাখী উড়িলে কি আর স্বইচ্ছায় ধরা দেয়, মায়াযুক্ত সাধু পুরুষ একবার পলাইতে পারিলে আবার কি ফিরিয়া আসিবেন? ইহাই তাঁহার শেষ দর্শন ভাবিয়া সকলে দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রণয় সঞ্চার

“বিয়ে করলে ঘর চলে না” এই প্রবাদবাক্যটি সকল দেশেই সমানভাবে প্রচলিত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—যখন সংসারে বেশী লোকজন থাকে না—কাজকর্মের জন্ত লোকের অত্যন্ত অভাব হয়—তখন গৃহিণী বা কত্রী হাড়ভাঙ্গা খাটুনির দ্বারা সংসারের আলয়-আশ্রয় দেখেন—পুত্র পরিজনের সেবা শুশ্রূষায় দেহপাত করেন কিন্তু যখনই একটি হাত মুড়কুং ঘরে আসিয়া উপস্থিত হয়—অর্থাৎ পুত্র-পৌত্রাদির বিবাহ হইয়া একটি বধু ঘরে আসে, তখন আর তিনি একাকিনী থাকিতে চাহেন না—সেই সাহায্যকারিণী রমণীটি কাছে না থাকিলে—তাহার সংসার-কার্য্য যেন আর ভাল লাগে না। সে সাহায্যকারিণীটি যদি আবার বয়স্কা বা উপযুক্ত হন—তাহা হইলে ত কথাই নাই; তাহাকে ছাড়িয়া থাকা যেন তখন দায় হইয়া উঠে।

সৌভাগ্যক্রমে তুলসী দেবী বয়স্কা একটি বধু পাইয়াছেন—এতদিন পরে তাঁর প্রাণের তুলসীর বিবাহ হইয়াছে। বধুটি স্বরূপা এবং কশ্মিষ্ঠা, রূপের কান্দাল তুলসী বধুটির প্রতি একান্ত অনুরক্ত, সে এতদিন গৃহবাসী হইবে না—সংসার করিবে না বলিয়া একপ্রকার ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, বিবাহের পর যখন সে বধুর রূপগুণে মোহিত হইয়া আবার সংসার করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছে, তখন আর কেন বধুটিকে বাপের বাটি ফেলিয়া রাখা উচিত নয়?

হুলসী দেবী একটা শুভদিন দেখিয়া বধুটিকে ঘরে আনিলেন। তাঁহার ত বয়স হইয়াছে—কোনদিন শমন দূত আসিয়া তাঁহার মহা প্রস্থানের হুকুম জারি করে—এই সময় বধুটিকে সংসারকাৰ্য্যে স্থনিপুনা করিয়া যাইতে পারিলে, ছেলেটার পক্ষে অনেক ভাল হয়, বধুটী দুঃখের সংসার স্থখে চালাইতে পারিলে ভবিষ্যতে তুলসীকে আর সংসার-সংগ্রামে হাবড়াইয়া পড়িয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিতে হইবে না। জীলোকই ত সংসারের সার—তাঁহার হাতেই ত ইহার উন্নতি-অবনতি নির্ভর করিতেছে? পুরুষ যতই অবুঝ হউক, জী সুবুদ্ধি সম্পন্ন, পাকা হইলে সংসারের সকল কষ্ট নষ্ট হইবে; তিনিও ত অতি অল্প বয়সে স্বামীর ভাঙ্গা সংসারে চুকিয়া কেমন সুন্দরভাবে তাহা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন—কালে তাহাকে কেমন সুখের আশ্বাস করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই সকল চিন্তা করিয়া হুলসী দেবী রত্নাবলীকে হাতে ধরিয়া সমস্ত গৃহকর্ম শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

তুলসী চিরকালই সৌন্দর্য্য প্রিয়, ভাল চেহারার লোক দেখিলে সে আগেই তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া বসে—কাছে কাছে থাকিয়া তাহার সহিত সন্তানের আদান প্রদানে আত্মীয়তা করিয়া ফেলে। সে নিজে বড় রূপবান—তাই রূপের সহিত মাখামাখি করা তাহার অত্যন্ত অভ্যাস—এই রূপের জন্যই দুঃখীরামের সহিত তাহার এত সৌহৃদ্য।

যেদিন হইতে রত্নাবলী গৃহে আসিয়াছেন, সেইদিন হইতে তুলসী আর বাড়ী ছাড়া হন না—রাত্রে পরের বাড়ী শুইতে যান না। অনবরত ঘরেই থাকেন, ঘরের কাজকর্ম করেন, বাজারে যাওয়া—জিনিষপত্রাদি স্মরিদ করা, মজুর লইয়া বাগানের আওলাংপত্র দেখা

প্রভৃতিতে মন দিয়াছেন, যজমান বাড়ী কাজকর্ম পড়িলে বন্ধু দুঃখীরামের সহিত তাহা আগ্রহের সহিত সম্পাদন করিতেছেন। অর্থের আবশ্যক হইয়াছে—এখন ত আর বসিয়া থাকিলে চলিবে না? তবে যজমান বাড়ীর পাওনা-গণ্ডা তিনি পূর্বের ত্রায় বন্ধু দুঃখীরামকে কিছু কিছু দিতেন—যাহাতে তাহার সংসার চলে। তুলসীদাস সে বিষয়ে একদিনও কৃপণতা বা টানাটানি করেন না। পরোপকার যে সর্বোপেক্ষা প্রধান ধর্ম—তাহা তিনি বিশেষ করিয়া গুরুদেবের নিকট উপদেশ পাইয়াছিলেন। চরিত্রই মানবের অমূল্য সম্পত্তি—ইহার অপব্যবহারে মানুষ যে পশুত্ব প্রাপ্ত হয়—নৃসিংহদাস তাহা তাহাকে প্রাণপণে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন—তাঁহারই শিক্ষাগুণে তুলসীর চরিত্র চিরদিন নির্মল—খাঁটি সোনা।

পুত্রকে সংসার কার্যে একপভাবে মনোনিবেশ করিতে দেখিয়া জননীর আর আনন্দের সীমা রহিল না। দুঃখীও তাহার মাতুলানী তুলসীদাসকে সংসার কার্যে মত্ত হইতে দেখিয়া বিশেষ সুখী হইলেন। তুলসীদাসের খাইয়াই যে তাহারা মানুষ; কোন কিছু ভাল দ্রব্য পাইলে তিনি যে তাহাদের না দিয়া খান না—এ হেন পরমোপকারী সংসারবিরাগী বন্ধুকে বিশেষভাবে সংসার কার্যে মত্ত হইতে দেখিলে কার না আনন্দ হয়?

যাজ্ঞক্রিয়াই তুলসীদাসের উপজীবিকা—রাজাপুর গ্রামের অধিকাংশ ব্রাহ্মণই তাঁহার যজমান—কাজেই ইহাদের পৌরহিত্য করিয়া তুলসীদাসের সংসার বেশ স্বচ্ছলে চলিয়া বাইত; সঙ্গে সাথে থাকিয়া দুঃখীরামেরও কোন অভাব হইত না। প্রতিদিনই যজমান বাড়ী দুই একটা কাজকর্ম ত থাকিতই; পূজা পার্বণে তাহা এত বেশী হইত যে দুইজনে সমস্তদিন যজমান বাড়ী ঘরিলেও

ফুরাইত না—তুই একজন নূতন লোকও নিযুক্ত করিতে হইত।

এইসকল কাজকর্ম সারিয়াও তুলসীদাস প্রত্যহ তিন চারি ঘণ্টা অধ্যয়ন করিতেন—শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ, দেবদেবীর বিষয়ে জ্ঞানলাভ তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। নূতন নূতন শাস্ত্রপাঠে তাঁহার আত্মরক্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল। তখনকার দিনে যেখানে যত নূতন পুঁথি পাওয়া যাইত—তুলসীদাস তাহা সংগ্রহ করিতে ছাড়িতেন না। অধ্যয়ন সমাপন করিয়া তিনি প্রত্যহ ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম সন্ধ্যা আহ্নিক করিতেন—তারপর ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া আহারাদি করিতেন।

বধুমাতা উপযুক্ত হওয়ায় হলসী দেবী সংসার কার্যে একটু অসামান পাইয়াছেন। এখন আর তাঁহাকে তত খাটিতে হয় না—সমস্তই রত্নাবলী অতি পরিপাটীরূপে সম্পন্ন করিয়া শাস্ত্রভীর প্রীতি সম্পাদন করেন। এই সামান্য দিনের মধ্যে রত্নাবলী সংসারকার্যে বেশ স্থনিপুণ হইয়াছেন। পাড়ার অপরাপর স্ত্রীলোকেরা তাহা দেখিয়া খুব তারিফ করে—শিক্ষয়িত্রীর বাহাদুরী দেয়। পাকা হাতের প্রাণখোলা শিক্ষা না পাইলে কি একজন নূতন লোক এই সামান্য দিনের মধ্যে এমন কর্মকুশল হইতে পারে ?

পুত্রবধুর প্রশংসা শুনিয়া শাস্ত্রভীর প্রাণ পুলকিত হইত। এবার থেকে বৌমা যে নিজে সংসার করিতে পারিবে—করণীয় অকরণীয় বুঝিয়া লইতে পারিবে—সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই; কাজেই তিনি এখন একটু অবসর লইয়া আপনার পরকাল চিন্তায় মন দিয়াছেন, প্রাণারাম রামনাম জপে এখন দিবসের অধিকাংশ সময় যাপন করিতেছেন।

সংসারের রন্ধন—স্বামীর পরিবেশন, তিনি কিসে সুখী হন, কিসে না হন, প্রভৃতি দর্শন, এখন রত্নাবলীরই কার্য্য হইয়াছে। বধু উপযুক্ত হইলে শান্তুড়ী আর সংসার কার্য্যে তত অগ্রসর হন না। রত্নাবলী একে সুরূপা-সুন্দরী—তাহাতে নূতন ঘোবনের প্রবল তরঙ্গে আবার সে রূপের সৌন্দর্য্য এরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে যে দেখিলে নয়ন ফিরান যায় না—কামভাবে দেখিলে—ইহা প্রথর অগ্নিশিখার ছায়া; আর জননী ভাবে দেখিলে—ইহা অতি রমণীয়, কমণীয়—বাৎসল্য ভাববিশিষ্ট। রত্নাবলীর রূপের ঔজ্জ্বল্য আছে—কিন্তু তীব্রতা নাই; সে বহুম নয়নে কান কটাক্ষ নাই, অতি মধুর স্নিগ্ধোজ্জল—শান্তভাবে, দেখিলে কানের বদলে প্রীতি-ভক্তির উদ্রেক হয়।

রূপের পাশল তুলসীদাস প্রণয়িনীর এই রূপ দেখিয়া—তাহার রমণীয় বরাঙ্গে ঘোবন ভাতি বিভাসিত দেখিয়া একান্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। এত রূপ—এত গুণ, তথাপি অহঙ্কার নাই—তাহার এই বৃহৎ সংসারে আসিয়া—সমস্তদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া রত্নাবলী একদিনের জন্তও দুঃখ প্রকাশ করেন না—একদিনের জন্ত কোনপ্রকার অভাব অভিযোগ তাহার মুখে শুনিতে পাওয়া যায় না; দরিদ্র পিতার ঘরে প্রতিপালিতা সতী, স্বামীর স্বচ্ছল সংসারে আসিয়া স্বভাবের কোনপ্রকার বৈলক্ষণ্য করেন নাই—যা পান তাই খান—যা পান তাই পরেন; মরি মরি—এমন স্ত্রী না হইলে কি তাহার দ্বারা সংসার উজ্জল হয়; এমন কর্মকুশল। পত্নী না হলে কি হিন্দুর সংসার লক্ষ্মীর আবাস ভূমি হইয়া চিরশান্তির আগার হইয়া উঠে?

তুলসীদাসও যেমনি স্ত্রীর রূপে মুগ্ধ; রত্নাবলীও তেমনি স্বামীর অতুলনীয় রূপ-জ্যোতি, সেই বরাঙ্গে ধর্ম্মের পবিত্র ভাতি দেখিয়া

আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেন। তাঁহার স্নায় দরিত্রের কন্যা যে এমন মহৎশে—এমন অশিক্ষিত সুন্দর স্বভাব সম্পন্ন স্বামীর অঙ্কশোভা বর্ধন করিবে, তাহা স্বপ্নেও কেহ ভাবে নাই; গুরুদেবের অশেষ রূপায়ই তাঁহার এইরূপ সৌভাগ্যোদয় হইয়াছে। শাস্ত্রভীর অকৃত্রিম আদর যত্রে এবং স্বামীর অতুলনায় ভালবাসায় রত্নাবলী বারংবার নাই সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। একজন আর একজনকে না দেখিলে থাকিতে পারে না,—বিশেষতঃ তুলসী-দাস রত্নাবলীকে চক্ষুর অন্তরাল করিতে পারিতেন না। -ইহাতে সকলে তাঁহাকে স্ত্রীর একান্ত বশব্দ, দ্বৈগ্ন বলিয়া অসম্মাতে কত নিন্দা করিত; দুঃখীও সময়ে সময়ে তামাসা করিয়া বলিত—ভাই! এত ভাল নয়! রূপ যৌবন নিশার স্বপন।

তুলসী সে কথায় হাসিয়া বলিত—কি জানি ভাই! এরূপে কিরূপ একটা মাদকতা আছে—যেন নেশার বশীভূত হয়ে পড়েছি—না দেখলে থাকতে পারি না।

দুঃখী বন্ধুর ভাব দেখিয়া কোনপ্রকার নিকটসাহিত করিত না—একেত ভাদ্রা মন ঘোড়া লাগিয়াছে। তুলসীর ত সংসার করিবার কোন আশাই ছিল না; যখন হয়েছে—তখন একটু ভাল করেই হউক, সে বলিত—ভাই! প্রথম প্রথম ও রকম হয়েই থাকে—আমি তামাসা করে বলছি বলে কিছু মনে করো না—বৌদির কাছে প্রকাশ করে যেন আমার গালাগালি খাইও না!

তুলসীর এইরূপ অতিরিক্ত পক্ষীশ্রেয় দেখিয়া পাড়ার সকলে বাহাই বলুক—জননী বা দুঃখীর মাতুলানী কিছু বলিত না,—তুলসী যে এমন হয়েছে—এই তাঁহারা ভাগ্য বলিয়া মনে করেন—নতুবা

বিগ্ড়াইয়াইত গিয়াছিল—মাধু সাজিয়া সংসার ত্যাগের উপক্রম করিতেছিল। বন্ধুবর দুঃখীরাম কেবল সময়ে সময়ে হাসি তামাসা করিয়া, কত পরিহাস রসিকতা করিয়া তাঁহাদের প্রণয় বন্ধন আরও দৃঢ়তর করিবার জন্য প্রয়াস পাইত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পতিপত্নী

দ্বিরাগমনের পর দুই তিন বৎসর হইল—বধু শশুরালয়ে আদি-
রাছে—আর পাঠাইবার নাম নাই। কন্টার জননী কত কান্নাকাটি
করিতেছেন—দীনবন্ধু কত পত্র লিখিতেছেন কিন্তু তুলসীদাস তাহা
গ্রাহ্য করেন না। আপনার দোষ ঢাকাইয়া—স্ত্রীকে ছাড়িয়া, তাহার
বিরহ সহ্য করিয়া যে তিনি থাকিতে পারিবেন না—সে কথা না
বলিয়া বলিতেন—মা, অত্যন্ত বৃদ্ধা হয়েছেন—তাঁর কষ্ট হয়—সেবা-
শুক্লা হয় না—এইজন্য কেমন করিয়া পাঠাই বলুন; বিয়ে শু
তাঁর জন্যই করা। নতুবা আমি শু সংসার কর্কে না বলেই
প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, কেবল তাঁর চক্ষের জল দেখেই শু আশাকে
বাঁধা পড়তে হলো।

এ কথা সকলেই জানে যে তুলসীদাস চিরকাল সংসারে
বিতৃষ্ণ—কেবল শুভ্রর আদেশে এবং জনমীর কষ্টের জন্য তিনি
বিবাহ করিয়াছেন। তথাপি দীনবন্ধু গৃহিণীর অহরোধ জানাইয়া
বাবা। দুই তিন দিনের জন্য পাঠাইয়া দাও, বলিয়া কত অহু-
রোধ করিতেন, লোক পাঠাইতেন, কিন্তু সমস্তই বুঝা, তুলসীদাস তাহা

শুনিতেন না। রত্নাবলীও দুই একদিনের জন্য স্বামী-সোহাগে বঞ্চিতা হইয়া পিতামাতা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনকে দেখিয়া আদিবেদ বলিয়া, যাইবার জন্য কত জিদ করিতেন। তুলসীদাস কিন্তু সে কথা কানে করিতেন না, দুই একটা মিষ্ট কথা বলিয়া, দুই একটা সোহাগের, আদরের আভাস দিয়া সে কথা উড়াইয়া দিতেন। এরূপ আদরে, স্বামীর বিনা অনুমতিতে কোন্ হিন্দু স্ত্রী আর রত্নাবলী আদর আপ্যায়নে মুগ্ধ হইলেও সময়ে সময়ে পিতামাতার জন্ত মরমে মরিয়া থাকিতেন—কিন্তু পাছে স্বামীর কোনপ্রকার মনোকষ্টের কারণ হইতে হয় বলিয়া—তাহা প্রকাশ করিতেন না।

পাড়ার অগ্ন্যন্ত স্ত্রীলোকেরা তুলসীর কাণ্ড কারখানা দেখিয়া—নব বধূটার প্রতি অন্যায় অত্যাচার দেখিয়া বলিত—হারে তুলসী। বিয়ে করলে কি আর ঘর চলে না, এতদিন কি করে চলতো বাবা, তেমনি করে না হয় দুই চারদিন চালা না—আহা! ছুঁড়ীটা মা-বাপকে দেখতে না পেয়ে যেন মুসড়ে গেছে—দুই তিন বছর পরে কার না জন্মভূমি দেখতে, বাপমাকে দেখতে সাধ হয়—এত আর খতেপত্রে লিখে দেওয়া নয়—যে জান্ বিক্রী কর্ত্তে হয়েছে?

তুলসীদাস সে কথা শুনিয়া কোন উত্তর করিতেন না—আমতা আমতা করিয়া সেস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন। তুলসীদাসের ভাবগতিক দেখিয়া সকলেই ধিকার দিয়া বলিত—এমন মাগ্‌মুখো পুরুষও ত দেখিনি বাবা। বিয়ে আর কার কখন হয়নি—না এমন সুন্দরী মাগ কেউ কখন পায়নি—ছোড়াটার সবই অনাস্থ্যে একগুয়েমী, মা ত এমন নয়—সে ত পাঠাতে রাজী আছে।

ছোড়াই যত নষ্টের গোড়া। আমাদের অমন ভাতার হলে একবার দেখে নিতুম। রত্নাবলী মুখচোরা হাবাগবা মেয়ে, তাই অত সজ্জি করে। আমরা হলে অমন ভাতারের ভাত খেতুম না! ওমা, কেন দাস খৎ লিখে দিইনি ত?

অনেকদিন আসিয়াছে একবার না পাঠালে ভাল দেখায় না; চিঠির উপর চিঠি আসিতেছে—ষউও মুখ ভার করে রয়েছে। সত্যি ত তারা মেয়ে বেচে খায়নি! কিন্তু তুলসী যে একগুঁয়ে ছেলে, নিজের মতে পাঠালে কি জানি কি করে বসবে। হলসীদেবী নিজেকে কিছু করিতে পারেন না। পুত্রকে কত বুঝাইতেছেন বলিতেছেন—বাবা! দুই একদিনের জন্ত একবার পাঠিয়ে দে, তারপর না হয় নিজে আসি, আহা, বাপমায়ের প্রাণ ত, এতদিন না দেখে অস্থির হয়েছে?

তুলসীদাস তাহার উত্তরে বলেন—মা! জরু, গরু, খান—তিন রাখবে আপন বিদ্যমান—এই তিন ত্র্যাকে আপনার সম্মুখেই রাখতে হয়। বউত তোমার এখন ছেলে মানুষ নয় যে বাপেরবাড়ী গিয়ে বসে থাকবে। আর বাপ মা মেয়ের বিয়ে দেন কেন—নিজে সাবধানে রাখতে পারবে না বলেই ত? লোকে বা বলে বদুক—তাদের কথা তুমি শুনো না!

হলসী। লোকের কথা কি বাবা! তোর শত্রুরের বড় অস্থখ, এ সময় না পাঠালেই নয়?

তুলসী। এ কথা তোমায় কে বলে?

হলসী। ঐ দেখনা—আজ আবার একখানা পত্ৰ এসেছে আর ওপাড়ার কলমী দিদি কার মুখে শুনে এসে আমায় বল্ছিল, বউয়ের বাপের বড় বেয়ারার—এ সময় না পাঠালে, কি ভাল দেখায় বাবা! তারা দুই চারদিনের মধ্যে পাঠী নিয়ে আসবে!

তুলসী। সে তখন দেখা যাবে—তুমি কারু কথায় কাণ দিও না।—বলিয়া তিনি ছুখীরামের সহিত বেড়াইতে গেল।

রত্নাবলী এখনকার মেয়ের মত মুখরা মেয়ে নহে। সে প্রাণ থাকিতে স্বামীর মুখের উপর কথা কহিতে পারবে না—তাহার অমতে কোন কাজ কর্তে পারবে না। স্বামী সাক্ষাৎ দেবতা—তাহার উপর কি কোন কথা চলে! কোন প্রকার শক্ত কথা কয়ে তাহার প্রাণে কষ্ট দিলে যে তার পাপ হবে? এ কাজ সতী রত্নাবলী প্রাণ থাকিতে করিতে পারেন না।

রাজাপুর গ্রামে কোন হাট-বাজার ছিল না। বান্দা জিলার নদী তীরে সপ্তাহান্তে হাট বসিত। গ্রামবাসিগণ সপ্তাহের মত সমস্ত আবশ্যক দ্রব্যাদি ঐ হাট হইতে কিনিয়া আনিত। আগামী কল্যা হাটের দিন। তুলসীদাস কি কি দ্রব্য দরকার জীর নিকট একটা কর্দ লইয়া ছুখীর বাড়ী গিয়াছেন—সে কাল হাটে যাইবে কি না? কিন্তু মা বলিলেন—হাটে কাল যাইতেই হইবে—বউমার কাপড় নাই, কিন্তু দুইজনেই যাইলে চলিবে না। রহিমপুরের রামচন্দ্র হবে বাণের শ্রদ্ধ করিবে—তাহার বাটীতে একজনকে যাইতে হইবে।

তুলসী বাটী আসিয়া মার মুখে ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন—তবে ছুখীই শ্রদ্ধ করাইতে যাইবে। আমি হাটে যাইব—কাপড় চোপড় কিন্তে হলে সে ত পারবে না!

বউয়ের কাপড় নিজে পছন্দ করিয়া কিনিয়া আনিবে; অত্ন কেহ কি মনের মত কাপড় কিনিতে পারিবে? তুলসীর নিজের একটু পছন্দ ছিল—নিতান্ত হিন্দুস্থানীর মত থাকিত না। পরমা আছে, নিতান্ত গরীবয়ানা চালে তিনি চালিতে পারিতেন না। তিনি জানিতেন “বা দিবে অঙ্গে তাই যাবে সঙ্গ”—অর্থের সম্ব্যাহার করা, ভাল

করিয়া খাওয়া-পরা করাই তিনি ভাল বুঝিতেন—যকের মত অর্থ সঞ্চয়
করিয়া নিজেদের আত্মারামকে কষ্ট দেওয়া তিনি মহাপাপ বলিয়া
মনে করিতেন। কেবল যে নিজের জন্য ঐরূপ করিতেন তাহা
নহে—অধীনস্থ জনগণের জন্যও তাঁহার ঐরূপ ব্যবস্থা ছিল।
তুলসীদাস অভাবে দান করিতেন—কেহ কষ্ট পাইলে তাহার প্রতিকার
জন্য প্রাণপণ করিতেন কিন্তু বাহাদুরী লইবার জন্য লোক জানা-
জানি হইতে দিতেন না। সকল ধর্ম অপেক্ষা দান ও দরিদ্র সেবা
যে শ্রেষ্ঠ তুলসীদাস তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া ভদ্রহুসারে
কাধ্য করিতেন। তাঁহার জীবনে এইটী প্রধান গুণ ছিল। কলমী
আদিয়া পিতার পীড়ার সংবাদ দিয়াছে—তাহার অবস্থা খারাপ ;
উঠিতে বসিতে পারেন না, তাই একবার রত্নাবলীকে দেখিতে
চাহিয়াছেন। কি জানি যদি ভাল মন্দ হয়—তাহা হইলে ত পিতার
সহিত এ জন্মে আর দেখা হইবে না। কথা শুনিয়া অবধি রত্নাবলীর
প্রাণ বড়ই অস্থির হইয়াছে ; পিতার এমন নিদান অবস্থা শুনিয়া
কাহার না মন খারাপ হয়? তাই তিনি রাজিতে শয্যার আশ্রয়
গ্রহণ না করিয়া বিরসবদনে ঘরে একধারে বসিয়া ভাবিতেছেন।
স্বামী ঘরে না আসিলে, তাঁহার পদসেবা না করিয়া ত শুইতে
পারেন না?

রামচন্দ্র হুকের পিতৃশ্রদ্ধে দুঃখীকে নিযুক্ত করিয়া তুলসীদাস
অনেক রাত্রে বাড়ী আসিলেন।—রত্নাবলীকে এমন বিরসবদনে বসিয়া
থাকিতে দেখিয়া তাঁহার প্রাণে আঘাত লাগিল। পত্নীর শুষ্ক মুখ
তুলসীদাস প্রাণান্তেও দেখিতে পারিতেন না। গৃহে প্রবেশ করিয়াই
বলিলেন—রত্ন! এমন করে বসে রয়েছ, এ কি কাঁদছো নাকি?

রত্নাবলী আশ্বস্তবর্ণ করিয়া বলিলেন—কই না, তবে মনটা বড়

ধারণা হয়েছে; বাবা কেমন আছেন, সংবাদ না পেলে হৃদয় হতে পারছি না? তুমি না হয় দুই একদিনের জন্ত পাঠিয়ে দাও আমি কি আর বেশী দিন থাকবো?

তুলসীদাস বলিলেন—রত্ন! তাতো জানি; কিন্তু আমি দুই একদিন ছেড়ে দিতেও পারি না—কেন যে এমন হয়—তাত বলতে পারি না, আরও ত অনেকের বউ আছে, কই তারা ত এমন করে না! হিন্দুস্থানীর মত স্বামী এক দিকে স্ত্রী এক দিকে কত দিনধরে পড়ে রয়েছে খোঁজ খবর নাই। রত্ন! গুরুদেব যে আমাদের কি রত্ন দিয়ে গিয়েছেন তা বুঝতে পারি না! এত লোক-লজ্জা পেয়েও আমার কিছু লজ্জা হয় না!”

রত্নাবলী স্বামীর অকৃত্রিম ভালবাসা বুঝিতে পারিয়াছিলেন—তুলসীদাস যে তাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে—তিনি রত্নাবলীর প্রণয়-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন—তাহা রত্নাবলীর জানিতে বাকী নাই। এইজন্ত রত্নাবলীও নিজের অস্তিত্ব কিছুমাত্র রাখেন না—তিনিও স্বামী-সাগরে একেবারে আত্মহারা—একেবারে তন্ময়! কিন্তু কি করিবেন—বাহার জন্ত তাহার এত সুখ—এত শান্তি—সেই পিতামাতাকে একবার চক্ষের দেখা না দেখিলে যে পতিত হইতে হইবে! কাজেই আর দুঃখ চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া একবার পিতৃভবনে বাইবার প্রার্থনা করিলেন।

তুলসীদাস বলিলেন—“আচ্ছা! কাল হাট থেকে এসে আমি একবার নিজেই যাইব। তাহার অবস্থা যদি একান্তই শোচনীয় হয়ে থাকে—তা হলে বাড়ীতে আসিয়া তোমায় রাখিয়া আসিব। স্বার্থ হলে পাঠাতে হবে বৈকি!

স্বামীর মন নরম হইয়াছে দেখিয়া রত্নাবলী, আর কিছু বলি-

লেন না—অতীব আগ্রহের সহিত পদসেবা করিতে লাগিলেন।
সে কমনীয় স্পর্শ স্নেহে সত্তরই নিদ্রা আকর্ষণ হইল। তুলসীদাস
নিদ্রিত হইলে সতী পতি-পদতলে শয়ন করিয়া দিবসের শ্রান্তি
দূর করিতে লাগিলেন।

অষ্ট পরিচ্ছেদ

অদর্শনে

প্রাতঃকাল হইতে না হইতেই তুলসীদাস হাটে চলিয়া গেলেন।
কারণ সকাল সকাল ফিরিয়া আহাঙ্গাদির পর আবার ধরমপুরে
টাহার খণ্ডরবাড়ী যাইতে হইবে—তথাকার সঠিক সংবাদ না দিলে
রত্নাবলী যে আর স্থির থাকিতে পারিতেছে না। জ্বর প্রাণে
আনন্দদান করা যে তাহার অবশ্য কর্তব্য কর্ম। দুঃখীরামও বজ্র-
মান বাড়ী শ্রদ্ধ করিতে গিয়াছে। অনেকদূর—প্রাতে বাহির না
হইলে ঠিক সময়ে উপস্থিত হইতে পারিবে না।

রত্নাবলী প্রাতের কাজকর্ম সারিয়া রক্তনশালায় প্রবেশ করিবেন,
এমন সময় ধরমপুর হইতে একজন লোক আসিয়া ডাকিল—“বাড়ীতে
কে গা, আমি ধরমপুর থেকে আসছি।” পরিচিত স্বর শুনিয়া
রত্নাবলী একটু অগ্রসর হইয়া দরজার নিকট প্রবেশ করতঃ বলি-
লেন—“কেও বলদেত্ত কাকা! এস, এস!”

বলদেত্ত বাটীতে প্রবেশ করিয়া বলিল—“রতন! তোর খাণ্ডী
কোথায়? তাঁকে একবার ডাক, তোকে এখনি মেতে হবে, তোর
বাবার বড় ব্যয়বাহ—দেবী করলে আর দেখা হবে না।”

হলসীদেবী বাটার মধ্যে গো-গৃহে গো-সেবা করিতেছিলেন। পর পুরুষের কথা শুনিয়া এবং বউ-মা তার সহিত কথা কহিতেছে দেখিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন—বলদেত্ত তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—“মা ! আমি তোমার বেইবাড়ী থেকে আসছি ; তোমার বেইহাইয়ের বড় শক্ত ব্যায়রাম। মেয়েকে একবার তিনি শেষ—দেখা দেখতে চান—দেখা করে গেলে বোধ হয়—আর দেখা হবে না।”

হাজার হউক জ্বীলোকের প্রাণ, বেহাইয়ের অবস্থা শুনিয়া হলসীদেবী ছল ছল নেত্রে বলিলেন—“তাইত বাবা ! তা তুলসী ত বাড়ী নাই, সে সকালে চাটে গিয়াছে ! এখন উপায় ?”

রত্নাবলী পিতার সাংঘাতিক পীড়ার কথা শুনিয়া ঘরের কোণে বসিয়া মৃদু চীৎকার করিয়া কাদিতে লাগিলেন। তুলসীর বাড়ীতে কুটুম্ব আসিয়াছে শুনিয়া দুঃখীর মামীও আসিয়া উপস্থিত হইল এবং দীনবন্ধু মৃত্যুশয্যায় শায়িত শুনিয়া দুঃখ করিতে লাগিল।

বলদেত্ত সমস্ত কথা শুনাইয়া বলিলেন—“আপনি এখন একবার রতনকে পাঠিয়ে দিন, আমি পাক্কী নিয়ে এসেছি।

হলসীদেবী বলিলেন—“তুমি যেকোন অবস্থা বলছো তাতে ত পাঠিয়ে দেওয়া উচিত, আমার আদৌ অনিচ্ছা নাই। কিন্তু ছেলে যে গোয়ার গোবিন্দ বাবা, সে কার কথা শুনে না ; বউ অস্ত তার প্রাণ, যেমন বিয়ে করবে না করবে না করেছিল, জ্বীলোকের নাম শুনেলে জলে উঠতো, এখন তেমনি হয়েছে! এসে যদি বৌকে দেখতে না পায়—তা হলে একটা অনর্থ বাড়িয়া বসবে,—ভাত তো খাবেই না, হাড়ী-টাড়ী ভেঙ্গে একেবারে করবে। এখন আমি কি করি বাবা বল ?”

দুঃখীর মামীও দুঃখ করিতে করিতে বলিল—“দিদি, এ অবস্থা

শুনে না পাঠালেও ভাল দেখায় না; তুমি আর অমত করে না, সে যা করে তা কর্কে, এখন কুটুংঘের মান রাখ।”

কথাটা অপর একজন সমর্থন করিল দোঁখিয়া বলদেব্ত বলিল—
“আমি এত করে অহুরোধ কর্তেম না, তবে নাকি ফুলো কাঁপা, জর, তার উপর পেট ছেড়ে দিয়েছে—কাকার নিদান অবস্থা—এ যাত্রায় রক্ষা পান—এমন বোধ হয় না—এইজন্ত এত অহুরোধ, নতুবা সোমন্ত মেয়ে শশুরবাড়ী থাক্বে—এর আর আশ্চর্য্য কি! আর তাকে নিয়ে যাবার জন্তই বা এত জোর জবরদস্তি কেন? একমাত্র মেয়ে, মৃত্যুকালে দেখা না হলে চিরকালের জন্ত একটা দুঃখ রয়ে যাবে।”

রত্নাবলী আর থাকিতে পারিলেন না—প্রাণ ফাটা দুঃখে কান্ধর হইয়া খাণ্ডড়ীর পায়ে ধরিয়া বলিল—“মা! তোমার পায়ে পাড়, তুমি আমাকে পাঠিয়ে দাও, একটীবার বাবাকে দেখে আসি, যদি তিনি একটু ভাল হন—তাহা হইলে আমি ছ’চার দিনের মধ্যে চলে আসবো, তুমি তাঁকে বুঝিয়ে বলো।”

ছলসী।—আমি কি অমত কচ্ছি মা, কি খুনে ছেলে তাত জান—এসে দেখতে না পেলো—ষেকরূপ বদরাগী, বিষম কাণ্ড একটা না করে ছাড়বে না।

রত্নাবলী তথাপি পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দুঃখীর মামীও বিশেষ করিয়া বলিতে লাগিল—“দিদি, কপালে যা থাকে তাই হবে। তুমি কুটুংঘের ছেলের অপমান করে না—কপাল ঠুকে পাঠিয়ে দাও।”

এদিকে বাহিরে পাকীর বেহারাগণ হাঁকাহাকী করিতে লাগিল। চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—বাবু! এক রাজ্যের পথ যেতে

হবে, আর দেরি করলে হবে না—আমরা নাইবার বেলার ভিতর পৌঁছে দিয়ে অগ্নি কাজে যাব, এই কাজটি নিয়ে সমস্তদিন থাকলে ত আর চলবে না? হাঁকাহাঁকী শুনিয়া আশে পাশের আরও দুই একজন বয়স্ক জীলোক আসিয়া জমায়েৎ হইয়া বলিল—“কিগো খুড়ি, আজ যে দোরের গোড়ায় পাকী খাড়া দেখছি—বৌমাকে নিতে এসেছে বৃষ্টি? আহা বেশ বেশ, অনেকদিন এসেছে, একবার পাঠিয়ে দাও, বাপমারও ত চক্ষের দেখার সাধ আছে।

বলদেত্ত বলিল—“তার জন্তে নয় গো, রতুর বাপের বড় ব্যায়-রাম, এখন যায়—তখন যায় হয়ে রয়েছেন, বৃষ্টি মেয়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্তই প্রাণটি এখনও ধড়ে রয়েছে। তা ঘেরকম দেবী হচ্ছে বোধ হয়—আর দেখা হয় না।”

“এ্যা বল কি” বলিয়া জীলোকটি শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—“খুড়িমা, এতে বাপু তুমি বৌমাকে না পাঠালে অধর্ম হবে, সত্যিই তো আর বেচে খায়নি, এ বিপদ শুনে কি রাখতে আছে? আমাদের ঘরেও ত বৌ বি আছে, কই মা এমন অলক্ষণে কাণ্ড ত কখন দেখিনি, তারা তো বছরে দুই একবার বাওয়া আসা করেই। এমন না হইলে কি কুটুম্বিতা থাকে? তার-পর এই বিপদের সময়—তুমি কেমন করে চূপ করে রয়েছো গো খুড়িমা!”

হলসী বলিলেন—“তোমাদের সঙ্গে আমাদের লক্ষ বাড়ী তফাত, তোমাদের ছেলে বাপমার কথা শুনে—আমার ছেলে কি তেমন, কিরকম মেজাজ তাতো জান?”

প্রতিবাসী।—হাজার মেজাজ হউক, এ বিপদ শুনে কেউ চূপ করে থাকতে পারে না খুড়ী! আহা! দেখ না, ছুড়ীটা শুনে

অবধি আধখানি হয়ে গেছে, কেঁদে কেঁদে বুক ভাঙাচ্ছে—তোরা
প্রাণেও কি একটু দয়ামায়া নেই ?

হলসী।—আমার মতে কাজ হলে, আমি বৌমাকে এতদিন
দুই তিনবার পাঠিয়ে দিতাম—কুটুম্বের সঙ্গে মনান্তর করা কি
কারো সাধ ?

প্রতিবাসী।—তা যাই হোক খুড়ি, এখন তুমি পাঠিয়ে দাও—
না হয় তুলসীকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বলো—সেও না হয়
দুই চারদিন থেকে, শশুর একটু ভাল হলে আবার সঙ্গে করে নিয়ে
আসবে।

দুঃখীর মামী।—হাঁ দিদি, সে যুক্তি মন্দ নয়—তুলসী ত অনেক-
কণ গেছে এই আসে বলে, তাই না হয় মত করো—আহা !
বউটার অবস্থা দেখে বড় দুঃখ হয়।

বলদেত্ত মনে মনে ভাবিল—এমন জৈগ পুরুষ ত কখনও
দেখিনি ! মাগ ছেড়ে একদণ্ড থাকতে পারে না—অপর সময়
হলে ছুঁচর কথা শুনাইয়া দিয়া তিনি পাখী লইয়া চলিয়া
যাইতেন। কিন্তু এ-ত আর সে সময় নয়—ঝগড়া করে শুধু ফিরে
গেলে ত চলবে না, মেয়েকে নিয়ে যেতেই হবে। তজ্জন মনের
দুঃখ মনে চাপিয়া বলিলেন—“দেখুন, সে কথাও মন্দ নয় : তাতে
এক কাজে দুই কাজ হবে—মেয়ে জামাই দুইজনকে দেখলে তাঁর
খুব আনন্দই হবে !

হলসী।—সে কথাও আমি তাকে অনেকবার বলেছি—তাতেও
সে রাজী নয়—বলে আমি কি ছোটলোকের ছেলে যে বউকে সঙ্গে
করে শশুরবাড়ী যাব। আজ সে হাটে গেছে—কখন যে আসবে
তারও তো ঠিক নাই !

বেহারাগণ অসহ্য তাড়া করিতে লাগিল, তারা বলিতে লাগিল—
বাবু! যাওয়া হয় ত বলুন—নইলে আমরা কিরে যাই। জিবেদী
মহাশয়ের অস্থখ, তাঁর কন্যাকে নিয়ে যাওয়া দরকার, তাই এত-
দূর এসেছি,—আমরা এতকণ কাছাকাছি শোয়ারী বইলে এর
চেয়ে ঢের বেশী পেতাম।

এক চৌচামেচি, এত উপরোধ-অনুরোধ, বউমার এত কান্না—
হলসীদেবীর প্রাণে আর সহ্য হইল না; তিনি বলিলেন—কপালে
যা থাকে তাই হবে—বউমা, তুমি কাপড় চোপড় ছেড়ে একটু
জল টল ধৈরে নাও, কুটুম্বের ছেলেটাকেও কিছু দাও, বেহারারা
চাঁৎকার কচ্ছে, ওদেরও কিছু জলপান দিয়া ঠাণ্ডা কর। তারপরও
সে যদি এসে না পড়ে—জুর্গা বলে চলে যাও, আমার কপালে
যা থাকে তাই হবে; এ বিপদ শুনে আর চূপ করে থাকা
যায় না।

হলসীদেবীর কথা শুনিয়া সকলে আশ্বস্ত হইল। রত্নাবলী, বলদেত্ত
ও বেহারাদের কিছু কিছু চিড়া গুড় দিলেন। নিজের প্রাণের
ভিতর ঝড় ফড় করিতেছে—বাপের অবস্থা না দেখলে কি আর
মুখে কিছু রুচে, তথাপি শান্ত্তীর সন্তোষের জন্য তিনি মুখ হাত
ধুইয়া একটু মিষ্ট মুখে দিলেন এবং একটা তাম্বুল চর্কণ করিতে
লাগিলেন।

তুলসীর এখনও দেখা নাই, কাজেই হলসীদেবী আর কাল
বিলম্ব না করিয়া বলদেত্তকে অনুরোধ দিলেন। রত্নাবলী শান্ত্তীর
পদধূলি লইয়া বলিলেন—মা! তুমি তাঁকে বুঝিয়ে বলো, বাবাকে
ভাল দেখলে আমি দুই চারদিন থেকেই চলে আসবো, তারপর
অপর বয়োজ্যেষ্ঠাগণের পদধূলি লইয়া তিনি যানারোহন করিলেন।

বেহারাগণ তৎক্ষণাৎ পাকী স্বস্তি করিয়া তাহাদের স্বাভাবিক স্বর তুলিয়া ছুটিতে লাগিল। বলদেত্ত সকলকে অভিবাদন করিয়া পাকীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

তখনও পাকাদি কিছুই হয় নাই। হলসীদেবী বধূমাতাকে পাঠাইয়া দিয়া কাপড়-চোপড় কাঁচিয়া চুল্লীতে অগ্নিসংযোগ করিয়া হাড়ী চাপাইয়া দিলেন। একেত বউ চলিয়া গিয়াছে, তার উপর আসিয়া ভাত না পাইলে তুলসী কি আর রক্ষা রাখিবে, এত রাত্তা কষ্ট করে আসছে? জননী তাড়াতাড়ি পাকাদি করিলেন—অন্যান্য দিন অপেক্ষা আজ পাকাদির প্রকার কিছু বেশী হইল, কি জানি যদি দুই এক তরকারীতে ছেলের মন না উঠে। ঘরে আসিয়া বউকে না দেখিলেইত তাহার মুণ্ড ঘুরে যাবে, খাওয়া-দাওয়া কোথায় থাকুবে—তথাপি মায়ের প্রাণ,—পুত্র বা ভালবাসে আজ সেই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া খিড়কীর পুকুরিলীতে কাপড় কাঁচিতে গেলেন।

বেলা অতিরিক্ত হইয়াছে—তখন প্রায় দ্বিতীয় প্রহর অতীত সময়ে তুলসীদাস হাটবাজার করিয়া মনোমত একজোড়া কাপড় কিনিয়া শ্রাস্ত কলেবরে বাটী আসিলেন। নিজের ঘরে গিয়া দেখিলেন—বউ নাই; এ ঘর সে ঘর খুঁজিলেন—তারপর বলিলেন—তাই ত এরা সব গেলো কোথা, ঘরের ভিতর কাপড় চোপড় গুলো ছড়ান রয়েছে—জিনিষপত্র গুলো সব এলোমেলো ভাবে চারদিকে ছড়ান দেখছি, ব্যাপার কি? বলিয়া উঠিলেঃঃ ঘরে ডাকিলেন—মা, মা, মা, ওমা। পুত্রের গলার জোর আওয়াজ শুনিয়া হলসীদেবী পুকুর হইতে উঠিলেঃঃ ঘরে সাড়া দিয়া বলিলেন—এই যে বাবা যাচ্ছি।

অন্যান্যদিন তুলসীর গলার স্বর শুনিলে রত্নাবলী দৌড়িয়া আসে,

কই আজত সে আসছে না; শ্বশুরের পীড়ার কথা বলে কেবলই পত্র আসছিল, আজ কি তবে তারা নিয়ে গেল নাকি?" তুলসীদাস অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া পুনরায় ডাকিলেন—মা, মা, ওমা! তোমারও পুকুরে যাবার কি আর সময় নেই বাছা?

হলসীদেবী দুঃখীরামের মামীকে সঙ্গে করিয়া গৃহ প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন—এই যে বাবা! আমি এসেছি? তুলসীদাস সান্ত্বিত্য বিরক্তিসহকারে বলিলেন—তোমাদের ত সময় অসময় নেই, যখন তখনই পুকুরঘাটে, বলি—এ কোথা গেল!

দুঃখীর মামী। হাঁ বাবা! কার কথা বলছো!

স্ট্রীকে না দেখিয়া তুলসীদাসের মাথা গরম হইয়া গিয়াছে, তিনি চারিদিক শূন্য দেখিতেছেন—প্রাণ একেবারে খারাপ হইয়া গিয়াছে; অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া বলিলেন—তোমরা আবার এখন কেন বাপু, তিতিবিরক্তের সময়?

তুলসীর ভাব দেখিয়া কোন একটা অনর্থপাত হবে ভাবিয়া—দুঃখীর মামীকে সরাইয়া দিয়া জননী বলিলেন—কি বলছিস্ বাবা! বউমার কথা জিজ্ঞাসা করছিস্!

তুলসী রাগত স্বরে হাঁ হাঁ—তা নয়ত আর কি, ঘরের মধ্যে আর করজন লোক?

সংবাদ ত দিতেই হইবে—হলসীদেবী ভয়ে দু একটা ঢোক গিলিয়া সাহসে তর করিয়া বলিলেন—এই বাবা! তোমার শ্বশুরের বড় ব্যারাম, এখন তখন হয়ে রয়েছেন, বাঁচবার আশা নেই; এতক্ষণ বেঁচে আছেন কি না—সন্দেহ; সেইজন্য পাখী নিয়ে লোক এসেছিল; পাঠিয়ে না দিয়ে কি করি, তবু আমি তোমার অপেক্ষার থাকতে বলে ছিলাম—সে বললে—জাহলে দেখা হবে না; তখন আর কি করি

বাবা! বউয়ের কান্না দেখে আর থাকতে পারলাম না; পাঠাতেই হলো।

তুলসীদাস কিয়ৎকণ স্তব্ধভাবে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। সে আমাকে না বলিয়া গেল কি করে। আমি যে তাহাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসি—এত ভালবাসা, এত আদর যত্ন যে আমি জীবনে কাহাকেও করি নাই। বাপের ব্যায়রাম বলে কি একদণ্ড দেরী সহিলো না? তার সেই কমনীয় কান্তি, নখর অধরের সেই মুহূ হাসি না দেখলে যে আমার মন অস্থির হয়—সে মুখচন্দ্রমা তিলেক না দেখলে যে আমার কিছুই ভাল লাগে না; জগতে এত জিনিস থাকতেও যে সমস্ত অন্ধকার বলে বোধ হয়—হায়! আমি এখন কি করি? সতী ছাড়া শিব থাকতে পারেন, নারায়ণ লক্ষ্মী ছাড়া হতে পারেন কিন্তু রত্ন ছাড়া তুলসী কেমন করে হবে? আজ চার বৎসর যে শশাঙ্ক লালিত বদন আমি সর্বদা নয়ন-গগনে ভাসিয়ে রাখতাম, একদিনও বাহার সুধাপানে আমার বিরক্তি হয় নাই; সেই সুধামুখীর সুধাময়বদন এ দুই তিন দিন না দেখে কেমন করে থাকবো! উঃ তা তো পারবো না! যদি স্বত্তরের মৃত্যু হয়, তাহলে ত দশ পনের দিন—না না এতদিন তাকে ছেড়ে তুলসীর প্রাণ থাকবে না; আমি আজই ধরমপুর চলে যাব।

তুলসীদাস উঠিলেন—কষ্টে সৃষ্টে কাপড় চোপড় ছাড়িয়া পূজায় বসিলেন কিন্তু মন কোথায়? সে যে অনেককণ রত্নাবলীর পাছ পাছ দৌড়িয়াছে! পূজা ঠিক হইল না, নামমাত্র নিত্য কর্ণসারিয়া তুলসীদাস জননীর অঙ্গুরোধে চারিটা ভাত চোকে মুখে পুরিয়া উঠিয়া পড়িলেন। প্রাণ উদাস হইয়াছে, তাহাতে আর তিনি নাই, তাই উদাস ভাবে বাটীর বাহির হইয়া রাগে গর গর করিতে করিতে বলিলেন—

না, এই জন্মের মত চলিলাম। জননী বুঝিলেন—তুলসী কাহাকেও না বলিয়া শত্রুবাটী যাইবে। কিন্তু সন্ধ্যা ত হয় হয়—আজ থাকিয়া গেলে ভাল হয়—জন্মের মত যাই, বলে গেলো যে, না জানি কি অনর্থপাতই করে, দেখি হুঃখী যদি বারণ কর্তে পারে, এইজন্য তাহাকে ডাকিতে গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মাের প্রাণ

অপরাহে তুলসী ধরমপুরাভিমুখে ছুটিল, স্ত্রীর অদর্শন সে একদণ্ডও সহ্য করিতে পারিবে না। কিন্তু বেলা ত বেশী নাই, ধরমপুর যাইতে রাত্রি অনেক হইবে, রাস্তা জঙ্গলে পূর্ণ; বাছার আমার বড়ই কষ্ট হইবে—আজ না যাইয়া কাল সকালে আহাঙ্গাদির পর যাইলে দিনে দিনেই পৌছিতে পারিত। হুঃখীরাম যদি তাহাকে বুঝাইয়া বুঝাইয়া ফিরাইতে পারে, এইজন্য তিনি অতি ক্ষীপ্র-গতিতে হুঃখীরামের গৃহাভিমুখে ছুটিয়াছেন—সে ত এখনও বেশীদূর যাইতে পারে নাই—হুঃখী যদি আজ তাহার গমনে বাধা দিতে পারে।

হুঃখীরাম মামীর মুখে বহুপত্নীর পিতৃভবন গমনের কথা শুনিয়াছিল—বোয়ের বাপের বড় ব্যাঘ্ররাম, বাঁচে কি না বাঁচে। তুলসীদাস এতক্ষণ হাট হইতে আসিয়াছে, দেখি সে বউকে না দেখিয়া কি করিতেছে, বলিয়া হুঃখীরামও আহাঙ্গাদির পর তাঁহাদের বাটীর দিকে আসিতেছিল, হাতে পুজার দ্রব্যাদিও ছিল। পথে হলসী-

দেবীর সহিত দেখা হইলে—“কিগো খুড়ীমা কোথায় যাচ্ছ” বলিয়া খম্কাইয়া দাঁড়াইল।

তুলসীদেবী দুঃখীরামকে দেখিয়া কাদিতে কাদিতে বলিলেন—
“দুঃখী! সর্বনাশ হয়েছে, বৌমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়েছি বলে তুলসী আমার রাগ করে কোথায় চলে গেলো, যাবার সময় বলে গেল—“এই জন্মের মত চললাম।” বলিয়া বৃদ্ধা হাউ মাউ করিয়া কাদিয়া উঠিলেন—এবং বলিলেন—“কি হবে বাবা দুঃখী, সে যে আমার অঙ্কের নড়ী, কাণা মায়ের ধন, এমন জান্লে কি আমি বউমাকে পাঠাতাম বাবা!

দুঃখীরাম ব্যাপার সমস্ত বৃত্তিতে পারিয়া বলিল—“খুড়ীমা! তার আর ভাবনা কি, বেশী রাগ হয়েছে—তাই অমন কথা বলে বাড়ী থেকে চলে গেছেন, রাগ পড়লেই আবার আসবেন।”

তুলসী। বাবা! যদি সে বিবাহী হয়ে যায়?

দুঃখী। বিবাহী কি হলেই হলো খুড়ীমা, বাড়ী ছেড়ে যাওয়া কি সহজ কাজ—তুমি মনে কর, কে তোমার মত বন্ধ করে—খাওয়াবে, পরাবে?

তুলসী। না বাবা! সে যেরূপ একগুঁয়ে ছেলে, তাতে সে সব কর্তে পারে—রাগলে তার জ্ঞান থাকে না, আমার ও বউমার উপর রাগ করে সে বাড়ী ছাড়াও হতে পারে—তার গুণে ঘাট নেই। বাবা! এখনও সময় আছে—তুই বাবা, এর একটা উপায় কর—নতুবা আমি ধরে থাকতে পারবো না!

দুঃখী। তার জন্য কোন ভাবনা নেই খুড়ীমা! দাদা বউদিকে ফিরিয়ে আনতে নিশ্চয়ই শ্বশুরবাড়ী গিয়েছেন, আজ আকাশের বড়ই ছুঁচোপ—নষ্টলে আজই আস্তেন—কাল আসবেনই, তার জন্য তুমি অত উত্তলা হইও না!

হলসী। না বাবা! তোর ওকথা আমার কিছুতেই মনে নেয় না, সে যেরূপ রেগে বেরিয়েছে, তাহাতে একটা অনর্থপাত করবেই! তুই আগে থাকতে তার একটা বিহীত কর।

দুঃখী। তবে কি তুমি আমাকে সেখানে যেতে বলো?

হলসী। সে এখনও সেখানে যেতে পারে নাই; পথেই আছে—তুই একটু আগ্ বাড়িয়ে, তাড়াতাড়ি গিয়ে, তাকে ধরে নিয়ে আয়।

দুঃখী। তা আমি যাচ্ছি—তোমার কথা ঠেলতে পারবো না, কিন্তু তিনি কোন পথে গেছেন, কেমন করে জানবো? ধরমপুরে বাবার ত অনেক পথ—তার উপর এই আকাশ ঘোর ষ্টাচ্ছন্ন হয়ে আসছে!

হলসী। তাতো দেখছি বাবা! তবে কি হবে?

দুঃখী। খুড়ী, ভালই হয়েছে—আকাশ যখন এত ঘুরে এসেছে, তখন দাদা, আর কোথাও যেতে পারবে না—হয় সেখানে যাবে—নয় কিরে আসবে। তুমি একটু চুপ করে থাক না—দেখই না দাদা কি কীর্তিটা করে—তারপর আমি কাল খুব ভোরে উঠিতে দাদাকে গিয়ে ধরবো; প্রথমে শগুরবাড়ী তাঁকে যেতেই হবে—সেখানে না যেয়ে পারবেন না। তুমি চল, বেলা প্রায় পড়ে এলো—খাওয়া দাওয়া করবে না?

হলসী। বাবা! যতক্ষণ না সে আমার ঘরে আসে, ততক্ষণ আমার মুখে কিছু রুচবে না; সে যে বড় মর্যাদাসিক কথা বলে গেছে দুঃখী!

দুঃখী। খুড়ী, তুমি ত জান, দাদার মনটা চিরকালই একটু বেতাল, ভাল কথা বলতে বলতে কল করে এমন একটা বেকাল কথা

বলে ফেলেন—যে তার মাথামুণ্ড কিছুই নাই; আজও সেইরকম বাঃভা একটা বলে বেরিয়েছেন—তুমি কি মনে কর খুড়ী, সন্ন্যাসী হওয়া সহজ কথা? আর তিনি যেইরকম বউদিকে ভালবাসেন, তাতে তাঁর পক্ষে সন্ন্যাসী হওয়া চলতেই পারে না; তুমি সেজন্য কিছু ভেবো না।

হুলসী।—বাবা, ঐ কথা শুনে অবধি প্রাণ টা আমার খড়ফড় কচ্ছে, কত কি অমঙ্গল-কথা মনে হচ্ছে—তা আর বলতে পারি না। বলিয়া বৃদ্ধা হাপুশ নয়নে রাস্তার ধারে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আহা! মাগের প্রাণ যে কত কোমল—বাৎসল্য রসে পূর্ণ, সন্তানের অদর্শন যে কিরূপ কষ্টদায়ক, বিশেষতঃ একমাত্র পুত্র “জন্মের মত যাচ্ছি” বললে যে কি কষ্ট হয়, প্রাণ কিরূপ আঁচর পেঁচর করে—তা দুঃখীরাম কি করে বুঝবে? সে বৃদ্ধার অবস্থা দেখিয়া স্তোক বাক্যে বলিল—খুড়ী মা! তোমার যদি এতই ভাবনা হয়, তা হলে আমি এখন যাচ্ছি, তুমি না-বা-থা-বে চলো।

হুলসী।—আঃ বাবা! কি বলে আর তোকে আশীর্বাদ করো, আমার চুলের মত তোর পেরমাই হোক, বাবা! ঐ কথা বলতেই আমি তোর কাছে যাচ্ছিলাম।

দুঃখী।—যাও খুড়ীমা, আর যেতে হবে না, তুমি নাওয়া-খাওয়া করগে যাও, সন্ধ্যা হয়ে এলো; আমি চাদর গামছা নিয়ে এখন যাচ্ছি।

দুঃখীরাম সেরূপ ছেলে নয়, সে কখনও মিথ্যা কথা বলে না। বখন বলিয়াছে, তখন সে নিশ্চয়ই যাবে, তবে রাজে আসা না আসা সে তাদের হাত—এত রাজে কি আর কি-আমাইকে কেউ পাঠায়? বেহাই ভাল থাকলেও পাঠাবে না, তবে যে ভাবনার

ভেবে মরছিলাম, দুঃখী গিয়ে পড়লে আর সে ভাবনা নাই ! সে গেলে, তুলসী কখনই বিবাগী- হয়ে যেতে পারবে না।

তুলসীদাস, চিরকাল সন্ন্যাসী হবো, বাড়ী ছেড়ে দেশে দেশে ফিরবো, বলিয়া সকলের কাছে আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিতেন। সে কথা শুনিয়া বৃদ্ধার প্রাণ বড়ই কাতর হইত, একমাত্র পুত্র, বাড়ী ছেড়ে গেলে তিনি এ অন্ধকার পুরীতে কেমন করিয়া থাকিবেন ? এট হেতু গুরুর পদে ধরিয়া ইহার একটা প্রতিকার করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন—তুলসী যাহাতে ঐ কথা আর মুখে না আনে, যাহাতে তাহার মতিগতি একেবারে ফিরিয়া যায়, বিশেষ অত্ননয় বিনয় করিয়া নৃসিংহদাসকে তুলসী উহার একটা কিনারা করিতে বলিতেন।

নৃসিংহদাস সমস্তই জানিতেন, তথাপি বৃদ্ধার মনস্তট্টর জন্য তুলসী-দাসের বিবাহ দিলেন। যুবক বড় সৌন্দর্য্য প্রিয়, স্নন্দর মুখ দেখিলে সে একেবারে মজিয়া যায়, তাহার কাছ ছাড়া হয় না। একটা খুব রূপসী কন্যার সহিত বিবাহ দিলে মন্দ হয় না ; মতিগতি ফিরিলেও ফিরতে পারে কিন্তু তুলসীদাসের সন্ন্যাস যোগ রহিয়াছে, কিছুতেই তাহাকে বাধিয়া রাখিতে পারা যাইবে না—একদিন না একদিন সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনায়, তাহার প্রসন্নতা লাভ করিয়া পরমভক্ত নামে অভিহিত হইবে ; বংশের মান, পিতা মাতার মুখোজ্জল করিবে। যদি তাহাই হয়—তাহা হইলে পূর্ব হইতেই তাহার বিবাহ দেওয়া উচিত—যদি সে গৃহত্যাগী হয়, তাহা হইলে বধূটির দ্বারা তুলসীর সেবা হইবে, কোন কষ্ট হইবে না, এই মনে করিয়া তিনি তুলসীকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিয়া দিয়া, জননীর ইচ্ছায় কঠিন প্রণয়-নিগড়ে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া, তিনি গ্রাম ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু এত

চেষ্টা করিয়াও কিছু হইল না, তুলসীদাস এখনও যে সেই কথাই বলে, তবে কি তুলসী আর ফিরিবে না?

তুলসীদেবীর ইহাই বিষম চিন্তার বিষয় হইয়াছে। এতদিন সে বউমাকে দেখিয়া ঐ মধ্যাহ্নিক কথা মুখে আনিত না; বউনার রূপে ভুলিয়া-কাছে কাছে থাকিত; দুইজনে কত ভালমন্দ, ধর্মকর্মের কথা কহিত; তাহাকে বাপের বাড়ী পাঠাইবার নাম পর্য্যন্ত একবার মুখে আনিত না, সে বউমাকে এত ভাল বাসতো; আমি সেই বউমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে কি কুকাড়ই করেছি, এখন বাছা আমার ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিরে এলে হয়—আমি আর কখনও তার অগতে বউমাকে কোথাও পাঠাব না, হে প্রভু বধুনাথ! আমার আঁচলের ধন তুলসীর মতিগতি ফিরিয়ে দাও, সে যেন বাড়ী ছাড়া না হয়।

বৃদ্ধা ইষ্ট দেবতার পদে প্রণাম করিতে করিতে বাটী ফিরিল। দুঃখী চলিয়া গিয়াছে, সে নিশ্চয়ই তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া আসিবে। তিনি বধুমাতাকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া অত্যন্ত অন্তায় কার্য করিয়াছেন, পাড়ার সকলে তখন তাঁহাকে অমুরোধ করিল কিন্তু এখন ত তুলসীকে সাঙ্গনা দিতে কেহই আসিল না! বাহা হউক, তিনি এত মন্দ কাজই বা কি করিয়াছেন? বেহাইয়ের অবস্থা ধারাপ, বাপে রিমে পাছে দেখা না হয়, এই জন্য দায়ে পড়িয়া পাঠাইয়াছেন—ইহাতে তাঁহার দোষ কিছুমাত্র নাই। তুলসীদেবী নানা প্রকার দুশ্চিন্তার অগ্নীরা হইয়া আহারে বসিলেন কিন্তু আহার করিতে পারিলেন না, হাতে ভাতের টুট্টিয়া, সমস্ত গরুর ডাবায় দিয়া খালা বাসন মাকিয়া আনিলেন। আজ তাহাতে আর তিনি নাই, কেবল একগুঁয়ে তুলসীদাসের কণ্ঠা যেনে করিতেছেন—না জানি সে কি করিতে কি করিয়া যবে।

বৈকাল হইতে আকাশে মেঘ হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর খুব বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তাথাপি সেইরূপ মেঘাভ্রমর—বিদ্যুৎ হানিতেছে, কড় কড় শব্দে বজ্রপাত হইতেছে, কেহ বাটীর বাহির হইতে পারিতেছে না; হুলসী সেই জলঝড়ে ভিজিয়া পুত্রহার। উন্মাদিনীর ন্যায় আবার দুঃখীরামের বাড়ী গমন করিলেন।

দুঃখী ধরমপুরে গিয়াছে। আজ বাড়ী আসিবে না শুনিয়া তাহার স্বামী মনিষাদেবী বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, হুলসীদেবী আসিয়া উঠেঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন কিন্তু কে শুনে—ঝড় বৃষ্টিতে সে স্বর দুঃখীর মাখীর কর্ণে পৌছিল না। অনেকক্ষণ জাকাডাকির পর মনীষা আসিয়া দ্বার খুলিয়া বলিল—কি গো দিদি! এত ঝড় জলে কেন? হুলসীদেবী বলিলেন—হ্যা মা! দুঃখী কি করে এসেছে?

মনীষা বলিলেন—এইত সন্ধ্যার একটু আগে সে গিয়েছে, এবং মনে কি ধরমপুর থেকে করে আসতে পারে—তাতে আবার এই দুঃখোগ। হুলসী শশবাস্তে বলিলেন—তাই বলছি মা! তাই বলছি, আহা, না জানি বাছার কত কষ্ট হবে; তা মা তুমি কিছু মনে করো না, যদি একলা থাকতে না পারে, তাহলে আমাদের বাড়ীতে এস না?

হুলসীদেবী নিজেই বাড়ীতে একাকিনী থাকিতে পারিতেছেন না। এইজন্য তাহাকে লইতে আসিয়া প্রকারান্তরে নিজের মনোভাবই প্রকাশ করিলেন। আহা, পুত্রপ্রাণা জননী একাকিনী কেমন করিয়া গৃহে থাকিবেন—তিনি কখন একাকিনী গৃহে অবস্থান করেন নাই; এরূপ নির্জনে রজনী বাণন একান্ত অসহ্য হওয়ায় প্রাণ অভ্যস্ত উদাস হইয়াছে, মনে নানাপ্রকার কুচিন্তার উদয় হইয়া তাঁহাকে ব্যর্থপর নাই কাতর করিয়া তুলিয়াছে, গৃহে থাকা

তাহার পক্ষে দায় হইয়াছে। তাই এত দুর্ভোগে তিনি বাড়ী ছাড়িয়া মনীয়ার কাছে আসিয়াছিলেন, মনে করিয়াছিলেন—মনের কথা বলিয়া তাহাকে আপন গৃহে লইয়া যাইবেন, সমস্ত রাজি দুঃখের কথা কহিয়া একপ্রকার মনাবরণ করিয়া থাকিবেন কিন্তু তাহা হইল না, তিনি আপনার কথা বলিবার পূর্বেই মনোয়া বলিলেন—কি করো দিদি! রাখাল ছোঁড়াটাও আজ বাড়ী গিয়েছে, এই দুর্ভোগে ঘর ফেলিয়া ত যেতে পারি না—নইলে তোমার কাছে গিয়ে শুভাম!

তুলসী হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। এই দুর্ভোগে তিনিও নিজের বাড়ী ছাড়িয়া তাহাদের বাড়ীতে থাকিতে পারেন না—এই জল ঝড়ে যদি বাড়ী আলুগা পাইয়া কেহ চুরি করে; সংসারে যাহা হউক হুচারখানা বাসন-কুসনো ত আছে? তার যেন কিছু দরকার নাই কিন্তু কাল বউ-বেটা এলে ত সে সব দরকার হবে? বৃদ্ধা পুনরায় বাড়ী আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া যাহাতে প্রাণে শান্তি আসে—যাহাতে বিপদে উদ্ধার পাওয়া যায়, সেই বিপদতারণ রাম রাজীবলোচনের নাম জপ করিতে লাগিলেন। দুঃখী যখন তুলসীর অশ্রুবর্ণে গিয়াছে, তখন আর কোন সন্দেহ নাই—ভাবিয়া তিনি একপ্রকার স্থ-দুঃখের আবেগে ভগবানের নাম জপ করিয়া রজনী যাপন করিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বৈরাগ্য

দারুণ অন্ধকার, বাড়—বৃষ্টি—বজ্রাঘাত, তথাপি দৃকপাত নাই। পত্নী-প্রেমমুগ্ধ যুবক তুলসীদাস—একান্তমনে সেই দারুণ দুৰ্যোগে পথ অতিবাহিত করিতেছেন। পাছে রাত্রি অনেক হইয়া যায়, পাছে তাঁহার প্রাণপ্রিয় পত্নী নিদ্রিতা হইয়া পড়েন—এইজন্য একান্ত অচুরাগে, প্রাণের একান্ত আবেগ ভরে—দিক্‌বিদিক জ্ঞান-শূন্য হইয়া, প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করত তুলসীদাস উর্দ্ধ্বাসে ছুটিয়াছেন। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত—বজ্রাদি সমস্ত ভিজিয়া গিয়াছে; অত্যন্ত বৃষ্টিতে সিক্ত হইয়া দেহ পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তথাপি বিরাম নাই—কোথাও বিশ্রাম না করিয়া তিনি অনবরত পথ অতিবাহিত করিতেছেন। অন্ধকারময় বন-জঙ্গলের পথ—কোথায় কি হিংস্র জন্তু গুপ্ত ভাবে বাস করিতেছে দংশন করিয়া প্রাণ নষ্ট করিবে—তখন সে চিন্তা তাহার নাই—যত শীঘ্র পারেন, তাঁহার প্রাণের প্রণয়িনীর নিকট পৌছিতে পারিলেই হইল। তুলসীদাসের প্রাণ তখন জীর প্রেমে এত মুগ্ধ, কণিক বিরহের পর তাহাকে দেখিবার জন্য এত ব্যতিব্যস্ত, যে নিজের প্রাণের প্রতি কিছুমাত্র মায়া নাই, শাস্ত্রপাঠী তুলসীদাসের হিতাহিত বিবেচনা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। সেই নব বিকসিত ঘোবনা, পদ্মপলাশ লোচনা রত্নাবলীর জন্য তাঁহার প্রাণ অস্থির! জীকে তিনি কণিক চক্ষুর অন্তরাল করিতে পারিতেন না, আর এ যে সমস্ত দিন গিয়াছে; তুলসী আর কতকণ সে অতুলনীয় মুখচন্দ্রমা

না দেখিয়া থাকিবেন? তাই যত বিলম্ব হইতেছে, পদে পদে যত পদক্ষলন হইতেছে, ততই তিনি উঠিপড়ি করিয়া দৌড়িয়াছেন।

যখন বহু কষ্টে ধরমপুর গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন—তখন রাহি দুইদণ্ড অতীত হইয়াছে। আকাশের মেঘের মলিনতা কাটিয়া গিয়াছে; বৃষ্টিও আর পড়িতেছে না, বিদ্যুৎও আর হানিতেছে না; বজ্রও আর ভীম রবে গর্জন করিতেছে না, তুলসীদাস অতীব আগ্রহের সহিত একেবারে শম্বরবাটীর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন।

সে দিন সকাল হইতে দীনবন্ধু একটু ভাল আছেন, জরের বেগ অনেক কমিয়াছে, পেটের পীড়া অনেক ধরিয়াছে—বোধ হয় আশার ধন নন্দিনীকে বহুদিনের পর দর্শন করিয়া বৃদ্ধের হতাশপ্রাণে একটু আশার সঞ্চার হইয়াছে; বাঁচিবার আশা না থাকিলেও এখন যে সেবা ভাল হইবে, সে পক্ষে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার পত্নী একাকিনী, কত দিক দেখিবেন? যত্নাশ্রয় পড়িয়া দীনবন্ধুর সেবার অত্যন্ত ক্রটি হইতেছিল, এই জন্য তুলসীর শাস্ত্রী লক্ষ্মীদেবী প্রতিবাসী বলদেওকে একেবারে পাখী লইয়া পাঠাইয়া ছিলেন, তাহা হইলে আর কেহ আপত্তি করিতে পারিবে না এবং পীড়া যে খুব শক্ত, তাহা সকলেরই প্রতীতি হইবে। বলদেও কন্যাকে লইয়া আসিলে বৃদ্ধ দীনবন্ধু একটু আশস্ত হইয়াছেন; তাহাকে দেখিয়া পীড়ার প্রকোপ ক্ষণিক একটু কমিয়াছে, আজ তাঁহার অবস্থা পূর্ব পূর্ব দিন অপেক্ষা খুব ভাল।

রত্নাবলী শম্বরবাড়ী হইতে আসিয়া সমস্ত দিন পিতার সেবা করিয়াছেন; সে অবস্থা দেখিয়া নয়নের জলে ভাসিয়াছেন, এখন সে সঙ্গীন অবস্থা হইতে একটু ভাল আছেন; বোধ হয় আজিকার রাজিটা টিকিলেও টিকিতে পারেন। তজ্জন জননীর অনেক বলা কওয়ার রত্নাবলী এই

নাড় চারিটী ভাত মুখে দিয়া, দাবায় আসিয়া একটু বসিয়াছেন। রত্নাবলীর মাতা সমস্ত দিন স্বামী-শুশ্রূষার ভার কন্যার উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, এখন কন্যাকে একটু আসান দিয়া অন্যান্য দিনের মত নিজেই সেভার গ্রহণ করিয়াছেন।

বহুদিন পরে রত্নাবলী শশুরবাড়ী হইতে আসিয়াছে, শুনিয়া পাড়ার সমবয়সী অনেক স্ত্রীলোক দীনবন্ধুকে যত না হউক, তাহাকে দেখিতে আসিয়াছে। তখন চারিদিকে জ্যোৎস্নায় ক্রিনিক ফুটিতেছে। রত্নাবলী আহালাদির পর তারকা পরিবেষ্টিতা রোহিনীর ন্যায় সজ্জীনীগণ সহ নানাবিধ সুখ-দুঃখের কথা কহিতেছেন। এমন সময় তুলসীদাস সিন্ধু বস্ত্রে তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন—রত্ন! একি, তুমি আমায় না বলিয়া চলিয়া এসেছ? তুলসীদাসকে দেখিয়া প্রতিবাসী যুবতীগণ লজ্জায় মস্তকাবরণ করিয়া পলায়ন করিল। রত্নাবলী স্বামীর নিকটে আসিলেন—তাহাকে উন্মাদের ন্যায় এতটা পথ জলে ভিজিয়া আসিতে দেখিয়া মনে বড় কষ্ট হইল, সামান্য ক্রোধও যে হয় নাই—তাহাও নহে। এমন কি স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা, যে নিজের শরীরের প্রতি মমতা নাই! আর দুই মাস নয়, ছয় মাস নয়, আট দশ ঘণ্টা আসিয়াছি, ইহাতেই এত অধৈর্য্য, পুরুষ মানুষের এত অধৈর্য্য হওয়াত ভাল নয়? বিশেষতঃ শাস্ত্র-পাঠী ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচর্য্য ধিনি চির সংযমী, তিনি রমণীর মোহে এত মোহিত কেন? রত্নাবলী কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—দেখ, সামান্য স্ত্রীর প্রতি এত আগন্তি ভাল নয়, ব্রাহ্মণ চিরকাল ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণ—সংযমই তাঁহাদের আশ্রয় ভূষণ, তুমি সেই ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ হইয়া একি করিতেছ! সামান্য রমণীর প্রতি আসক্ত হইয়া হিতাহিত বিবেচনা পূন্য হইয়া পড়িয়াছে? এই যে ভয়ানক বড় জল, এই যে তীক্ষ্ণ বজ্রপাত

হইয়া গেল, তুমি প্রাণের মায়া না করিয়া কোন্ সাহসে মাঠের উপর দিয়া এই দারুণ দুর্যোগে ভিজিতে ভিজিতে এখানে আসিলে, কেন একটা দিন কি আর তর সয় না ?

রমণীর রূপ ক্ষণস্থায়ী—নখর, এ দেহ অকিঞ্চিৎকর রক্ত, মাংস বশা প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত—আজ এইরূপ দেখিতেছ, দুদিন পরে ইহার প্রতি তাকাইতেও ইচ্ছা হইবে না, ইহা এমনি বিকৃত হইয়া যাইবে। পার্থিব সকল সৌন্দর্যই এইরূপ ক্ষণভঙ্গুর; অতএব ইহার প্রতি প্রাণের এত আসক্তি, হৃদয়ের এত অমুরাগ, মনের এত ব্যাকুলতা বৃদ্ধি না করিয়া, এইটে যদি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি অর্পণ কর্তে, তাঁহার জন্য যদি এইরূপ ব্যাকুল হইতে পারিতে, তাঁহাকে পাইবার বা দেখিবার জন্য যদি মনের এইরূপ অমুরাগ, এইরূপ প্রগাঢ় আসক্তি দেখাইতে পারিতে, তাহা হইলে আর সামান্য রূপজন্মোহে অভিভূত হইয়া তোমাকে এত দোড়াদোড়ি করিতে হইত না ? জাগতিক সকল রূপের আধার, সকল সৌন্দর্যের সারভূত, মহা-মহিমময় নব দুর্বাদলশ্যাম রাম গুণধামকে হৃদয় সিংহাসনে বসাইতে পারিলে তোমার সকল অভাব, সকল চিন্তা মিটিয়া যাইত ! কিছার মিছার রমণীর সৌন্দর্য, কিছার মিছার রমণী প্রেম; সেই চির হৃন্দর প্রেমময়ের প্রেম পারাবারে অবগাহন করিতে পারিলে—তোমার ইহকাল, পর কাল, ভবের সমস্ত জঞ্জাল জাল কাটিয়া যাইত, তুমি অনন্ত রূপ-সাগরে, স্বর্গীয় প্রেম-সাগরের অমিয় তরঙ্গে সঁতার দিয়া মানব জন্ম সার্থক করিতে, নখর জগতের কোন সৌন্দর্য আর তোমায় এমন করিয়া বধা অভিভূত করিয়া ছুটাছুটি করাইতে পারিত না। স্বামীন; তোমার এ পত্নী প্রিয়তা বড় বিবশ দেখিতেছি !

তুলসীদাসের চমক ভাঙ্গিল। মহিমাময়ী রমণীর তীব্র বচনবাণে,

তাহার গুপ্ত হৃদয়ের স্থপতি প্রায় মহাব্যাক্ত একমুহূর্তে জাগিয়া উঠিল, প্রাণের রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া দেহের প্রত্যেক পরতে পরতে কি একটা নবীন শক্তির সঞ্চার হইল, মন বিবেকের দারুণ কষাঘাতে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল; রমণীর সৌন্দর্য্য-চটকের চটক! ভাঙ্গিয়া গেল, হঠাৎ প্রবুদ্ধ হইয়া বুঝিতে পারিলেন—তাইতো আমি একি করিতেছি! কিসের জন্য এত লালায়িত, কিসের জন্য এত মমতায় অভিভূত, কিসের জন্য সামান্য রমণীর সৌন্দর্য্য-প্রেমে এরূপ মত্ত হইয়া দ্বিজেন্দ্রের তথা ব্রাহ্মণেন্দ্রের এত অবমাননা করিতেছি? আমি না ঋষিকল্প মহাত্মা আত্মারামের আশ্রয়, আমিই না মহাপুরুষ সৰ্ব্বভাগী শঙ্কর সদৃশ গুরুদেব নৃসিংহদাসের প্রিয়তম শিষ্য! তিনি না আজীবন প্রাণপণ করিয়া প্রতিপালন করত আমাকে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পদে অর্পণ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—বাবা! হুখে-হুখে, বিপদে-সম্পদে এই মন্ত্রই তোমার আশ্রয়, এই মন্ত্র ও মূর্তি হৃদয় মধ্যে জাগরিত রাখিতে পারিলে, ত্রিলোকী তলে তোমার আর কোন ভাবনা থাকিবেনা, জগতে কিছুই অভাব হইবে না, ত্রিতাপতপ্ত মনপ্রাণ জুড়াইতে হইলে সদা সৰ্ব্বদা একান্ত মনে এই মহামন্ত্র জপ করিও—এই বীজমন্ত্রের মধ্যেই তোমার জগন্মোহন কমললোচন, নয়নাভিরাম শ্রীরামের মূর্তি বিরাজিত দেখিয়া প্রাণে অপার আনন্দ, অতুলনীয় শাস্তি অনুভব করিবে! হায়! এমন অপার্থিব অমৃত পাইয়া, তাহার আশ্বাদনে বঞ্চিত হইয়া—আমি একি করিতেছি! স্বর্গীয় সুধায় বঞ্চিত হইয়া বিষ্ঠার মজ্জিতেছি! তুলসীদাস মুগ্ধচিত্ত হইয়া তীব্র কটাক্ষে রত্নাবলীর সেই সুন্দর মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—“রত্নাবলী, প্রিয়তমে! এতদিনে তুমি আমার চৈতন্য সম্পাদন করলে—আমার হৃদয়ের রুদ্ধ-দ্বার তোমার তীব্র বচন-কষাঘাতে সহসা উন্মুক্ত হয়ে গেল! আজ

বুঝিলাম—তুমি আমার অজ্ঞাননাশিনী, সুশিক্ষাদায়িনী, বথার্থ সহধর্মিণী! আজ জগৎ প্রপঞ্চের সমস্ত মায়া পাশ ছিন্ন হইয়াছে; তোমার তিরস্কার আজ পুরস্কাররূপে আমার প্রাণে ধর্মের উৎস খুলিয়া দিয়াছে; দ্বিজজ্ঞাতির কর্তব্যের পথ আজ আমার নয়ন সম্মুখে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে—আহা কি সুন্দর! কি মনোরম পন্থা! যোগী-ঋষিগণ যে পন্থা অনুসরণ করে, গন্তব্যস্থানে গমন করিয়া ভবের সকল ভাবনা হতে অব্যাহতি পাইয়াছেন—সাধুসন্ন্যাসীগণ যে রমণীয় পথের পথিক হইয়া জীবন ধন্য করিয়াছেন; এ যে সেই পথ, এই পথে যাইলে যে আমার প্রাণের আরাধ্য দেবতার দর্শন লাভে মনপ্রাণ পরিতৃপ্ত হইবে! সে চির সুন্দর নবজলধব মূর্তি, ঐ যে আমার নয়নের সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ঐ যে আমার প্রেমময়ের প্রেম-পারাবার উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গে নৃত্য করিতেছে—ঐ যে আমার প্রাণের দেবতা তাহার মাঝখানে বসিয়া ডাকিতেছেন—কে দুঃখী, তাপি, পাপী, আয়—এই প্রেম-সমুদ্রে অবগাহন করে আয়—তোদের দারুণ ব্যথার উপশম করিয়া দিই! প্রিয়ে! আর না, আর না—আর দাঁড়াইবার সময় নাই, যাই—যাই—” পাগলের ত্রায় তুলসীদাস উর্দ্ধ্বাশে ছুটিলেন।

রত্নাবলী স্বামীর অবস্থা দেখিয়া ভীত হইলেন—হাত ধরিয়া টানিয়া বলিলেন—“প্রভু! দাসী আমি, না জানিয়া অনেক কথা রাগের বশে বলিয়া ফেলিয়াছি—ক্ষমা কর, রক্ষা কর! বলিয়া হাত টানিতে লাগিলেন। কিন্তু তীব্র বৈরাগ্য ভাব একবার হৃদয়ে আগিয়া উঠিলে—জগতের কোন বাধাই আর তাহাকে বাধা দিতে পারে না।

তুলসীদাস বিভোর প্রাণে বলিলেন—“প্রিয়ে! নহ দাসী তুমি মোর, জ্ঞানদাত্রী, শিক্ষাদাত্রী মহাপুরুষরূপে আজ আমার চক্ষের আবরণ উন্মোচন

করিয়া দিলে—আর না, ছাড়—যাই যাই! বলিয়া তুলসীদাস আর কাহারও প্রতি চাহিলেন না। এত সাধের—এত স্নেহের—এত ভালবাসার রত্নাবলী ধূলায় পড়িয়া কাদিতে লাগিল—তথাপি আর তাহার প্রতি মায়ায় সঞ্চার হইল না। প্রেম-বিরাগী সিদ্ধার্থ যেমন প্রেমময়ী গোপার প্রণয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া—সমস্ত রাজভোগে জলাঞ্জলী দিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, আজ মহাত্মা তুলসীদাস বিবেক-বাহুর তীব্র তেজে তেজস্বীমান হইয়া, জগতের দাবতীয় মায়া পাশ ছেদন করিয়া—সেই রাত্রেই কোথায় উধাও হইয়া গেলেন।

রত্নাবলী কাদিয়া আকুল হইলেন। কন্নার কান্না শুনিয়া জননী দৌড়িয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“রত্ন! একি, ধূলায় পড়িয়া এমন করিয়া কাদছিস্ কেন? কর্তা ত ভাল আছেন; তিনি ত বেশ সজ্ঞানে কথা কহিতেছেন, তবে তুই কাদিয়া আকুল হচ্ছিস্ কেন? জননী মনে করিলেন—কন্না বৃদ্ধি মুগ্ধ পিতার অবস্থা দেখিয়া মনের আবেগে নির্জনে আসিয়া কাদিতেছে, তাই তিনি সাহুনা করিয়া বলিলেন—কেন কাদছিস্ মা! কর্তা ত ভাল আছেন।”

রত্নাবলী জননীকে দেখিয়া আরও আকুল নয়ান প্রাণের আবেগে কাদিতে কাদিতে বলিলেন—“মা! সর্বনাশ করেছি। তিনি আমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন—একদণ্ড চক্ষের আড় করেন না—আজ তাঁহাকে না বলিয়া চলিয়া আদিয়াছি, তাই তিনি আমার অদর্শন সহ্য কর্তে না পেরে, এত দুঃখোগেও এই সুদূর পথ হেঁটে এতদূর এসেছিলেন কিন্তু আমি হঠাৎ রাগেব বশবর্তিনী হয়ে তাঁকে বলে ফেলেছি—“একদণ্ড কি আমার না দেখলে থাকতে পার না, একটা দ্রোলকের উপর এত আসক্তি কেন.

এইটে যদি ভগবান রামচন্দ্রের প্রতি দিতে—তা’হলে কত ভাল হত, ইহকাল পরকালের কোন ভাবনা থাকতো না।” এই কথা শুনেই জানি না তাঁর প্রাণে কি ভাবাস্তর হলো, তিনি আর একদণ্ড না দাঁড়িয়ে—এই রাত্রেই কোথায় চলে গেলেন। মা—মা! আমার বৃদ্ধা শান্তুড়ীর যে অন্ধের নয়ন স্বরূপ—তিনি কোথায় গেলেন! সত্য সত্যই কি তিনি গৃহত্যাগী হলেন—এই সামান্য কথায় কি তিনি দাসীকে পায়ে ঠেলে কেল্লেন? বলিয়া রত্নাবলী আরও কাঁদিতে লাগিলেন।

জননী লক্ষ্মীদেবী তুলসীদাসের একগুঁয়েমী জানিতেন—সে যাহা বলল, তার অন্তথা কখনই করেনা, তবে কি সত্যসত্যই স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া করে তুলসী আমার গৃহত্যাগী হবে কিন্তু এ রজনীতে ত আর কোন উপায় নাই, বিশেষতঃ স্বামী মূর্খ—এখন কে তাহার গমনে বাধা দেয়? বলদেও ত আজ আর আসিবে না; সে ঔষধাদি দিয়া বাড়ী গিয়াছে! লক্ষ্মীদেবী সাত পাঁচ ভাবিয়া মনে একটা বিবম খটকা লাগিলেও কন্যাকে বুঝাইয়া বলিলেন—মা! বাড়ী ছেড়ে সন্ন্যাসী হওয়া কি মুখের কথা; তুই সেজন্য কিছু ভাবিসনে, তুলসী নিশ্চয়ই রাগিয়া বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। কাল না হয় বলদেওকে আবার তাঁর সন্ধানে একবার রাজাপুরে পাঠাব এখন, তার জন্ত আর ভাবনা কি মা! রাত্রি অনেক হয়েছে, তুমি একটু ঘুমোওগে, আমি কর্তার কাছে খানিকক্ষণ জাগিয়া থাকি, আমার একটু অবসাদ আসিলে তোমাকে তুলিয়া দিব। আর নিদ্রা! সে চক্ষে কি আর নিদ্রা আসে! তথাপি শোকাতুরা জননীর কথায় কোনও উত্তর না দিয়া রত্নাবলী ভিন্ন কক্ষে শয়ন করিতে গমন করিলেন।

যেহনি স্বামী তার স্ত্রীও তেমনি। তুলসীদাস যেমন পত্নী-প্রিয়,

স্বীয় অদর্শন সহ্য করিতে পারেন না—রত্নাবলীও তেমনি স্বামীর অসুগতা, স্বামীর বিরহ তাহার পক্ষে একান্ত অসহ্য, এইজন্য এতদিন তিনি স্বামীকে ছাড়িয়া পিত্রালয়ে আসিবার নাম পর্য্যন্ত মুখে আনেন নাই ; কিন্তু কি করিবেন—আজ পিতার মুমূর্ষু অবস্থার কথা শুনিয়া না আসিয়া থাকিতে পারেন নাই। পিতার শেষ দর্শন, তাঁহার অন্তিম সাধ পূরণ করা ত কত্কার অবশ্য কর্তব্য ; আর যে তাঁহার পুত্রাদি কিছুই নাই—রত্নাবলীই যে তাঁহার সব, এইজন্য দায়ে পড়িয়া আসিতে হইয়াছে কিন্তু তাহাতে যে এমন অমঙ্গল ঘটবে—তাহা কে জানে ?

রত্নাবলী একাকিনী কক্ষমধ্যে শয়ন করিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন—হায় ! আমি কেন, এমন কথা বলিলাম, আসিয়াছিলেন—আহারাদি দিয়া গৃহে রাখিলেই হইত, কেন আমি না বুঝিয়া রাগেব বশবর্তিনী হইয়া তাঁহাকে এত কথা বলিলাম ! পণ্ডিত তিনি, প্রেমিকের অগ্রগণ্য তিনি, হঠাৎ ভিন্ন ভাবে ফিরিয়া পড়িলেন, আমার কথা অশ্রু প্রকারে গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন—হায় ! তিনি কি আর ফিরিবেন না, আর কি দাসীকে দাসী বলিয়া পদাশ্রয়ে তেমন করিয়া আশ্রয় দিবেন না ! ওঃ ! তাঁর প্রেমের কি গভীরতা, সামান্য নগণ্য আমি, আমার মত কত শত রমণীকে তাঁর মত গুণী, জ্ঞানী সুপুরুষ, ইচ্ছা করিলে দুপায়ে জড় কর্তে পারেন কিন্তু তথাপি আমার জন্য তিনি কিনা করেছেন—আজকের ঘটনাই কি সামান্য ! হায় ! হায় ! আমি কি করলাম, কি দুষ্ট সরস্বতীর বশে আমি জ্বী হইয়া এমন ককণাময় স্বামীকে উপদেশ দিতে গেলাম ! হতভাগিনী আমি কি করিতে কি করিলাম ! ছিঃ ছিঃ এখনও আমি ঘরের মধ্যে হৃৎকথ্য শারিতা—আর স্বামী আমার সিন্ধুবন্ধে অনাহারে এই দারুণ দুর্যোগে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন ! না শয়্যা আর আমার উপহৃত

নয়, এ কণ্টকময় বোধ হচ্ছে ! গৃহে, আর
 গৃহত্যাগী—উদাসী, তার জীবন এত মৃৎ
 কি করি, কোথা যাই, কোথায় গেলে তাঁকে
 তিনি জন্মের মত দাসীকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে,
 পীড়িত, নতুবা এ কথা শুনিলে কি তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন ?
 হায় ! আমি এখন কি করি !

দারুণ দুশ্চিন্তায় প্রাণ অস্থির হইয়াছে । রত্নাবলী আর গৃহের
 মধ্যে শয্যায় শয়ান থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া বাহিরে আসিলেন ।
 আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন । রাত্রির এই প্রথম যাম—শেষ
 হইতে এখন অনেক বাকি, আকাশ আবার মেঘযুক্ত হইতেছে ;
 চাঁদের কিরণও তত জোর নয় ! রত্নাবলী কাহাকেও কিছু না
 বলিয়া পাটা পাটা করিয়া সদর দরজা খুলিয়া বাটীর বাহির হইলেন ।
 ধরমপুরের রাস্তা-ঘাট তাঁহার সমস্ত জানা ছিল—এই পল্লীজননীর
 কোলে তিনি আশৈশব মানুষ হইয়াছেন—ইহার অলিগলি, স্থান-অস্থান
 সকলই তাঁহার জানা, কোন দিক দিয়া কোথায় যাইলে, কোথায়
 যাওয়া যায়, তাহা তিনি জানেন—তবে কুলের কুলবধু বলিয়া একাকিনী
 যাওয়া, গৃহত্যাগ করা উচিত নয় কিন্তু যখন হৃদয়ে দারুণ বিরহ-বল্লি
 জলিয়া উঠিয়াছে, স্বামীর মর্যাদাসিক্ত বাক্য যখন শেলের ন্যায় তাঁহার
 কোমল হৃদয়ে বিদ্ধ করিতেছে—তখন তাঁহার হৃদয়দীর্ঘ, ভালবন্ধ,
 হিতাহিত জ্ঞান কোথায় ? স্বামী এখনও বেশী দূর বাইতে পারেন
 নাই—কাল হইলে হয়ত বহু দূরে গিয়া পড়িবেন—মুজিবাব উপায়
 থাকিবে না ; এখন বাইলে পায়ে ধরিয়া কিরাইতে পারিবেন, এই
 আশায় রত্নাবলী কাহাকেও না বলিয়া কজনীর সেই গভীর গভীর নিস্তর
 ব্যস্ত অনেকের আবেগে একাকিনী স্বামী অবেশে বাহির হইয়া পড়িলেন ।

নবম পন্নিচ্ছেদ

দস্যুহন্তে

পতিবিরহ-বিধুরা রত্নাবলীর গৃহবাস অসহ্য হইল—তিনি কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া সেই রাত্রেই একাকিনী গৃহ হইতে বাহির হইলেন। তিনি পতিকে দেবতা অপেক্ষাও মান্য করিতেন, জানে বা অজ্ঞানে তিনি কখনও কোন অপ্রিয় কথা বলিয়া তাঁহার প্রাণে কোনপ্রকার কষ্ট প্রদান করেন নাই বা মনে কোনপ্রকার অসন্তোষ উৎপাদন করেন নাই; দুইটিতে একটি হইয়া—ছুই কায়ায় একপ্রাণ রূপে আবদ্ধ থাকিয়া এতদিনে মনের আনন্দে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতেছিলেন। আজ কি কুক্ষণে তাঁহার মুখ দিয়া যে স্বামীর প্রতি এরূপ উপদেশ বাণী নির্গত হইল—তাহা তিনি বলিতে পারেন না। স্বামীর কথার উপর, তাঁহার কার্যের প্রতি তিনি একদিনের জন্ত প্রতিবাদ করেন নাই—কোনপ্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করাও তাঁহার রুচিবিরুদ্ধ, স্বামী দেবতা, আমি তাঁর অঙ্গগতা দাসী—তাঁহার কার্যের দোষ দেখা বা তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা আমার নাই। হায়! আজ কেন এ পাপ প্রতিবাদ বাণী মুখে আনিয়া তাঁহার হৃদয়ে ব্যথা দিলাম, তাঁহাকে গৃহত্যাগী করিলাম।

রত্নাবলীর প্রাণ অস্থির—মন কিছুতেই সাধনা মানিতেছে না; আবার কেমন করিয়া তাঁহার দর্শন পাইব—তাঁহার চরণতলে আশ্রয় লইয়া আবার কেমন করিয়া এ তাপিত মনপ্রাণ জুড়াইব, আমি ভ

তাহার চিন্তা করিতে করিতে সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া চলিয়াছি। কিন্তু যাইব কোথা; স্বামীর যাইবার স্থানের ত একটা স্থিরতা নাই? সত্য মনের আবেগে গৃহ হইতে বাহির হইয়াছেন মাত্র। দেখা পাইলে তাঁহার পদে ধরিয়া কমা ভিক্ষা করিবেন—কাকূতি মিনতি করিয়া ঘরে কিরাইবেন—এই আশা, কিন্তু কোথা তিনি? ভগবান, আর কি তাঁহার দেখা পাইব না—আর কি তিনি এ দানীকে “রত্ন আমার, প্রাণেশ্বরী আমার” বলিয়া চরণে স্থান দিবেন না—হায়! অভাগিনী আমি, না বুঝিয়া কি দুর্ভিক্ষ করিয়াছি,—নিজের আত্মার এই পাপে পুড়িয়া মরিবই এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ নিরপরাধিনী শান্তীকেও পুড়াইয়া মারিব। তাঁহার যে আর পুত্র নাই—এ সংবাদ শুনিলে কি তিনি আর জীবিত থাকিবেন—হায়, আমি কি করিলাম, নিজে মরিলাম—আর একজন নিরপরাধিনী বৃদ্ধাকেও প্রাণে মারিলাম—রত্নাবলী কাদিতে কাদিতে সদর রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছেন। টিপ্-টিপ্ বৃষ্টি পড়িতেছে—পথে লোকজন কেহ নাই।

পথে যাইতে যাইতে রত্নাবলী মনে করিলেন—তিনি এ সদর রাস্তা দিয়া কখনই যাইবেন না—পাছে কাহার সহিত দেখা হয়। আর যদি গৃহে যাওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য হয়—তাহা হইলেও মাঠের পথ ধরিতে হইবে, অতএব আমি আর রাজপথ ধরিয়া কতদূর যাইব? মাঠের পথ ধরিয়া যাই—তাহা হইলে অনেকদূর অবধি লক্ষ্য হইবে—দেখিতে পাই ভাল, নতুবা বাড়ীতে গিয়া সত্তর শান্তীকে এই সংবাদ দিলে তিনি অচিরে তাহার প্রতিকার কারতে পারিবেন—নানাপ্রকার লোকজন ত তাঁহার বাধ্য আছে?

মনের আবেগে রত্নাবলী প্রাস্তরের পশ্চাৎ অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিলেন। কতদূর যাইতে যাইতে এক ভীষণ শ্মশানের মাঝখানে

আসিয়া পড়িলেন। তখন বৃষ্টিও খুব জোরে পড়িতে লাগিল।
এতদূর পথ অতিবাহিত করা কখন অভ্যাস নাই—তাহার উপর ভয়ানক
বৃষ্টি; সতী-বিবশা হইয়া অবসাদগ্রস্ত দেহে এক বৃক্ষতলায় আশ্রয়
লইলেন। এই সময় কতকগুলি তঙ্কর সময় বুঝিয়া গ্রামান্তর হইতে
নানাপ্রকার দ্রব্য চুরি করিয়া সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

জীলোকের রূপ ও অলঙ্কার পথের শত্রু। সালঙ্কারা রূপবতী
জীলোককে অরণ্য মাঝারে একাকিনী দেখিলে—সহজ লোকেরই যখন
মনে দুরভিসন্ধির উদয় হয়, তখন এত দম্য—তঙ্কর, তাহাদের প্রাণে যে
উৎসাহ জাগিয়া উঠিবে, তাহারা যে রূপবতী যুবতীর সর্বনাশ
করিয়া অলঙ্কারাদি লুণ্ঠন করিতে চেষ্টা করিবে—তাহার আর
বিচিহ্ন কি? বিদ্যুতের আলোকে তাহারা ঐ অস্বর্ধ্যামগ্ধা রত্নাবলীকে
দেখিয়া লুপ্তচিস্তে নিকটে উপস্থিত হইল। 'রত্নাবলী তখন
অবসাদগ্রস্ত হইয়া একাগ্রচিস্তে ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছেন—
বিপদ ঘনীভূত দেখিয়া তিনি একেবারে জড়সড় হইয়া গিয়াছেন।
এতরাজে এই ভীষণ আশানে এমন রূপবতী জীলোক দেখিয়া দম্যগণও
প্রথমে তাঁহাকে ভূত বা প্রেত বলিয়া ভীত হইয়াছিল—কেহই সাহস
করিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে ভরসা করিতেছিল না কিন্তু দম্যপতি
নির্ভীকচিস্তে অহুচরগণকে সাহস প্রদান করিয়া বলিল—আরে ভয়
কি, আমরা এত লোক থাকতে কি ভূতে তোর রক্ত থাকে?।
একজন দম্য বলিল—না সর্দার, ও যখন নড়ে চড়ে না—তখন
নিশ্চয়ই ভূত, আমি কিছুতেই এগুতে পারবো না, তুমি যাদ
পারো ত দেখো।

সর্দার।—তবেই দম্যগিরি করে খেয়েছিল—আর কি; এত ভয়
যদি, তবে তুই আমানী হাঁড়ির ভিতর লুকুণে যা; সব সব আমি

দেখি। বলিয়া সর্দার অগ্রসর হইয়া বলিল—এ মাগী! তুই এখানে একলা কি করছিস্ ?

আর কথা না কহিলে নয় দেখিয়া রত্নাবলী ভয় বিহ্বল প্রাণে বলিল—বাবা! আমি ধর্মপুত্রের দীনবন্ধু পাঠকের মেয়ে—যশুর-বাড়ী যাচ্ছিলাম, জল ঝড়ে ছোড়ভঙ্গ হয়ে এখানে এসে পড়িছি। বাবা! তোমরা আমাকে রক্ষা করো। যখন তাহারা দেখিল—এ ভূত-প্রেত নয়—মামুষ, তখন একজন একলক্ষ্যে তাঁহার ঘাড়ে পড়িল। যে অগ্রে লইতে পারিবে, তাহারই হইবে, আর যায় কোথায়!

রত্নাবলী পদাঘাতে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিল—পাষাণ! স্পর্শ করিস্ না—যদি অলঙ্কারের লোভ থাকে, তাহা হইলে বল—আমি এখনি সমস্ত খুলিয়া দিতেছি, তবে স্পর্শ করিলে আর রক্ষা থাকিবে না কিন্তু সে কথা শুনে কে? অপর একজন বল—পূর্বক তাঁহার গাত্র হইতে গহনা খুলিয়া লইয়া সর্বনাশ করিবার চেষ্টা করিল। রত্নাবলী হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক—বাঙ্গালীর মত নিতান্ত দুর্বল নহেন। আক্রমণকারীকে পুনরায় পদাঘাতে দূরে ফেলিয়া দিলেন কিন্তু একাকিনী স্ত্রীলোক, পাঁচ সাতজন দস্যুর সহিত কতক্ষণ যুঝিতে পারিবেন? এইবার তাহারা কয়েকজনে ধরিয়া তাঁহাকে ভূমে পাতিত করিয়া ফেলিল, রত্নাবলী অনন্তোপায় হইয়া তখন অনাধরণ দীনের বন্ধু দাননাথকে ডাকিয়া বলিলেন—ভগবান! পতি-হারী আমি অনাধিনী—মনের আবেগে স্বামীর দর্শন আশায় বাটীর বাহির হইয়া এই বিপদে পড়িয়াছি—ভগবান, এ সময় তুমি রক্ষা না করিলে আমার সর্বনাশ হয়—যদুন্দন রক্ষা কর ঠাকুর, আমার কেউ নাই; ভগবান রক্ষা কর!

কামোদ্ভূত দস্থাগণ যখন সেই ললামভূতা রমণীর অলঙ্কারাদি হরণ করিয়া তাঁহার সর্বনাশ সাধনে উদ্ভূত—আর সতী যখন

প্রাণের কপাট খুলিয়া উঠেবরে “ভগবান রক্ষা কর” বলিয়া কাতরকণ্ঠে চীৎকার করিতেছেন—তখন কি আর অনাখনাথ ভগবান থাকিতে পারেন? ঠিক সেই সময় ভিন্নদিক হইতে “খাবো খাবো, রক্ত খাবো, ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খাবো” বলিয়া একটা বিকট শব্দ হইল। একে হুর্যোগ, তায় হুরস্তু শ্রশান—চারিদিকে নরমুণ্ড, অস্থি প্রভৃতির ছড়াছড়ি—তাহার উপর ঐ অমুনাসিক শব্দ শুনিয়া দম্মাগণের প্রাণ আতকে শিহরিয়া উঠিল, তাহারা প্রাণভয়ে রক্তাবলীকে ছাড়িয়া “বাগ্নে পালারে, ভূতরে” বলিয়া উর্দ্ধ্বাসে পলায়ন করিল।

বিপদে পড়িয়া একান্তমনে বিপদতারণ ভগবানকে ডাকিলে তিনি ভক্তকে কেমন করিয়া উদ্ধার করেন, দেখিয়া রক্তাবলী আশ্চর্য হইয়া গেলেন এবং বলিলেন—দেবতা দয়া না করিলে আজ আমার সতীত্ব রক্ষার কোনও উপায় ছিল না। ভগবান ভূতনাথ বুঝি আজ সতীর গতি ভগবতীর আজ্ঞায় ভূত পাঠাইয়া আমার সতীত্ব রক্ষা করিলেন। প্রভু! তুমি যে হও, সে হও, ভূত-প্রেত যাহাই হও—তুমি আমার দেবতা, আজ রূপা করে অমূল্য সতীত্ব ধন সহ আমার প্রাণরক্ষা করিলে, আমি তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণাম করি। এক্ষণে অগ্রসর হইয়া দর্শন দানে আমায় কৃতার্থ কর।

ঝোঁপের আড়াল হইতে একটি মনুষ্য মূর্তি ধীরে ধীরে নিকটে আসিল, রমণীর গলার স্বর শুনিয়া সে স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গিয়াছিল। সেই সময় একবার বিছাৎ চমকাইলে রমণীর প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া আগন্তুক মনুষ্য মূর্তি অতিশয় বিস্ময় সহকারে বলিল—একে, আমার বৌদিদি; তুমি আজ এখানে কেন! দাদা কোথায়; তাঁহার ও তোমার পিতার কুশলত?

সোদরপ্রতিম পরমাত্মীয় দুঃখীরামকে দেখিয়া এত দুরাশার মধ্যে

রত্নাবলীর প্রাণে আশার স্ফূর্তি হইল। তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন—
ঠাকুরপো ! ভগবান আজ তোমার রূপ ধরে এসে আমার জাতকুল রক্ষা
করিলেন। ভাই, ভাই ! এত রাতে তুমি এতদূরে—এ স্থানে কেন ?

দুঃখী। সে কথা বলছি, আগে বল, আমার প্রাণের তুলসীদাদার
কোন অসুস্থতা হয় নাই ত ? তবে কি তোমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে,
তাই কি তুমি এতরাতে স্থানে এসেছিলে—খুড়ীয়ার মুখে তাঁর ত
খারাপ অবস্থার কথা শুনে এসেছিলাম, তাঁর কি কিছু হইয়াছে ?

রত্ন। না ঠাকুরপো ! সে সব কিছু নয়—তোমার দাদা বিষয় রেগে,
এই গভীর রাতে জলে ডিঙ্কতে ডিঙ্কতে এসে বলেন—তুমি আমাকে
না বলে এসেছো—অতএব এখন চল, আমি তোমাকে এখন নিয়ে
যাব। ভাই ! আমি জীবনে কখন তাঁর উপর রাগ করিনি বা
তাঁর কথার অবাধ্য হইনি। কিন্তু আজ মাত্র এসেছি, তাও বইজ্ঞার
নয়, বাপের অবস্থা বড় খারাপ, দুই একদিন থাকবো, তাঁকে একটু
হুঁহু করে, তারপর চলে যাবো—কিন্তু তাঁর আর দেহি নয় না,
তিনি বলেন—আমি একদণ্ড তোমাকে ছেড়ে থাকতে পার্শো না।
তাঁর কথা শুনে, আমার প্রাণ একটু খারাপ হয়ে গেলো, মুখ দিয়ে কস
করে বেরিয়ে পড়লো—“দেখ, এই ভালবাসাটা যদি আমার উপর না
দিয়ে, ভগবান স্বামচন্দ্রের পদে দিতে, তাহলে আর ভয়ের ভাবনা
থাকতো না”। এই কথা বল্‌বামাত্রই তিনি যেন কেমন হয়ে গেলেন—
তারপর আমার দিকে অতি কমনীয়ভাবে বিস্ময় বিস্ময়ভরিতনেত্রে তীক্ষ্ণ
দৃষ্টি করে বলেন—রত্ন ! তুমি আমার বধার্ব জ্যো—আজ তুমি ঠিক
সহধর্মিনীর মত কাজ করলে—আমার অঙ্গ চক্ষু হুটিয়ে দিলে, আজ তুমি
আমার জান-গুরু—আর না, আর না, তবে যাই—আর না, বলিয়া
সেই ভিজে কাপড়ে কণমাত্র দাঁড়ালেন না, ছুটিয়া বাড়ীর দ্বার হয়ে

গেলেন। আমি চীৎকার করে কেঁদে উঠলাম, মা বেরিয়ে এলেন, তাঁকে সমস্ত কথা খুলে বললাম, তিনি বল্লেন—এত রাতে আর কি হবে, কর্তা ভাষাগত, বলদেওও নাই, কাল সকালে খোঁজ নেবো। এই বলে তিনি আমাকে আশা দিয়ে বাবার কাছে গেলেন। কিন্তু আমি আর থাকতে পারলেম না, প্রাণ উদাস হয়ে পড়লো, মন কেবল খারাপ ভাবনাই ভাবতে লাগলো, কিছুতেই ঘরে থাকতে না পেরে রাজাপুর বাবার জন্য বাহির হয়ে, এই বিপদে পড়েছিলাম। তুমি আজ আমায় যে বিপদ থেকে রক্ষা করলে, জীবনেও তাহা শোধ হবে না, ই্যা ঠাকুরপো! তবে তিনি বোধ হয় বাড়ী গিয়েছেন? অতীত আগ্রহের সহিত রত্নাবলী স্বামীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন।

দুঃখী। তিনি বাড়ী গেলে আর আমি এ হুৰ্যোগে এতদূর আসবো কেন? তোমাকে পাঠিয়ে দেওয়ায় সেখানেও মায়ে-পোয়ে ঝগড়া করে; দাদা বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন। আসবার সময় বলে এসেছেন—“এই জনের মত চল্লাম” শুনে বুড়ি ত কেঁদে কেটে অস্থির। সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়ীতে গিয়ে বল্লেন—দুঃখী বাবা! একবার ধর্মপুরে যা, দেখে আর সে সেখানে গেছে কিনা, নইলে ত আমি ঘরে থাকতে পারবো না, আমাকেই যেতে হবে। আমি আর কি করি—তঁার কষ্ট দেখে বেরিয়ে আসতে হলো। পথ ত ভাল জানি না—তার উপর এই হুৰ্যোগ—আশ্বে আশ্বে বিপথে এসে, এই স্থানে পড়েছি—এখন দেখছি, ভগবান এ পথে এনে ভালই করেছেন।

স্বামী গৃহে গমন করেন নাই শুনিয়া রত্নাবলীর হৃদয় আরও ফাটিয়া যাইতে লাগিল। আশা করিয়াছিলেন—তিনি নিশ্চয় গৃহে গিয়াছেন কিন্তু দুঃখীর মুখে “তিনি গৃহে গমন করেন নাই” শুনিয়া পতিগতপ্রাণা রত্নাবলী বিবম ভ্রমে কঁাদিতে কঁাদিতে সেই স্থানেই বসিয়া পড়িলেন।

হায় ঠাকুরপো! তবে আর কিসের জন্য সংসার, কেন আমাকে দয়াগণ প্রাণে মারিয়া ফেলিল না—আমি আর এ পৃথিবীতে কেন করিয়া থাকিব; কাহার পাদপদ্ম পূজা করিয়া নারীজন্ম সকল করিব, কে আর আমাকে সেই স্বর্গীয় সোহাগে পরিতুষ্ট করিবে! দেবর! পতিই নারীর ইহ ও পরকালের দেবতা, তাঁহাকে না পাইলে আমি জীবনই রাখিব না।

দুঃখীরাম জানিতেন—রত্নাবলী কিরূপ প্রাণ দিয়া দাদাকে ভাল বাসিতেন। ভুলসীদাস যেমন পত্নীকে একদণ্ড ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না, রত্নাবলীও তদ্রূপ, পতি-বিরহে যে তাঁহার একান্ত অসহ্য, দাদাকে না পাইলে বউদিদিকে এবং তাহার জননীকে বাঁচান দায় হইবে! দুঃখীরাম নানা প্রকারে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—বৌদিদি! এখানে আর দেরি কল্পে না। তাঁকে ত খুঁজতে হবে—চল, এখন তোমার বাপের বাড়ী যাও—সেখানে তোমার বাপকে দেখে, আমি খুব ভোরে ভোরেই এ গ্রাম সে গ্রাম খুঁজবো। তোমার ভাবনা কি? যখন আমি রয়েছি, তখন তিনি যাবেন কোথা—যেখান থেকে হউক তাঁকে বাহির করোঁই!

দুঃখীরামের কার্য-কলাপ রত্নাবলী জানিতেন—অসাধ্য সাধন করিতে দুঃখীরাম বিশেষ পারদর্শী, গ্রামে তিনি অনেকবার তাহার এইরূপ অসীম সাহসিকতার পরিচয় পাইয়াছিলেন—কাজেই তাহার বাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়া রত্নাবলী চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে উঠিলেন। দুঃখীরাম বলিলেন—রাজাপুর অনেকদূর, এ রাজ্যে তথায় ঘাইতে পারা যাইবে না—এইজন্য তোমার বাপের বাড়ীই চল। যখন এসেছ—তখন বাপের ওরূপ অবস্থা দেখে যাওয়া উচিত নয়। আমি সমস্ত সকালবেলাটা ঘুরলে, তাঁকে খুঁজে বার কর্তে পারোঁই—তিনি যাবেন কোথায়?

চৌরগণ বাইবার সময় অনেক লুণ্ঠিত দ্রব্য কেলিয়া গিয়াছিল। রত্নাবলীর অলঙ্কারগুলিও তাহারা লইয়া বাইতে পারে নাই। ছুঃখী-রাম তাহা কুড়াইতে লাগিলেন। রত্নাবলী বলিলেন—ঠাকুরপো! বতর্দিন তিনি না আসিবেন—বতর্দিন তাঁহার দর্শন না পাইব—ততদিন আমি আর ও পাপ দ্রব্য স্পর্শ করিব না—তুমি লইয়া বাহা হয় করো! স্বামী যার গৃহত্যাগী-বিরাগী, রত্ন-অলঙ্কার তার কি শোভা বাড়াইবে, আর তাহা পরিয়াই বা কাহার মনস্তৃষ্টি করিব? স্বামীই ত জীলোকের অলঙ্কার, আমার সে অলঙ্কার বধন ছাড়িয়া গিয়াছে, তখন পার্শ্বব সাঙ্গসজ্জা আর আমি করিব না, এ রূপকেও বিস্ময় করিব—বলিয়া কঁাদিতে লাগিলেন। স্বামীর বিরহ কেননা সতীর অসহ্য হইয়াছে—জগত সংসার বধন তাঁহার নিকট তুচ্ছাদপি তুচ্ছ—তখন কিছার স্বর্ণের অলঙ্কার—কিছার দেহের দৌন্দর্য-শোভা!

রত্নাবলীর ভাব দেখিয়া ছুঃখীর প্রাণ গভীর ছুঃখলাগরে নিমগ্ন হইল, না জানি সতী স্বামী-বিরহের এই প্রথম আঘাতেই কি ভয়ানক অনর্ধগাত করিয়া বসিবে! তিনি কতপ্রকারে প্রবোধ দিয়া তাঁহাকে তাঁহার বাপেরবাড়ী লইয়া গেলেন। রাজিকালে কতাকে গৃহে না দেখিয়া লক্ষ্মীদেবী প্রমাদ গণিতেছিলেন—এক্ষণে তাহাকে আবার গৃহাগত দেখিয়া দেবতার চরণে অসংখ্য প্রণিপাত করিলেন।

ছুঃখী তেওয়ারী নীনবন্ধুর অবস্থা দেখিয়া বড়ই চুঃখিত হইলেন—স্বামিকার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় কিন্তু কি করিবেন—এদিক দেখিতে গেলেও ওদিক হয় না, কাজেই তিনি অতি প্রত্যাঘে সকলকে সাধনা করিয়া দাদার অশেষণে বাহির হইলেন।

দশম পর্কেছেদ

কাশীর পথে

একান্ত অসুখাগই মহুগুড়-বিকাশের পূর্ব লক্ষণ। বাহার প্রতিই তাহা ভুত্ব ইউক না কেন, বাহাতেই মন মজিয়া পড়ুক না কেন— একদিন না একদিন তাহাতে স্তম্ভল ফলিবেই ফলিবে। কুপথে একান্ত অসুখাগী হইয়া হটাৎ কোনরূপ ধাক্কা খাইয়া ফিরিয়া পড়িলেও তাহার আর সৌভাগ্যের সীমা থাকে না। তখন গড়া-মন একে-বারে ভীত বৈরাগ্যে বিভোর হইয়া, সাংসারীক সমস্ত কামনা-বাসনা, সমস্ত আকাঙ্ক্ষা-উন্নাদনা বিসর্জন দিয়া, ভগবানের প্রেম-সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়ে। এই সামান্ত দাম্পত্য প্রথম, তখন রসময়ের স্বর্গ প্রেমরসে রসিয়া মানুষকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যায়, তাহার বিন, থাকে না। এইরূপ সামান্ত দাম্পত্য প্রেমই কত কত সাধককে ভগবান উচ্চস্তরে লইয়া গিয়া দেবত্ব দান করিয়াছে। সংসারের : এতদ্ব মাথা অন্তর-কন্ডর স্বর্গীয় প্রেমজ্যোতিতে আলোকিত গৌরাইলেও জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছে।

হয়—ভগবান

সামান্ত বারবণিতা চিন্তামণির প্রেমরসে রসিয়া বিকাকালে টানিয়া কিরূপ হইয়াছিল—তাহা কে না জানে? রজকিনী রামীঅসময়ে তাহার হইয়া শেষে চণ্ডীদাল যে কি শক্তি বেখাইয়া পিয়াছেন করিয়া তাহার লেরই বিদিত? প্রণয়ানুগামী সাধক যখন বৃত্তিতে পাহর বীজ উপ্ত হইয়া কয়বার আছে—ইহার স্তম্ভ কণিকমাত্র, ইজির চপিড়ে। দুই দিন পূর্বে বায় কিন্তু ভগবৎ প্রেমের কুল-কিনারা নাই—হাড হইয়াছিলেন, পক্ষীর

প্রাণ শিকল পায়ে পরিয়া সংসারকে স্বর্গ বলিয়া অহুমান করিতেছিলেন, ইহার প্রত্যেক বস্তুতে ঘিনি জ্বিদিবের আনন্দ লাভ করিয়া প্রমত্তচিত্তে একেবারে বিভোর হইয়া গিয়াছিলেন, আজ তাঁহার প্রাণের এই ভাব দেখিলে, অবহেলায় সংসারের মায়াবন্ধন এইরূপে শিথিল করিতে দেখিলে সহজেই মনে হয়—এসকল কার্যে পূর্বজন্মের স্মৃতি; আর ঐশ্বরীক রূপায় ব্যতীত কেবল তপস্তা বা কেবল ব্রত উপবাস প্রভৃতিতে কিছু হয় না! হৃদয় ভক্তিরসে আর্দ্র করিয়া একবার মাত্র ডাকে যে কাজ হয়—অপ্রেমিক-জীবন, ভক্তিভাব বিহীন প্রাণ বহুক্ষয় চেষ্টা করিলেও সেই প্রাণের ধনকে পাইতে পারে না। এইজন্য পরম ভক্তিমতী সাধিকা মিরাদেবী বলিয়া গিয়াছেন :—

তিরণ্ ভোগ্কে হরি মিল্তে তো, বহত যুগ অজা।

স্রী ছোড়কে হরি মিল্তে তো, বহৎ রহা হায় খোজা,

দুখ পিকে হরি মিল্তে তো, বহৎ বৎস বালা ;

মিরা কহে বিনা প্রেম-সে না মিলে নন্দলালা।

ক্রমশঃ পথ অতিবাহিত করিয়া তুলসীদাস প্রায় দুইমাস পরে কান্দিয়ামের নিকটবর্তী এক প্রাক্তরের বটবৃক্ষ ছায়ায় আসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—কোথায় যাই, কে আমার প্রাণের পিপাসা মিটাইবার উপায় বলিয়া দেয়, কে আমার হৃদয়ক্ষেত্রে প্রেমের প্রবল বস্তা তুলিয়া সেই প্রেমময়ের রাজত্বে আমাকে ভাসাইয়া লইয়া যায় ? আকাঙ্ক্ষার দারুণ অনলে পুড়িয়া প্রাণ ছার কর হইতেছে ; কে আমাকে নবহুর্কাদল শ্রাম-সেই ধনুর্কাগধারী ভগবান রামচন্দ্রের সন্ধান বলিয়া দেয়, আমার প্রাণের দেবতার সন্ধান বলিয়া দিয়া কে আমার গুণাগুণ প্রাণে শাস্তির সঞ্চার করে ? অনাহারে অনি-

দ্রায়, বহুদূর আলিয়াছি, বোধ হয় পবিত্র বারানসী পৌছিতে আর বেশী বিলম্ব নাই। এই ত অনেক লোকই এই পথে রাওয়া-আসা করিতেছে, তবে কি পবিত্র কাশীধাম অতি সন্নিকট?

তুলসীদাস সন্ধ্যার প্রাক্কালে বটবৃক্ষ মূলে বসিয়া অপার চিন্তা সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছেন, আহার নিদ্রার অভাবে শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছে—তথাপি দৃকপাত নাই। দেহের অবস্থার জ্ঞাত প্রাণের ক্ষুৎপিপাসার জ্ঞাত একদিনও তিনি কাতর হন নাই—পথে আসিতে আসিতে ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইয়াছেন, তাহাতেই ক্ষুৎপিপাসা একপ্রকার মিটাইয়া সন্তুষ্টচিত্তে এতদূর আসিয়াছেন, সন্ধ্যার সময় যেখানে আশ্রয় পাইয়াছেন—সেইখানেই ধূলি শয্যায় শয়ন করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছেন। এত আদরে প্রতিপালিত তুলসীদাস একদিনের জ্ঞাত এ দারিদ্র্য কষ্টকে কষ্ট বলিয়া মনে করেন নাই—তাঁহার প্রাণ এমনি কষ্টসহিষ্ণু—মন এমনি ধৈর্য্যশীল হইয়া পড়িয়াছে।

ঠিক এই সময় একজন সন্ন্যাসীও সেই পথ দিয়া কাশীধামে যাইতেছিলেন—তুলসীদাসের নবযৌবনে তাঁহার প্রাণের একান্ত অনুরাগ বুঝিতে পারিয়া তিনি বিশেষ সন্তুষ্টচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—বৎস! কে তুমি, কোথা হতে আসছো এবং যাইবেই বা কোথায়?

তুলসীদাস বহুদিনের পর এই তপঃপ্রভাববিশিষ্ট সন্ন্যাসীকে দেখিয়া ভক্তি-বিনম্রচিত্তে প্রণাম করিয়া বলিলেন—প্রভো! কোথা যাব, তাহার কোন স্থিরতা নাই, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হতে আসছি, আমি কে তা আমি নিজেই জানি না, আমার আত্ম-পরিত্যক্ত কিছু নাই—অতি সামান্ত ব্যক্তি, তবে পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ

করে, এই মাংসপিণ্ডময় দেহভারবহন করে, এই নখর সংসারে দিক্
ব্রাস্ত হয়ে ঘুরিয়া বেড়াচ্ছি।

সন্ন্যাসী। বৎস! দেখছি তুমি যুবক, এই অল্প বয়সে সংসার
মুখে জলাঞ্জলি দিয়ে কি আকাজ্জক গৃহত্যাগ করেছ?

তুলসী। প্রভো! প্রাণের আকাজ্জক বড় কঠিন—জগতের
কোন বস্তুতে আর আমার চিত্ত সংযত হইতে চাহে না—বিনা সেই
ভকতবৎসল শ্রীরামচন্দ্রের চরণমুগল! ঠাকুর। বলে দিন, আমি কি
আমার সেই প্রাণের ধনকে পাইয়া জীবন সার্থক করিতে
পারিব?

শ্রীরামের পদে যুবক তুলসীদাসের একান্ত ভক্তি, অসীম অমুরাগ
দেখিয়া সন্ন্যাসী আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন—বৎস! যদি দেখিবার
সাধ একান্ত হয়ে থাকে—মন যদি তন্ময় ভাবেই গঠিত কর্তে
পেরে থাক, তবে তাঁর দেখা পাবার আর ভাবনা কি, কিন্তু এমন পথে
পথে ঘুরিয়া বেড়াইলেত হইবে না, একস্থানে নিবিষ্ট চিত্তে বসিয়া
তাঁহাকে ডাকিতে হইবে, অনবরত পথে পথে ঘুরিলে চিত্ত ঞ্জির
হইবে কেন? যদি বাধা না থাকে—আমার আশ্রমে চল—এই
কাশীধামের একটা নিভৃত পল্লীতেই আমার আশ্রম, ছাত্র নির্বিশেষ
তোমাকে শাস্ত্র-শিক্ষা এবং সাধনার ক্রামশিক্ষা প্রদান করিব।

তুলসীদাস হাতে স্বর্গ পাইলেন। শ্রীরামচন্দ্র যে তাহাকে দয়া
করিবেন—তাঁহার অভীষ্ট যে পূর্ণ হইবে—এইখানে তাহার সূত্রপাত
দেখিয়া তিনি পুলকিত চিত্তে তাঁহার অমুজ্জা শিরোধার্য্য করিয়া
বলিলেন—প্রভো! একস্থানে স্থিতি হইতে না পারিলে কোন
কার্য্যই হইবে না—তাহা জানি, আর শাস্ত্রপাঠ ও সাধনা-ভজন
অভ্যাগ করাই আমার একান্ত বাসনা, ঠাকুর! আজ বিনা আশ্রমে

আপনার শ্রায় মহাপুরুষের আশ্রয় পাইয়া বুঝিলাম—ইহা রঘুনাথেরই কৃপা, চলুন, প্রভো! কোথায় যাইতে হইবে?

এইরূপ তৈয়ারী ছাত্র পাইলে, এইরূপ সাত্বিক ভাবাপন্ন যুবকের গুরু হইতে পারিলে—অধ্যাপনা কার্যেও যথেষ্ট আনন্দ হইবে; তাহার পরে এ যুবক যেরূপ প্রেমিক দেখিতেছি, রাম নাম করিতে করিতে ইহার নয়ন যুগল হইতে যেরূপ প্রেমোন্মত্ত প্রাবৃত হইতেছে—যদি বাস্তবিক ইহা প্রাণের ভাবে হয়, এ যদি যথার্থ এইরূপভাবে সুগঠিত চিন্তা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সাধনার সুগম পথ প্রদর্শন করিলে যুবক সহজেই উন্নতি মার্গে উত্তীর্ণ হইয়া, কালে ভগবান রাম চন্দ্রের পরম ভক্তরূপে সংসার পবিত্র করিতে পারিবে—আর আমার শ্রায় সামান্ত ব্যক্তি এরূপ একজন ভক্তবীরের সহায়তা করিয়াও জীবন ধন্য করিতে পারিবে। কিয়দ্দিন একত্র বসবাস না করিলে ত লোক চেনা যায় না কিন্তু বাহ্যিক দেখিয়া যতদূর অনুমান হয়, তাহাতে বোধ হয়, উত্তরকালে এই যুবক একজন পরম ভক্ত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় জগতে অশেষ কীর্তি স্থাপন করিবে। সন্ন্যাসী আর কিছু না বলিয়া পরম হৃষ্টচিত্তে তুলসীদাসকে সঙ্গে করিয়া কাশীর মধ্যবর্তী নিজের নিভৃত আশ্রমে লইয়া গেলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পুত্রশোক

পরদিন আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন—না আসিলে পুত্রগতপ্রাণা হলসীদেবীর জীবনরক্ষা করা দায় হইবে। হুঃখীরাম এইজন্য আসিয়াছেন—নতুবা প্রাণের বন্ধু তুলসীদাসকে গৃহত্যাগ করিতে দেখিয়া হুঃখীরাম কখনও দুই একদিনের মধ্যে রাজাপুরে কিরিতে পারিতেন না। কিন্তু কি করিবেন—দাদা ত চলিয়া গিয়াছেন—এখন খুড়ীকে ভিন্ন প্রকারে বঝাইয়া, তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের বন্দোবস্ত করিয়া তবে ত দাদার সন্ধানে যাইতে হইবে? নতুবা বুড়ী যে পরদিন কোন সংবাদ না পেল, এক করিতে আর এক করিয়া বসিবে—তাঁর ত সংসারে মায়া নাই, স্বামী-বিয়োগের পর হইতে কেমন খেন আড়ু আড়ু ছাড়ু ছাড়ু বিপরীত ভাব, তবে ছেলের মায়া নাকি অত্যন্ত বেশী—তাই এতদিন একপ্রকার কাদায় গুল ফেলিয়া সংসারে আছেন।

তুলসী দাদার সংবাদ না দিয়া আমি যদি চলিয়া যাই, তাহা হইলে পরদিন খুড়ীমা ধর্মপুর ছুটিবেন, সেখানে দেখিতে না পাইলে—নিশ্চয়ই জীবন ক্ষয় করিবেন। কাজেই হুঃখীরাম পরদিন প্রাতঃকালে আসিয়া স্তোক দিয়া বলিয়াছেন—খুড়ীমা! দাদা কান্নিতে এক পণ্ডিতের কাছে বেদান্তশাস্ত্র পড়তে গেলেন, আমাকে বলেন—হুঃখী! তুই গিয়ে মায়ের সংসার খরচের মত জিনিষপত্র কিনে দিয়ে, বউকে তাঁর কাছে রেখে আর, মাস কয়েক পড়লেই বেশ পাকা হতে পারা যাবে—তাহা হইলে শিশু-যজ্ঞমানের কাছে আর অত

ঠকুতে হবে না—এইজন্য আমাকে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি কাশী চলে গেলেন।

বাড়ীতে আসিয়া দুঃখীরাম এইরূপ বাক্যে হলসীদেবীকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা কি হয়? মায়ের প্রাণ এরূপ মিথ্যা স্তোকবাক্যে সাস্থনা মানে না, এ জগতে মায়ের প্রাণ পুত্রের ভালমন্দ আগে জানিতে পারে। এমন অতুলনীয়, সন্তানের এমন প্রিয়কারিণী দেবী কি আর জগতে কেহ আছে? দুঃখী যতই গোপন করিতে চেষ্টা করিলেন—হলসীদেবী ততই নানাপ্রকার অবিশ্বাস করিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া একপ্রকার শয্যাগত হইয়াছেন—আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন—অনধরত কেবল ‘হা তুলসী—হা প্রাণের পুত্র, তুই কোথায় গেলি; আমি তোঁর মুখ চাহিয়া কষ্টার সহিত যাইতে পারি নাই, বাবা! তোঁর কি এই ধর্ম হলো?’ ইত্যাদি অশেষবিধ বিলাপ করিয়া শয্যার আশ্রয় লইয়াছেন। দুঃখীর মামী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধাকে কত বুঝাইতেছে—পাড়ার লোক কত সাস্থনা দিতেছে কিন্তু সে কথা তাঁহার প্রাণে স্থান পাইতেছে না—তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইয়া ফেলিয়াছেন—অঙ্ক হইবার উপক্রম করিয়াছেন।

যতই দিন যাইতেছে, দুঃখীর প্রাণ ততই অস্থির হইতেছে। শীঘ্র শীঘ্র বাটীর বাহির হইলে নিশ্চয়ই দাদাকে ধরিতে পারিতাম, কিন্তু যত বেশী দিন যাইবে, উদাস প্রাণে ততই তিনি বহু দূর দেশে যাইয়া পড়িবেন—তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করা তখন মহা দায় হইবে।

দুঃখীরাম একদিন বলিলেন—“খুড়ীমা! দাদা আমাকে সঙ্গে যেতে বলেছিলেন, কিন্তু এখানে বন্দোবস্ত না করিয়া বউদিদির বাপের

অবস্থা না দেখিয়া ত বাইতে পারি না—এইরূপ এত দেৱী করছিলাম। এখন শুনিলাম—বউদিদির বাপ মারা গিয়েছেন। তাঁর আস্তে দেৱী হবে—মাকে একলা কেলে—তাঁর শোকে সাক্ষ্য না দিয়ে ত তিনি আস্তে পারিবেন না? আর আমিও এদিকে তোমাকে নিয়ে বিব্রতে পড়লাম—দাদা মনে কর্বেন কি বল দেখি? তাঁর খাওয়া দাওয়ার কত কষ্ট হবে—নিম্নে রেঁধে খেয়ে কি আর লেখাপড়া শিক্ষা হয়? এতে অনেক সময় নষ্ট হলে—তাঁর লেখাপড়া শিখে ফিরতেও দেৱী হবে। এখন তুমি কি বলো?”

দুঃখীরাম তুলসীদাসকে আনিতে বাইবে শুনিয়া হুলসীদেবী বলিলেন—“বাবা! আমার সে আশায় দুঃশা! সে আর কি হবে—সংসারী হবে—তা বলে ত বিশ্বাস হয় না! সে যে অতি একগুঁয়ে ছেলে—তবে যদি তুই দুই একমাসের মধ্যে তাকে ফিরিয়ে আনতে পারিস্ ত চেষ্টা কর। কিন্তু দুইমাস অবধি দেখে আমি আর সংসারে থাকবো না—আমারও যদিকে দুঃচক্ষু যাবে চলে যাবে।”

দুঃখীরাম মনে করিলেন—মামী ত কাছে কাছেই রইলেন, আর পাড়ার লোকের জিহ্বায় রেখে বাই—অত বুড়ো নান্দব আর যাবে কোথায়? চক্ষে চক্ষে রাগলে কোনই ভয় নাই। এখন যদি ঠুকে নিয়ে ঘরে বসে থাকি, তা হলে দাদার সন্ধান করা এর পর দায় হবে। এইরূপ মনে করিয়া বলিলেন—“আচ্ছা! খুড়ীমা, তুমি দেখই না, আমার কথায় কি তোমার বিশ্বাস হয় না, আগে যে তুমি আমার কথা অকাট্য বলে মনে কর্তে?”

এখন হুলসীদেবীর ভিতর গুড়িয়া থাক হইলেও বাহ্যিক শোক-ভার একটু মন্দীভূত হইতেছে—ইহা স্বভাবেরই স্বভাব। একটা শোক-বেগ, সহ্য হইয়া গেলে বাহ্যিক তাহার প্রভাব আর তত কষ্টদায়ক হয় না।

তুলসীদেবী বলিলেন—“বাবা! তোর প্রতি অবিশ্বাস কিছুই নাই। তুই ছিলি বলেই দ্বিবেদীর সংসার এখনও সমানভাবে চলছে, তবে কি জানিস—প্রাণে আর কত জ্বালা সহ হবে? স্বামী গেলেন, গুরুদেব ছিলেন—তিনিও গেলেন, ছেলেটাকে নিয়ে এক-প্রকারে মনাবরণ করেছিলাম! সেও এতদিনের পর ফাঁকি দিয়ে চলে গেল—তবে আর কত সহ করোঁ! যদি একান্তই তাকে খুঁজতে বাস, তবে যা—কিন্তু ঐ সময়ের পর এলে আর আমার সঙ্গে দেখা হবে না। এখন যাবার সময় তুই বউমাকে বলে যা—সে যেন তার মাকে সাক্ষ্য করে শীগ্গীর চলে আসে—নইলে তার সঙ্গে এই শেষ দেখা।”

তুলসীদেবীর অমুমতি পাইয়া দুঃখীরাম পরদিন সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া, পাড়ার লোক সকলের উপর তাহার মামী এবং তুলসীর জননীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। প্রাণের তুলসীদা বিহনে তাঁহার মনে স্থখের লেশমাত্র নাই। যাহাকে একদণ্ড না দেখিলে দুঃখী অস্থির হইতেন—যাহার সহবাস স্থখ দুঃখী-রাম স্বর্গস্থ অপেক্ষাও প্রীতিকর মনে করিতেন, আজ আট দশ দিন হইল তাঁহার সেই প্রাণের সখার অদর্শন তাঁহাকে কিরূপ কষ্ট দিতেছে—তাঁহাকে কিরূপ মনমরা দিশাহারা করিয়া কেলিয়াছে—তাহা যাহার এরূপ বন্ধু-বিয়োগ হইয়াছে—যিনি এরূপ অকৃত্রিম বন্ধুত্বের বিরহ সহ করিয়াছেন—তিনি জানেন—ইহা বর্ণনায় বুঝাইতে বাওয়া ধুইত। মাত্র।

দুঃখীরাম বাটীর বাহির হইয়া প্রথমে ধর্মপুরে তাহার বউদিদির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। একে পতি নিরুদ্দেশ—তাঁহাতে আজ দুই তিনদিন হইল পিতৃ-বিয়োগের অসহ্য কষ্ট সহ করিয়া, রক্তাবলী

যেন জীবন্ত হইয়াছেন। অধীর সে অপরূপ রূপ, নবীন যৌবনের সে সৌন্দর্য এই কয়দিনের মধ্যে যেন কোথায় তিরোহিত হইয়াছে—দেখিলে আর চিনিতে পারা যায় না। রত্নাবলী দুঃখী-রামকে দেখিয়া প্রাণের আবেগে উচ্চৈশ্বরে পিতার জ্ঞাত কাদিয়া আকুল হইলেন।

দুঃখীরাম কিয়ৎক্ষণ ত্রিযমাণভাবে কালযাপন করিয়া বলিলেন—
“বৌদি! আর কাদিয়া কি করিবে, জগতে কালের হাত তাকে এড়াইতে পারে না? তুমি বুদ্ধিমতী, এক্ষণে ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া শোক সম্বরণ করিতে চেষ্টা কর। এখন এদিক ওদিক দুই দিকের ভার তোমারই উপর পতিত। তুমি শক্ত না হইলে দুইদিকই ভাসিয়া যাইবে।”

রত্নাবলী।—ভাই! আমার আর কোনদিকেই চাহিতে ইচ্ছা নাই। পিতার ত কাল পূর্ণ হইয়াছিল—তিনি চলিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আমার গতি কি হইবে? যম আমাকেও এ সময় গ্রহণ করিলে আমি প্রাণের এ দুর্কিসহ জালা হইতে নিষ্কৃতি পাই। আমি আর এ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না, চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি।”

দুঃখীরাম বলিলেন—“অদৃষ্টে দুঃখ থাকিলে কে তাহা রোধ করিবে বৌদি! তুমি একটু ধৈর্য ধারণ কর—আমি দাদার অন্বেষণে বাহির হইয়াছি—দেখি, ভগবান কি করেন।”

দুঃখীরাম তুলসীদাসের অন্বেষণে বাহির হইয়াছে; সে অতি বুদ্ধিমান এবং কষ্ট-সহিষ্ণু যুবক—সহজে হতাশ হইয়া গৃহে ফিরিবে না, ভাবিয়া একটু আশ্বস্ত চিন্তে রত্নাবলী বলিলেন—“বাড়ীর বন্দোবস্ত কি করিয়া আসিলে?”

হুঃখীরাম কহিলেন—“সেখানকার অবস্থা আরও খারাপ, খুড়ীকে ত কিছুতেই রাখা যায় না—তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন—কাঁদিয়া কাঁদিয়া একপ্রকার অন্ধ হইবার উপক্রম করিয়াছেন, কিন্তু তা বলিয়া আমি আর কতকাল বসে থাকি? তাঁহার তত্ত্বাবধানে নামীকে রাখিয়া এবং পাড়ার লোককে সমস্ত ভার দিয়া আজ বাহির হইয়াছি। দাদা সাধুসদ্ব বড় ভালবাসিতেন—কাশী-ধামেই সকলপ্রকার সাধুর আড্ডা, এইজন্য প্রথমে কাশীতেই যাইব। তুমি এক কাজ কর। যত শীঘ্র পার—এখানকার বন্দোবস্ত করিয়া সেখানে খুড়ীর কাছে বাও; তুমি গেলেও কতকটা রক্ষা হয়!”

রত্নাবলী হুঃখীরামের নিকট আপন মনোভাব কিছুই প্রকাশ করিলেন না। সংসার যে এখন তাঁহার পক্ষে কণ্টকাকীর্ণ—সে ভাবের কোন আভাস না দিয়া বলিলেন—“ঠাকুরপো! মাকে একটু প্রকৃতিস্থ দেখিয়া আমি শীঘ্রই তথায় যাইব। সেজন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। তুমি ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া স্বকাষ্যে গমন কর—ভগবান করেন যদি দুই একমাসের মধ্যে তাঁহাকে আনিতে পার—তবেই মঙ্গল, নতুবা এ সংসার অরণ্যের ঘোর অন্ধকারে আর থাকিতে পারিব না—আমিই যে তাঁহার গৃহত্যাগের প্রধান কারণ, সেদিন যদি মদগর্বে আত্মহারা হইয়া সেরূপ কথা না বলিতাম—তাহা হইলে আর এরূপ মর্ম্মযাতনা ভুগিতে হইত না—তোমাকে আর মাকেও এত কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। যেমন কৰ্ম্ম করিয়াছি—চির পদানতা দাসী হইয়া প্রভু প্রীতি তিরস্কারের ফল যথেষ্ট ভোগ করিতে হইবে—আরও কিছুদিন এই দুশ্চিন্তা হৃদয়ে পোষণ করিতে হইলে ধৈর্যের বাধ বোধ হয় ভাবিয়া পড়িবে—তিনিও যে পথে গিয়াছেন—আমাকেও সেই পথে যাইতে হইবে। এখন আর

তাহাতে ভয় নাই—নারীর ভয়ের কারণ যে রূপ-যৌবন, এই কয়দিনের দারুণ দুঃখভোগে তাহা নষ্ট হইয়াছে—এখন কাহারও চক্ষু আর আমার রূপে আকৃষ্ট হইয়া সর্বনাশ সাধনে উদ্যত হইবে না।

দুঃখীরাম রত্নাবলীর উদাস ভাব, তাঁহার মনোপত সঙ্কল্পের আভাস পাইয়া প্রমাদ গণিলেন। রত্নাবলী মনে করিয়াছিলেন—প্রাণের কথা কাহাকেও প্রকাশ করিব না কিন্তু অতিশয় অসহ্য হওয়ায়—তিনি স্বামীর একমাত্র বন্ধু দুঃখীরামের নিকট মনোবেদনা না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না।

স্বামীর গৃহত্যাগের যে আমিহ কারণ—রত্নাবলীর তাহাই দৃঢ়-বিশ্বাস হইয়াছে। তুলসীদাস যে এই রকমে ফিরিয়া পড়িবে—প্রাণারাম ভগবান রামচন্দ্রের পরম ভক্ত হইয়া জগতীতলে অক্ষয় কীর্তি সংস্থাপন করিবে, তাঁহার জ্ঞাত যে দ্বিবেদীর কুল পবিত্র হইবে,—রত্নাবলী একদিনের জ্ঞাত তাহা ভাবেন নাই। জানেনও না যে ইহা সেই চক্রীর চক্র। তিনি যে নিজেই মহাদোষে দোষী ; তাঁহারই তাঁত্র বচনবাণে স্বামী গৃহ ছাড়া, এই ভাবিয়া সতী রত্নাবলীর প্রাণে ভয়ানক ধিকার জন্মিয়াছে। কিন্তু দুঃখীরাম বন্ধুর প্রাণের ভাব জানিতেন—গুরু নৃসিংহদাসের মুখে তিনি ভবিষ্যদ্বাণীও শুনিয়াছিলেন—তুলসী সামান্য বালক নহে—ইহার দ্বারা জগতে অতি সুমহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। তাই তিনি বৌদ্ধিকে সাস্ত্যনাচ্ছলে বলিলেন—বৌদি ! তুমি ভেবো না—দাদার এই বৈরাগ্যে, বোধ হয় তোমরা ধন্ত হইবে—তুমি যে শক্তি তাহাতে প্রয়োগ করিয়াছ—ইহার বলে বোধ হয়—তিনি যথার্থ রঘুনাথের পদে আত্ম-সমর্পণ করিয়া মানব জন্ম সার্থক করিবেন, তুমিও যথার্থ সহধর্ম্মিনীর কার্য্য করিয়া অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করিবে।

ভাই! আমি পাপ পুণ্য কিছুই জানি না—একমাত্র সেই চরণই আমার ভরসা, নারীজীবনে—তাহা ছাড়া বে আর কোন মোক্ষপদ আছে তাহা আমার বিশ্বাস নাই? বলিয়া রত্নাবলী বস্ত্রাঞ্চলে চকের জল মুছিলেন।

লক্ষ্মীদেবী স্বামীর বিয়োগে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। তিনি এতক্ষণ আনুমনে বসিয়া কেবল নিজ অদৃষ্ট চিন্তায় ধরাতল অভিযুক্ত করিতেছিলেন। স্বামীত স্বর্গগত হইয়াছেন, তাহার আর উপায় নাই।

এক্ষণে মেয়ে স্বামীর ঘর করিবে—স্বামী-স্থখে, স্থখিনী হইবে—সকল জননীর প্রাণের ইহাই আকাঙ্ক্ষা—কিন্তু এ কি হইল? একমাত্র কন্যা—রূপ-ঘোবন-সুসম্পন্ন; কোথায় তাহার উন্নতি দেখিয়া, স্থখে স্বচ্ছন্দে তাহাকে ঘর সংসার করিতে দেখিয়া প্রাণে অপার আনন্দানুভব করিবেন—না মেয়ের এই অল্পবয়সে, তাহার এই দারুণ দুর্দশা—স্বামী-বিরহে তাহাকে একান্ত বিমনা দেখিয়া মন নিরানন্দসাগরে ডুবাইয়া দিতেছেন।

এই সেদিন তাঁহারও কপাল ভাঙ্গিয়াছে—স্বামী স্বর্গগত হইয়াছেন—এ সংসারে আর তাঁহার আপনার বলিতে কেহ নাই। কন্যা জামাতা যদি ঠিক থাকিত, তাহারা যদি মনের আনন্দে সংসার করিত—তাহা হইলে তাঁহারও কতকটা আশা ছিল। এই নিরাশ্রয় অবস্থায় তাঁহাকে একবেলা এক মুঠা খাবার জন্ত, যা তা একখানা পরবার জন্ত কষ্ট পাইতে হইত না। লোকে কথায় বলে—“যদি কন্যা পড়ে পাড়ে, কি করিবে দশ পুত্রে” সেইরূপই পড়িয়া ছিল—কিন্তু কপাল দোষে সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল। এখন নিজের অপেক্ষা কন্যার, ভবিষ্যৎ ভাবিয়া লক্ষ্মীদেবী অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন।

দুঃখীরাম আসিয়াছে—সে জামাইয়ের অধেষণে যাইতেছে—দেখিয়া
প্রাণের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া কাদিতে কাদিতে বলিলেন—বাবা !
আর বিলম্ব করো না—ওনিয়াছি তুমি আমার তুলসীর পরম বন্ধু
যাও বাবা ! আশীর্বাদ করি, তুমি শীঘ্র তাঁহার সন্ধান করিয়া
আমাদের প্রাণ বাঁচাও—নতুবা একজনের জন্ত অনেকগুলি প্রাণীর
কষ্টের একশেষ হইবে, এমন কি, খাওয়া পরার অভাবে নানাস্থানী
হইতে হইবে।

দুঃখীরাম বলিলেন—মা ! কোন চিন্তা নাই, ভগবান ভালই
করিবেন। আপনি প্রবীনা—বৌদিকে দেখিবেন—সময়ে সময়ে খুড়ী-
মার সংবাদ লইবেন—আমি তবে এখন আসি। এই বলিয়া দুঃখীরাম
আহারাদি করিয়া ধর্মপুর ত্যাগ করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সৌভাগ্যোদয়

তুলসীদাসের প্রাণে এখন আর সংসার ভাবনা কিছুমাত্র নাই।
এখন তিনি ভুলেও পরিবারের কথা মনোমধ্যে স্থান দেন না—
তবে সময়ে সময়ে জননীর স্নেহ তাঁহাকে মুগ্ধমান করে, তিনি
মনে করেন—কিছুদিন ভগবানের সাধনায় একটু পাকা হইলে
তাঁহাকে লইয়া আসিব। রত্নাবলীর প্রতি তাঁহার একান্ত আসক্তি,
সেই প্রগাঢ় অমুরাগ, এখন ঈশ্বরমুখী হইয়া প্রাণের সহস্র দ্বার খুলিয়া
দিয়া তাহাকে অমূল্যম আশার আশ্বাসে উদ্ভুদ্ধ করিতেছে। সাধিলেই
শিক্তি, কাতর প্রাণে ডাকিলেই ইষ্ট দরশন অনিবার্য—তুলসীদাস

এখন এইরূপ বিশ্বাস করিয়া কেবল রঘুপতি সীতানাথের চরণ সার করিয়াছেন।

কালীতে আসিয়া তিনি সন্ন্যাসীর চতুপ্পাণীতে আশ্রয় পাইয়াছেন। এখানে বেদান্তের ব্রহ্মসূত্র, তত্ত্ব-নির্ণয়, মীমাংসা প্রভৃতি অনেক গ্রন্থই আয়ত্ত করিয়াছেন; গুরুদেব তাঁহাকে অন্ত ছাত্র অপেক্ষা প্রাণের সহিত শিক্ষাদান করিতেছেন। কিন্তু কই, ইহাতে ত তাঁর ইষ্ট আরাধনার পথ বিস্তৃত হইতেছে না। বরং জ্ঞানের প্রাবল্য হেতু ধর্ম সম্বন্ধে নানাপ্রকার যুক্তি তর্ক মনোমধ্যে উদয় হইয়া প্রাণের সরল বিশ্বাসকে বিচলিত করিতেছে। ভক্তিহীন জ্ঞানে, অসার গুরু তর্কবাদে প্রেম-বিষয়ের মীমাংসা হয় না; কেবল তর্কের বৃদ্ধি হয়। এইজন্ত শ্রীমদ্ভগবৎ বলিয়া থাকেন—“বিশ্বাসে পাইবে বহু তর্কে বহুদূর।” ভক্তির নব লক্ষণাক্রান্তা—শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণু-স্মরণং পাদ সেবনং, অচ্চনং বন্দনং দান্ত্যং সখ্যমন্ত নিবেদনম—এই নব-লক্ষণা ভক্তির দ্বারা ভগবানে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেই সকল অন্ধকার ঘুচিয়া যায়।

গুরুদেব তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন, অধ্যাপনা কার্যে তাঁহার কিছুমাত্র ক্রটি নাই। সময়ে সময়ে ভগবৎচিন্তার ধ্যান ধারণার বিষয়ও উপদেশ দিতে ক্রটি করেন না। কিন্তু এখানে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ছাত্র সকলে একত্র থাকায় তাঁহার সাধনার ব্যাঘাত হইয়া থাকে। সকলের প্রাণ ত আর সমান নয়! সকলে ত আর সমান ভাব লইয়া শিক্ষা করিতে আসে নাই! কাজেই গুরুর অমুমতি গ্রহণ করত তুলসীদাস আরও নির্জন স্থানের দরিদ্র পল্লীতে আপনার বাসস্থান নির্বাচন করিলেন এবং প্রত্যহ এক একবার-গুরুর নিকট ভক্তিশাস্ত্র পাঠ করিয়া যাইতেন।

তারপর সমস্ত দিবা রজনী তাঁহার সেই নির্জন গৃহে বসিয়া রাম নামে বিভোর হইয়া থাকিতেন। নিজের গ্রামাচ্ছাদনের জন্ত কুটীরের বাহিরে তিনি সামান্য একখানি পসারীর দোকান খুলিয়া ছিলেন। তাহাতে ছাতু, ছোলা, চিড়া, মুড়কী, গুড় প্রভৃতি দ্রব্য কিছু কিছু সাজান থাকিত। দরিদ্র পল্লীবাসী, অভাব হইলে সময়ে সময়ে তাঁহার নিকট হইতে ঐসকল দ্রব্য খরিদ করিত। ইহাতে তাঁহার একপ্রকার প্রাণধারণোপযোগী জীবিকাজন হইত।

দোকান করা নাম যাত্র—তবে ভিক্ষা না করিয়া একটা অবলম্বন লইয়া ত থাকিতে হইবে? এই জন্ত এই কারবার পাতিয়া বসিয়া তিনি সমস্ত দিন আপনার কাজে ব্যাপ্ত থাকিতেন। ভগবান উহাতে যাহা দিতেন, তাহাতেই তিনি পরম সন্তুষ্টচিত্তে কালাতিপাত করিতেন। প্রাতঃকালে একবার গুরু গৃহে যাওয়া ভিন্ন তুলসীদাসের আর দিবারাত্র অল্প কোথাও যাইবার সময় বা প্রবৃত্তি ছিল না; নিজ গৃহে সমস্তদিন তন্নয়নভাবে প্রভু রামচন্দ্রের উপাসনা করিয়া চিত্ত-শুদ্ধি লাভ করিতেন।

তুলসীদাস প্রত্যহ প্রাতঃকালে শৌচাদি সমাপন করিয়া পাত্রা-বশিষ্ট অপবিত্র জল একটা ঝোঁপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া গঙ্গায় স্নান সমাপন করিয়া কুটীরে আগমন করিতেন—ইহাই তাঁহার নিত্য-ক্রিয়া ছিল। একদিন অসাবধানতা বশতঃ তুলসী ঐ ঝোঁপের মধ্যে শৌচাবশিষ্ট জল নিক্ষেপ না করিয়া, প্রত্যুষে স্নান সমাপনান্তর কুটীরে আগমন করিয়াছেন। সেদিন তাঁর প্রাণ এত ভাব-বিভোর, বন এত ভক্তিভাবে আপ্নত হইয়াছিল যে, সমস্তদিন ভগবানের পাদপদ্মে মতিস্থির রাখিয়াই সময় কাটাইয়া দিলেন। দেহ অনবরত রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল—কোনপ্রকার কাজে মন লাগিল না। এই-

রূপে সমস্তদিন ইষ্টচিন্তায় অতিবাহিত করিয়া তুলসীদাস সন্ধ্যার পর কিছু জলযোগ করিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিষামাত্র তাঁহার নিজাকর্ষণ হইল। কিছুক্ষণ পরে সহসা এক আশ্চর্য ঘটনায় তাহার নিজাবেশ কমিয়া আসিল, তুলসীদাসের ভাগ্যগগণে সৌভাগ্য সূর্য্যের উদয় হইল। স্ত্রীমূর্তি না হওয়ায় তিনি স্বপ্ন দেখিলেন—যেন একটি বিকটাকার পিশাচ মূর্তি তাঁহার শিরোদেশে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন—ব্রাহ্মণ কুমার! তোমার প্রদত্ত প্রত্যহ শৌচাস্ত ভূজার করিতে আমার পিপাসার শাস্তি হয়—আজ তাহা না দিবার কারণ কি, বৎস?

তুলসীদাস ভয়ানকচিত্তে চমকিত হইয়া নিদ্রোথিত হইলেন, ভয়ে জড়মড় হইয়া বলিলেন—“আপনি কে? আমি কখন কি আপনাকে অপবিত্র বারি প্রদান করিয়াছি?”

প্রেতমূর্তি অভয় প্রদান করিয়া বলিল—বৎস! ভয় নাই, আমি তোমার অপকার করিতে আসি নাই—উপকার করিবার মানসেই আসিয়াছি। তুমি অভিলাষিত বর প্রার্থনা কর!

তুলসী।—কে আপনি? কিসের জগুই বা বর প্রার্থনা করিব—কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না!

পিশাচ।—বৎস! তুমি প্রত্যহ শৌচাস্ত জল, যাহা ঝোঁপের মধ্যে নিক্ষেপ কর—আমি একজন প্রেতমূর্তি, প্রত্যহ ঐ জল পান করিয়া তৃপ্ত হই। আজ তাহা না পাইয়া অস্থির হইলেও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতেছি—তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে গ্রহণ কর!

তুলসীদাস বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন—হে পিশাচবর! কি পাপে আপনার এ দুর্গতি হইয়াছে, বলিতে আপত্তি না থাকিলে প্রকাশ করুন এবং যদি কোন প্রতিকার করিলে আপনার প্রেতত্ব মোচন হয়—তাহারও অনুমতি করুন।

পিশাচ। বৎস! তুমি আমার পরম উপকারী। আমার পূর্ব কাহিনী শুনিতে যদি এতই ইচ্ছা থাকে, তবে শ্রবণ কর। আমি পূর্বজন্মে নন্দীগ্রামে এক পবিত্র ব্রাহ্মণকূলে জন্মগ্রহণ করি। বিদ্যা-বুদ্ধি প্রভাবে এক সদাশয় নৃপতির সভা-পণ্ডিত হইয়াছিলাম। রাজা আমাকে বিশেষ ভক্তি ও বিশ্বাস করিতেন। দরিদ্রতা নিবন্ধন তাঁহার নিকট যখন যাহা চাহিতাম, অকাতরে তিনি তাহা প্রদান করিতেন। সভায় আরও অনেক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন, সময়ে সময়ে তাঁহাদের নাম করিয়া রাজার নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতাম কিন্তু এক কপর্দকও তাঁহাদের দিতাম না। এইরূপে ব্রহ্মস্ব অপহরণ করিয়া সুখে কাল হরণ করিতে লাগিলাম।

তুলসীদাস আশ্চর্য্যাব্বিত হইয়া বলিলেন—তারপর, আপনি নন্দী-গ্রাম বাসী হইয়া কিরূপে এখানে আসিলেন?

পিশাচ পুনরায় বলিতে লাগিল—মহারাজা অতি ধার্মিক ছিলেন। একদিন সপরিবারে ৩৬বিংশত্বরের দর্শন মানসে কাশী আসিবার মনস্থ করিয়া আমাকে সহযাত্রী করিলেন। আমিও মনের আনন্দে কাশীতে আসিলাম। এমন পবিত্র স্থানে আসিয়া—এত বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও, এমন পবিত্র কূলে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমার ধনের তৃষা কিছুতেই মিটিল না। পূর্বাপেক্ষা অনেক বড় ধনী হইয়াছি—তথাপি পরের নাম করিয়া রাজার নিকট হইতে টাকা লইয়া আশ্রসাৎ করার অভ্যাস আমার গেল না—“অর্থ মনর্থঃ ভাবয় নিত্যং” কেবল পড়িয়া আসিয়াছি—কাজে কিছু কিছুই করি নাই। কাশী-তেও আমি ঐ দুষ্টবুদ্ধি বশে চালিত হইয়া একদিন এই প্রান্তর মধ্যে যাইতে যাইতে রাত্রিকালে সর্পদংশনে হটাৎ আমার প্রাণত্যাগ হইল। মহারাজা অনেক চেষ্টা করিয়াও আমার প্রাণরক্ষা করিতে পারিলেন না।

তুলসী। আপনি জীবনে আর কোন পুণ্য কার্য করেন নাই কি ?

পিশাচ।—না, যথেষ্ট উপার্জন করিয়াছি। শঠতা, প্রবঞ্চনা দ্বারা অনেক অর্থ উপার্জন করে কেবল পুত্র-কন্যাত্রেয় ভরণ-পোষণে ব্যয় করেছি, সংসারের অসার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে কেবল উহাদের ভরণ-পোষণই পরম পুরুষার্থ মনে করেছি, অল্প ধর্ম কিছু করি নাই, কেবল একদিনের একটু মাত্র পুণ্য করেছিলাম বলে—তোমার প্রদত্ত ঐ অপবিত্র জলে আমি পিপাসার শান্তি করছি।

তুলসী।—হায় হায় ! কি সর্বনাশ, এই শৌচাস্ত্র জল আপ-নার পুণ্য প্রভাবে প্রাপ্ত, পিশাচবর ! সে পুণ্য কি—যদি আপত্তি না থাকে—অনুগ্রহ পূর্বক প্রকাশ করুন।

পিশাচ।—বৎস ! যখন এতদূর বলিয়াছি তখন আর অবশিষ্ট টুকু না বলিব কেন ? তবে শ্রবণ কর। একদিন মধ্যাহ্নকালে দারুণ রোদ্রে পিপাসার্থ হয়ে একজন ব্রাহ্মণ আমার নিকট বারি প্রার্থনা কল্লেন। আমি তখন অল্প বারির অভাবে আমার শৌচাদির জন্ত রক্ষিত ভৃঙ্গারের জল সেই ব্রাহ্মণকে পান কর্তে দিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণ বারিপানে তৃপ্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন। এই আমার সারা জীবনের মধ্যে পুণ্য কর্ম।

তুলসী। তারপর আপনার মৃত্যুর পর কি হলো ?

পিশাচ। কাশী মৃত্যুতে যমের অধিকার নাই, অপঘাতে মৃত্যু হলেও যমদূতেরা আমাকে লইতে আসিলে শিবদূতগণ তাহাদের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া আমাকে এইস্থানে প্রেতযোনী করিয়া রক্ষা করিলেন। বহু কষ্টভোগের আদেশ করিয়া বলিলেন—পাপিষ্ঠ, তুই এইখানে এইভাবে অবস্থান কর—কোন ভক্ত ব্রাহ্মণের শৌচাস্ত্র

বারিগানে মুক্তিলাভ করি; তোমার এই বারি আমার মুক্তির উপায়। আর একদিন মাত্র বাকী, বৎস! কল্যাণ তাহা প্রদান করিও, এক্ষণে যদি তোমার কোন বর নইবার ইচ্ছা থাকে—প্রার্থনা কর।

তুলসী। মহাশয়! আপনার অপূৰ্ব্ব জীবন কাহিনী শ্রবণ করে আমার চৈতন্য সঞ্চার হলো। যে অর্থের জন্য আপনার এত দুর্গতি, সেরূপ পার্থিব কোন অর্থের আকাঙ্ক্ষা আমার নাই—কারণ অর্থই যে অনর্থের মূল তাহা আমি জানি। তবে যদি একান্তই আমার প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে থাকেন, তাহা হইলে আমার হৃদয় রাজ্যের অধিষ্ঠার প্রভু রামচন্দ্রের দর্শন কেমন করিয়া পাইব। যদি তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবার কোন পন্থা বলিয়া দিতে পারেন—তাহা হইলে আজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকি। ইহা ভিন্ন আমার জীবনে আর অন্য কামনা নাই।

পিশাচ। বৎস! আমার সে ক্ষমতাই যদি থাক্বে তবে আমি এ দুঃসহ কষ্ট সহ করিও কেন? দেখাইয়া দিবার ক্ষমতা আমার নাই, তবে আমি একটা উপায় বলে দিচ্ছি—তাহাতে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

তুলসীদাস সাগ্রহে বলিলেন—বলুন, বলুন পিশাচবর! সে উপায়টি কি?

পিশাচ। বৎস! কাশীর অনতিদূরে একস্থানে প্রত্যহ রামায়ণ পাঠ হইতেছে, তুমি প্রত্যহ তথায় রামায়ণ পাঠ শুনুতে যাও। সেখানে যাইয়া দেখিবে, একটা ব্যাধিগ্রস্ত ব্রাহ্মণ সকলের অগ্রে আসিয়া আসরের একদ্বারে অতি বিনীতভাবে বসিয়া থাকেন। তারপর পাঠ শেষ হইলে সকলের পর তিনি আস্তে আস্তে সেস্থান ত্যাগ

করেন। তিনি আঃ কেহই নহেন—তোমার ইষ্ট দেবতার প্রধান ভক্ত পবন নন্দন হুমান। তাঁর শরণাগত হলে তোমার মনো-বাসনা নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবে।

তুলসীদাস পরম পুলকিত হইয়া বলিলেন—শিশাচ প্রবর! পরম ভক্ত ধার্মিক চুড়ামণি হুমানজী এমন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া সকলের অগ্রে আসিয়া সকলের পর যাইবার কারণ কি? এবং তিনি কোথায় গমন করেন?

শিশাচ। বৎস! তুমি শাস্ত্র-পাঠী পণ্ডিত। বোধ হয় জ্ঞান, অর্থব্যয় বলি, ব্যাস, হুমানস্ত, বিভীষণ প্রভৃতি ইহারা অমর—চিরকালই আছেন—তবে পাপ চক্ষে কেহ দেখিতে পার না। যেখানে প্রভুর গুণগান হয়, সেইখানে হুমানজী অলক্ষ্যে আগমন করেন। পাছে কেহ চিনিতে পারে বা তাঁহার সহিত কথাবার্তা কহিয়া মনের ভাব গ্রহণ করে—এইজন্ত অতি ঘৃণিত ব্যাধিগ্রস্ত রূপ ধারণ করিয়া আসেন। তাহা হইলে ঘৃণায় আর কেহ কাছে ঘেসিবে না। সকলের শেষে যাইবার কারণ—পাছে কেহ পশ্চাদ্ভ্রমসরণ করে—এইজন্ত সকলে চলিয়া গেলে—তবে তিনি স্বস্থানে গমন করেন। কাশীর পশ্চিমে নিবিড় অরণ্যে তাঁহার বাসস্থান। বৎস! এই তোমার অভিলাস পূর্ণ হইবার উপায় বলিয়া দিলাম, এখানে কল্যাণান্তে জল প্রদানে বিন্মত হইও না—এই বলিয়া শিশাচ মৃষ্টি অন্তর্হিত হইলেন।

পুলকাবশে, ভাবের ঘোরে তুলসীদাস সমস্ত রজনী মনের আনন্দে শ্রীরামের ধ্যানে কাটাইয়া প্রাতঃকালে উঠিয়া শিশাচের কথা মন্ত সেই ঝোপে শোচাস্ত বারি প্রদান করিবামাত্রই—“আঃ! আজ আমি উদ্ধার প্রাপ্ত হইলাম—তুলসীদাস তোমার অভিলাস পূর্ণ

হউক”—বলিয়া অশরীরি পিশাচ মূর্তি দিব্য দেহ ধারণ করিয়া শিব-লোক প্রাপ্ত হইল।

তুলসীদাসের প্রাণ আজ আনন্দে নৃত্য করিতেছে। শরীর সর্বদা পুলক রসে আগ্রুত হইয়া কণে কণে রোমাঞ্চিত, শ্বেদ নির্গত ও চক্ষু ভক্তি অশ্রুতে আর্দ্র হইতেছে। সামান্য মাত্র আহার করিয়া তিনি তন্নয়নভাবে রাম নাম কীর্ত্তন করিয়া দিব্যভাগ অতিবাহিত করিলেন। সায়াহ্নে আপনার কর্তব্য কর্ম সমাধা করিয়া যথায় রামায়ণ গান হইতেছিল—তথায় যাইয়া একটা নিভৃত স্থানে প্রচ্ছন্ন ভাবে দাঁড়াইয়া দেখিলেন—বাস্তবিক একটা ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি আসিয়া চব্বরের একধারে উপবেশন করিল। তখন সবেমাত্র বিছানা পাতা হইয়াছে, কোন লোক সমাগম হয় নাই। তারপর সন্ধ্যা হইল, কথক ঠাকুর আসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য লোকের জনতা হইল। রামায়ণ গান শুনিয়া সকলে মোহিত হইল—রাত্রি দশটার সময় সভাভঙ্গ হইলে যে যাহার আবাসে চলিয়া গেল। ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিটি আসর নির্জন দেখিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইলেন। তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে, পথে ঘাটে কোন লোকজন নাই। তিনি আন্তে আন্তে অগ্রসর হইতে লাগিলেন—তুলসীদাসও পশ্চাৎ গ্রহণ করিলেন।

অনবরত এক ঘণ্টা পথ অতিবাহিত করিয়া তিনি যখন মাঠের শেষ প্রান্তে বনমধ্যে প্রবেশ করিবেন—সেই সময় পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিবার মাত্র তুলসীদাস তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইলেন। ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি বিশ্বয়াষিষ্ট চিত্তে বলিলেন—কে তুমি, আবার অহুগমন করিতেছ? এদিকে তোমার আবশ্যক কি, এদিকে ত লোকালয় নাই? তুলসী। প্রভু! লোকালয়ে আমার আবশ্যক নাই—আমি

বহুদিন হইল—গৃহবাস বা লোকালয় একপ্রকার ত্যাগ করিয়া পথে পথে ঘুরিতেছি। আর কিছুদিন যদি আরাধ্য দেবতা প্রভু রামচন্দ্রের দর্শন না পাই, তাহা হইলে এ জীবন পরিত্যাগ করিব। কিন্তু বিধি সদয়—আজ আপনার দর্শন পাইয়াছি, আপনাকে চিনিতে আমার বাকী নাই; এক্ষণে আমার প্রভুর দর্শনের উপায় বলিয়া দিন, নতুবা আপনার ক্ষম্য পরম ভক্তের পদে এ প্রাণ আহুতি দিয়া জন্ম সার্থক করিব—এই আমার প্রতিজ্ঞা! ছদ্মবেশী পবনকুমার কিছুক্ষণ আত্মবিস্মৃত যুবকের কথায় ধ্যানস্থ হইলেন—এ যুগে যে পরম ভক্ত, রামচন্দ্র যে প্রকারান্তরে ইহাকে দেখা দিবেন। ইহার জীবনে যে সে নোভাগ্যের পরিণাম নাই—তাহা বুঝিতে পারিলেন, ইহার দ্বারা জগতের যে মহোৎসবের সাধন হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই! রামাধন রচয়িতা মহাকবি বাম্বিকী আর তুলসীদাস রূপে ভগ্নগ্রহণ করিয়া প্রভুর মাহাত্ম্য কীর্তন করিবে। সংস্কৃত রামায়ণ পণ্ডিতের জন্ত; হিন্দুধানীর নেশে তুলসীদাস নিজ নামে প্রভুর মাহাত্ম্য-গাথা হিন্দ ভাষায় প্রচার করিয়া দত্ত হইবে—সেই উদ্দেশ্যেই প্রভু তাহাকে ধরাধামে পাঠাইয়াছেন। ইহার ভক্তিময় রচনা পাঠ করিয়া সমগ্র পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দ মুগ্ধ হইয়া প্রভুর মহিমারসে মজিয়া যাইবে! তবে বলিকাল বলিয়া ইহার সহিত প্রভু সাক্ষাৎ দর্শনে নান বিঘ্ন ঘটবে, কিন্তু প্রভু ইহাকে নানা প্রকারে দর্শন দিবেন। কর্মজ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ে তুলসীদাসেব জয়যজ্ঞের উৎসব হইয়া রামনাম মহাবীজের অর্জুত বৃক্ষ অঙ্কুরিত হইতেছে। আর এই ভক্ত চূড়ামণিকে দেখিয়া আমিও দত্ত হইলাম। হুহুমান প্রকাশে বলিলেন—বৎস! তুমি পরম ভাগ্যবান, আর আমার অহুসরণ করিতে হইবে না। তুমি আপ্যায়ী পরম শ্রীরামনামী তিথিতে তোমার গৃহ বসিয়া

তঁাহার দর্শন লাভ করিবে। যাও বৎস ! অনেক দূর হইয়াছে, আর অগ্রসর হইও না, কুটীরে যাইয়া আহাতি কর !—এই বলিয়া পবনকুমার তুলসীদাসকে আশ্বাসপ্রদান করিয়া বনের মধ্যে অস্তিত্ব হইলেন।

তুলসীদাস আবেশ-বিভোর—চলিতে চরণ আর চলে না ! আনন্দে বিভোর হইয়া দিক্ নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না ! চক্ষু প্রেমাপ্ত ! কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না—দিশাহারা, দিক্ভ্রান্ত হইয়া আনন্দে চলিয়াছেন। সেই নব-দুর্জাদল-শ্রামযুগ্মির দর্শন আশায় প্রাণ এত পুলক পূর্ণ হইয়াছে যে, আর চলিবার শক্তি নাই ! আনন্দে আত্মহারা হইয়া আধ ঘণ্টার পর দুই ঘণ্টায় আসিয়া রাত্রি শেষে নিজ কুটীরে উপস্থিত হইলেন। আশার আশ্রমে প্রাণ ভোরপুর, ভবক্ষুধা নিবৃত্তির আশা এখন পাইয়াছেন, তখন সামান্ত ক্ষুধা তঁাহার আর কোথায় ? তথাপি দোকানের সামান্ত চিড়াগুড় লইয়া সমস্তদিনের পর উদরের তৃপ্তিসাধন করত বাহিরের দাওয়ায় শয়ন করিলেন।

তুলসীদাস মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—যখন পরমভক্ত পবন-কুমার হনুমান আশা দিয়া বলিয়াছেন—আগামী পরশ্ব শ্রীরাম নবমীর দিন প্রভুর সহিত তোমার কুটীরেই দেখা হইবে—আর ইত্যন্ততঃ করিতে হইবে না—তখন আর চিন্তা কি ? তঁাহার কথা কি কখন মিথ্যা হইবার ? হায় ! এতদিন আমি কি করিয়াছি, বৃথা কুটূর্ব-ভরচিন্তনে জীবন অতিবাহিত করিয়াছি ! বৃথা পার্থিব-প্রেমে মুগ্ধ হইয়া অমূল্য সময় নষ্ট করিয়াছি ! কিন্তু তুলসীদাস জানেন না যে সেই পার্থিব প্রণব, শ্রীর প্রতি সেই ঐকান্তিক অমুরাগই তঁাহার সাধনার পথ এত হৃগ্নয় করিয়া দিয়াছে ! তঁাহার প্রাণে অমুরাগ-ভক্তির উৎস এমন করিয়া খুলিয়া দিয়াছে ! রত্নাবলীর ন্যায় সাধনাসাধীর অমোঘ শক্তিই তঁাহার

এত শীঘ্র ভগবদ্দর্শনে সামার্থ্য প্রদান করিয়াছে। তিনি অনন্যশরণ হইয়া ভাবাবেশে নিজার কোমল ক্রোড়ে নিমজ্জিত হইয়া পড়িলেন।

চিন্তামণি যেমন বিষমকালকে একদিনের এক কথায় সংসারের লকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, চিন্তামণির হৃদয়ভেদী বাক্যে তিনি যেমন প্রাণের আবেগে ফিরিয়া পড়িয়াছিলেন, আজ অতুল-প্রেমিক তুলসীদাসও সেইরূপ রত্নাবলীর তীব্র বচনবাণে বিদ্ধ হইয়া জীবনের পথ মুক্ত করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পরোক্ষ দর্শন

“জপাংসিদ্ধি” মনেপ্রাণে অনবরত ইষ্টনাম জপে যত সঙ্কর সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়, এরূপ আর কিছুতেই পারা যায় না। এই জপ কেহ মালা ঘুরাইয়া সাধনা করেন, কেহ করাকুলি ঘারা সংখ্যা রাখিয়া সমাধা করেন, কিন্তু ভক্তসাধক তুলসীদাস এ দুইয়েরই পক্ষপাতি ছিলেন না, তিনি বলিতেন—

মালা জপে শালা, কর জপে ভাই।

যো মন মন জপা, উন্মো বলিহারী যাই।

ভক্ত সাধক তুলসীদাস কর্ম ও জ্ঞানমার্গ উত্তীর্ণ হইয়া ভক্তিমাগে সুব পাকা হইয়াছিলেন। সেই ভক্তিতে পাকা হইলে প্রেম সঞ্চার হইয়াছিল। আবার সেই প্রেম হইতে সাধক মহাভাবের ভাবুক হইয়া সময়ে সময়ে ভগ্ন হইয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। এইজন্য তাঁহার সাধনকার্য্যে কোন প্রকার আড়ম্বর ছিল না। তাঁহার ভাব দেখিয়া

সাধারণ লোক জানিতেও পারিত না যে ইনি একজন মহাত্মা—স্বর্গনার উচ্চতরে আরোহণ করিয়া যথার্থ মহুগ্ৰন্থ অর্জন করিয়াছেন।

ভক্তিমার্গে আরোহণ করিয়া তিনি কর্ম বা জ্ঞানমার্গ পরিত্যাগ করেন নাই, শুধু তিনি প্রত্যহ দৃঢ় ভাবে লিপ্ত থাকিতেন। অগতাই যে কর্মময়! সৃষ্ট বস্তু মাঝেই যে কর্মের অধীন! কর্ম না করিয়া তুমি পরম জ্ঞানী, ভক্ত বা সম্মানী হইলেও তোমার একবৎ ঋকিয়ার অধিকার নাই! নিষ্কর্মী-কলাকাজ্জ্বরহিত হইলেও তোমাকে কর্ম করিতে হইবে—তবে সে কর্ম তোমার বন্ধনের কারণ হইবে না। রামময় জীবন তুলসীদাস পূর্ণজন্মের স্মৃতি বলে অতি অল্প বয়সে কর্ম ও জ্ঞানমার্গে বেগ পাক হইলেও প্রত্যহ পূজাত্মিক, জপতপ করিতেন—গুরু নিবট নানাবিধ শাস্ত্রাধ্যয়নে প্রভূত জ্ঞানের অধিকার লাভেও তাঁহার বিরতি ছিল না। তিনি প্রত্যহ ইষ্টপূত্রা করিয়া যেতচ্চন্দ্রের তিলক ধারণ করিতেন, কণ্ঠে তুলসীর মালা ও বজ্রোপবীত শোভা পাইত, কাপড় ময়লা হইবার ভয়ে গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করিতেন—এ সকল আড়ম্বর বাহ্যিক সাধু সাজবার জন্য নহে! পূজার অঙ্গ বলিয়া এ সকল ধারণ করিতেন। আত্মদর্শনে অর্থাৎ জপের সময় তিনি বীজমন্ত্রে এতদূর মনপ্রাণ অর্পণ করিতেন, এতদূর তন্ময় হইতেন যে তাঁহার মালা বা করের দ্বারা সংখ্যা রাখিবার সময় হইত না। কারণ কোম কাজে তাঁহার সন্মত ছিল না—যখন অনবরতই এই কাজ, রামনাম জপ ভিন্ন যখন অন্য কার্য্য তাঁহার ছিল না—তখন তাঁহার পক্ষে সমস্ত বিকল্প কি, আর তার সংখ্যাই বা কি?

আজ চৈত্র মাসের শ্রীরামনবমী তিথি। শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তগণ ভগবানের এই জন্ম তিথিতে উপবাসাদি করিয়া নানাবিধ কর্মের

অহুষ্ঠান করে। গত পরশ মহাবীর পবননন্দন আশা দিয়াছেন—
আজ তাঁহার সহিত ভগবান রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইবে। তুলসীদাস
তাই আজ প্রাতঃকাল হইতেই দোকানের কাজকর্ম বন্ধ করিয়া
দিয়া, ভাব-বিভোর চিত্তে ভগবানের দর্শন আশায় নানাপ্রকার
কর্মের অহুষ্ঠান করিতেছেন—পূজার আয়োজন করিয়া একান্ত মনে
শ্রীরামচন্দ্রের পদে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। নয়ন বুদিয়া জপ
করিতেছেন—আর এক একবার আশা-স্বাক্ষাৎকার উৎকর্ষি হইয়া
চক্ষু চাহিয়া দেখিতেছেন—প্রভু বৃষ্টি এই আসেন! তাঁহার আনন্দ-
নিকেতন, কুটীর প্রাঙ্গণ পবিত্র করিতে বৃষ্টি এই আসেন—এই
আসেন!

বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল—তুলসীদাস ইষ্ট দর্শনে বড়ই
চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছেন। তৃতীয় ও চতুর্থ প্রহর অতীত হইল
তথাপি দেখা নাই। বেলা প্রায় শেষ হয়—উৎকর্ষিত চিত্তে তুলসী-
দাস ভ্রমণনা হইয়া ভাগিতেছেন—এ কিরূপ হইল! ভগবানের
প্রিয় ভক্ত রামদাস হুহুমান স্বয়ং আশা দিয়াছেন—আজ দেখা
হইবে—তবে এ কি হইল! দেখি কতকণে তাঁহার দর্শন পাই?
তুলসীদাস আবার জপে বসিলেন—পাছে মন চঞ্চল হয় বলিয়া
তিনি দোকানের দুইখানি ঝাঁপ বন্ধ করিয়া একখানি খুলিয়া
রাখিয়া তদগতচিত্তে জপে বসিলেন। কিন্তু মনস্থির করিতে পারিলেন
না—বাহিরের কোলাহল আসিয়া তাঁহার দোকানের সংলগ্ন প্রাঙ্গণ
মুখারিত করিল।

হঠাৎ একজন বেদিয়া বেদিনী সঙ্গে একটী বানর লইয়া
নাচাইতে আসিল। সঙ্গে আরও একজন উত্তর সাধকরূপে ভিকার
মুলি কীদে করিয়া দাঁড়াইয়া তুলসীদাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—

“এ সাধুজী! বান্দর কা খেল দেখ, খুব বড়িয়া খেল, বহুৎ কস-
লং দেখা একা, হকুম হয় ত খেল সুর কর দেই?”

তুলসীদাস তখন তন্ময়চিত্ত। দিবাভাগ অতীত হইয়া যায়—
এখনও তাঁহার ইষ্ট দর্শন—ভগবান রামচন্দ্রের দর্শনলাভ হইল না।
পরমভক্ত হনুমানের কথাও মিথ্যা হইল? ভাবিয়া তিনি প্রাণে বড়ই
ব্যথা পাইয়াছেন—মন ক্ষুব্ধ হইয়া গিয়াছে—চিত্ত বড়ই অশ্রময়।
তখন কি আর “বান্দর নাচ” দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে
প্রাণ চায়? যে আনন্দ-সাগরে অবগাহন করিয়া তিনি পরমানন্দে-
মোত্তার দিবার জন্ত আশা করিয়া বসিয়া আছেন—সে আনন্দ কোথায়?
এখন আবার এ জঞ্জাল কোথা হইতে আসিল? বৃথা আমোদ-প্রমোদের
কোলাহল কোথা হইতে আসিয়া তাঁহার প্রাঙ্গণে জমা হইয়া এত সাধের,
এত কষ্টের, এত আয়াসের সাধন-ঘোর ভাদ্রিয়া দিল! তিনি অতিশয়
বিরক্ত হইয়া বলিলেন—“নেহি নেহি, খেলুনেকা কুছ দরকার নেহি,
আভি ভাগো।”

তাঁহার বড় আশা করিয়া আসিয়াছিল—এখানে কিছু রোজগার
হইবে; বান্দরের কসলং দেখাইয়া তুলসীদাসের নিকট হইতে বেশ দুই
পয়সা আদায় করিবে, কিন্তু তাহা হইল না। মালিক যখন বিরক্ত
হইয়া তাড়াইয়া দিল, তখন আর কি হইবে? অগত্যা তাঁহার
মুখভার করিয়া সেস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তুলসীদাস হতাশ প্রাণে কাঁদিতে লাগিলেন।
সেদিন আর তাঁহার খাওয়া হইল না। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—
হায়! অদৃষ্ট ক্রমে হনুমানের দ্বায় ভক্তপ্রবরের কথাও মিথ্যা হইল।
তাঁহার কথায় যখন বিশ্বাস বা “আস্থা” স্থাপন করিতে পারা গেল না—
তখন আর কাহার কথা সত্য হইবে—কাহার কথায় বিশ্বাস করিব?

পরক্ষণেই বলিলেন—না না—তা কখনও হইতে পারে না।
 মহুয়ের যেমন কাজকর্ম আছে—দেবতাদিগের ত সেইরূপ কাজকর্ম
 আছে। আমরা সামান্ত সংসারের কাজে বিব্রত হয়ে যখন কথার
 ঠিক রাখিতে পারি না, তখন ত্রিলোকের কর্তা যিনি—তঁহার
 কত কাজ। হয় ত ভক্তবীর হুম্মান তাঁহাকে উপরোধ করিলে
 তিনি অগ্র কার্য সম্পাদনের আবশ্যকতা দেখাইয়া, বোধ হয় অল্প
 আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শনের বিষয় স্থগিত রাখিয়াছেন। তাঁহার
 আরও কত মহৎ ভক্ত ত আছেন? আমি সামান্য, অতি দীন
 ভক্ত। আজ শ্রীরামনবমী, বোধ হয় কার্যের ভিড় বেশী। আচ্ছা
 দেখি প্রভু কি করেন? নতুবা কল্য আবার সেইস্থানে গিয়া মহা-
 বীরের পায়ে জড়াইয়া পড়িব—যতক্ষণ একটা সহুত্তর না পাইব—
 যতক্ষণ তাঁহার কথা সঠিক বলিয়া মনে না করিব—ততক্ষণ পা
 ছাড়িব না। প্রভু! দেখা আমাকে দিতেই হবে—তুলসী চির-
 কাল একজুঁয়ে ছেলে—যা ধরে, তা না করে ছাড়ে না! দেখি তুমি
 কত ফাঁকি দাও? “মস্তের সাধন কিম্বা শরীর পতন” এ মহাবাক্য
 যখন সার করেছি, তখন তুমি যাবে কোথা ঠাকুর? ভক্ত প্রাণের
 তেজ যে অসীম—কার্য যে তাঁহাদের অসমসাহসীক! একপ
 আত্মোৎসর্গ, একপ ত্যাগ স্বীকার করিতে না পারিলে কি সেই
 দেবের ছাঁভ, ধন লাভ করিতে পারা যায়? পৃথিবীর সামান্ত
 বস্তু লাভ করিতে যখন কত সহ করিতে হয়, তখন এ অপার্থিব
 পরমার্থ বস্তু লাভে একদিন নিরাশ হইয়াছি বলিয়া কি চিরকালই
 হইব? প্রভু যে আমার ভক্তাধীন! ভক্ত কাতর কণ্ঠে ডাকিলে—
 তিনি যে স্বর্গের মণিমন্দির ত্যাগ করে, যা সীতাদেবীর অন্ত
 ভোগ ত্যাগ করে, ভক্তের পর্ণ কুটিরে শাকার ভোজন করিতে

দোঁড়িয়া আসেন। আজ আমারই ক্রটি হইয়াছে বোধ হয়! আমার প্রাণের ভাক, তাঁহার চরণে পৌঁছায় নাই! শুধু হুমান বলিলে কি হইবে—আমার প্রাণের ঐকান্তিকতাও ত চাই?

ভক্তবীর নিরাশ হইলেন না। আশার আশ্বাসে রামপ্রসে যজ্ঞিয়া রজনী ঘাপন করিলেন। প্রাতঃকালে স্নান করিয়া গৃহে আসিলেন এবং পূর্বদিনের ব্রত ধারণের মোক্ষফল প্রাপ্তির জন্ত, সাধক শ্রেষ্ঠ কণ্ববীর তুলসীদাস কয়েকজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া তাঁহাদের প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন।

সমস্তদিন অতি প্রকৃত মনে রামগুণানুকীৰ্ত্তন করিয়া বৈকালে পুনরায় যেখানে রামায়ণ গান হইতেছিল—সেইখানে হুমানজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। সেদিনকার মত ঠিক নির্দিষ্টস্থানে সেই ব্যাধিগ্রস্ত ব্রাহ্মণকে দেখিয়া মনে মনে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। পাছে কেহ জানিতে পারে, এইজন্য স্বতন্ত্র স্থানে বসিয়া তিনি ভগবানের গুণানুবাদ শুনিয়া ভক্তিভরে অজস্রধারে নৈজনীর বিসর্জন করত আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন।

তারপর যখন কথকতা ভাঙ্গিয়া গেল—সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। ব্যাধিগ্রস্ত বিপ্র যখন উঠিয়া আপন গড়বা পথে ধাবিত হইলেন, তুলসীদাসও পশ্চাদ্ভ্রমরণ করিয়া সেই বনের প্রান্তভাগে দেখা করিলেন। বলিলেন—ভক্তবীর! একি, আপনি আশা দিয়া নৈরাশ করিলেন? আমি গত কল্য সমস্তদিন প্রভুর আশায় বসিয়া বসিয়া কাল কাটাইলাম, কিন্তু কই, তাঁহার দর্শন ত পাইলাম না! এ কি হলনা প্রভু! আজ যদি আপনি প্রকৃত পন্থা বলিয়া না দেন, তাহা হইলে আজ আর আপনাকে ছাড়িব না। এই বলিয়া ক্রমে লুটাইয়া হুমানের পদব্রজ বক্ষে জাপটাইয়া ধরিলেন।

পাতা মুড়িবেন না।

ভক্তের বক্ষ ভগবানের আসন। পবননন্দন সাগ্রহে বলিলেন—
 আহা, করিস কি তুলসীদাস? ছাড় ছাড়, তুই যে পরমভক্ত, ভগবান
 যে তোর জন্য সদাই উতল্য! এই বলিয়া তাঁহাকে তুলিয়া লইলেন
 এবং মধুর বচনে বলিলেন—বৎস! সে কি কথা? গত কল্য ত
 আমরা তোমার ভবনে গিয়াছিলাম। প্রভু স্বয়ং মা জানকীর
 সহিত, আমার গলায় দড়ি দিয়া নাচাইতে নাচাইতে গিয়াছিলেন,
 ঠাকুর লক্ষণও বুলি কাঁধে করিয়া সঙ্গে ছিলেন। তবে যাই নাই
 কি? তোমাকে কত ক্ষেদ করিয়া প্রভু বাদর নাচ দেখিতে বলিলেন,
 কিন্তু তুমি বিরক্ত হইয়া বলিলে—না, না, আর খেলা দেখাইতে
 হইবে না—কাজেই আমরা চলিয়া আসিলাম। বরং এই দেখ আমার
 গলায় এখনও দড়ি বাঁধার দাগ রহিয়াছে। কাল তোমার জন্য
 আমাকেও পুনরায় বন্ধন যাতনা সহ্য কর্ত্তে হয়েছিল।

তুলসীদাস ঘোর বিশ্বয়াবিষ্টচিত্তে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে কাঁদিয়া
 হৃদমানের পদানত হইয়া বলিলেন—একি প্রভু! এত ছলনার মধ্যে
 এমন করিয়া দেখা দিলে, আমি কেমন করিয়া বুঝিব? প্রভু! কমা
 করুন, আমার জন্য আপনার এত কষ্ট!

হৃদমান।—বৎস! এ আর তোমার জন্য কষ্ট কি? এ যে
 প্রভুর অহুজ্জা, তাঁর আশীর্বাদ! তোমার মত ভক্তের জন্ত এমন
 কষ্ট সওয়া ত প্রার্থনার বিষয়!

তুলসী আরও ভক্তি বিনম্রভাবে বিভোর হইয়া বলিলেন—
 আপনার এইরূপ দয়াই বটে? আপনার ন্যায় প্রভুর এখন অহুজ্জ
 ভক্ত না থাকিল কি ভীষণ রাক্ষস দশাননের কবল হইতে আমার
 মা জানকীর উদ্ধার হইত? প্রভু! দেখা যদি দিলেন—তবে এমন
 প্রচ্ছন্ন ভাবে কেন?

হুমান।—বৎস! কলিতে সাক্ষাৎ দর্শন হয় না। এইজন্য প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রকারান্তরে প্রভু ভক্তকে দেখা দেন। নতুবা কখন কিরূপ লোকের সাক্ষাতে পড়িবেন—তাহার ত স্থিরতা নাই? এক ভাবেই ঘোরে মনে মনে হৃদয়-সিংহাসনে ভক্ত ভগবানকে দেখিতে পায়। আর যদি সে না-ছোড় বান্ধা হয়—প্রত্যক্ষ দেখিতে চায়—তাঁহা হইলে এইরূপ পরোক্ষ ও প্রচ্ছন্নভাবে প্রকারান্তরে দেখা ভিন্ন কলিতে আর অন্য উপায় নাই। তোমার ঐকান্তিক অহুরাগে, তোমার প্রাণভরা ভক্তিভাবে প্রভু আমার তোমার প্রতি বড়ই সুপ্রসন্ন। এরূপভাবে আরও অনেকবার দেখা হইবে। তবে প্রভু তোমার কাছ ছাড়া একদণ্ডও নহেন—ইহা স্থির নিশ্চয়। তোর অন্তরে অন্তর্ধামী-রূপে ত রহিয়াছেন—যেমন আমার হৃদয়ে। বৎস! ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া দেখ—এ জগৎ প্রপঞ্চ যে তাঁহারই মূর্তি। তিনি যে সর্বময়, সকল ভূতে তাঁর অধিষ্ঠান। তুমি বৈরূপভাবে তাঁহাকে দেখিতে চাহিবে—যে ভাবে তাঁহাকে ভাবিবে, তিনি সেই ভাবেই আবির্ভাব হইবেন। কেন, তুমি কি গীতায় পড় নাই—যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহং”। তবে এরূপ সেরূপ করিয়া বিরূপ হইয়া পড় কেন? যাও, আর কোন চিন্তা নাই। ভক্তশ্রেষ্ঠ, জ্ঞান বৃদ্ধ তুমি বাকসিদ্ধ হইয়াছ। তোমার জীবমুক্তি হইয়াছে—ভয় ভীতি আর কিছু নাই। পার তো চিত্তকুট পর্বতে একবার গমন করিও। সেস্থান প্রভুর প্রিয়স্থান, দৃশ্যও অতি মনোরম। এই বলিয়া পবন নন্দন মারুতী অরণ্যের মধ্যে অন্তর্ধান হইলেন।

তুলসীদাস বিগত দিনের ঘটনায় তাঁহার আহম্মুকীতার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে বাড়ী ফিরিলেন। প্রাণ আক্স আনন্দে বিস্তার—এরূপ আনন্দ তুলসীদাস জীবনে কখন ভোগ করেন

নাই। ইহার সহিত পার্শ্ব কোন আনন্দেরই তুলনা হয় না। তুলসীদাস সেই দিন হইতে গৃহে আসিয়া দোকান-পাঠ বন্ধ করিয়া কেবল অহরহঃ অমৃত-নির্ঝরিণী রামনাম রসনায় গান করিয়া কান্দীর গগন-পবন পবিত্র করিতে লাগিলেন। আহা-নিজা তাঁহার দূরে পলাইল। জীবনের জীবন যাহার জীবন রক্ষার জন্য,— অলক্ষ্যে পাছে পাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাহার জীবন রক্ষার জন্য ভাবনা কি? তুলসীদাস কোন দিন কোন ছত্রে স্বহস্তে কিছু পাক করিয়া খাইতেন। তিনি বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী বলিয়া কাহারও পৃষ্ঠ অন্ন ভোজন করিতেন না। কোন দিন হয় ত উপবাসী থাকিতেন, তথাপি সে দেহ হইতে এমন কমণীয় নয়নাভিরাম জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল যে, যে দেখিত সেই তাঁহাকে মহাপুরুষ জানে পথ ছাড়িয়া দিত। আহা-র করিতে চাহিলে পরম সৌভাগ্যবান মনে করিয়া রসনাতৃপ্তিকর আহাৰ্য্যদানে তাঁহার সম্ভাষণাধন করিত। কিন্তু তিনি প্রায়ই কাহারও দারস্থ হইতেন না—স্বহস্তে যথায় তথায় পাক করিয়াই খাইতেন—যথায় তথায় শুইয়াই রজনী যাপন করিতেন। ভগবান যাহার প্রহরী-রূপে সজে সজে রহিয়াছেন—তাহার সকল স্থানই ত স্বর্গ, সকল খাওয়াই ত অমৃত! ভক্ত ভগবানকে নিবেদন করিয়া বিষ খাইলেও অমৃতের গুণ ধারণ করিবে।

এইজন্য তুলসীদাস পারকপক্ষে কাহার নিকট আহা-র করিতেন না। নিজের স্বক্ষে একটি বুঝি রাখিয়া তাহাতে আবশ্যকীয় দ্রব্য রক্ষা করিতেন—যেখানে ইচ্ছা হইত, রন্ধন করিয়া খাইতেন। তাঁহারই স্থানের স্থিরতা নাই! এই সময় হইতে তুলসীদাস এক প্রকার "ভবঘুরে" হইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। প্রাণ ভগবন্তকে বিভোর হইলে সাধকের অবস্থা এইরূপই হইয়া থাকে। তখন তাহার

নিজস্ব কিছুই থাকে না; তাই বলিয়া সমাজে থাকিতে হইলেও বাহার-ভাহার অন্নভোজনও উচিত নহে। সমাজের চক্ষে ইহা অত্যন্ত দোষনীয়—এবং শিক্ষার অপব্যবহারও করা হয়। এইজন্য সাধক তুলসীদাস কখন অনাচারের প্রশংসা দেন নাই।

তবে তিনি প্রথমে কামিনীকাঞ্চনের বড়ই বিপক্ষ ছিলেন। সাধনসিদ্ধ হইবার পর হইতে তিনি মুখে মুখে উপদেশ স্বরূপ অনেক হিতকথা কহিয়া গিয়াছেন। সেই সকল উপদেশ “তুলসীর দোহা” নামে হিন্দু-সমাজে বিশেষ প্রচলিত। এই দোহার একটি না একটি জানে না, এমন লোক অতি বিরল। ঘর-সংসারের উপদেশে পণ্ডিতগ্রন্থা চাপকোর শ্লোক যেমন অতি উপাদেয়—একটি না একটি সকলেই জানে—সমগ্র জানিলে যেমন কোন বিষয়ে ঠেকিতে হয় না; সঙ্গীত-বিষয়ে শাক্ত ভক্ত রামপ্রসাদের সঙ্গীত যেমন অতি ভক্তি ভাব পূর্ণ এবং সুখশ্রাব্য সহজবোধ্য, বাঙ্গালাদেশে তাহার সঙ্গীতের একটি মাত্র জানে না, এমন স্ত্রী পুরুষ অতি বিরল—জানিয়া রাখিলে সমুদ্রে অতি কঠোর প্রাণেও শাস্তির সুখাদারা বর্ষণ হয়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সেইরূপ, শুধু তাই নয়—এই বাঙ্গালাদেশেও সাধন বিষয়ে ভক্তকবি তুলসীদাসের দোহা অতি উপাদেয়—অতি জ্ঞানগর্ভ। সামান্য কথায় তিনি এমন মহৎ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, যাগ সাধন বিষয়ে সকলের অনেক উপকারে আইসে। তিনি প্রাথমিক বলিতেন—

দিন্কা বাঘিনী রাত্কা মোহিনী পলক পলক লই চুষে,

ছুনিয়া সব বাউরা হোকে ঘর ঘর বাঘিনী পোষে।

নারীজাতিকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার এই দোহা রচিত হইয়াছিল।

কিন্তু এই রংগীর প্রতি অশ্লীল ই তাঁহাকে এতদূর উন্নতির সোপানে

তুলিয়াছিল। রমণীর প্রতি আসক্ত হও, পুত্র-কলত্র প্রতিপালন কর—কিন্তু তাহাদের প্রেমে আমার মত বউরা, ষ্ণার্থ পাগল হইয়া সময় নষ্ট করিও না। জীজ্ঞাতি শক্তি-স্বরূপা বলিয়া তাহার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি দেখাইয়া পরকালের পথ নষ্ট করিও না—ইহাই উক্ত দোহার উদ্দেশ্য। এইজন্য তিনি পরে বলিয়াছেন :—

নিগুণ্যহোম সো পিতা হামারা, সত্ত্ব হে য় সে মাতা হামারী।

কাকে নিন্দো, কাকে বন্দো দুগো পাল্লা ভারী।

শেষে তিনি এইরূপে জীজ্ঞাতিকে মহাশক্তির অংশ বলিয়া ক্রময়ে ধারণা করিয়াছিলেন। সাধক রামপ্রসাদের গানের ভাষ্য দোহাগুলি তিনি প্রথম হইতে শেষ পধ্যস্ত রচনা করিয়াছিলেন। যে গুলি গভীর ভাবপূর্ণ, সেগুলি তাহার সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর গভীর জ্ঞানের অবস্থায় রচিত, আর যেগুলি হালুকা ভাবপূর্ণ, সেগুলি সাধন সিদ্ধির পূর্বাভাস রচিত। অতএব ভাবের তারতম্য অনেক। সাধক রামপ্রসাদের গানেরও এই ভাব।

সাধন সিদ্ধির পর তুলসীদাসের কর্ম-বিপাক কাটির গিয়াছিল। এই সময় তিনি আর বেশী কষ্টে লিপ্ত থাকিতে পারিতেন না। কেবল শ্রীরামজন্মের আরাধনায় রাতদিন কাটাইয়া দিতেন—জীবনের প্রধান কর্ম নাওয়া খাওয়া, যাহাতে শরীর রক্ষা হয়—সে কর্মও তাহার ভুল হইয়া যাইত, এইজন্য তিনি বলিতেন :—

যাহা কাম তাঁহা রাম নেহি, যাহা রাম তাঁহা কাম।

দুহো এক নাহি মিলে, রবি রজনী এক ঠাম।

তুলসীদাসের এই সময়কার ভাব দেখিয়া অনেকেই তাঁহার পিত্ত হইয়াছিল। সকলেই তাঁহাকে দেখিলে ভক্তিতরে ঘেবড়ার ভাষা আদর করিয়া চরণে প্রণত হইত। তখনকার অনেকাধিক

নৃপতিবর্গ, এমন কি অমরাধিপতি অমর সিংহ প্রমুখ রাজবর্গও তাঁহার চরণাশ্রয়ে আসিয়া আপনাকে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন।

তুলসীদাস কাহারও বাড়ী বাইতেন না—আপন সাধন-পাঠে বসিয়া অনবরত রাম নাম জপে বিভোর থাকিতেন—সময় পাইলে অধ্যাপনা কার্যেও তিনি খুব আনন্দ অনুভব করিতেন। এইজন্ম অনেক ছাত্রও তাঁহার নিকট পাঠাভ্যাস করিয়া জীবনের পথ মুক্ত করিয়াছিল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

অভীষ্ট পূরণ

অনেকে সকল প্রকার মালিগ্ন হইতে মুক্ত হইবার জন্ম, প্রাণকে সংপথগামী, সংভাবাপন্ন করিবার জন্য সাধুসঙ্গই একমাত্র উপায়। অনেক অসাধু ব্যক্তি যখন এই সংস্কার শীতল ছায়ায় বসিয়া আপনাকে গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছে—তখন পবিত্র চিত্ত, নির্মল অন্তঃকরণ সাধু ব্যক্তি যে এ ছায়ায় আসিলে আরও নির্মল এবং উন্নত শক্তিশালী হইবেন—তাহাতে আর সন্দেহ কি?

তুলসীদাস চিরকাল সাধুসঙ্গের বড়ই প্রিয় ছিলেন। বাল্যকাল হইতে ভগবান তাঁহাকে সাধু-সন্ন্যাসীর দ্বারা প্রতিপালিত করাইয়া তাঁহার স্বভাব এইভাবে বিভোর করিয়া দিয়াছিলেন। সাধুসঙ্গে নানা তীর্থ ভ্রমণ করিব—মনের কলুষ কালিয়া ধৌত করিয়া প্রাণের আনন্দে বিচরণ করিব—তুলসীদাসের ইহা অন্তরের ইচ্ছা হইলেও এতদিন

তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। এক্ষণে তাঁহার সকল দ্বার মুক্ত হইয়াছে, সাধন ক্ষেত্রে তিনি এখন অনেকটা উন্নতি করিয়াছেন, কান্দীতে পণ্ডিত ও সাধক বলিয়া তাঁহার বেশ স্বেশ মহত্ব প্রচারিত হইয়াছে। এইজন্য এখন সম্পূর্ণ ইচ্ছা, একবার তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইবেন। ভগবান ঈশ্বরচন্দ্রের প্রিয় জন্মভূমি অযোধ্যা, চিত্রকূট, পঞ্চবটী প্রভৃতি লীলা-নিকেতন দর্শন করিয়া প্রাণে আনন্দ লাভের ইচ্ছা হইল। রামভক্ত হুমানজীও তাঁহাকে এই সকল দেশ ভ্রমণের আদেশ দিয়াছিলেন। ঐসকল স্থান ভগবানের পদরেণুতে মাখামাখী, অতএব তাঁহার পবিত্র মাটি অঙ্গে মাখিলেও জীবন সার্থক—দেহ পবিত্র হইবে।

গুরু আদেশে তুলসীদাস নিজের আস্তানায় একটা চতুষ্পাঠী খুলিয়াছিলেন, তাহা এখন বেশ চলিতেছে—অনেকগুলি ছাত্র এখন তুলসীদাস বাবাজীর টোলে পাঠ করিতেছে। তুলসীদাস বেদান্ত, সাংখ্য প্রভৃতি শাস্ত্রের শিক্ষা দানে তাহাদের মনের আধার দূর করিতেছেন। অপরাপর চতুষ্পাঠী অপেক্ষা ছাত্রগণ এখানে বেশ স্বেচ্ছা আছে, এবং পাঠাভ্যাসেরও অস্ববিধা কিছু নাই। অস্তান্ত স্থান অপেক্ষা তুলসীদাসের ঐকান্তিক যত্নে ছাত্রগণ বেশ লেখাপড়া শিখিতেছে।

একদিন তিনি আপনার ছাত্রগণকে রাজী করিয়া দেশ ভ্রমণের জন্য নিজ গুরুদেব ঘটাকর্ণ যোগীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। ঘটাকর্ণ তুলসীদাসের প্রধান সহায়। কান্দী-প্রবেশের পথে তিনি তাঁহাকে আনিয়া সাদরে নিজ চতুষ্পাঠীতে আশ্রয় প্রদান না করিলে, গুরুর ন্যায় শিক্ষা দান এবং সাধন পন্থা সকল বিবৃত করিয়া না দিলে—তুলসীদাসের

এত শীঘ্র এরূপ উন্নতি কখনই হইত না। আজ যে তিনি কানী-
ধামে এত প্রতিপত্তি সম্পন্ন এবং সাধন-মার্গে এত উন্নত হইয়া-
ছেন, ভগবান যে তাঁহাকে কৃপা করিয়া এতদূর অগ্রসর করাইয়াছেন—
তাঁহার মূলে যোগীবরের অমোঘ আশীর্বাদ এবং প্রাণাত্মিক সাদচ্ছা
বর্ত্তমান, ধর্ম জীবনে তিনিই যে গুরুরূপে তাঁহার প্রধান মহাদ, সাধু
তুলসীদাস তাহা জীবনে কখনও ভুলিতে পারিবেন না। এইজন্য
যাইবার অগ্রে যোগীবরের পাদবন্দনা করিয়া অহুমতি ভিক্ষা
করিলেন। ঘটাকর্ণ আনন্দের সহিত অহুমতি প্রদান করিয়া বলি-
লেন—বৎস! আশীর্বাদ করি, তুমি ভগবানের লীলাক্ষেত্র সকল
দর্শন করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধলাভ কর, ভগবান রামচন্দ্র তোমার প্রতি
প্রসন্ন হউন।

গুরুদেবের আশীর্বাদ শিরোধার্য করিয়া ছাত্রগণের উপর চতুষ্পাঠীর
ভারার্পণ করত তুলসীদাস প্রথমে অধোখ্যাতিমুখে যাত্রা করিলেন। আর
যত ভীর্থ দেখা হউক বা নাই হউক, ভগবান শ্রীরাঃ চন্দ্রের জনভূমিও
লীলাক্ষেত্র সকল দর্শন করিয়া মনপ্রাণ স্থশীতল করিবেন—এই একমাত্র
ইচ্ছা। শিষ্যের অহুপস্থিতিতে ষাঃত তাঁহার টোলের অবস্থা খারাপ
না হয়—ঘটাকর্ণ এতাহ একবার করিয়া তাঁহার তদ্ব্যবধারণ করিতেন—
প্রয়োজন হইলে কিছু কিছু শিক্ষাদানেও বিরত হইতেন না এবং প্রধান
ছাত্রকে অভাব অভিযোগের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। ছাত্র কোনপ্রকার
অভিযোগ করিলে যোগীবর তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ করিতেন। এখনকার
মত ধোয়াধোয়ী ভাব তাঁহার ছিল না। উন্নতমনা সাধু চরিত্রেও যদি
একরূপ কলঙ্ক বর্ত্তমান থাকিবে—তবে তাঁহার সাধুত্ব কোথায়?

তুলসীদাস বহু আয়াসে প্রথমে পঞ্চাশটি বন ভ্রমণ করিয়া
চিহ্নকূট পর্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইস্থান হইতেই

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের লীলাখেলার স্মরণাত। পঞ্চবটীর বনে ঠাকুর লক্ষণ শূর্ণনখার নসাকর্ণ ছেদ করিলে, রাক্ষসরাজ রাবণ সীতা হরণ করিলেন। বনবাসী নিঃসহায় শ্রীরামচন্দ্র এইস্থানে আসিয়াই হুগ্ৰীব, হুম্মান, নল, নীল প্রভৃতির সহিত সখ্যতা করেন এবং অমৃতচরণের সাহায্যে রাবণবধ করিয়া সীতাদেবীর উদ্ধার করিয়া আপন মহত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। এই সেই গিরিবর চিত্রকূট, তাঁহার লীলাখেলার প্রথম সোপান। মরি মরি! এমন পবিত্র স্থান কি আর আছে? সম্প্রতি সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে এখানে বহু সাধু সমাগম হইতেছে। বহু সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ন্যাসীর দর্শন লাভ করিয়া ভক্তবীর তুলসীদাস আনন্দে অধীর হইতে লাগিলেন। সাধু সহবাসের অপূর্ণ মহিমায় মুগ্ধ হইয়া তিনি কিছুদিন এই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। রামদাস মাক্তাত তাহাকে এইস্থানে আসিতে আদেশ করিয়াছিলেন—অতএব নিশ্চয়ই এখানে ভগবানের কোনপ্রকার বিভূতি দেখিয়া নয়নরমন চরিতার্থ করিতে পারিবেন। তুলসীদাস অনন্যচিত্ত হইয়া একটী নিভৃতস্থানে বাসস্থান নির্দেশ করত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ সূর্যগ্রহণের মেলার অবসান হইল—সাধু-সন্ন্যাসীগণ একে একে চিত্রকূট ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তুলসীদাস কোথাও বাইলেন না, একাকী নিজ আবাসেই অবস্থান করিতে লাগিলেন কিন্তু এই অজানা অচেনা দেশে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। একদিন সাধু সজ্জনগণের কৃপায় তাহার কোন অভাব হয় নাই—একপ্রকার বেশ আনন্দে কাটিয়া যাইতেছিল—আহারাদিরও কিছু অনটন হয় নাই। এইবার মেলা ভাঙ্গিলে, তথায় লোকজনের অভাব হইলে, তাঁহার একবেলার সামান্যমাত্র জীবন ধারণের মত আহারেরও অভাব হইতে লাগিল। নিকটে লোকালয় নাই—যে ভিক্ষা করিয়া

তাহা সংগ্রহ করিবেন। সামান্য চিড়াগুড়, ছাতু, চানা পাইবার জন্য কয়েকখানি ক্ষুদ্র দোকান আছে—কিন্তু তাহার ত অর্থ নাই, আসিবার সময় সে সমস্তই ফুরাইয়া গিয়াছে—তথাপি তুলসীদাস এইরূপ ভয়ানক অজ্ঞাবে পড়িয়াও কিছুমাত্র মুহূমান হইলেন না। ভগবান যখন জীব দিয়াছেন—তখন আহারের জন্য তাহাকেই বাবস্থা করিতে হইবে—প্রাণে এ বিশ্বাস দৃঢ় না থাকিলে কি সাধু হওয়া যায়? আনন্দময় সাধক-জীবন অর্থাভাবে একদিনের জন্তও নিরানন্দ হইল না। প্রত্যহ নিরীক্ষণী নীরে স্নান করিয়া তুলসীদাস নিজ কুঠিরে ভগবানের আরাধনা করিতে লাগিলেন। ক্ষুধা পাইলে কেবল গাছের কল ও ঝরণার জল তাহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করিতে লাগিল।

এইরূপ কয়েকদিন গত হইলে হঠাৎ একদিন দুইটা কাঠুরিয়া—একটা বালক ও একজন বৃদ্ধ, মস্তকে কাঠের ভার লইয়া, আর একজন তাঁর ধমুক লইয়া একটা যুগের পশ্চাৎ ছুটিতে ছুটিতে তুলসীদাসের কুঠির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিণটা তখন পলায়ন করিয়াছে, তুলসীদাসকে মুগ্ধিত নয়নে দেখিয়া তাহারা বিবেচনা করিল—ইহার বোধ হয় কাঠের দরকার আছে, ধূনি জ্বলাইবার জন্য ইনি বোধ হয় কাষ্ঠ খরিদ করিতে পারেন। এইজন্য নিকটবর্তী হইয়া বালক জিজ্ঞাসা করিল—“এ সাধু এ সাধু—এ সাধুজী, আরে লেকড়ি নিবে?”

তুলসীদাস মুগ্ধিত নয়নে নিরুত্তর। কোন উত্তর দিলেন না দেখিয়া বৃদ্ধ বলিল—“আরে ভালা ত সাধু দেখছি, এতো হাঁকাহাঁকি করছিস্—তবু সাড়া দিল না।”

বালক। না না সাড়া দিল না, আরে আঁখ মুদিয়ে কি মতলব করছেরে, এ সাধুজী, পণ্ডিতজী! লেকড়ী নিবে?

মুন্নির নেত্র তুলসীদাস বিরক্ত হইয়া বলিলেন—“না বাবা! আমার লেকড়ীর আবশ্যক নাই, তোমরা অন্যত্র চেষ্টা কর!”

বালক। আরে সাধু বাবা! তু আঁখি মুদিয়ে বলছিস্—
আঁখি খুলিয়ে দেখ্, কই সন্ ভালা লেকড়ি নেইয়েছি।

তুলসী। বাবা! আমার রক্তনের দ্রব্য নাই—কাট লইয়া কি করিব? তুমি ভালই আন, আর মন্দই আন, আমার দেখ্‌বার আবশ্যক নেই; বিরক্ত করো না বাবারা। প্রাণ বড় ব্যাকুল—আমাকে চিন্তা কর্তে দাও—তোমরা অন্যত্র দেখ।

বৃদ্ধ। এ ছেলিয়া! এ সাধু ত চক্ষু চাহিলে না—হামি বহুত সাধু দেখিয়েছি—এমন পাগলা সাধু কভি দেখি নেইরে! আরে, একবার চাহিয়ে দেখ্লে কি তোর প্রাণের ধন পালিয়ে যাবে রে?

তুলসীদাস বিরক্ত হইয়া—আচ্ছা বাবা! এই চক্ষু চাহিলাম—
এখন কি কর্তে হবে বলো?

কাঠুরিয়া বালক হস্ত করিয়া করতালি দিতে দিতে “আরে বুড়া! এই দেখ সাধু চাহিয়েছেরে চাহিয়াছে!”

তুলসীদাস চক্ষুকন্মিলন করিয়া বলিলেন—“মরি মরি, কাঠুরিয়া বালকটির কি রূপ! যেন প্রাণ আকর্ষণ কছে, নীচ জাতির মধ্যেও ত এমন ছেলে থাকে? তুলসীদাস বালকের দিকে চাহিয়া বলিলেন—“এখন তোমাদের কি কর্তে হবে বাবা, বলো ত?”

বালক। তু লেকড়ি লিবি! হামার বুড়ো মা বাপ তুখা আছে, খাবার কুছ নাইরে, তু চার পরয়া কা লেকড়ি লে! হামার-বুড়ো মা বাপ খাইয়া বাচবে। নীকার কর্তে এলাহ—নীকার শাসিয়ে গৈলো।

তুলসী। বাবা! আমি বিদেশী, এই কিছুদিন এখানে এসেছি,

বা অর্থ ছিল—সব ফুরাইয়া গিয়াছে, এখন কিছুই নাই। যদি তোমাদের এতই অভাব হয়ে থাকে, তা হলে আমার এই চাদর-খানি বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহ কর, ইহাতে তোমার পিতামাতার একদিনও চলবে ত? এই বলিয়া পরম ধার্মিক পরার্থপর জীবন-তুলসীদাস বালকটির হস্তে নিজের চাদরখানি প্রদান করিলেন।

বালক। দে, দে, তুঁ ইচ্ছা করিয়ে দিচ্ছি—হামি লিবো নাই কেনো? রাগ করি নাই ত?

তুলসী। না বালক! যখন স্বইচ্ছায় দিচ্ছি, তখন রাগ করো কেন, তুমি শীঘ্র গ্রহণ করে, ইহার বিক্রয় দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করোগে, আমি ধ্যান করি।

বালক। এ সাধুজী! আমি তুঁকে কুছ দিব না, দিবো, দিবো, এই এক খাটী লেকড়ী লেয়ে।

তুলসী। না বালক! আমার কাষ্ঠের প্রয়োজন নাই—তুমি অন্ত্র দিলে, ইহার পরিবর্তে কিছু পাবে—নিয়ে যাও না?

বৃদ্ধ। এ সাধুজী! ছেলিয়া দিচ্ছে, লেয়ে, কুনো হরজা হোবে না।

বালক। এই লে লে—আমি দিচ্ছি, তুঁ লেয়ে!

অত্যন্ত বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া তুলসীদাস আর কিছু বলিলেন না, ধ্যানে বসিলেন। তথাপি কাষ্ঠরিয়া বালক সরিল না, বলিল—আরে সাধু! তুঁ আখ মুদিয়ে ধ্যান কচ্ছিস্‌রে! আখ মুদলে কি কুছ দেখা যাবে, হেথা কেন আসিঘেছিস্‌!

তুলসীদাস বালকের মধুর আলাপে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন—বাবা! এই চিত্রকূট গিরি ভগবান রামচন্দ্রের লীলা-নিকেতন শুনিয়াছি, ভগবান এখানে নিত্য বিহার করেন, তাই তাঁর রাতুল চরণ দেখে জীবন সার্থক কর্তে এসেছি!

বালক। আরে বুড়ুয়া! সাধু রামজী দেখ্বেরে, এ সাধু বাবা! তুঁ ত, বড় আন্নার খরিয়েছিল, রামজী কি তেরা সামনে আসিয়ে খাড়া হোবে রে!

তুলসী। বাবা! ইহাই আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, অন্তর্ধানী হয়ে তিনি আমার অন্তরের আশা পূর্ণ করিবেন না কেন?

বুড়া। সাধুজী! এই লেকড়ি লে, হাম্ লোক চলে।

বালক। সাধু বাবা! তব্ হাম্ লোক চলে।

তুলসীদাস বলিলেন—হাঁ বাবা! তোমরা এস, বেলা অনেক হয়েছে!

কাঠুরিয়াঘর চলিয়া যাইলে তুলসীদাস পুনরায় ধ্যানস্থ হইলেন। বালক নোড়িয়া পলাইবার সময়—“আরে আঁধ খুলিয়ে ধ্যান কররে” বলিয়া—রে-রে-রে—এ বুড়ুয়া একঠো ডাল্‌কী ভগছে—ঐ দেখ রে! বলিয়া পলায়ন করিল। বালক ও বৃদ্ধ অদৃশ হইলে তুলসীদাস কাঠের আঁটাটা দূরে নিক্ষেপ করিবার সময় তাহা হইতে কতকগুলি স্বর্ণ-মুদ্রা বব্ বব্ করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

তুলসীদাস বিশ্বয় সহকারে বলিল—এ কি, এ কি, ইহার মধ্যে এত অর্থ কোথা হইতে আসিল! কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া মনের আবেগে “ওহো বুঝেছি” এ কাঠুরিয়া বালক নহে, ছদ্মবেশে নিচ্চয়ই আমার হৃদয় দেবতা এসেছিলেন, আমার অভাব বুঝতে পেরে, এই খেলা খেললেন? ভগবান্! আর কতদিন এমন করে ছলনা করবে ঠাকুর! তুলসীদাস ভাববিভোর হইয়া তন্নয় হইয়া পড়িলেন। তিনি দেখিতে লাগিলেন—চিত্রকূটের প্রতি লতাগুলোই ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বড়িত হইয়া খেলা করিতেছেন। তুলসীদাস উঠিয়া প্রত্যেক বৃক্ষলতা, প্রত্যেক শিলাখণ্ডকে শ্রীতিভরে আলিঙ্গন করিয়া, ধন্য হইলেন। পেরদিন চিত্রকূট পরিগহনে কলমুল ও নিম্ব রিণীর জল বাতীত আর আর

কিছু খাওয়া হইল না। পুলকপূর্ণিত দেহে তুলসীদাস তাহাই উদয়স্থ করিয়া শীতলে শয়ন করত রাত্রি যাপন করিলেন।

এইরূপে কিছুদিন ভক্তবীর তুলসীদাস বনের ফল, নদীর জল খাইয়া চিত্রকূটে কাল কাটাইতে লাগিলেন। যে দিন অত্যন্ত ইচ্ছা হইত—সেদিন পসারীর দোকানে গিয়া কোন দিন ছাতু গুড়, কোন দিন বা চানা গুড় কিনিয়া আনিয়া ভগবানকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাই-তেন। একদিন সেই দাক্ষণ গ্রীষ্মের প্রভাতে সমস্ত রাত্রি বিনিদ্রভাবে ভগবানের উপাসনায় যাপন করিয়া অতি প্রত্যাষে তুলসীদাস ইষ্টপূজার জন্ত ঝুলি হইতে চন্দন কাষ্ঠ ও শীলা লইয়া চন্দন ঘসিতেছেন। এমন সময় একটা সুন্দর বালক আসিয়া তাঁহার কুঠিরে উপস্থিত হইল। বালকের অপূর্ণ মোহন বেশ, নবীন মেঘের ন্যায় বর্ণ—সন্ন্যাসীর মত মস্তকে জটাভার, অতি স্থঠাম গঠন; বালক তুলসীদাসকে লক্ষ্য করিয়া অতি আব্দারের সহিত বলিল—সাধুজী! আমাকে চন্দন পরাইয়া দাও না?

বালকের দিব্যজ্যোতি পূর্ণ মনোহর বরবপু দেখিয়া তুলসী মুগ্ধ চিত্তে মনে মনে বলিলেন—মরি! মরি! এ বালক ত যে সে নহে! তিনি করষোড়ে অতিশয় বিনয় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

বালক! শুনহ বিনয় মম এহঁ,

তুম্‌ শ্রীরামচন্দ্র কি কেহঁ?

বালক সহাস্তে উত্তর করিল—“সাধু। সকল শ্রীরাম অবতারা।” বালকের মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া তুলসীদাসের দেহ কণ্ঠকিত হইতে লাগিল, প্রেমপুলকে হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল, নয়ন কোনে অশ্রু দেখা দিল—স্বৈদনির্গমনে শরীর স্নাত হইতে লাগিল—সাধক তখনই সমাধি বুদ্ধিত হইয়া পড়িলেন। মর্চ্ছাভঙ্গে তুলসীদাস চারিদিকে

চাহিয়া দেখিলেন—হৃদয় দর্পণে বাহাকে দেখিতেছিলেন—এইবার নয়নের সম্মুখে তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছায় যখন চাহিয়া দেখিলেন—ত আর কেহ নাই, কোথায়ই বা বালক আর কোথায়ই বা কে! সেই অপরূপ বালক, সেই লোকললাম জ্যোতির্বিশিষ্ট সুন্দর সম্মাসী বালক আর তথায় নাই। শিলোপরি ঘর্ষিত চন্দনও দেখিতে পাইলেন না, তখন তাহার দৃঢ় প্রতীতি হইল যে তিনি যাহা মনে করিয়াছিলেন— তাহাই, এ বালক সামান্য নহে—এ তাঁহারই মনোচোর স্বয়ং ভক্ত-বিমোহন ভগবান শ্রীরামচন্দ্র! তুলসীদাস তখন প্রভুকে হাতছাড়া হইতে দেখিয়া উন্মাদের মত ইতস্ততঃ ছুটছুটি করিতে লাগিলেন। তন্ময় ভাবে বাহুজ্ঞান হারাইয়া যাহাকে দেখিতে লাগিলেন, পথে পথে ঘুরিয়া যাহারই সাক্ষাৎ পাইলেন, তাহারই গলা জড়াইয়া প্রোক্ষণ বিগলিতনেত্রে বলিতে লাগিলেন :—

চিত্রকূট কি ঘাট পর ভই সন্তন কি ভিড়।

তুলসীদাস তাঁহা চন্দন ঘষয়তঃ তিলক দেই রঘুবীর ॥

তুলসীদাস সেইদিন হইতে পাগলের মত আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অনবরত “হা রাম, হা ইষ্টদেব! একি ছলনা ঠাকুর” বলিয়া বনে ঘমে কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ভক্ত বৎসল ভগবান, ভক্তের কাতর ক্রন্দনে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। একদিন স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন—ভক্তবীর তুলসীদাস, বৎস! আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, এ যুগে তুমিই আমার পরম ভক্ত! তুমি একখানি রামায়ণ রচনা করিয়া আমার লীলা-মহিমা প্রকাশ কর, এ কার্যে তুমিই যথার্থ উপযুক্ত পাত্র। প্রভু রামচন্দ্রের আদেশ পাইয়া তুলসীদাস সেইদিনই রামায়ণ রচনার প্রভূত উপকরণ সংগ্রহের জন্য ভগবানের কন্যভূমি অধোধ্যায় গমন করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সখ্যতার টান

তুলসীদাস দেশত্যাগী হওয়ায় দুঃখী তেওয়ারীর কষ্টের একশেষ হইয়াছে। সে পাড়ার কাহারও সহিত মিশিত না, কাহারও বাড়ী বাইত না, কেবল তুলসীর সহিত তাহার সখ্যতা ছিল—প্রাণের মিল ছিল। আজ প্রায় এক বৎসর তুলসীদাসের ন্যায় বন্ধুর অদর্শনে সেও কেমন শুধাইয়া গিয়াছে—প্রাণে ঘোর বাতনা অহুভব করিতেছে।

পাছে তুলসীদাসের শিশু বজ্রমান নষ্ট হইলে সংসার অচল হয়—তাঁহার বৃদ্ধ জননীর ও পরিবারের কষ্ট হয়, এইজন্ত সে প্রাণ-পুণে তাহা বজ্রায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু শিশু বজ্রমানের লোভে পড়িয়া বেশীদিন নীরবে থাকিলে ত বন্ধুর অন্বেষণ হইবে না, যত দিন বাইবে—ততই তুলসী মনের দুঃখে বেশী দূর দেশে বাইবে, তখন আর সন্ধান পাওয়া দায় হইবে। এইজন্য তিনি নিজের মাতুলানীকে হলসীদেবীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া, একজন ব্রাহ্মণের উপর শিশু-বজ্রমানের কাজকর্ম সমাধার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আজ কয়েক মাস হইল তিনি বাটী হইতে বাহির হইয়াছেন। হলসীদেবীকে এত পাড়ার সকলকে আশা দিয়া গিয়াছেন—প্রহু রামচন্দ্রের কৃপায় দাদাকে শীঘ্র ঘরে আনিয়া হাজির করিব। কিন্তু প্রায় দুই তিনমাস হইল—কই তাঁহারও ত দেখা নাই ?

দুঃখীরাম রত্নাবলীকেও বুঝাইয়া গিয়াছেন—বৌদি ! কোন চিন্তা নাই—দাদা আমার চক্ষু এড়াইয়া কোথাও লুকাইতে পারিবে না।

তুমি দেখ না, দুই তিন মাসের মধ্যেই তাঁহাকে ধরিয়া আনিতোছ কিন্তু কই দুঃখী ত ফিরিল না? সখ্যতার টানে তাঁহার প্রাণ তুলসীদাসের অন্য একান্ত অধীর; সে পুরুষ মাহুব—কাঁদিতে পারে না, পাছে কেহ তাঁহাকে লঘুচিত্ত বলিয়া উপহাস করে কিন্তু তাঁহার প্রাণের ভিতর যে কি হইতেছে—তা সেই জানে, আর জানেন তগবান যিনি অন্তর্ভামী। এরূপ দাগা তিনি জীবনে কখনও পান নাই, এরূপ দুঃখ দুঃখী জীবনে কখনও অনুভব করেন নাই—বহু তুলসীর বিচ্ছেদে যত করিতেছেন। তিনি বে-থা করেন নাই—সংসারে তাঁর কোন বন্ধন নাই—চিরকাল সদানন্দে কাটাইবেন বলিয়া তিনি কোন বাঁধনে বাঁধা পড়েন নাই কিন্তু একি হইল—এক তুলসীর বিহনেই যে প্রাণ যায় যায়!

প্রকাশ্যে তাঁহার মুখে কোনপ্রকার মলিনতার ভাব নাই—সদাই হাসি বিরাজিত, হস্ত কোতুকে তিনি সদাই মত্ত কিন্তু প্রাণে তাঁহার বহু বিচ্ছেদের দাবানল দাউ দাউ জ্বলিতেছে, তগবান এ অনল কি নির্ঝাণ হইবে না, আর কি আমি তুলসীদাসের সঙ্গ লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিব না? দুঃখীরাম আহার নিদ্রা ভাগ করিয়া অনবরত পথ হাঁটিতেছেন, শরীর অনাহারে অনিদ্রায় দুর্বল—দারুণ দুঃখে প্রাণ ওষ্ঠাগত—তথাপি বিরাম নাই।

তুলসীদাস সাধু সঙ্গ বড় ভাল বাসিতেন। ভাল সাধু সন্ন্যাসী দেখিলে তিনি আশ্রয়প্রার্থী হইয়া, গৃহ সংসার ছাড়িয়া তাহাদের সেবা করিতেন, কাছে কাছে থাকিয়া নানাপ্রকার ধর্মের কথা শুনিতেন—এ অভ্যাস তাঁহার বাল্যকাল হইতেই ছিল। তিনি সাধু সন্ন্যাসীর সেবায় একপ্রকার পাগল ছিলেন বলিলেই হয়। তাই দুঃখীরাম বেখানে যত সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রয় ছিল—তাঁহার, পরিচিত

যে সকল মঠে ভাল ভাল সাধু-সন্ন্যাসী বাস করিতেন—দুঃখীরাম সেই সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অল্পসন্ধান করিলেন কিন্তু কেহ তাহার প্রাণের দাদার সন্ধান বলিয়া দিতে পারিল না। তথাপি দুঃখীরাম হতাশ না হইয়া এইবার কাশীধামে যাইয়া শেষ চেষ্টা করিবেন—বলিয়া অগ্রসর হইলেন। কাশী যাত্রার পথে একটি পাছশালায় দুঃখীরাম একদিন বিশ্রাম করিতেছেন—দুইদিন পরে কিছু আহারাদি করিবার আশায় পাকাতির যোগাড় করিতেছেন। এমন সময় তথায় একজন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। বয়স অতি অল্প, কথাবার্তায় দুঃখীরাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন—যে তিনি কাশী যাইবেন—তাঁহার এখনও স্মৃতির শিক্ষা শেষ হয় নাই—তাই কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত বিশ্বম্ভর স্বাস্ত্যবাসীশের টোলে যাইতেছেন।

দুঃখীরাম তাঁহাকে তুলসীদাসের কথা জিজ্ঞাসা করিলে—তিনি বলিলেন—হাঁ তুলসীদাস নামে একজন ছাত্র ঘটাকর্ষ যোগীর টোলে পড়িত কিন্তু কেবল শাস্ত্রপাঠে তাঁহার প্রাণে শান্তি না হওয়ার উক্ত যোগীর নিকট যোগ শিক্ষা করিয়া কিছুদিন ভব ঘুরের মত ঘুরিয়া বেড়াইত। এখন শুনিতেছি—সে আবার নিজের অসি নদীর ধারে আশ্রম প্রস্তুত করিয়া টোল খুলিয়াছে—কতকগুলি ছাত্রও পড়াইতেছে। আমাদের গুরুদেবের সহিত তাহার মনের মিল ছিল না, প্রায়ই সে আমাদের সহিত তাহার বিরোধ, তাহার কোমর সন্ধান আমরা রাখি না, তবে সে যে কাশীতে আছে—সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এই বলিয়া সন্ন্যাসবশী ছাত্রটি অপর স্থানে বিজ্ঞপ্তি করিতে গেলেন।

দুঃখীরাম একেবারে হতাশ হইয়াছিলেন, এক্ষণে তুলসীদাসের

কতকটা সংবাদ পাইয়া, হতাশ প্রাণে আশার সন্ধান হইল—তিনি তাড়াতাড়ি আহাঙ্গা করিয়া সেদিনই চটা ত্যাগ করিবেন—এই আশা কিন্তু চটায়াল বলিল—ঠাকুর! প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল, আজ আর এস্থান ত্যাগ করিবেন না—কিছুদূর যাইলে বড় মাঠ পার হইতে হইবে, সেখানে ভারি ঠান্ডার উপদ্রব—রাত্রিকালে তাহাদের হাতে পড়িলে প্রাণের আশা বড় কম। অতএব রাত্রি অতিবাহিত করিয়া যাইলে ভাল হয় না? দুঃখীরাম দরিদ্র—ডাকাতগণ তাঁহার কি করিবে—টাকার জগুইত তাহারা রাহী ব্যক্তির প্রাণ হনন করে, কিন্তু দুঃখীর ত তাঁহা নাই? তথাপি চটায়াল অতি ভাল মানুষ এবং বুদ্ধ—“বুদ্ধস্ত বচনং গ্রাহ্যং মাপৎকালে” অতএব তাহার কথা অবহেলা করা ভাল নয়, ভবিষ্যৎ দুঃখীরাম সেদিন আহাঙ্গাদির পর চটায়াল একপার্শ্বে কবল পাতিয়া শয়ন করিলেন।

বহুদিন তাঁহার নিদ্রা হয় না। বন্ধুর জগু প্রাণ অস্থির—মন চিন্তাধিত ছিল, নিদ্রা হইবে কোথা হইতে? চিন্তার নিকট নিদ্রার প্রভাব যে কোন কার্যকারী হয় না! আজ বন্ধুর সন্ধান পাইয়া মনের আনন্দে বহুদিনের পর দুঃখীরাম গাঢ় নিদ্রায় নিমজ্জিত হইলেন কিন্তু তাহা বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না—কিছুক্ষণ পরে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন—তাঁহার বৌদিদি যেন স্বামী-শোকে পাগলিনী হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন; তাহার খুড়ীমার অবস্থাও নিতান্ত খারাপ, বাটীর বার না হইলেও পুত্রশোকে তিনি একপ্রকার হতাশ হইয়া, নানাপ্রকার রোগগ্রস্ত হইয়াছেন। বৃদ্ধ বয়সে পুত্রশোক—কত সহ্য করিবেন? দুঃখীরামের নিদ্রাভঙ্গ হইল—তিনি করঘোড়ে উঠে হস্তোত্তোলন করিয়া বলিলেন—জগদীশ! যখন আশা দিয়াছ, যখন দাদার সন্ধান বলিয়া দিয়াছ, তখন আর কিছুদিন অভাগিনী জননী আর তাঁর

পক্ষীকে প্রাণে বল দাও, আমি বেন দাদার সন্ধান লইয়া তাহাদিগকে স্বস্থ শরীরে দেখিতে পাই। পরোপকারী ছুখীরামের আর নিদ্রা হইল না—বসিয়া বসিয়া রজনী যাপন করিলেন—তারপর পূর্বা-কাশে উষার আলোকরশ্মি দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চটায়ালের নিকট বিদায় হইলেন।

কাশী আর বেশীদূর নাই। এই মাঠ পার হইয়া দুই তিন খানি গ্রাম অতিবাহিত করিতে পারিলেই বাবা বিশ্বনাথের শাস্তিময় কাশীধামে প্রবেশ করিতে পারিবেন শুনিয়া ছুখীরাম দ্বিগুণ উৎসাহে পথ চলিতে লাগিলেন।

প্রাণের আবেগে পথ চলিয়া তিনি বৈকাল বেলায় কাশীধামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কাশীর মনোরম শোভা, তথাকার লোক সকলের ধর্মময় ভাব দেখিয়া ধার্মিক ছুখীরাম মনে মনে বলিতে লাগিলেন—মরি মরি, এ কি স্বর্গ! এইজন্তই বুঝি লোকে কাশীবাসের জন্ত এত আগ্রহ প্রকাশ করে—আর এইজন্তই বুঝি কাশীর মাহাত্ম্য পুরাণাদিতে এত বিস্তৃত রূপে বিবৃত হইয়াছে? বাস্তবিক এখানে আসিলে মাহুঘের সকল ভাবনা সকল যাতনা, তিরোহিত হয়—প্রাণে ধর্মভাব না থাকিলেও সঙ্গুণে তাহার উদ্রেক হইয়া জীবন পবিত্র হইয়া যায়। দাদা, এইজন্তই অল্প কোথাও না যাইয়া বাছিয়া বাছিয়া মন নয়নের আনন্দগ্রন্থ এইরূপ আনন্দ-নিকেতনে আসিয়া প্রাণের পিপাসা মিটাইতেছেন। তিনি যে চিরকাল সৌন্দর্যের মধ্যে এবং আনন্দের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে ভালবাসিতেন—এইজন্ত দাদা আমার এত শীঘ্র সংসার ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন। হৃদয়ে ত রৈবাগ্যের ভাব ছিলই, তারপর স্থান-মাহাত্ম্য দাদা সকল ভুলিয়া এখানেই মজিয়া পড়িয়াছেন।

দুঃখীরাম একে, ওকে, তাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন অসি নদীতীরে তুলসীদাসের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়। তুলসীদাস কিছুদিন দেশ ভ্রমণে যাওয়ায় পাছে প্রিয় শিষ্যের চতু-
 পাঠীর বদনাম হয়—পাছে ছাত্রগণ উচ্ছ্বল হইয়া আশ্রম ছাড়িয়া
 যায়—এইজন্য সাধু ঘণ্টাকর্ণ প্রত্যহ দুবার করিয়া তুলসীদাসের
 টোলে আগমন করেন—ছাত্রদের রীতিমত অধ্যাপনা করান,—
 বাহাতে তাহারা ঠিক নিজ গুরুদেবের মত পাঠাভ্যাস করিতে
 পারে, ঘণ্টাকর্ণ প্রত্যহ তাহার প্রতি দৃঢ় দৃষ্টি রাখিয়াছেন। সকালে
 বৈকালে তিনি সহস্র কৰ্ম ফেলিয়া তুলসীর টোলে পদার্পণ করিয়া
 টোল পবিত্র করেন। কিন্তু তুলসীদাস ছাত্রগণকে যেরূপ শিক্ষা
 দিতেন—তাহার শাস্ত্র-বাখ্যা শ্রবণ করিয়া ছাত্রগণ যেরূপ তুষ্ট হইত,
 ঘণ্টাকর্ণের অধ্যাপনা কার্যে তাহারা সেরূপ আনন্দ লাভ করিতে
 পারে না। তাহার কারণ ঘণ্টাকর্ণ অত্যন্ত বুদ্ধ হইয়াছেন—মানসিক
 পরিশ্রম এখন আর তিনি করিতে পারেন না। তারপর শুধু পাণ্ডিত্যে
 কি হইবে? প্রাণে ঈশ্বর ভাব না জাগিলে ঈশ্বরতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া
 স্বকঠিন, তুলসীদাস রামময় প্রাণ লইয়া, তাঁর ভাবে বিভোর হইয়া
 যোগমুদ্রাদি যাহা বাখ্যা করিতেন—তাহা অতি উপাদেয়, ঘণ্টাকর্ণ
 কেবল তুলসীদাস ছাড়া আর কাহাকেও তত ত্যাগ স্বীকার করিয়া
 পড়ান না, আর এখন তাঁহার তত ক্ষমতাও নাই? ছাত্রগণ
 একবারের বেশী দুইবার জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বিরক্ত হইয়া পড়ি-
 তেন, কাজেই ছাত্রগণের আশা মিটিত না, প্রাণের পিপাসার
 শাস্তি হইত না। তিনি প্রাণ খুলিয়া তুলসীদাসকে যাহা শিক্ষা দিয়া-
 ছেন—তাঁহার প্রতি যেরূপ করিয়াছেন—জীবনের শেষদশায় ক্ষমতার
 অভাবে আর কাহার প্রতি তিনি তাহা করিতে পারেন না—তবে

কাশীধামে যে তাঁহার তুল্য বৈদাস্তিক এবং যোগপরায়ণ যোগী আর কেহ নাই—ইহা সকলেই জানিত—এইজ্ঞা সকলেই সসম্মমে তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিত। ছাত্রগণও তাঁহার পদার্পণ সৌভাগ্যদয় মনে করিয়া আর বেশী কিছু জিজ্ঞাসার জন্ত বিরক্ত করিত না।

দুঃখীরাম যখন তুলসীদাসের টোলে গিয়া উপস্থিত হইলেন, সেই সময় ঘটাকর্ষ নিজ আশ্রমে আসিতেছেন—তাঁহার সেই দেবতুল্য কাস্তি দেখিয়া দুঃখীরাম সসম্মমে পথ ছাড়িয়া দিলেন। তিনি চলিয়া যাইলে দুঃখীরাম জনৈক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হ্যাঁ মহাশয়! তুলসীদাস নামে একজন সাধু কাশীতে টোল খুলিয়াছেন—ইহা কি তাঁহারই টোল?

ছাত্র। হ্যাঁ—এই টোল ও এই আশ্রম—তাঁহারই; আপনি কোথা হতে আসছেন?

দুঃখীরাম। আমি তার দেশ থেকে আসছি; তিনি কোথায় গিয়াছেন?

ছাত্র। তিনি সম্ভ্রতি এখানে নাই—শীঘ্র আসবেন।

দুঃখী। কত দেরী হবে—কত দিন গিয়াছেন?

ছাত্র। প্রায় ছমাস গিয়াছেন, বোধ হয়—আর মাস খানের মধ্যেই আসবেন।

দুঃখীরামের বয়স বেশী নয়—লেখাপড়া শিখিবার এখনও বয়স আছে। ছাত্রটি মনে করিল—পণ্ডিতজীর নাম শুনে বোধ হয়, ইনি ছাত্র হতে এসেছেন, তাই খাতির করে বল্লেন, তার আর ভাবনা কি। আপনি থাকুন না—তিনি এলেই দেখা হবে, পড়া-শুনার বন্দোবস্ত হবে।

আজ রাত্রেই মত ত থাকতেই হবে, নতুবা বাই কোথা?

দাদা না থাকলে এদের কাছে থাকা হবে না, তাহা হইলে কল্পার কথায় অনেক কথা বাহির হয়ে পড়ে, দাদার অনিষ্ট হতে পারে— এই ভাবিয়া ছুঃখীরাম কেবলমাত্র সেই দিনকার মত থাকিবার ক্ষমতা আশ্রয় প্রার্থনা করিলে—হাতীগণ আপত্তি করিল না। ছুঃখীরাম বিনাক্রোশে আহাতি করিয়া তথায় রাত্রি বাস করিলেন।

নিভ্রাকর্ষণের পূর্বে মনে করিতে লাগিলেন—দাদা! কালীতে আসিয়া খুব ঘাঁটা জমাইয়া লইয়াছেন দেখছি, পণ্ডিততেও যেমন নাম—সাদুগিরিতেও তেমনি, সকলে তাঁহার নামে একেবারে ডকা রাজ্য আছে। বাহা হউক, কেবলদানীটা দেখিয়েছেন। আর না হবে কেন, সাধুর্লেই যে এ বিষয়ে সিদ্ধি লাভ হয়, তিনি যে রূপ একগুঁয়ে, তাহাতে তিনি যে এই সামান্ত দিনের মধ্যে লেখাপড়াও বেশ শিখিয়াছেন— তাহা তাঁর টোলের ছাত্র-সংখ্যা দেখিলেই বুঝতে পারা যায়। পড়া-শুনা ভাল না হলে কি আর এত বড়ো বড়ো ছাত্র এখানে থেকে কেবল ভাত মারছে! নিশ্চয়ই ইহারা কল পায়, তাই টেকে আছে! বাবা! ছাত্র নয়ত যেন ছেলের বাপ,—এদের পড়ান কি সামান্ত বিত্তের কর্ম? দাদা! যে সামান্ত দিনের মধ্যে খুব উন্নতি করেছে, তার আর সন্দেহ নাই?

ছুঃখীরাম মনের আনন্দে রজনী বাপন করিয়া প্রাতঃকালেই বিদায় হইলেন। মনে মনে করিলেন দিনকয়েক কালীধামের শোভা দেখিয়া বাড়ী যাই, দাদা যখন এখানে নাই, তখন আমি এখানে থেকে সময় নষ্ট করি কেন? বাড়ী গিয়ে খুড়ীমা, মামী ও বৌদিকে নিয়ে একেবারে সেখানকার বিষয়-আশয় বেচে চলে আসি। দাদা যখন এখানে এত নামজাদা সাধু হয়েছে, তখন আর আমরা সেখানে একলা থেকে কষ্ট পাই কেন? আর খুড়ীমা, বৌদিকে আমলে

কাল আর ঘাড় তুলতে পারেন না, আমার একার কথায় সম্মত হতে নাও পারেন—হয়ত নানা যুক্তি তর্কে আমাকে হারিয়ে দিতে পারে কিন্তু সে বুড়িকে দেখলে, তাঁর মরা কান্না শুনে দাদার আর সাধ্য নাই যে কেটে ছেঁটে ফেলে দিবেন। বুড়ীর অবস্থা দেখে, যখন পাড়ার লোক কেঁদে আকুল হয়, তখন দাদা ত তার ছেলে—এত নিষ্ঠুর কখনই হতে পারবেন না।

দুঃখীরাম কয়েকদিন কাশী বাস করিয়া মনের আনন্দে তাহা-দিগকে আনিতে স্বদেশ যাত্রা করিলেন। এবার বাড়ী-ঘর বিক্রয় করিয়া হাতে টাকা হইবে, তখন একান্ত পথ চলিতে না পারিলে বোদি, খুড়ীমা ও মামীকে ডুলী করিয়া দিবেন। দুঃখীরাম এইরূপ আশস্ত চিত্ত হইয়া মনের আনন্দে রাজাপুরে ফিরিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

পাগুলী মা

কাশী ও অযোধ্যার মধ্যবর্তী গোসাইগঞ্জ নামক স্থানে ছগনলাল চৌবে নামক একজন অতি বদান্তব্যয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ছগন সে অঞ্চলের জমীদার—অনেক টাকার মালীক কিন্তু তাঁহার যত্ন আয়—তত্ৰ ব্যয়, টাকাকে তিনি টাকা জ্ঞান করিতেন না। পর-হিতব্রতে তাঁহার যাবতীয় অর্থ ব্যয় হইত, বিত্তহীন জমীদারীর আয়েই এক কপর্দকও তিনি বাজে নষ্ট করিতেন না।

ছগনলাল প্রৌঢ়, হুটপুট ও বলীষ্ট। চেহারা অতি সুন্দর—যেন রাজপুত্র। সংসারে তাঁহার স্ত্রী যশোদাদেবী এবং কন্যা—নাম

সরস্বতীদেবী ছাড়া আর কেহ ছিল না। তবে অর্থ হইলে যেমন আত্মীয়-স্বজনের ভাবনা থাকেনা—সকলেই একটা না একটা সম্বন্ধ পাতাইয়া আসিয়া উপস্থিত হয়, ছগনের সংসারে সে সকলের কিছুই অভাব ছিল না। সে হিসাবে তাহার সংসার অতি বৃহৎ, পৌত্ত্বর্গ বিশ-পঁচিশটির কমানহে। তাহার উপর বড়লোকের বাড়ী—দাসদাসী ত আছেই। তিনি এই সকল আত্মীয় স্বজনের ভরণ করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেন না। তীর্থযাত্রার পথে কোন স্ত্রীপুরুষ বিপন্ন হইলে বা অর্থের অভাব হইলে, তিনি তাহাদের সাহায্য করিতেন। কোন লোক পীড়িত হইয়া কষ্ট পাইতেছে কিম্বা আহারের সংস্থান করিতে পারিতেছে না, জানিতে পারিলে ছগন তাহাকে বাড়ীতে আনিয়া রীতিমত চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা করিতেন, অন্নহীনের অন্ন সংস্থান করিতেও ছগন কিছুমাত্র ক্রটি করিতেন না। এইরূপে তাহার মাসিক সংসার খরচ যে কত, তাহা কেহ স্থির করিতে পারিত না। ইহার কারণ—তাহার সংকল্প অসংখ্য প্রকারে অন্তর্ভুক্ত হইত! এত ব্যয় করিয়াও তিনি কখন অভাব গ্রস্ত হয় নাই? যখন ষে রূপ সংকার্য্য মনে করিতেন—অন্নানবদনে তাহা সম্পন্ন করিতেন। এই সকল কার্য্যে শুধু তিনি নহেন, পত্নী যশোদাও তাহার অমুরূপা ছিলেন। কন্যাটী বালিকা হইলেও পিতামাতার সমস্ত গুণ তাহাতে বর্তাইয়াছিল, বার চোদ্দ বৎসরের বালিকা, তাহার হৃদয়ের কোমলতা দেখিলে সাক্ষাৎ ভগবতী বলিয়া বোধ হইত। কোন পীড়িত বা অভাবগ্রস্ত স্ত্রী কিম্বা পুরুষকে পিতা কুড়াইয়া আনিলে, আর কেহ না হউক—সরস্বতী আগে তাহার সেবায় ব্রতী হইত। দেশও সমাজের হিসাবে সরস্বতী এখন অমৃত—বিবাহ হয় নাই। বাঙ্গালার মত হিন্দুস্থানীর দেশে এত অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ না দিলেও কোন দোষ হয় না।

ছগনলাল পরোপকারীতা ও দানে এইরূপ মুক্ত হস্ত হইলেও বিধাতা তাঁহাকে ঐ একমাত্র কণ্ঠারত্ন ভিন্ন আর কোন পুত্রাদি দেন নাই ? যশোদা বা ছগন তাহার জন্ম একদিনও কোনপ্রকার দুঃখ প্রকাশ করেন নাই। তাঁহারা বলিতেন—“সরস্বতী মাই হাম্ লোগোনকা সব ছায়। আউর এতনা দীন-দরিদ্র ছায়, ঐহি সব হাম্ লোগোনকা বাল্ বাচ্ছা !

হৃদয় ষাঁহাদের এত উদার, মন ষাঁহাদের এত বড়—নাই বা হইল তাহাদের পুত্র, তাঁহারা একটা কিছা দুইটা পুত্রের কান্দাল নহেন। যত দীন-দরিদ্র আছে—সকলকে তাঁহারা পুত্র-কণ্ঠা বলিয়া মনে করেন—কাজেই পুত্র নাই বলিয়া তাঁহাদের হৃদয় অভাব অহুভব করিবে কেন ? এইজন্তই তাঁহারা এতদিন সরস্বতীর বিবাহ দেন নাই। কোনও একটা সংস্কার সম্পন্ন দরিদ্র যুবক পাইলে তাহার সহিত সরস্বতীর বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গৃহ-জামাতা রূপে নিজের কাছে রাখিবেন, প্রাণের একমাত্র পুত্রী, আনন্দ প্রতিমাকে তাঁহারা চক্ষুর অন্তরাল করিয়া পরের বাড়ী পাঠাইতে পারিবেন না ; এইজন্ত সরস্বতী এখনও অহুচা। মনের মত পাত্র মিলিতেছে না বলিয়া সেইজন্ত তাঁহারা তাহার বিবাহ দিতে পারিতেছেন না।

নিজের পরিবারবর্গ মোটে দুইজন হইলেও ছগনলালের গৃহ সদাই জন কোলাহল মুখর, সদাই আনন্দরোলে পরিপূর্ণ। সুবৃহৎ রাজবাটীর মত অট্টালিকা, প্রায় দশ পনের বিঘা জমী ষুড়িয়া বৃহৎ পরিখার মধ্যে তাঁহার এই বাসভবন অবস্থিত। বাহিরেও অন্তরে স্বচ্ছ-সরোবর, চারিদিকে সুন্দর বাগান—ফুলে-ফুলে সুশোভিত ; সরস্বতী প্রত্যহ সখীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া এই সরোবরে খেলা করে—বাগানে ফুল তুলে—ফুলের মালা গাঁথে—সেই মালা প্রত্যহ তাহাদের গৃহ দেবতার গলদেশে ঢলাইয়া বালিকা সান্তিণয় আনন্দ অহুভব করিত।

আজ কয়েকদিন হইল ছগন রাস্তা হইতে একটা পাগলীকে ধরিয়া আনিয়া প্রকৃতিস্থ করিবার জন্ত সেবা-শুশ্রূষা করিতেছেন ও কবিরাজ দেখাইতেছেন। পাগলী মেয়ে বোধ হয় কোন ভ্রূ গৃহস্থের কুলবধু, কোন মর্মান্তিক দুঃখে তাহার মাথা খারাপ হওয়ায় গৃহত্যাগ করিয়াছে। ছগন একদিন গাড়ী করিয়া বেড়াইতে যাইবার সময় পথের ধারে তাহাকে দেখিয়া বাড়ী লইয়া আসিয়াছেন। সরস্বতী ঐ পাগলীর রূপ দেখিয়া একেবারে মোহিতা হইয়া পিতার মত অনবরত তাহার সেবা করিতেছে, যাহাতে সে শীঘ্র ভাল হয়, এই ধার্মিক পরিবারের স্বত পরত তাহাই ইচ্ছা? ছগন এই পাগলিনীকে মা বলিয়া ডাকে, তাহাকে কত আশ্বাস দেয়—বলে মা! তুমি ভাল হও, তোমার বাড়ী কোথা বল—আমি তোমাকে সেখানে রাখিয়া আসিব—যদি টাকাকড়ির অভাব থাকে তাহা হইলেও আমি সে অভাব পূরণ করিয়া দিব। পাগলী কোন কথাই শুনে না, কেবল আপন মনে বলে—

“আগড়ম বাগড়ম ঘোড়াডুম সাজে,

ভাল মেগোর ঘাগোর বাজে,

বাজে বাজে চল্লো ডুলি,

ডুগেল সেই কমলাপুণী,

কমলাপুণী টেটা

স্বর্ধি মামার বেটা।”

একথার কেহ কোন মানে বুঝিতে পারেনা বটে, তবে ইহা হইতেও কতকটা বুঝিতে পারা যায় যে কমলাপুণী নামক কোন স্থানে ইহার বাড়ী; ডুলী করিয়া সেখানে যাইতে হয়। যাহা হউক, এখন ত আর সেকথা নয়, বখন তাহাকে আশ্রয়ে আনিয়াছি, তখন তাহাকে

যে কোন প্রকারে হউক রোগমুক্ত করিতে হইবে—পাগল ভাল করিতে হইবে—তারপর অন্য কথা।

কবিরাজ প্রত্যহ আসে, প্রত্যহ দেখিয়া যায়, নানাপ্রকার তৈল ঔষধ ব্যবস্থা করে, আর ছগন সঙ্গীক সরস্বতীকে লইয়া তাহার সেবা করেন। দুঃখীর দুঃখমোচন, আর্ন্তেব সেবা-শুশ্রূষা করিতে পাইলে এই মহৎ বংশ যেন হাতে স্বর্গ প্রাপ্ত হয়—নিজেদের আহাৰ নিত্যা ত্যাগ করিয়া পরার্থে এইরূপে জীবন উৎসর্গ করে। এমন পরোপকার পরায়ণ না হইলে কি এই সংসারে পাকা কর্মযোগী হইতে পারা যায়? ছগন সপরিবারে যে আদর্শ কর্মী তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

পাগলী এখন বাড়ীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। কখন বাটীর মধ্যে, কখন পুকুর ঘাটে, কখন ফুলের বাগানে সে আনুমনে পদচারণা করে; ঔষধ বা পথ্য খাওয়াইবার সময় হইলে—হয় ছগন, না হয় সরস্বতী অথবা বাটীর কোন দাসী তাহাকে খুঁজিয়া আনে। স্নবহৎ প্রাচীরবেষ্টিত গৃহ চত্বর ছাড়া তাহাকে আর কোথাও যাইতে দেওয়া হইত না। পাছে সে কোথাও বাহির হইয়া যায়, এইজন্য দ্বারবান প্রভৃতির উপর কড়া হুকুম ছিল—পাগলী পলাইলে তাহাদের জরিমানা হইবে। এইজন্ত সকলেই পাগলিনীকে চক্ষে চক্ষে রাখিত।

সরস্বতী আজ বৈকাল বেলা সখীগণ পরিবৃত হইয়া পুকুরিগীতে গাত্র ধৌত করিতে আসিয়া দেখিল—পাগলিনী তথায় বসিয়া মালা গাঁথিতেছে আর আপন মনে বলিতেছে—

“রাম দুই তিন, অমাবস্তা ঘোড়ার ভিম”

উঃ হ চারিদিকে আগুন, যেখানে পা বাড়াই সেখানেই আগুন, আকাশে আগুন, নীচে আগুন, জলে আগুন, আমার মনে আগুন

ধূ ধূ করে জ্বলছে, উঃ হঃ পুড়ে গেল, পুড়ে গেল। আমার মুখে আগুন, আকাশে সূর্য্যে উঠে—তাতেও আগুন, রেতে চাঁদ উঠে। তাতেও আগুন কিন্তু সে আগুনে তাপ নেই—যত তাপ আমার এই মনের আগুনে। ধূ ধূ জ্বলে আর বৃকে ফোঁকা ওঠে, জল দিলেও নেবেনা—বৃকটা যেন পুড়ে পুড়ে আঁকার হয়ে গেছে !

পাগলিনী তথায় বসিয়া ঐরূপ খেদের কথা কহিতেছে দেখিয়া সরস্বতী অতীব হৃঃখের সহিত বলিল—হ্যাঁ ভাই ! তুমি এখানে এসে একলা বসে আছ—আর বাবা, মা, ও আমি যে তোমার খুঁজে খুঁজে সারা হচ্ছি—তুমি এখানে এসে কি করছো !

পাগলিনী । বৃক পোড়াচ্ছি গো, বৃক পোড়াচ্ছি—আর কি কর্কে ।

১ম সখী । আহা ! সখী বোধ হয় ওর বৃকের ভিতর খড় কড় কচ্ছে—তাই ওকথা বলে ।

পাগ । আমার কেন কর্কে, শত্রুরের কর্কক, বাবা যে আমার ওষুধ দেয়—তার জন্তে ! ভাল হবে বলে । দেখ মা ! একদিন আমি গঙ্গা নাইতে গেছিলুম, দেখি একজন মাটির রামসীতা গড়ে ঘাটে বসে ভিক্ষে করছে, আমাকে দেখে তার সেই রামসীতা বলে—ও পাগলী ! তোর কি কিছু হারিয়েছে ! আমি বলুম—“মদনমোহন পালিয়েছে” বলিয়া পাগলিনী উচ্চ হাসিয়া হাতের ফুলের মালা ছড়াটা ছিঁড়িয়া ফেলিল ।

সরস্বতী । হা দিদি ! তোর মদনমোহন কোথা—তাই বল না, তা হলে ত রোগ এখনি সেরে যায় ।

পাগ । তাই ত বলছি গো, আমার মদনমোহন পালিয়েছে ।

দ্বিতীয় সখী বলিল—আহা ভাই ! ওকি আর ওতে আছে, ওর স্বামী বোধ হয় বিবাহী হয়ে গেছে বলে ও মন পাগল হয়েছে ।

আহা, এমন রূপের ডালি মেয়ের অমন কপাল পুড়ে, ছুঁড়ীর অন্ন
ব্যয়েল কিনা, তাই সহ্য কর্তে পারেনি! মাথা গরম হয়ে গেছে।

সরস্বতী। বল কি ভাই! হিন্দুর মেয়ের স্বামী যে কি জিনিস—
তা যার হয়েছে সেই জানে; সেই স্বামী হারা হলে মেয়ে মানুষের
আর কি থাকে, পাগল হবে নাত কি?

১ম। আহা, ছুঁড়ীর এই সোমর্ন্ত বয়স, তায় রূপ যেন ফেটে
পড়ছে, আর বেহায়া ত নয়—যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীঠাকুরণ!

পাগ। দেখ মা! এ বাজারে লক্ষ্মী অলক্ষ্মীর একদর, বরং
অলক্ষ্মীর তেজ বেশী, কাজেই দরও বেশী, আর লক্ষ্মী ত নারায়ণের
পায়ের তলার পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছেন। তা হাঁ মা, লক্ষ্মী ত
নারায়ণের বুকের উপরই থাকেন?

২য়। দিদি! দেখ দেখ, এখন ত বেশ জ্ঞানের কথা কচ্ছে—
আহা মরি মরি, ওর কত কষ্ট হচ্ছে।

সরস্বতীর প্রাণ অতি কোমল ঠিক মা-বাপের মত, সে ছলছলনেত্রে
পাগলিনীর কাছে গিয়া হাত ধরিয়া বলিল—পাগলী দিদি! আয়,
এখানে বসে আর কাজ নাই, চল ঔষধ খাবার সময় হয়েছে, আহা
কত দিনে ভাই! তুই ভাল হবি, আমি তোঁর হাত ধরে ছোট
বোনের মত খেলা করিঁ।

পাগ। ওলো করিঁ লো করিঁ! আমার সঙ্গে না হয়—তোঁর
বয়ের সঙ্গে খেলা করিঁ—তাঁর জন্ত এত ভাবনা কেন? এই বলিয়া
পাগলিনী সরস্বতীর কাপড়ের আঁচলে কতকগুলি ফুল বাঁধিয়া দিয়া
বলিল—বা, তোঁর বয়ের জন্ত মালা গাঁথগে বা!

সর। আচ্ছা, পাগলী দিদি! আমরা যদি তোঁর মদনমোহনকে
ধরে দিতে পারি, তা হলে কি দিবি?

পাগ। ইস্তা আর পারতে হয়না—আমার মদনমোহন তেমন নয়—সে কাকুকেও ধরা দেয় না, যা একবার মা বশোদাকে দিয়ে ছিল, তাও কত কষ্টে।

সর। তাত বেশ জানি—এখন তুমি কি কর্তে এখানে এসেছ, চল ঘরে যাই—ঔষধ খাবার সময় হয়েছে।

পাগ। কি কর্তে আর আসবো, মদনমোহনকে খুঁজতে এসেছি, তোরা যদি খুঁজে পাস আমাকে দিবি ত? “খুঁজি খুঁজি নারী—যে পায় তারি” বলিতে বলিতে পাগলী সেখানে আর দাঁড়াইল না—ছুটিয়া ঘরের দিকে পলাইয়া গেল।

সরস্বতী সহচরীগণকে সঙ্গে লইয়া পুষ্করিণীতে বস্ত্রাদি ধোত করত বাড়ী গেল। এবং জননীকে পাগলী দিদির ঔষধ দিতে বলিল। কবিরাজ আজ বহু অর্থব্যয় করিয়া একটা নূতন ঔষধ তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—এই ঔষধ নিয়মমত খাওয়াইলে মাথা গরম নিশ্চয়ই ভাল হইবে। হুগনলাল এই পাগলিনীর জন্ত অর্থব্যয়ের কিছুমাত্র ক্রটি করিতেছেন না। কবিরাজ যখন যত টাকার ঔষধের ফর্দ দিতেছেন—তিনি অকাতরে তাহা খরচ করিতেছেন। আপনার স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের জন্ত লোকে যাহা করিতে পারে না, এই পরোপকারী ব্রাহ্মণ একটা কুড়ানো পাগলির জন্ত তাহাই করিতেছেন। বলিহারী তাঁহার দানশক্তির—আর বলিহারী তাঁহার পরোপকার ব্রতপরায়ণতার।

এইরূপ সপরিবারের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অসীম ত্যাগ স্বীকারে প্রায় ছয় মাসের পর পাগলিনীর মাথা গরম একটু প্রশমিত হইল—পাগলামীর ভাব একটু কম পড়িয়া আসিল। রোগের উপশম হইয়াছে দেখিয়া হুগনের ও তদীয় পত্নীর আর আনন্দের সীমা রহিল না।

এতদিন পরে যে তাঁহার ভগবানের একটি পরম প্রিয়কার্য সমাধা করিতে পারিলেন—তজ্জন্ত তাঁহাকে অন্তরের শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

সরস্বতীর আনন্দও ততোধিক, সে এই অল্পপমা রূপসী সঙ্গিনীর সহিত আনন্দে কাল কাটাইবে—তাঁহাকে সখীত্বে বরণ করিয়া তাহার নিকট হইতে নানাপ্রকার উপদেশ গ্রহণ করিবে—ইহাই তাহার একান্ত ইচ্ছা। ভগবানের রূপায় আজ তাহা সফল হইয়াছে, পাগলিনী ভাল হইয়াছে—তবে আর ভাবনা কি? এই পাগল অবস্থাতেই সে সময়ে সময়ে এক একটি এমন সুন্দর জ্ঞানের কথা কহিত—যাহা সামান্ত স্ত্রীলোকের মুখ দিয়া কখন বাহির হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রকৃতিস্থ থাকিলে—ভাল হইলে না জানি, ইহার দ্বারা কত শিক্ষাই হইবে। স্ত্রীজাতির শিক্ষাই যে পদে পদে, জগতে তাহাদের কর্তব্য যে অনেক, জননীর জ্ঞাতি তাহারা—মাতৃত্বের আদর্শ তাহারা, অনেক দায়িত্ব যে ভগবান্ তাহাদের উপর গ্রস্ত করিয়াছেন। জননীর নিকট অনেক বিষয় শিক্ষা করিয়া সরস্বতী একপ্রকার সাংসারিক বিষয়ে পাকা হইয়াছে কিন্তু একজন উপযুক্ত সমবয়সী থাকিলে যেমন মনের কথা, প্রাণের কথা খুলিয়া বলা যায়—তাঁহার কাছে যেমন অল্প বিষয়ের শিক্ষা লাভ করা যায়, জননীর নিকট ত আর তাহা হয় না? পাগলিনী ভাল হওয়ায় সরস্বতীর তাই এত আনন্দ—সে এখন সদা সর্বদা তাহারই নিকটে থাকে—তাঁহাকে বড় ভয়ীর মত মাগু করে। ছগনলালও যশোদাও তাঁহাকে বড় মেয়ের মতই ভালবাসে। সকল কথায় সে বেশ ভাল উত্তর দেয় কিন্তু তাহার বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে কিছুই বলেন না। পিতার এবং স্বশ্রের নাম মুখে আনে না—তবে লিখিয়া জানায়! তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা

করিলে সে বড় দুঃখিত হয় বলিয়া আর কেহ তাহার জন্ত তত পীড়াপীড়ি করে না। যখন ব্রাহ্মণের মেয়ে জানা গিয়াছে, তখন আর কেন, ও যতদিন পারে আমার কন্টার মত থাক, পরে যদি কেহ সঠিক সংবাদ দিতে পারে এবং যদি কেহ সন্ধান করিয়া সন্তোষজনক পরিচয় দেয় তখন পাগলী মায়ের অভিমত লইয়া কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করিব। এখন পাগলিনী আমার পরিবার মধ্যে ঠিক বড় মেয়েটির মত প্রতিপত্তিশালিনী হইয়া অবস্থান করুন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

হলসী ও দুঃখী

হ্যাঁ বাবা! দুঃখী! তবে কি তুই আমার তুলসীর দেখা পেয়েছিস—সে কি আমার প্রাণে বেঁচে আছে; আবার কি আমি তার চাঁদমুখে মা বুলি শুন্তে পাব? বলিয়া বৃদ্ধা হলসীদেবী দুঃখী তেওয়ারীর মুখের দিকে সজল নয়নে হা করিয়া চাহিয়া রহিলেন। দুঃখী বলিল—খুড়ীমা! আমি তোমার মত বড়ো মানুষের কাছে মিথ্যে বলছি না, আমি কি কখন অকারণে মিথ্যে কথা বলি? হলসীদেবী বলিলেন—না বাবা! তুমি সোণার চাঁদ ছেলে—কার সাধ্য তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে—তবে বাবা! এত দিনের পর অত আশার কথা শুনে একেবারে বিশ্বাস কর্তে পারিনে বাবা! তাই বলছি? দুঃখীরাম বলিলেন—না খুড়ী তার জন্ত ভাবনা নাই—আমি বেশ করে দেখে এসেছি, দাদার এখন সময় খুব ভাল—তিনি এখন কাশীতে খুব নামজাদা হয়েছেন; অনেক ছাত্রকে বেদান্ত

শাস্ত্র পড়াচ্ছেন,—এখন খুব বড় একজন পণ্ডিত হয়েছেন। হুঃখীরাম এই বলিয়া তাহার মাতুলানীকে শিষ্য যজ্ঞমানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। যে লোকটাকে নিষ্কৃত করিয়া গিয়াছিলেন—সে ঠিক কাজ করেছে কি না; শিষ্য যজ্ঞমান তাহার উপর সন্তুষ্ট কি না? হুঃখীর মামী মনিষাদেবী বলিল—হাঁ বাবা! সে কাজ বেশ করছে, কোন গলদ করে নাই, তবে তুলসী আর তোর উপর শিষ্যযজ্ঞমানেরা যেমন সন্তুষ্ট, তেমন কি আর তার উপর হবে তবে কি কর্কে, না হলে আর উপায় কি?

হুলসীদেবী আর এ সকল বিষয়ে কিছুমাত্র দেখেন না, যে দিন থেকে তুলসীদাস বাড়ী ছাড়া হয়েছেন। হুলসীদেবী সেই দিন হইতেই সংসারের যাবতীয় কর্তব্য কর্ত্তে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল হা তুলসী হা জীবনধন বলিয়া অহরহঃ রোদন করিতেছেন। শিষ্য যজ্ঞমান থাকিল—কি গেল, সে বিষয় দেখিবার তাঁহার ইচ্ছা নাই। আর দেখিয়াই বা কি হইবে? এক ছেলে সেও বিবাগী হইল—বউটীও আর তাঁহাকে দেখিল না—এত দিন গেলো একবার খোঁজ করলে না—তবে আর এ সকল কার জন্ত? চারটি খেতে হয় তাই খান—একখানা পরিতে হয়—তাঁহাই পরেন। যেখানে বসে থাকেন—সেইখানেই থাকেন, হুঃখীর মামী হাত ধরিয়া তুলিয়া না আনিলে আর সেখান হইতে আসেন না—একপ্রকার যবুথবু হইয়া পড়িয়াছেন।

তুলসীদাসের মত নয়নাভিরাম পুত্র গৃহত্যাগী হইলে হুলসীদেবী যে জীবিত আছেন—এই যথেষ্ট, সংসারের আলস্য-আশ্রয় দেখা ত পরের কথা। হুঃখীরাম তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া সমস্ত ভাঁর তাঁহার মাতুলানীর উপর দিয়া গিয়াছিলেন এবং হুলসীদেবীকে খুব সযত্নে রাখিয়া প্রতিপালন করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন, খুড়ীমারই

সব—ইহঁার কৃপায়ই এখনও আমাদের অস্তিত্ব আছে—ইহঁাকে অবহু করিয়া ধর্ম্মে পতিত হইও না। মাতুলানী মনিষ্যাদেবীও ধার্ম্মিক রমণীর মত বৃদ্ধার যথেষ্ট সেবা-শুশ্রূষা করিয়া আসিতেছেন।

বহুদিনের পর দুঃখীকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া এবং তাহার মুখে প্রিয় পুত্রের কুশল সংবাদ পাইয়া এ কয়দিন বৃদ্ধা যেন একটু আশ্বস্ত হইয়াছেন—সে জড় ভাব যেন অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। এখন কেবলই বলেন—ই্যারে দুঃখী, কাশীতে যদি আমার তুলসীর সন্ধান পেয়েছি, সে যদি সেবানকার বড় পণ্ডিত হয়েছে, আর ঐ কি বলছি, ছাত্রগণকে “বেদানা” না কি পড়াচ্ছে, সকলে তার খুব স্তুতি করছে, তবে আর দেবী কেন বাবা! আমাকে সেখানে নিয়ে চল না, এতদিনের পর বাছার মুখ দেখে প্রাণটা ঠাণ্ডা করি। আর শেষ দশাটায় পণ্ডিতের মা হয়ে, তুলসীর হাতের আগুন নিয়ে মরতে পারলেও জীবনটা সার্থক হয়—বাবা! দুঃখী এত দুঃখ কষ্ট করে যখন সন্ধানটা আনলি—তখন আর দেবী করতিল কেন?

দুঃখী। খুড়ীমা! দুই একদিন সব্ব করোনা—বৌদিদির খপরটা একবার নিই, শুন্ছি তিনি দাদার সংবাদ না পেয়ে পাগল হয়ে কোথায় ছটকে বেরিয়ে পড়েছেন।

হলসী। তা হতেও পারে—অমন স্বামীশোক কি সোমন্ত মেয়ে মানুষ সামলাতে পারে? তুলসী যে আমার বউ অস্ত্র জীবন ছিল, হতভাগী আমি, ঐ বউকে বাপেরবাড়ী পাঠিয়ে দিয়েইত যত গোল করলুম। মর্মে যদি সেই সময় বউমাকে না পাঠাতুম তাহলে আর কি এমন হয় বাবা! বলিয়া বৃদ্ধী হাউ মাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল, রত্নাবলীর নাম করিয়া তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া বহুধারা বাহির হইতে

লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—আহা! সে কি আমার তেমন বউ; মাথা ঠিক নেই বলেই আমার কোন খোঁজ নেইনি—এখানে আসেনি, পাগলের ঝোঁকে কোথায় চলে গেছে, ইয়া রে বাবা দুঃখী! শেষকালে কি আমার কপালে এই ছিল—ছেলে গেল, বউ গেল, তবে আমি কি কর্তে আছি? এই বলিয়া বৃদ্ধা গভীর দুঃখে বুক চাপড়াইতে লাগিলেন।

বৃদ্ধার অবস্থা দেখিয়া দুঃখীরামের প্রাণ ফাটিয়া বাইতে লাগিল। তিনি স্বপ্নে মনে মনে বলিতে লাগিলেন—ধর্মকর্ম করবার জন্ম দাদার ঘর ছেড়ে না গেলিই কি হতো না। ধর্ম-সাধনার জলন্ত প্রতিমূর্তি দেবী-স্বরূপিনী এই জননী ও পত্নীর প্রাণে কষ্ট দিলে কি ধর্ম হয়? জানি না দাদার বুদ্ধিগুণ কেমন বিগড়ে গিয়েছে, যাহাই হউক, যখন সন্ধান পেয়েছি, তখন আর তাঁর কোন ওজর-আপত্তি শুনবো না, আমি দুই একদিনের মধ্যে এখনকার বন্দোবস্ত ঠিক করে খুড়ীকে কাশী নিয়ে গিয়ে ফেলবো, দেখি তিনি কেমন করে সন্ন্যাসী হয়ে যান। বৃড়ো মা থাকতে সন্ন্যাসী—এত শাস্ত্র পড়ে তাঁর এই বিচ্ছেদ হয়েছে—কোন্ শাস্ত্রে বলে “মা-বাপ ছেড়ে সন্ন্যাসী হতে?” জেনে শুনে দাদার মাথা বিগড়ে গেছে, বুদ্ধিগুণ চুলোর দোরে হাজির হয়েছে। যাহা হউক, খুড়ীমাকে ত নিয়ে যাবই কিন্তু বউদিদি গেলেন কোথা, তার ত সন্ধান পাচ্ছি না। কেউত কোন সন্ধানও বলতে পারলে না, তাঁর পতি শোকাতুরা জননী ত কেঁদে কেঁদে মরবার দাখিল হয়েছেন। হায় দাদা! তুমি জেনে শুনে এমন সাজান সংসারটাকে ছারখার করলে?

দুঃখীরাম বৃদ্ধাকে সাহুনা করিয়া বলিলেন—খুড়ীমা! আর কেঁদোকেটো না বাপু! চল, তোমাকে আগে কাশীতে রেখে এসে,

তারপর বৌদির সন্ধান করো! তবে দুই চারদিন অপেক্ষা কর, আমি একবার ভাল করে বউদির খপরটা নিয়ে আসি, কোন দিকে গিয়েছেন, কি করেছেন, ভাল করে জেনে আসি—তারপর জায়গাজমীর একটা কিনারা করে—তোমায় রেখে আসব।

হলসী। হাঁ বাবা! দুঃখী তোকে কি বলে আশীর্বাদ করো, তুই যা ভাল বুঝিস্, তাই কর, কিন্তু আমি বাবা! আর এমন করে থাকতে পারবো না, নয়ত বল, আমি আফিম খেয়ে, না হয় বিষ খেয়ে মরি—প্রাণের এমন হিচ্পিচানো আর সহি কর্তে পারি না।

দুঃখী। খুড়ীমা! এতদিন কষ্টে কাটালে আর কয়টাদিন দেবী সয় না? আমি এত কষ্ট করে দাদার সন্ধান করলুম—তারপরও তুমি ঐ কথা বলছো?

হলসী। বাবা! এতদিন কেবল তোর আশায় বসেছিলাম—জানি তুই যখন সন্ধান গিয়েছিস্—তখন একটা না একটা উপায় করবেই।

দুঃখী। তা যদি বিশ্বাস হয়—তবে আর অমন কথা বলছো কেন, ভবিষ্যতের একটা কিনারা করে যেতে হবে, আর কিছু টাকাও সংগ্রহ কর্তে হবে—নইলে তুমি অতদূর চলে যেতে পারবে কেন?

হলসী। বাবা! আমি খুব পারবো! সেজ্ঞাত তোর কোন ভাবনা নেই—তবে যদি কিছু টাকা সংগ্রহ কর্তে চাস্, তাহলে ঐ বাহিরের জমীটা ছেড়ে দে!

দুঃখী। বাজী-ঘর-দোর কি বেচতে চাও?

হলসী। না বাবা! স্বস্তরের ভিটেটা বেচে কাজ নেই, ঠাকুরপালা রয়েছে, তাহলে চলবে কেমন করে, এ সকল ঠিক থাক!

যদি সেখানে তুলসীর আমার বোলবালা খুব ভাল দেখি, আর যদি সে এখানে আসতে না চায়, তাহলে সব তোর থাকবে—তুই আমার ছোট ছেলে—এ সমস্ত তুই ভোগ করবি।

দুঃখীরাম বুঝার উদার প্রকৃতি দেখিয়া মনে মনে যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—খুড়ীমার ও দাদার আমাদের প্রতি প্রাণের টান যে যথেষ্ট আছে—তাহা সকলেই জানে, নতুবা নিঃস্বার্থ ভাবে এমন ত্যাগস্বীকার কেউ করিতে পারে কি? খুড়ীমা মনে করেন দাদাকে ছাড়িয়া আমি গ্রামে আসিয়া বাস করিব, কিন্তু দাদা ছাড়া আমি যে তিলান্নি কোথায় থাকতে পারি না, তা তো তিনি জানেন না? দাদাকে না দেখিয়া আমি যে প্রাণহীন দেহ লইয়া মনের ভোষণ কষ্ট মনে চাপিয়া দিশাহারা হইয়া ঘুরে বেড়াছি—বুড়ী তার কিছুই জানে না। অবশ্য তাঁর মত কষ্ট না হলেও, অন্তর্ধামী জানেন—তুলসীদাকে ছেড়ে দুঃখীর প্রাণ কিরূপ কষ্ট ভোগ করছে, হায় দাদা! কাছে কাছে রেখে, পদাশ্রয়ে আশ্রয় দিয়ে, শেষে কি এইরকম করে কাঁদাতে হয় ভাই? প্রাণ ফাঁটা দুঃখে অলক্ষ্যে তুই এক ফাঁটা রক্তাশ্রুপাত করিয়া দুঃখীরাম বলিলেন—খুড়ীমা! আজ আর একবার ধর্মপুরে যাই—রাত্রে আসিয়া ও পাড়ার পোন্ধরদের কাছে বাহিরের জায়গা বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা লইব। তুমি এখন খাওয়া-দাওয়া কর।

এই বলিয়া দুঃখীরাম আহারাদির পর পুনরায় ধর্মপুর গমন করিলেন, রত্নাবলীর কি হইয়াছিল—তিনি কেমন করিয়া গৃহত্যাগ করিলেন, মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছিল কি না; প্রভৃতি সংবাদ লইয়া আসিবেন।

ঐহার তিরস্কার বাক্যেই যে স্বামী গৃহত্যাগী হইয়াছেন—রত্নাবলীর ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস হওয়ায় তিনি কিছুদিন আহার-নিদ্র

ত্যাগ করিয়া কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়া “হা নাথ—হা হৃদয় দেবতা, তুমি চিরদিন আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিতে, আর সেদিনের এই সামান্য দোষটা ক্ষমা না করিয়া একেবারে চরণে ঠেলিলে—“এই বলিয়া কেবল কাঁদিতেন, কখন কি বলিতেন তাহার স্থিরতা ছিল না। লক্ষ্মীদেবী স্বামীর শোকে অধীরা হইলেও কণ্ঠকে চক্ষে চক্ষে রাখিয়াছিলেন—চিকিৎসা করাইয়াছিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই, অবশেষে একদিন কাশী যাইব কাশী যাইব করিয়া তিনি রাত্রে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন; পাড়াগুচ্ছ লোক তাহার সন্ধান করিয়া কোন কিনারা করিতে পারে নাই।

দুঃখীরাম রত্নাবলীর অবস্থা এবং গৃহত্যাগের বিষয় সমস্ত শুনিয়া সেইদিন রাত্রেই রাজাপুরে ফিরিয়া আসিলেন এবং পোন্ধরদের নিকট বাহিরের জমীখানি বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করিলেন। হলসীদেবী তাহাতে সম্পূর্ণ অভিমত জানাইলে ক্রোড়া আর কোনও প্রকার সন্দেহ করিল না। ঐ জমীখানি হলসীদেবীর নিজস্ব সম্পত্তি, আশ্চর্য্যাম পত্নীর নামে যখন উহা কিনিয়াছিলেন—তখন তুলসীদাস ভূমিষ্ট হন নাই।

দুঃখীরাম পরদিন মনিষাদেবীকে সমস্ত বুঝাইয়া দিয়া, বিষয়-সম্পত্তির সমস্ত ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করিয়া, হলসীদেবীর সহিত কাশী যাত্রা করিলেন। হারামনিধি পাইবার জন্ত বৃদ্ধা পথের কষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া বাহির হইলেন বটে কিন্তু এ বয়সে এই সুদীর্ঘ পথ কেমন করিয়া হাঁটিবেন—তাহা ভগবানই জানেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

রামায়ণ রচনা

দৈবের অলঙ্কার হইলে এ জগতে মানুষের অসাধ্য কিছুতেই থাকে না। পদ্ম যখন গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে—মুখ যখন বাচালতা প্রকাশ করিতে পারে—তখন দৈবদেশে ভক্তকবি তুলসীদাস যে তাহার প্রাণের আরাধ্য দেবতা রাম-চরিত্র রচনা করিবেন—তাহার আর বিচিত্র কি? একে তুলসীদাস ঘণ্টাকর্ণ যোগীর টোলে নানাপ্রকার শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া মহাপণ্ডিত হইয়াছেন। তারপর যোগতপস্শ্রায় তাঁর কৃতীত্ব যথেষ্ট জন্মিয়াছে, ভক্তিমার্গে তিনি যখন এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যখন ভক্তিভরে বাধা হইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন—তখন ভক্তবীর তুলসীদাস যে রামায়ণ রচনা করিয়া যশস্বী হইবেন—হিন্দুর ঘরে ঘরে যে এই ভক্তিভাবমার্থা রামচরিত্র পঠিত হইবে—তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

যোগসাধনায় তুলসীদাস সুসিদ্ধ হইয়াছিলেন। প্রাণায়ামে সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি বহুদিনের পথ অতি অলঙ্কণের মধ্যে যাইতে পারিতেন, যোগী ইচ্ছা করিলে প্রাণায়ামের দ্বারা দেহভার লাঘব করিয়া বাতাসে উড়িতে পারিতেন। যোগীর যোগবলের কি তুলনা আছে?

তুলসীদাস ভগবানের আদেশে যোগবলে অযোধ্যায় আগমন করিলেন। প্রভুর লীলা-নিকেতন অযোধ্যানগরীর শোভাসম্পদ—তাহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভক্তকবি তুলসীদাসের প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি কিছুদিন ইহার গগনপবনে দেহ মন

পবিত্র করিয়া, ইহার প্রান্তর প্রাক্কনের পবিত্র ধূলি—ভগবানের পদরজ্জ্ব বিবেচনায় অঙ্গে মাখিয়া—প্রাণে অপার আনন্দ, হৃদয়ে অসীম শক্তির ক্ষুরণ করিয়া রামায়ণ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তুলসীদাস স্বভাব কবি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে তিনি আজীবন মুগ্ধ, কোন কিছু হৃদয়ের দেখিলে তাঁহার প্রাণ পূৰ্ণ হইতেই মুগ্ধ হইয়া তাহা হইতে একটা অভাবনীয় কবীত্ব শক্তির ক্ষুৰ্ণি পাইত।

এই নয়নানন্দকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যমাধা অযোধ্যাধামে আসিয়া ভক্ত কবির প্রাণের দ্বার দশদিকে উন্মুক্ত হইয়া পড়িল। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি রামায়ণ রচনা আরম্ভ করিয়া অতিশয় কৃতীত্বের সহিত তাহার বালকাণ্ড সম্পূর্ণ করিলেন। বহু রাজকুলবর্গ তাঁহার এই উপাদেয় ভক্তিভাব সম্বন্ধিত রামায়ণ পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। বাহ্যার প্রাণে একটুমাত্রও ভক্তিরসের উজ্জেক হইয়াছে, তিনি এই রমণীয় গ্রন্থ অতীব আগ্রহের সহিত পাঠ করিবেন—ইহার প্রত্যেক পদ্যে, প্রত্যেক শ্লোকে, এমন কি প্রত্যেক ছন্দে, ভক্তির অমিয় সুধা ক্ষরণ হইতেছে। শ্রীরামের পরম ভক্ত হইয়া তাঁহাকে হৃদয়পদ্মে বসাইতে না পারিলে, শুধু পাণ্ডিত্যে পুস্তকের মধ্যে এমন ভক্তিমধু ঢালিয়া দিয়া কেহ তাহাকে সাধারণের এত রসনাতৃপ্তিকর করিতে পারে না; তাই ভগবদ্ভক্ত ভাবুকগণের পক্ষে ইহা স্বর্গের সুখা, বাহ্যিকের চরণ-পদ্মের পবিত্র নির্মালা।

এই রামায়ণ পাঠে সকলের প্রীতির উজ্জেক হইল; সকলেই তুলসীদাসকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল কিন্তু তথাকার বৈষ্ণব সম্প্রদায় তাঁহার প্রতি বিরূপ হইল। তুলসীদাস বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে দুই ভাগে বিভক্ত করায় তাহারা তাঁহার প্রতি হাড়ে চটিয়া গেল।

তুলসীদাস রামায়ণ বৈষ্ণব নামে এক বৈষ্ণব সম্প্রদায় গঠন করিলেন।

তাহারা বিজ্ঞ নামে অভিহিত হইল, ব্রাহ্মণের মত সমস্ত ক্রিয়াকলাপে তাহারা অধিকারী হইতে পারিবে, ব্রাহ্মণের মত উপবীত ধারণ করিয়া তাহারা দেবসেবা করিতে পারিবে—ইহারাই তুলসীদাসের সৃষ্ট সম্প্রদায়, অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সে সকল অধিকার কিছুই থাকিবে না, তাহারা উপবীত ধারণ করিতে পারিবেন না, কেবল বৈষ্ণবের চিহ্ন—তুলসীমালা, তিলকসেবা প্রভৃতি করিবে এবং হরিনাম জপ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবে।

এইরূপ সাম্প্রদায়িক মত বিরোধ হওয়ায় অযোধ্যার বৈষ্ণব সম্প্রদায় তুলসীদাসের প্রতি খড়্গ-হস্ত হইল, সকলেই—তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। সাধু ভক্ত বলিয়া এখন কেহ আর তাঁহার খাতির করিল না। ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ না করিলে রামাং বৈষ্ণব হইবার ক্ষমতা কাহার থাকিবে না—ইহাই সাধক তুলসীদাসের মত কিন্তু তথাকার আধড়ার প্রধান পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার মতে মত না দেওয়ায় কলহের সূত্রপাত আরম্ভ হইল।

সাধু ব্যক্তি কাহার সহিত কলহ করিতে স্বীকৃত নহেন। পণ্ডিতী ফলাইয়া কাহার মনোকষ্ট দেওয়াও তাঁহার উদ্দেশ্য নহে; উদ্দেশ্য অধিকারী ও অনধিকারী লইয়া। ব্রাহ্মণ না হইলে কেহ দেবসেবার অধিকারী হইতে পারে না এবং তাহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ কিন্তু যখন শাস্ত্রের এ সকল বিধিনিষেধ তাঁহারা মানিতে চাহেন না, তখন তুলসীদাস আর কি করিবেন—অগত্যা সে স্থান ত্যাগ করত, পুনরায় কাশীধামে আসিয়া তাঁহার শাস্ত্রময় পবিত্র আশ্রমে বসিয়া রামায়ণের অপরাপর কাণ্ড লিখিয়া শেষ করিলেন। এই উপাদেয় গ্রন্থ পাঠ করিয়া কাশী—নরেশ তাঁহাকে পরম ভক্ত জ্ঞানে তাঁহার টোলের মাসিক একটী বৃত্তি দ্বাৰ্য্য করিয়া দিয়াছিলেন। নদীতীরের যে আশ্রমে বসিয়া তুলসীদাস

বাবাজী এই রামায়ণ রচনা করেন—অদ্যাবধি কাশীর সেই স্থান তুলসী-ঘাট নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। অনেক সাধু সন্ন্যাসী প্রত্যহ এই পবিত্র ঘাটে স্নান করিয়া সাধক কবি তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠ করিয়া ধন্ত হন।

রামায়ণ শেষ করিয়া তুলসীদাসের প্রাণ আর জগতের কোন বন্ধনে বাঁধা থাকিতে চাহিল না। প্রাণ ভক্তিভাবে বিভোর, মন প্রেম পুলকে মাতোয়ারা—এ অবস্থায় তাঁহার কি আর কোন বন্ধন সাজে, না কোন বন্ধনে তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পার? তুলসীদাস সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন—ভবঘুরের জায় নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি জোর করিয়া কাহাকেও সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে বলিতেন না; প্রত্যহ ছাত্রদের শিক্ষাদান করিতেন এবং বলিয়া দিতেন—বাবা! সংসার আশ্রম সকলের শ্রেষ্ঠ, ইহার কাজকর্ম বড়ই দায়ীত্ব পূর্ণ; বুঝিয়া এই সংসার করিতে পারিলে—ইহাতেই সকল শান্তিলাভ করিতে পারা যায়। সন্ন্যাস আশ্রম জোর করিয়া গ্রহণ করা যায় না, যথার্থ ত্যাগী না হইলে—প্রাণে ত্যাগের বন্ধি না জলিলে কেবল বাহিরের সাজ সজ্জায় সন্ন্যাসী হওয়া না হওয়া সমান কথা, বাহারা কেবল বাহিরের দৃশ্য দেখাইবার জন্ত সন্ন্যাসী সাজে—তাহারা ভণ্ড; লোকমুগ্ধ করিয়া কিছু আদায় করিবার ভাণ দেখান ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যথার্থ ত্যাগীর পক্ষে সংসার ও অরণ্য সমান, সংসার ত্যাগ না করিলেও তাহার কিছু যায় আসে না। সে যেখানেই থাকুক নির্লিপ্ত ভাবে থাকিয়া ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকিবে। তুলসীদাস সকল সজ্জায় ছাত্রদিগকে নিজের মত শিক্ষা দিতেন; চতুষ্পাঠীর যে সকল বৃত্তি আদায় হইত—তাহা প্রধান ছাত্রের অধিকারেই থাকিত, তিনি

অবস্থা বুঝিয়া তাহার ব্যবস্থা করিতেন—তুলসীদাস তাহার স্পর্শও করিতেন না। এইজন্য তুলসীদাসের আশ্রমে ছাত্রবর্গের কোন কষ্টও হইত না—আর পাঠাভ্যাস যাহা হইত—তাহা আর কোন টোলে হইত কি না সন্দেহ; তাহার কারণ তুলসীর শিক্ষাদান ত কেবল পুণ্ডিত নহে—কেবল পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া ছাত্রের শিক্ষাদান ত তিনি করিতেন না। বেদ-বেদান্তের যাহা কিছু বলিতেন—সমস্তই যে তাঁহার প্রাণের, তাঁহার প্রাণের ভিতর হইতে যাহা বাহির হইত, মনভূত প্রাণময় শ্রীরামচন্দ্রের চরণতলে বসিয়া যাহা শিক্ষা করিত—তুলসী দাস তাহাই প্রাণের আবেগে পুত্রেরমত যত্নে ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতেন। সাধারণ অধ্যাপকের এ ক্ষমতা কোথায় যে তাঁহারা এমন উপায়ে মনো-মুগ্ধকর বিষয় সকল শিক্ষা দান করিয়া ছাত্রগণের চিত্তব্রজন করিবেন, কেবল পুণ্ডিত বিদ্যায় কি প্রাণের সন্তোষ সাধন করিতে পারা যায়, না লোকমুগ্ধ করিবার ক্ষমতা তাহাতে আসে? প্রাণের ধনকে না পাইয়া শাস্ত্রের নিগূঢ়ভাব না বুঝিয়া যে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে, তাহা তাঁহার পাণ্ডিত্যেরই পরিচয়; যথার্থ অধ্যাত্ম শক্তির পরিচয় তাহা নহে।

সামান্য দিনের মধ্যে তুলসীদাসের নাম কাশীর আবাল বৃদ্ধ বণিতার কণ্ঠস্থ হইয়া গেল; সকলেই এই সাধু পুরুষের নাম করিয়া ধন্য হইতেন, প্রাতঃকালে এ পবিত্র নাম উচ্চারণ করিলে দিন ভাল বাইবে বলিয়া মনে করিতেন।

তুলসীদাসের চতুষ্পাঠীর নামও এখন দেশবিদিত। কাহার কোন কিছু শিক্ষা করিবার আবশ্যক হইলে সকলেই অগ্রে তুলসীদাস বাবাজীর টোলে আসিত; এই সাধু মহাপুরুষের চরণ স্পর্শ করিয়া পবিত্র হইত। এখানে কোন প্রকার ব্যবসাদারী ছিল না, অর্থের লোভে একটা বা তা বিধান দেওয়া হইত না। যাহা ঠিক শাস্ত্রসঙ্গত এবং দেশ কাল

পাত্রভেদে বাহা সমীচীন, বাবাজী সেইরূপ বিধানই দিতেন। এইজন্য তাঁর নাম অন্যান্য টোলধারী অপেক্ষা অতি সম্মান বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছিল। তুলসীদাসের অভ্যাসে অনেক বৃত্তিভোগী টুলোপণ্ডিতের ক্ষতি হইয়াছিল বটে; কিন্তু বাহারা গুণের পক্ষপাতী, তাহারা ইহাতে সম্বন্ধ বাতীত অসম্বন্ধ হইত না। তবে বিশ্বস্তর আর্থবাগীশ নামক একজন পণ্ডিত তুলসীদাসের অভ্যাসে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া নানা প্রকারে তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিতে লাগিল। তুলসীদাসের নামে অর্থনা নানা প্রকার কুংসা রটনা করিয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু শ্রীভগবান যাহার প্রাণের মধ্যে রহিয়াছেন, সম্পদে বিপদে সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন, লোকের সাধ্য কি যে তাঁহার অনিষ্ট করে!

কাশীতে এক সময় ঘটাকর্ণ যোগীর ব্যবস্থা অতীব ~~শ্রদ্ধা~~ ছিল, তিনি বাহা ব্যবস্থা দিতেন—তাহা অকাটা এবং সাধারণ লোক তাহা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিত। এই ঘটাকর্ণই তুলসীদাসের শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু, তিনি প্রথমে ইহার আশ্রয়ে থাকিয়াই শিক্ষা ও সাধনা বিষয়ে এত উন্নতি করিয়াছেন। এখন তিনি বৃদ্ধ হইয়া অগতের কার্য হইতে একপ্রকার অবসর গ্রহণ করত নিজের পরকাল চিন্তায় কাল কাটাইতেছেন। ইনি ~~উচ্চ~~ পণ্ডিত নহেন ভগবন্তুক্তি সম্পন্ন তপস্বী, তাই তাঁহার ব্যবস্থার—তাঁহার বাক্যের একদিন সমাজে খুব কদর ছিল। ইনি কার্যে অবসর গ্রহণ করিলে কাশীতে বিশ্বস্তরের প্রসার প্রতিপত্তি খুব বাড়িয়া ছিল; কাশীতে তাঁহার মত স্থিতি শাস্ত্রের পণ্ডিত আর কেহ ছিল না, শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাদি প্রদানে তাঁহার শক্তি অসীম; তবে ব্রাহ্মণ বড় লোভী, অর্থের ~~প্রতি~~ বড়ই আসক্ত; এই জন্য মহা পণ্ডিত হইলেও ~~অসম্মান~~ শূন্য; ভিতরে ধর্মের লেশমাত্র ছিল না; এক প্রকার নাস্তিক বলিলে ও হয় এবং অত্যন্ত দাস্তিক

প্রকৃতি ; নিজে বড় পণ্ডিত বলিয়া অহঙ্কারে ফুলিয়া মরিতেন। যখন পণ্ডিত আর কেহ নাই, তখন লোকে অনন্যোপার হইয়া তাহারই ব্যবস্থা শিরোধার্য করিত। এইরূপে প্রণামী ও তৈলবট ইত্যাদিতে তাঁহার অর্থেরও কোন অপ্রতুলতা রহিল না। কিন্তু আত্মভিমানী অহংবাদী লোকের প্রতিপত্তি সমাজে কতদিন থাকে ? দর্পহারী মধুসূদন কাহার দর্প রাখেন না ; অহংকারীর হৃদয় পাষণ্ডবৎ কঠিন বলিয়া ভগবানের কোমল চরণ ছায়া তাহাতে পতিত হয় না। কর্ম্মফলে কিছুদিন তাহার প্রভাপ অক্ষুন্ন থাকিলেও চিরস্থায়ী হইতে পারে না।

ঠিক এই সময়ে, বিশ্বস্তরের উন্নতির ঘোলকলা পূর্ণ হইবার কিছুদিন পরে কাশীর অসিন্দীর তীরে সাধকপ্রবর তুলসীদাসের অভ্যুত্থান হইল। ভগবান আচরিতে অতি সামান্য দিনের মধ্যে নিজ ভক্তকে লোক-লোচনের গোচর করিয়া বিশ্বস্তরের দম্ভ অহংকার চূর্ণ করিয়া দিলেন। এক সময়ে ঘণ্টাকর্ণ যে প্রতিপত্তি, যে ক্ষমতা লইয়া কাশী-ক্ষেত্র সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন, ভক্তদ্বয় তুলসীদাস তাঁহারই মত অথবা তাহা অপেক্ষাও বেশী সাধন ক্ষমতা লইয়া সাধারণে প্রকাশমান হইয়া পড়িলেন। ককণাময় রামচন্দ্রের ককণাবলে তুলসীদাস কাশীর অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং সাধকাগ্রগণ্য বলিয়া সকলের নিকট পুজিত হইতে লাগিলেন। কাজেই বিশ্বস্তরের অবাধ শক্তির গতি নিরুদ্ধ হইয়া পড়িল, তিনি আর সমাজে তত আদরণীয় হইতে পারিলেন না। ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রতিপত্তি কমিতে লাগিল। তিনি অর্থের লোভে সকলকে বৈরাগ্য কঠিন ব্যবস্থা দিতেন ; তুলসীদাসের নিকট যাইলে, তিনি দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া তাহার বিপরীত ব্যবস্থা প্রদান করিয়া—সকলের চিন্তাকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তুলসীদাসের শিক্ষার নিকট বিশ্বস্তরের শিক্ষা অনেক নীচে পড়িয়া গেল।

যাহারা তুলসীদাসকে বেশী চিনিত না—অথবা যাহারা পুরুষাণুক্রমে বিশ্বস্তরের ব্যবস্থামুসারে কাজ করিয়া আসিতেছে—তাহারই প্রথম প্রথম তাঁহার নিকট বাইত কিস্ত মনোগত না হইলে আবার তুলসীদাসের পরামর্শ লইয়া কার্য্যও করিত। ইহাতে পণ্ডিতজীর পসার ত কমিতে লাগিলই—অর্থাগমনের পথে ত কাঁটা পড়িলই—মানেরও যথেষ্ট লাঘব হইয়া পড়িল দেখিয়া তিনি তুলসীদাসের প্রতি খজ্ঞাহস্ত হইলেন। কিসে তাঁহাকে নষ্ট করিবেন, কাশী হইতে তাড়াইবেন—এমন কি কিসে তাঁহাকে প্রাণে মারিয়া নিকটক হইবেন—ভিতরে ভিতরে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

ভবানী মিশ্র

পাণের দংশন বড় ভয়ানক—মাগুষ তাহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না। বাহিরে তাহার কোন চিহ্ন দেখিতে না পাইলেও ভিতরে যে আগুন জলিয়া উঠে, তাহার তাপ, তাহার দহন, যন্ত্রণা কিছুতেই সহ্য করা যায় না।

ভবানী মিশ্র নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কুমার প্রত্যহ শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের পর কিছুক্ষণ ব্যায়াম চর্চ্চা করিত। তখন শরীর সবল ও সুস্থ করিবার জন্ত আমাদের দেশে কুস্তি ও বইটকী প্রভৃতি ব্যায়াম চর্চ্চার খুবই আদর ছিল। বিশেষতঃ হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে ইহা জীবনের একটা প্রধান আবশ্যকীয় কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত।

ভবানী মিশ্র তখন যুবক—কুস্তিবাজ বলিয়া তাহার খুব খ্যাতি

ছিল; উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তাহার মত কুস্তিবাজ কেহ ছিল না বলিলেই হয়। একদিন সে প্রাতঃকালে অপর একজন সমকক্ষ কুস্তিবাজের সহিত কুস্তি করিয়া জয়লাভ করিবার জন্য আসরে অবতীর্ণ হইল। নানাস্থান হইতে বহু দর্শক আসিয়া আজ সেইস্থানে কুস্তি দেখিবার জন্য সমবেত হইয়াছে। ভবানী মিশ্র আজ খাবন কুর্দনে নৃত্য করিতেছে; গায়ে মাটি মাখিতেছে, বাহুবান্ধাফাটন করিতেছে। অপর খেলুয়াড়ীও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেও আপনাকে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া তাহার সহিত মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। প্রথমে হাতে হাতে, তারপর পায়ে পায়ে, তারপর দুই জনে বল পরীক্ষা করিতে লাগিল। ভবানী একবার তাহাকে ভূমে পাতিত করিয়া বক্ষের উপর উপবেশন করে; আবার অপর খেলুয়াড়ী তাহাকে ফেলিয়া দিয়া, বুকের উপর উপবেশন করত ভবানীকে বিষম কায়দা করিয়া ধরে, ভবানী আর কিছুতেই তাহাকে ফেলিতে পারে না, দেখিয়া দর্শকবৃন্দ মুহমুহ করতালি দিতে লাগিল। বিষম লজ্জায় ভবানী দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া এইবার নৃতনু খেলুয়াড়ীকে এমন জোরে জাপটাইয়া ধরিল এবং বিষমবেগে ভূমে পাতিত করিল যে তাহাতে সে একটা বৃহৎ শীলার ধাক্কা লাগিয়া একেবারে অচৈতন্য হইয়া পড়িল। কোন প্রকারেই তাহার আর কোনও চৈতন্য হইল না, দেখিয়া দর্শকবৃন্দ ভয়ে পলায়ন করিল। ভবানী তখন নিজের ধৃষ্টতা বুঝিতে পারিয়া তাহার সেবা-শুশ্রূষায় রত হইল কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না—সে চিরদিনের জন্য ভবের খেলা সাজ করিয়া ইহখাম ত্যাগ করিল।

সামান্য খেলায় জয়লাভ করিবার জন্য একজনের প্রাণ বিনষ্ট করিয়া ভবানীর হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইল। ব্রহ্ম-হত্যা মহাপাপে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল—হায়! কি

করিলাম, সামান্য কুস্তি খেলা খেলিতে গিয়া বিষম খেলার বণবর্তী হইয়া—একজনের প্রাণসংহার করিলাম, খেলায় প্রতীক্‌ লাভ করিবার জন্য ব্রহ্মহত্যা করিলাম! যুবক ভবানীর হৃদয়ে অহুতাপানল প্রকলিত হইয়া অন্তর কন্দর দগ্ধ করিতে লাগিল। এ পাপের দংশন সে সহ্য করিতে না পারিয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করিল কেবল চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল—কিসে এ দারুণ জ্বালার অবসান হয়। এমন যে নগর দেহ, পরিপাটী শরীর কাস্তি ক্রমশঃ শুকাইয়া মলিন হইয়া যাইতে লাগিল। আহারে রুচি কমিয়া গেল, দারুণ চিন্তায় সে ক্ষণেকের জন্যও চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারিল না, চক্ষু মুদ্রিত করিলেই ব্রাহ্মণের সেই ভয়ানক মূর্ত্তি যেন তাহার হৃদয় মধ্যে উদিত হইয়া ভীষণ ভীতি প্রদান করিতে থাকে। মৃতের সেই নিষ্কলঙ্ক মূর্ত্তি ভীষণ আকৃতি ধারণ করিয়া তাহার অন্তরে বাহিরে যেন নাচিয়া নাচিয়া প্রতিহিংসার জগ্গ অনল-চক্ষু বাহির করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ভবানীর ভয়শূন্য হিয়া সেই প্রেতমূর্ত্তির তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়া অস্থির হইয়া পড়িল। কি করিলে ইহার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, কে বলিয়া দিবে—এই ব্রহ্মহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি! • হায়! কেন আমি এমন বিষম কুস্তি খেলা শিখিয়াছিলাম, কেনই বা সেদিন এমন বিষমভাবে খেলার অবতারণা করিয়া দর্শকবৃন্দের নিকট বাহাদুরী লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া ছিলাম! এক্ষণে এ ব্রহ্মহত্যা পাপের কি কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই? উঃ এ যে বিষম যন্ত্রণা, পাশানলে যে সমস্ত শরীর ঝলসিয়া যাইতেছে; ইহা অপেক্ষা মৃত্যু যে সহস্রগুণে শ্রেয়! বাহিরে কিছুই নাই বটে কিন্তু ভিতর যে পুড়িয়া থাক হইল—আর যে সহ্য করিতে পারি না!

পাপের ভার অসহ্য হইলে—প্রবলবেগে অহুতাপের অগ্নি জলিয়া উঠিলে ভবানী একদিন কাশীর প্রধান ব্যবস্থাপক বিশ্বস্তর স্মার্ত-বাগিশের নিকট উপস্থিত হইয়া মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভবানী বহুদিন বিশ্বস্তরের চতুষ্পাঠীতে পড়িয়াছিল,—বিশ্বস্তর এই কুস্তিবাজ যুবককে বেশ চিনিতেন।

ভবানী যখন উপস্থিত হইল—বিশ্বস্তর তখন ছাত্রগণের সহিত যুতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেছিলেন। একজন ছাত্র বলিল—গুরুদেব! আপনি যে ব্রহ্মসূত্রের পরিভাষার মীমাংসা করে দিয়াছিলেন তুলসীদাস বাবাজীর একজন ছাত্র তাহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করে, আমার মনে সংশয়োৎপাদন করে দিয়াছিল। গত রজনীতে আমি তাহা পুনঃ পুনঃ পর্যালোচনা করেও প্রাধান্য কৰ্ত্তে পারি নাই, এখন বেশ বুঝতে পেরেছি, তবে কি তুলসীদাস বাবাজীর ছাত্র তুল ব্যাখ্যা করেছিল?

মহা দাস্তিক প্রকৃতি বিশ্বস্তর অতি ঘৃণা ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন—তুলসীদাস আবার লেখা পড়া শিখলে কবে—তার গুরুই পূর্বে আমার কাছে কত বিষয়ের মীমাংসা করে নিয়ে যেতো, এখন সে বুদ্ধ হয়ে টোল ছেড়ে দিয়েছে তাই; তুলসী ত ঘণ্টাকর্ণ যোগীর ছাত্র; তার গুরুই বদ্ধ পণ্ডিত, তা আবার সে! অহংজ্ঞানী দাস্তিক বিশ্বস্তর জানিত না যে ঘণ্টাকর্ণ যোগীর সহিত তাহার আকাশ পাতাল প্রভেদ। ঘণ্টাকর্ণ শুধু পণ্ডিত নহেন—যোগী, যোগশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ দখল আছে, সেই জন্ত পুঁথিগত বিত্তাকে তিনি বিত্তা বলেই ধরেন না। তিনি দেখিয়া শুনিয়া শিক্ষায় ভগবদ্বিষয়ের কোন তত্ত্ব নিরূপিত হয় না বলিয়া—তিনি যোগমার্গ আলম্বন করত জগদগুরু বিশ্বনাথের নিকট শিক্ষার লাভ করিবার জন্ত একেবারে টোল ছাড়িয়া দিয়াছেন। ঘণ্টাকর্ণ এখন কাশী-

বাসী সকলের প্রণাম্য, সকলে তাহাকে যোগী বলিয়া মান্য করেন, আর তুলসীদাস এই গুরু শিষ্য ; এবং ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের রূপ লাভ করিয়া বাকসিদ্ধ যোগী হইয়াছেন। বলিয়া ব্যবস্থার জন্য সকলেই তাহার দারস্থ হয়। বিশ্বস্তর অহংকারের বশবত্তী হইয়া ইহাদিগকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন—দামান্য পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া ঋষিকল্প এই সকল মহাঋগ্ণের অপমান করেন বলিয়া সকলে তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করিতেছেন।

মহাত্মা তুলসীদাসের আবির্ভাব হইয়া কাশীতে তাঁহার প্রতিপত্তি কমিতেছে—ইহাই তাঁহার গাত্রদাহের প্রধান কারণ। এই জন্ত তিনি তাহাদের স্থখ্যাতি শুনিলে জলিয়া উঠেন এবং নানাপ্রকার কুকথায় তাহাদের অপমান করিয়া আপনার প্রভুত্ব স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন।

ভবানী মিশ্র অনেকক্ষণ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বিশ্বস্তর তুলসীদাসের নামে অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া তাঁহাকে অপদস্থ করত চাত্তের নিকট আত্মপ্রতিষ্ঠায় মত্ত হইয়াছিলেন। এইবার একজন ছাত্র ভবানীকে দেখাইয়া দিয়া বলিল—গুরুদেব! ভবানী আপনার নিকট আসিয়াছে, সে কি দোষ করিয়া ব্যবস্থা লইতে আসিয়াছে—একবার দেখুন।

বিশ্বস্তর ভবানীর প্রতি চাহিয়া বলিল—কি হে 'বাপু! কি করেছ; কিসের ব্যবস্থা চাই? কিছু তৈল বট আনিয়াছ কি? একজন ছাত্র বলিল—প্রভু! ওর অপরাধ বড় গুরুতর; আপনি ব্যবস্থা না দিলে উহার আর কোন উপায় নাই; ও মনের দুঃখে আজ প্রায় দশ দিন হইল বাড়ী যায় নাই; কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বিশ্বস্তর বলিলেন—কেন, কাশীতেত আরও অনেক টোল আছে, তাহাদের কাছে যাইতে পারে নাই; বাবা! বড় বড় ব্যবস্থা এই বিশ্বস্তর না হলে আর কার সাধ্য যে প্রদান করে—আর জানেই বা

কে, এত শাস্ত্র ঘাঁটাই বা কার আছে? এ সকল কাজেত ভুঁইকোঁড় হলে চলবে না—এ বিষয়ে যে রীতিমত বিদ্যের দরকার। বিশ্বস্তর অহঙ্কারে মঠ মঠ করিতে করিতে ভবানীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—
কিহে বাপু! কি হয়েছে, একবার দোষটাই বলনা, আমি হাতগুণে কি তোমার দোষ ধরোঁ!

ভবানী চক্ষের জলে বুক ভাসাইতে ভাসাইতে কেবল পদনখে মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিল, ব্রহ্মবধের কথা মুখ দিয়া বলিতে তাহার যেন বুক ফাঁটিয়া যাইতে লাগিল। ভবানীর অবস্থা দেখিয়া একজন ছাত্র, যে সেদিন দর্শকরূপে তথায় উপস্থিত ছিল, সে বলিল—গুরুদেব! ও দিনকতক আমাদের টোলে পড়েছিল। এখন একজন বড় কুস্তিবাজ পালোয়ান হয়েছে—সেদিন অপর একজনের সঙ্গে কুস্তি কর্তে কর্তে তাহাকে এমন জোরে একটা পাথরের উপর ফেলিয়া দিল যে তাহাতেই তাহার পঞ্চদ্ব প্রাপ্ত হয়েছে, এখন তারই ব্যবস্থা জানুতে এসেছে—ওকে কি কর্তে হবে?

বিশ্বস্তর। যাকে মেরেছে সে কি জাতি?

ছাত্র। সেও একজন ব্রাহ্মণ যুবক।

বিশ্বস্তর। ওঃ কি পাবণ্ড, খেলার ছলে ব্রহ্মহত্যা, ওর আর ব্যবস্থা কি? তুহানল না হয় জাহ্নবী জীবনে জীবন বিসর্জন—তা ছাড়া আর কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই—ব্রহ্মহত্যাকারীর মুখদর্শন শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, ও ইতিভাগা মহাপাপীকে এস্থান ত্যাগ করিতে বল, কেহ উহার মুখদর্শন করো না।

ভবানীও একে প্রাণের জ্বালায় অস্থির হইয়াছিল—তার উপর পণ্ডিতের ঘৃণা ব্যঞ্জক বাক্য শুনিয়া এবং বিষম ব্যবস্থার বিষয় অবগত হইয়া একেবারে মরমে মরিয়া গেল।

এই টোলের ছাত্রবর্গ একদিন ভাহার সহপাঠী বন্ধু ছিল কিন্তু গুরু মুখে ঐ পাপীর মুখবর্শন করিতে নাই শুনিয়া অতি ঘৃণার সহিত তাহাকে সেস্থান ত্যাগ করিতে বলিল। ভবানী মর্শ্মজ্বালায় অস্থির হইয়া চারিদিকে দৌড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। বে শুনিল—সেই ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া তাহার প্রতি মুখ বাঁকাইয়া ফিরিয়া যাইতে লাগিল। ভবানী সাধারণের নিকট এত ঘৃণাই হইল যে, শৃগাল কুকুরের আশ্রয় আছে তথাপি লোকালয়ে তাহাকে কেহ আশ্রয় দিল না। সকলেই দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতে লাগিল। সে প্রাণের জ্বালায় অস্থির হইয়া জীবন ভারবহ মনে করিল এবং একদিন জীবন পরিত্যাগের জন্য পতিত-পাবনী জাহ্নবীকূলে উপস্থিত হইয়া স্মার্ত্তা বাগীশের ব্যবস্থামত গঙ্গা সলিলে জীবন বিসর্জন দিয়া কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে যত্নবান হইল।

তখন প্রভাত হয় নাই। রজনীর গভীরতা তখন খুব বেশী; ভবানী পাপের দংশনে সমস্ত রাত্রি একটা ছত্রে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিয়াছিল, তারপর অসহ্য বোধে রজনী প্রভাত হইতে না হইতেই জীবলীলা শেষ করিবার জন্ত ঘাটে উপস্থিত হইয়া করবোড়ে বলিল—“মা! সত্তপাতক-সংহন্ত্রী, পতিত-পাবনী! আমি মহাপাতকী, আমার পাপের ইয়ত্তা নাই; খেলার ছলে একজন ব্রাহ্মণের প্রাণ বিনাশ করিয়া সকলের ঘৃণার পাত্র হইয়াছি, মা অজ্ঞাধামিনী। তুমি আমার অন্তরের ভার জান, আমি ইচ্ছা করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলি নাই, হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া ও সেকাজ করি নাই। অসাবধানতাবশতঃ সে একটা শীলার আঘাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। মা! আমিই তার মৃত্যুর কারণ নই! তবে বন্ধুর মৃত্যুতে আমি বড়ই মর্মান্বিত হইয়া পণ্ডিতের নিকট ব্যবস্থা লইয়াছি—তোমার কোড়ে স্থান গ্রহণ করা ভিন্ন

আমার আর অন্য প্রার্থনিত নেই। মা পতিত পাবনী! পাপী বলে সকলেই আমাকে ঠেলিয়া ঝেলিতেছে কিন্তু মা! তুমি ত পাপী নিস্তারিণী, কলুষ নাশিনী, অধম তারিণী—তোমা ভিন্ন অধমের আর গতি কোথায় মা! মহাপাপ কলুষিত জীবের তুমিই একমাত্র গতি-মুক্তি; তোমার এই পবিত্রনীরে জীবন বিসর্জন করিলে যত বড় পাপীই হউক না কেন, সে নাকি অনায়াসে পাপ হইতে মুক্ত হয়—তাই মা! বড় আশা করিয়া তোমার কূলে আসিয়াছি, মা! পাপের ভীষণ যাতনা আর সহ হয় না—পুড়ে মলাম মা! পতিত পুত্রকে শাস্তি দে মা শাস্তি বিধায়িনী, আর সহ হয় না” বলিয়া যেমন জলে বাষ্প প্রদান করিবে, নির্জনে প্রাণ বিসর্জন দিবার এই উপযুক্ত সময়, কেহ দেখিতে পাইবে না, কেহ নিষেধ করিবে না বলিয়া ভবানী যেমন জলে পড়িবে—অগনি পশ্চাৎ দিক হইতে “কি কর, কি কর, দেখিতেছি তুমি, ব্রাহ্মণ আত্মহত্যা মহাপাপ; সকল পাপের মোচন আছে; আত্মহত্যাকারীর মোচন নাই—সে নিরবচ্ছিন্ন অনন্ত নরক ভোগ করে, অতএব প্রতিনিবৃত্ত হও, ব্রাহ্মণ; আত্মনাশ আশা ত্যাগ কর।” বলিয়া কে সেই গভীর রজনীর নির্জন বামে আসিয়া তাহার প্রার্থনিতে বাধা প্রদান করিল।

ভবানী পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল—এক অপূর্ব যোগক্ষেম মূর্তি; সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ একজন যোগীপুরুষ তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাহার মরণে বাধা প্রদান করিতেছে। সে অপূর্ব যোগজ্যোতিঃ বিশিষ্ট মহাপুরুষকে দেখিয়, ভবানী কঁাদিতে কঁাদিতে তাঁহার চরণে পড়িয়া বলিল—কে প্রভু আপনি! আমাকে স্পর্শ করিবেন না—আমি যে মানুষ হইয়া আজ একপক্ষ হইল কুকুরেরও অধম হইয়াছি, ব্রহ্মঘাতী বলিয়া কেহ আমাকে স্পর্শ করা দূরে থাকুক—আমার প্রতি

কেহ ফিরিয়া দেখিতেও পাপানুভব করিতেছে। কে আপনি প্রভু! না জানিয়া এই মহাপাতকীকে স্পর্শ করিলেন?

আগন্তক। মহাশয়! আমি বিশ্বেশ্বরের বিশাল বিশ্বরাজ্যে একটা অতি নগণ্য জীব, লোকে আমাকে দয়া করিয়া তুলসীদাস বলে।

ভবানী। ওহো মহাত্মা তুলসীদাস সাধকজীবন রামময় প্রাণ তুলসীদাস! কাশীধামের প্রধান বৈদান্তিক সাধক প্রবর তুলসীদাস! দেব, এই ঘোর নিশিথ সময়ে কোথা হতে এসে আমার ন্যায় মহাপাতকীকে স্পর্শ করে—অপবিত্র হলেন, আমার প্রায়শ্চিত্তে বাধা দিলেন।

তুলসী। কিজ্ঞ তুমি আপনাকে মহাপাতকী বলে অভিহিত কর্ছো এবং তোমার এ আত্মনাশের কারণ কি ব্রাহ্মণ!

ভবানী। পণ্ডিতজী! আমার পাপের ইয়ত্তা নাই; আমি ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত, তাই আজ অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া এ পাপজীবন পরিত্যাগ করবার জ্ঞান এখানে এসেছি।

তুলসী। কিরূপ ব্রহ্মহত্যা করেছে। এবং এ প্রায়শ্চিত্তের বিধানই বা তোমায় দিলে কে?

ভবানী। প্রভু আমি ব্রাহ্মণকূলে জন্মগ্রহণ করিয়া কর্মদোষে আজ পতিত! আমি কুস্তিবাজ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলাম। আজ কয়েকদিন হইল—কুস্তি খেলায় একজন সহযোগীকে আহ্বান করিয়াছিলাম, অসাবধানতা বশতঃ জাপ্টাজাপ্টা করিয়া উভয়ে একটা বৃহৎ শীলাতলে পড়িয়া যাই। তাহাতে সে মস্তকেষে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হয়। খেলায় জয়লাভ করিবার জন্য মত্ত হইয়াছিলাম—সে যে মরিয়া যাইবে—তাহা আমার জ্ঞান ছিল না বা ইচ্ছা করিয়া তাহার মৃত্যু তুষ্টাই

নাই। ইহার জন্ত আমিও হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইয়া আজ প্রায় এক পক্ষ হইল—কেবল অমৃততাপের কান্না কাদিয়া কাদিয়া বেড়াইতেছি—কোন প্রকারে শান্তিলাভ করিতে না পারিয়া আজ প্রাতঃকালে কাশীর প্রধান স্মার্ত্ত্য বিখ্যাত ঠাকুরের নিকট গিয়াছিলাম—তিনি ব্যবস্থা দিয়াছেন—হয় তুহানল, না হয় জাহুবী জীবনে জীবন বিসর্জন। তাই আজ নির্জনে সেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে আসিয়াছি; মাহাত্মন! কেন আমাকে এই যন্ত্রণাময় জীবন ত্যাগে বাধ্য দিলেন?

তুলসী। ব্রাহ্মণ! ব্রহ্মহত্যা পাপের ইহাই প্রায়শ্চিত্ত বটে; তবে ষে রূপ বলিলেন তাহাতে তোমায় সে পাপ ও স্পর্শ করে নাই, তবে একটা ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপের ক্ষর করিতে গিয়া আর একটা ব্রহ্মহত্যা করা সাধুজনায় মোদিত নহে। ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়াছ মনে করিয়া তোমার হৃদয়ে যে ঘোর অমৃততাপাগ্নি জ্বলিত হইয়াছে। যখন তোমার অমৃততাপ আসিয়াছে এবং খেলার ছলে যখন একাধাও তোমার অনিচ্ছায় সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, তাহাকে মারিয়া ফেলিবার ইচ্ছা যখন তোমার প্রাণে ছিল না—তখন অমৃত ব্যবস্থা করলেও তোমার পাপের প্রতিবিধান হতে পারে।

ভবানী! বলেন কি প্রভু। প্রাণত্যাগ ছাড়া এ মহাপাপীর কি অমৃত ব্যবস্থা আছে?

তুলসী। ব্রাহ্মণ। বেশী উৎসাহিত হইও না; তবে প্রাণত্যাগ কর্তে হবে না—আমার ব্যবস্থামত কার্য্য কর, তাহা হইলে তোমার উদ্ধার হবে।

ভবানী। আঃ বলেন কি যোগীবর! তবে দেখছি আপনি আমার সাক্ষাৎ ঈশ্বর, আমাকে ব্রহ্মহত্যা পাপে মুক্ত করবার জন্য এসেছেন—বলুন বলুন প্রভু। আপনার পায়ে ধরি—আমাকে এখন

কি কর্ত্তে হবে? কি কার্য্য অহুষ্ঠান কল্পে আমি এই ভীষণ পাপের দংশন জালায় মুক্তি পাব? এই বলিয়া ভবানী সাধক প্রবর তুলসীদাসের চরণ ধারণ করিল! তুলসীদাস বলিলেন—আহা! কর কি তুমি ব্রাহ্মণ চরণ পরিত্যাগ কর, আমি তোমার উপায় বলিয়া দিতেছি।

ভবানী। সাধক প্রবর! আমি আর এখন ব্রাহ্মণ নই; আমি ব্রহ্মহত্যা পাপে চণ্ডালেরও অধম হইয়াছি; আপনার পদ ধারণ করে—আমার দেহ পবিত্র হলো—বলুন প্রভো! আমার উপায় কি?

তুলসী। বিপ্র! উৎকণ্ঠিতচিত্ত হি়র কর, মনে একাগ্রতা আনয়ন কর, অবশ্য তোমার নিষ্কৃতি লাভ হবে।

ভবানী। সাধকোত্তম। আপনার ব্যবস্থামত কার্য্য কল্পে আমাকে সমাজে গ্রহণ কর্কে ত?

তুলসী নিম্পাপ হলে সমাজে কেন গ্রহণ কর্কে না, অবশ্যই কর্কে?

ভবানী। বলেন কি প্রভো! এমন ব্যবস্থা থাক্তে সকলে আমাকে জোর করে মেরে ফেল্ছিল? এক্ষণে কি কর্ত্তে হবে দয়া করে বলুন।

তুলসী। ব্রাহ্মণ। যে নাম পঞ্চানন পঞ্চমুখে গান করেন; যে নামের গুণে সাগরে শীলা ভাসে, চোর রক্তাকর যে নাম জপ করিয়া, মূনি শ্রেষ্ঠ বাগ্নিকৌ হইয়া সমস্ত পাপ বিমুক্ত হইয়াছেন, সেই মহামন্ত্র “রামনাম” এই পবিত্র গঙ্গাতীরে বসিয়া একাগ্রমনে একপক্ষ জপ কর, তাহা হইলেই তুমি সকল পাপ বিমুক্ত হয়ে নিম্পাপ দেহ ধারণ করিবে। স্থাশিস্ত এই পবিত্র নাম রসনায় উচ্চারণ করিবামাত্র জীবন ধন্ত হয়, জীব সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া অন্তিমে অক্ষয় স্বর্গে গমন করে; এই রামনাম মহামন্ত্রই তোমার সন্দেহান্দলিত ব্রহ্মহত্যা পাপ বিনিষ্ট করিবার মহৌষধ; ইহাতেই তুমি সকল বন্ধনা হইতে পরিজ্ঞাপ পাবে, তবে আর কোন ভাবনা থাক্বে না।

ভবানী। মরি মরি, পাপ বিনাশের এমন পবিত্র নাম—রাম নাম; ঠাকুর। এই নাম জপ করে যে আমি সকল পাপ হতে বিমুক্ত হব; তা জানবো কেমন করে?

তুলসী। জ্ঞান। তার জন্ম আর তোমাকে বেশী চিন্তা কর্তে হবে না। হৃদয়ের জ্বালা নির্বাণ হবে—যে জ্বালায় জ্বল্লে মরছো— তাহার শাস্তি হয়ে প্রাণে এক অপূর্ণ আনন্দ লাভ কর্বে—তোমার মনই তোমাকে বলে দিবে—তুমি নিষ্পাপ; হৃদয়ের প্রত্যেক পরতে পরতে একটা শাস্তির অপূর্ণ রসাতিক্ষেপ হইলে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে যে তোমার সমস্ত পাপ বিধোত হয়ে গেছে, তুমি সন্দেহান্ধলিত ব্রহ্মহত্যা পাপে অব্যাহতি লাভ করেছো।

ভবানী। যে আত্মা প্রভো! তবে আমার কর্ণে সেই মহামন্ত্র প্রদান করুন। আমি ধন্ত হই!

তুলসীদাস ইষ্টদেবের পুতমন্ত্র মহাপাতকী ভবানী মিশ্রের কর্ণে প্রদান করিয়া বলিলেন—বৎস! এই পবিত্র দ্ব্যক্ষর যুক্ত নাম অবিরাম একপক্ষকাল জপ কর—তাহা হইলে ব্রহ্মহত্যা পাপ ত বিমুক্ত হইবেই— পরন্তু জীবনে আর কখন পাপ করিতে প্রবৃত্তি হইবে না, তোমার জীবন গতি ভিন্ন পথে ধাবিত হইবে!

ভবানী। মরি মরি কি মধুর নাম! অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয় পবিত্র হইল, মন আনন্দে অধীর হইয়া পড়িল, গুরুদেব! আপনি ষথার্থ মহাপুরুষ, এই মহাপাপীকে উদ্ধারের জন্ম বারানসী ক্ষেত্র পবিত্র করিয়াছেন। আজ আমি ধন্ত হলাম। এক্ষণে নির্জনে বসে, এই নাম জপমালা করিগে, পক্ষান্তে আবার আপনার আশ্রমে ঐ মুক্তি মুলাধার পাদপদ্ম দর্শন করিব! ভবানী মিশ্র স্থির বিশ্বাসের সহিত নাম জপে মন প্রাণ সমর্পণ করিল।

বাস্তবিক ভবানী ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মবধ করে নাই ; ইহাতে তাহার কোন দোষ নাই—অতএব এপাশে তাহার তুষানল বা জীবনত্যাগ ব্যবস্থা হইতেই পারে না ; শ্রীভগবান রামচন্দ্রের রূপায় নিশ্চয়ই ভবানীর পাপ-ভয়-ভীত-চিত্ত ; ভীতিশূন্য হবে। যাই, সময় বয়ে যাচ্ছে, ভগবান আজ আমাকে ইহার জগুই বুঝি এই দিকে এনেছিলেন—নতুবা আমার এদিকে আসিবার ত কোন আবশ্যকই ছিল না ? দয়াময় ! এ জগত প্রপঞ্চে যাহা হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে—সমস্ত কার্যেরই মূলধার তুমি ; মাহুষ তোমার দাসাম্বদান, তোমার হুকুমের চাকর—উপলক্ষ হয়ে তোমার আদেশ পালন করে মাত্র, তাহাদের কর্তৃত্ব ইহাতে কিছু নাই, যে ভাবে কর্তৃত্ব আছে—সে জানে না, সে অধম হইতেও অধম—সে মহাপাপী ! প্রভু ! ভবানী যুবক ; সে ইচ্ছা করিয়া পাপ করে নাই ; তথাপি তাহার মনে অহুতাপের অগ্নি এমন জলিয়াছে, যে সে অমূল্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত নয় ; ঠাকুর ! তাহাকে নিষ্পাপ কর, তার প্রাণে শান্তিরস্বধা-ধারা ঢালিয়া নির্মল করিয়া দাও। এই বলিয়া তুলসীদাস করবোড়ে শ্রীরামচন্দ্রের রাতুল চরণে ভক্তিগদগদ চিন্তে প্রণাম করিয়া আশ্রমভিমুখে গমন করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

দুঃখীরাম

৩৩ কি কষ্ট! অত বুড়ো মানুষকে এত দূর হাঁটিয়ে কাশী
আনা কি সহজ কথা? বুড়ী কি চলতে পারে, প্রাণের দায়ে বাড়ী
থেকে বেরিয়ে ছিল বটে কিন্তু এক কোশ পথ হাঁটতে না হাঁটতে
একবারে শুয়ে পোড়ল। তাকে কখন কঁাদে, কখন পীঠে করে আর কত-
দূর আনবো? ভাগ্যে ভক্তলোকটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ভাগ্যে তিনি
দয়া করে, বুড়ীকে তাঁর গাড়ীতে তুলে নিলেন—তাই, নতুবা
একদিনেও আমরা কাশীতে পৌঁছিতে পারতাম না। ভক্তলোকটা
খুব দয়াবান বটে, গাড়ী করে ত নিয়ে এসেছেন, তার পর আশ্রয়
দান করে বলেছেন—যত দিন ইচ্ছা হয়, তোমারা আমার এখানে
থাক, কিন্তু তাকি হয়? বুড়ীকে ত স্তোক দিয়ে বেরিয়েছি, দেখি
এখন দাদা কি করেন—কাশীতে এসেছেন কি না, সেবার ত দেখা
পারনি। এই বলিয়া দুঃখীরাম—মনিবর্ণিকার ঘাটে স্নান করিলেন।
কাশী যে এমন পবিত্র স্থান, তাহার মাহাত্ম্য যে এত, দুঃখীর সে
দিকে কোন দেখাশুনা নাই, তিনি তুলসীদাস ও তাঁর জননী এবং
পদ্মীর অস্ত্র প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন—তাহাদের তিলমাত্র উপকার
করিতে পারিলে তিনি স্বর্গস্থ অমৃতভব করেন। কৃতজ্ঞ হৃদয়ের এমনি
মহীয়সী শক্তি, পবিত্র পরোপকার ব্রতের এমনি ভাব। ধর্ম আর
কাহাকে বলে, কর্মযোগী মানুষ আর কেমন করিয়া হয়? অগতে
ইহাই কর্মের শ্রেষ্ঠ—ইহাই মহাযোগ।

আজ দুঃখীরাম তুলসীদাসের সন্ধানে যাইবেন। তাই অতি প্রভাতে স্নান করিয়া ভগবান দাসের বাড়ী—সকাল সকাল চারিটা আহার করিয়া লইলেন। কালীতে আসিয়া অবধি এ কয়দিন অত্যধিক পরিশ্রমে তাঁহার শরীর অত্যন্ত কাতর হইয়াছিল, তাই গৃহের বাহির হইতে পারেন নাই এবং ভগবান দাস মিশিরও তাহাকে বাহির হইতে দেন নাই। লোকটা খুব ভদ্র, অনেক টাকার মালিক, দয়া-ধর্ম ও তাঁহার যথেষ্ট আছে; কালীতে তাঁহার কয়েকখানি বাড়ী আছে; একখানি নিজের, যখন আসেন—তখন সেই বাড়ীতে অবস্থান করেন। আজ হলসী ও দুঃখীরামের সহিত তিনি সেই বাড়ীতেই অবস্থান করিতেছেন।

যত দিন যাইতেছে—হলসীর প্রাণ তত ছটকট করিতেছে। তিনি কেবল দুঃখীকে বিরক্ত করিয়া বলিতেছেন—কই বাবা দুঃখী ! তুই যে আমাকে এতদূর, আন্লি; তুলসীর কাছে নিয়ে যাবি বলে আশা দিলি; কই, তার যে আর নাম করিস্ না।

দুঃখী।—খুড়ি ! এখন কি আর তোর তুলসী সেই রাজাপুরের দুঃখীর বন্ধু তুলসী আছে। সে যে এখন কালীর একজন মহাগণ্য-মাংগ লোক, বেদান্তের মহাপণ্ডিত, সাধকের অগ্রগণ্য হয়েছেন : মনে করলেই কি তাঁর কাছে যাওয়া যায়—সময় অসময় দেখতে হবে ত।

হলসী।—কি তুই বললি বাবা ! তুলসী আমার বেদনার পণ্ডিত হয়েছে; খুব বড় সাধক হয়েছে—আচ্ছা, তাহ'ক না, তাব'লে কি, আর মা বাপ, বন্ধুবান্ধব কাছে যেতে পাবে না, এঘে অনাস্থ্যে কথ্য তুই বলছিস্ দুঃখী !

দুঃখী।—অনাস্থ্যে কথ্য কি খুড়ী ! তুই কি জানিস্ না—

কৃষ্ণ যখন মথুরায় রাজা হয়েছিল ; তখন নন্দ যশোদাকেও দুকুতে দেয় নাই ; বড় হলে যে তার সব বড় হয় !

হলসী।—ও দুঃখী, সে কিরে বাবা ! তবে এত আশা দিয়ে তুই এ একরাজ্যীর পথ আন্লি কেন,—যদি সে দেখাই না কর্কে, তবে এতদূর আসা যে বুখা, তুই আমাকে না হয়, নিয়ে চল না ; দেখি সে কৈমন বেদানার পণ্ডিত হয়েছে ।

দুঃখী। খুড়ী, অত উতলা হচ্ছি স্ কেন, যখন এনেছি, তখন তুলসীদাকে এনে দিবই—বা তার কাছে তোকে নিয়ে যাবই—তবে এখন ত সে আর পুজারী বামুন নয়—এখন সে খুব বড় লোক, রাজারাজড়া তার কাছে লাগে না, কত বড় বড় রাজা, তাঁর আশ্রমে এসে যখন গড়াগড়ি দেয়, তখন সময় বুঝে না গেলে, যে তাঁর ক্ষতি হবে, সে ক্ষতিটা করা কি উচিত, তাহ'লে হয়ত চটে যাবেন—দেখা কর্কে ন না ! আর কাশীতে আসবার সময় আমি বৌদিরও সন্ধান পেয়েছি, তিনি পাগল হয়ে—এদিকেই কোথায় চলে এসেছেন, তাই মনে করছি, একেবারে তাঁর সন্ধান করে, দুজনকে নিয়েই তাঁর কাছে যাবো, বউদিকে দেখলে—দাদা হয়ত আর কথা কইতে পারবে না—সে মুখের জন্য দাদা কত কাতর তাত তুমি জান ?

হলসী।—হাঁ বাবা ! তা জানি, তবে তাই কর—কিন্তু বেশী দেৱী করিস্নি ?

দুঃখী।—না না আর দেৱী কি, যত শীঘ্র পারি, আমি খুব চেষ্টায় আছি, এখন শিবরাত্রি, কাশীতে অনেক বড় লোকের ভিড়, একটু কমুক না, তাতে আর ক্ষতি কি, সেই তর্কে আমি একবার বউদির সন্ধান করে নিই !

হলসী।—বেশ বেশ বাবা ! তুই চিরজীবী হ ।

তুলসীদেবীকে সাস্তুনা করিয়া দুঃখীরাম বৈকালে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া অসি নদীর তীরে তুলসীদাসের আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। দুঃখীরামের হৃদয় পরোপকারে ভরা, কৃতজ্ঞতায মাখামাখী বাহার তখন একদিনের জন্য খাইয়াছেন—তাহার জন্য প্রাণ দিতেও দুঃখীরাম কুণ্ঠিত নহেন—এমন পবিত্র প্রাণ যুবক কি কেহ কখন দেখিয়াছেন? তুলসীদাসের উপকার দুঃখীর হৃদয়ে হৃদয়ে গাঁথা—তাই তিনি তাহাদের জন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া কেবল—“হা তুলসী দাদা,—হা বন্ধু” বলিয়া কাতর এবং কেবল সেই অনুরাগেই তিনি আপন হারা হইয়া কার্য্য করিতেছেন। দুঃখীরামের এ উপকারের কি তুলনা আছে?

বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কেবল তাহার চিন্তা, বউদিদিকে কেমন করিয়া খুঁজিয়া পাই। কান্ধিতে আসিবার সময় গৌসাই-গঞ্জের চটিতে সেই লোকটি বলিয়া গেল—একটা ভদ্রঘরের যুবতী বউ পাগল হয়ে, আজ কয়দিন এখানে—সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ছগনলাল ত্রিবেদী বলে কে একজন বড়লোক তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে? সেইজন্য একবার গৌসাইগঞ্জে সন্ধান কর্তে হবে, আজ আর হলো না, কাল এর একটা বীহিত কর্তেই কিন্তু যে মাঠ-ঘাট, বন জঙ্গল পথে বেরুতেও ভয় করে—যা হউক, তাতে আর কি হবে—না হয় প্রাণ বাবে—তথাপি, বউদির অনুসন্ধান কর্তে ছাড়বো না। আহা বউদি, যে আমাদের ঠিক ছোট দেবরটির মত না খেয়ে খাইয়েছেন—তার বিপদে না দেখলে—অধর্ম্ম হবে যে, প্রাণের মায়্যা কল্লো চলবেনা, উপরে ভগবান আছেন।

দুঃখীরাম বউদির ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে ঠিক সন্ধ্যার প্রাকালে যখন অন্ধকারের কালো ছায়া ধরণীর বক্ষে ঘনাইয়া আসে নাই—

চারিদিক বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সেই সময় দুঃখীরাম তুলসীদাসের আশ্রম সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—সেই তেজঃপুঞ্জ কলেবর যোগজ্যোতি পূর্ণ দেহ লইয়া তাহারই প্রাণের বন্ধু তুলসীদাস পশ্চাৎ ফিরিয়া একজন ছাত্রকে কি পাঠ বুঝাইয়া দিতেছেন। তুলসীদাস তাঁহাকে দেখিতে পান নাই, দুঃখীরাম তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া দেওয়ালের আড়াল হইতে ডাকিলেন—তুলসী দাদা, ভাই! আজ মথুরায় রাজ্য হয়েছ বলে কি—সাধের বৃন্দাবন, প্রাণের রাধা, ও জননী যশোদাকে, এবং তোমার প্রাণের সখা দুঃখে ভাইকে ভুলে গেছো?

তুলসীদাস নিবিষ্টচিত্তে পড়াইতে ছিলেন; কথা কয়টা কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র হৃদয়ে উদ্বেলিত হইল—হৃদয়ের স্তরে স্তরে সোহাগে গাথা সেই চিরপরিচিত স্বর বৃষ্টিতে পারিয়া আকুল প্রাণে চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন—তখন দুঃখীরাম আড়াল হইতে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তুলসীদাস দুঃখীরামকে দেখিয়া বিস্ময় বিমুগ্ধ স্বরে বলিলেন—দুঃখে ভাই! আয় আয় পরের মত বাহিরে দাঁড়িয়ে কেন?

দুঃখী। ভাই! পর করেছে, আর পরের মত বাহিরে দাঁড়াব না ত কি?

তুলসী। পর করিনি ভাই! দুঃখী, তোর ভালবাসা কি জীবনে ভুলিবার, তবে অনেক দূরে এসে পড়েছি বলে, কিছু করতে পারি নাই। ভাই দুঃখে! সব ভাল তো?

দুঃখী। ভাই! ভাল আর কি করে, প্রাণ একপ্রকার আছে মাত্র! বুড়ী মাকে যেসে সন্ন্যাস গ্রহণ করা কোন শাস্ত্রের বিধি নাদা! আর সাধ্যাসতী পৃণ্যবতী রমণী স্বামীশোকে উন্মাদিনী হয়ে

কোথায় চলে গেল, এমন কি তাঁহার সন্ধানও পাওয়া যায় নি—জানি না তিনি জীবিতা কি মৃত। দাদা! তাদের কাঁদিয়ে ধর্ম কল্পবার ভ্রম ঘর ছাড়া কি তোমার উচিত হয়েছে? কেন, এদের নিয়ে সংসারে থাকলে কি তোমার ধর্ম হতো না? আমি তোমার সহোদর না হলেও অতি স্নেহের, আমাকে না বলে তুমি কোন কাজই কর্তে না, আমিও তোমা বই কিছু জানিতাম না, ভাই! এ অবস্থায় আমরা ভাল আছি, কি মন্দ আহি তাত বুঝতেই পারছো। বলিয়া দুঃখীরাম কাঁদিতে লাগিলেন।

মায়ামোহের অতীত মহাজ্ঞানী তুলসীদাস বালাবদ্ধ দুঃখীরামকে দেখিয়া পূর্বস্মৃতি মনোমাবে উদিত হওয়ায় তিনিও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—ভাই দুঃখী! কিছু মনে করিস্ নি, বহুদিনের পর তোকে দেখে ঘরের কথা জানতে ইচ্ছা হয়—এইজন্য ভাল মন্দ জিজ্ঞাসা করা অনায়াস নয়—মায়ের কিছু দুঃসংবাদ শুনাবি না ত?

দুঃখী। ভাই, খুড়িমার ভালমন্দ বিষয়ের কথা নয়, একে অতি বৃদ্ধ, তায় পুত্রের অদর্শনজনিত শোকে যে খুড়িমার দেহ পতন হবে,—এর আর আশ্চর্য্য কি? তার প্রাণটী কেবল বেকতে বাকী আছে মাত্র, তেবে, ভেবে এদিকের সব মৃত্যুর মতনই হয়ে আসছে? হ্যাঁ দাদা! মার কথাত জিজ্ঞাসা করলে কিছু কই বউদিদির কথাত জিজ্ঞাসা করলে না—এটা কি তোমার বৈরাগ্য-শাস্ত্রের একটা নিষিদ্ধ স্থিতি নাকি? .

তুলসী। ভাই! এই ত তুই বলি—সে মনের দুঃখে উন্মাদিনী হয়ে কোথায় চলে গেছে!

দুঃখী। বস, এই পর্য্যন্ত জানলেই কি তোমার সব শেষ হলো? খোঁজ তলাস হয়েছে কি না, আছেন কি মরেছেন, পাওয়া গেলে

আরোগ্যের উপায় কি, এ সকল জানবার, বলবার কি অধিকার তোমার নাই? দাদা! তিনি তোমার ধর্মপত্নী; দেবতা সাক্ষী করে, ধর্মের কত শপথ করে—তুমি তাঁর ধর্মরক্ষার, শুধু তাই কেন—সর্বতোভাবে প্রতি পালনের ভার গ্রহণ করেছ! তুমি যখন ঘেরপ অবস্থায় থাক না কেন, তিনি সর্বদা সকল সময়ে তোমার পালনীয়া, রক্ষণীয়া—তুলসী দা! মনোযোগের সহিত এইসকল কর্তব্য পালন করা কি তোমার ধর্ম নহে! মনে করলে, বুঝি বৌদি পাগল হয়ে চলে গেলেই আপদ চুকলো?

তুলসী। ভাই দুঃখে! মায়ের আমরা দুই ছেলে ছিলাম—আমি বড়, তুই ছোট; আমি চলে এসেছি, তুই আছিস—কাজেই আমার সে চিন্তা বেশী নাই, আর তোর বউদির কথা যে বলি, সে ত আমার পরম উপকার করেছে?

হুঃখী। সেইজন্য বুঝি তার উপকারের এই প্রত্যুপকার কর্ছো।

তুলসী। না ভাই! আগে আমার সব কথাগুলি শোন—তারপর বলিস্!

হুঃখী। বল বল, খুব শুন্ছি—যা বলবে বল!

তুলসী। ভাই! তোর বউদিই আমার জ্ঞানদাত্রী, তাঁর কথাতেই আমার চৈতন্য হয়েছে; প্রাণের কপাট খুলেছে; তাই তিনি এখন আমার গুরুস্থানীয়া; রমণী ধর্মের আধার, স্বামীর পাপ কলুষিত হৃদয়ে রমণীই ধর্মের ভাব জাগাইয়া দেয়; তাহার অন্ধকারময় জীবনপথে সতী-স্ত্রী ধর্মের আলোকবর্তীকা ধরিয়া পথ দেখাইয়া দেন—এইজন্য স্ত্রী-সহধর্মিণী; তোর বউদি আমার তাই করেছেন? আমি তাঁরই বাক্যে পরম শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্য ধর্ম গ্রহণ করেছি; ভাই! এ ধর্ম বড় কঠিন—সম্পূর্ণরূপে ইঞ্জিয় সংযম কর্তে না পারলে এ ধর্মের অধিকারী

হওয়া যায় না। এ জগতে কামিনী-কাঞ্চন অতি লোভনীয় সামগ্রী—
এইজন্য শাস্ত্রকারগণ এই ধর্মের অধিকারীকে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ
কর্ত্তে উপদেশ—দিয়াছেন; রমণীর মুখাবলোকন করা, এধর্মের একেবারে
নিষিদ্ধ, ভাই ছুঃখী! প্রাণের বন্ধু হ'য়ে তুই আর আমাকে এপথ থেকে
বিচলিত করিস্ নে?

ছুঃখী। দাদা! তোমার বৈরাগ্যের কথা শুনে—এত ছুঃখের
মধ্যেও আমার হাসি পাচ্ছে; কেন? ধর্মপথগামী বা বৈরাগী হলে কি
স্ত্রী পরিবার সব ত্যাগ কর্ত্তে হয়—না হলে কি ধর্ম হয় না, না
ভগবানকে পাওয়া যায় না? সে কালের বড় বড় ঋষিরা ত কই
কেহই সংসার ছেড়ে চলে যান নি, তাহারা বরং সংসারকেই শ্রেষ্ঠ
বলে—এইখানেই ধর্ম কর্মের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গিয়েছেন। কেন
বশিষ্ঠ, গৌতম, জাবালী, কশ্যপ, বামদেব, অগস্ত্য প্রভৃতি কতশত
ঋষি ছিলেন—ধর্ম-কর্ম তাঁদের একরকম একচেটে ছিল—বল্লেই হয়,
যা যা করে গেছেন—অত্যাধি তার বিন্দুমাত্র বেশী আমাদের কেউ কর্ত্তে
পারুলে না—কই, তারা কি ছেলেপুলে ছেড়ে; ঘর সংসার ভাঙ্গিয়ে
দিখে—এসব করেছিলেন? আচ্ছা দাদা! জনক রাজার মত কে
ছিল—আর এখনই বা কে তাঁর সমকক্ষ হতে পেরেছে—তাঁর মত
বৈরাগ্য আর কেহ অবলম্বন কর্ত্তে পেরেছে কি?—শুকদেব হেন—পরম
বৈষ্ণব ও যোগশিক্ষা করিবার জন্য সাতদিন যার দ্বারস্থ ছিলেন; সেই
জনক রাজা যে ঘোর সংসারী হয়ে রাজ্যপর্য্যন্ত পরিচালন করে গেছেন?
অথচ বৈরাগ্যের হৃদযুদ্ধ; ত্যাগের চূড়ান্ত করে গেছেন। ভাই! যে
সংসারের কাছে কেহই নয়—তুমি রাগ করো না, যা বলছি তা শুনে—
আশ্রয়ই বল—চল, ঘরে গিয়ে আবার যেমন সংসার করছিলে—সেইরূপ
কর্কে,—আহা! তোমার বিহনে খুড়ীমার সেই বুক চাপড়ান আর মড়া-

কান্না দেখলে পাষণ ভেদ হয়ে যায়। এই বলিয়া হুংখীরাম চক্ষের জলধারা বস্ত্রাঞ্চলে মুছিতে লাগিলেন।

তুলসীদাস তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—ভাই হুংখে ! আমি রাগ কর্ণো কেন, রাগ যে পরম শত্রু, এ শত্রু জয় কর্তে না পারলে কি ধর্ম-কর্ম করা যায়। তোর যুক্তিতর্ক খুব বেশী বটে কিন্তু কি কর্ণো এ আশ্রমে প্রবেশ করলে সংসার করা নিষেধ ; তুই ঘরে যা—ছোট ছেলেটির মত তাঁকে দেখ্গে যা। আমি আর কিছুদিন পরে একবার জন্মভূমি দেখ্তে যাব।

হুংখী। সে দক্ষা আমি রক্ষা করে এসেছি ; সব বেচে কিনে, খুড়ীমাকে কাশী নিয়ে এসেছি ; একজন ভদ্রলোকের বাড়ীতে তাঁকে রেখে তোমায় বল্তে এসেছি। এইবার বৌদির সন্ধান করে দেখি ; তারপর কি কর্তে পারি—একবার দেখ্বে। এই বলিয়া হুংখীরাম কাদিতে কাদিতে সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন।

তুলসীদাস কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিয়ৎক্ষণ সেইস্থানে বসিয়া রহিলেন। ছাত্রগণ গুরুদেবের অবস্থা দেখিয়া সকলেই বিষময়াগরে নিমগ্ন হইয়া, ভাবিতে লাগিল—হায় ! কি দুর্দৈব, যদি বাস্তবিক লোকটা ইহার জননীও পত্নীকে আনয়ন করে, তাহলে ত সব মাটি হল—প্রভু ! যতদূর অগ্রসর হয়েছেন—তাহলে ত এখানেই তার খতম হবে—সংসারে মাখামাখি হলে কি আর এতদূর ধর্ম-কর্মে মন থাক্বে ?

অপর একজন ছাত্র চুপে চুপে বল্লে—ভাই ! তুমি ভুল বুঝেছ ; ঐ লোকটা যা বল্লে—তার কথা কি অসত্য ; বর্ণে বর্ণে যে সমস্ত ঠিক ; আমাদের যে ঋষিরা ছিলেন—সকলেই ত সংসারী ছিলেন—দ্রৌ পুত্র নিয়ে সংসার কর্তেন—অথচ ধর্ম-কর্মের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গিয়েছেন।

সংসার আশ্রমে থাকলেই যে ধর্ম হয় না—ইহা সম্পূর্ণ ভুল ; আমার মতে গুরুদেব যদি সংসারী হন, জননী-পত্নীকে নিয়ে আসেন, তাহলে এর চেয়ে উন্নতি ত হবে, আমাদেরও এমন করে পড়া বন্ধ দিতে হবে না, এখন ওর সমস্ত খামখেয়ালী ; কখন এখানে—কখন সেখানে, কখন কাশী—কখন অযোধ্যা ; একটা ত মতিস্থির নেই—যেখানে ইচ্ছা পড়ে থাকেন। তাঁরা এলে একটা দায়িত্ব এসে পড়বে, আর এমন করে—এখায় সেখায় কর্তে পারবেন না। আমার মতে লোকটা যা বলে গেলো—তা যদি করে, তাহলে ভালই হয়। আমরাও সকল সময়ে তাঁকে পেয়ে লেখাপড়া ও ধর্ম-কর্ম অনেক উন্নতি কর্তে পারি ! গুরুদেব যে মুক্ত হয়ে গেছেন, এখন ওর সংসারই কি আর অরণ্যই কি ; অত উন্নত ব্যক্তিকে কি সংসার কখন ধর্মচ্যুত কর্তে পারে ? বোধ হয়, আমাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, তাই লোকটা এসে, গুরুদেবকে একস্থানে রাখবার চেষ্টা কছে ; ও আর একবার এখানে এসেছিল নয় ?

ছাত্র। হাঁ ; অনেক দিন হলো একবার এসেছিল—তখন প্রভু এখানে ছিলেন না। ভগবান করেন—ওর জননী-পত্নী যেন শীঘ্র এসে উপস্থিত হন। চল এখন, সায়াং সন্ধ্যার কাল উপস্থিত হয়েছে, আর বিলম্ব করা উচিত নয়। এই বলিয়া ছাত্রবৃন্দ নদী-তীরান্তিমুখে প্রস্থান করিল।

তুলসীদাস চিন্তায় বিভোর—তখনও তাঁহার চৈতন্য নাই। হুঃখীরাম বধন সন্ধান পাইয়াছেন, বধন মাকে এতদূর আনিয়াছে—তখন তাহাকে দেখা দিতেই হইবে—নিকটে রাখিতেই হইবে। বাহা হউক, বলিহারী হুঃখীরামের হৃদয়—সেই আমার কেউ নয়—তথাপি, আমার জন্ম, আমার জননী-পত্নীর জন্য, কিনা কর্ছো, আহা !

আমার ভাবনা ভেবে ভেবে ছোঁড়াটা আধখানা হয়ে গেছে—একেই বলে বন্ধুত্ব ! আর ভাবলে কি হবে—যা করেন ভগবান রামচন্দ্র ; তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত ত কিছুই হবে না, যদি তিনি পুনরায় সংসারে সংসাজান ত আবার সাক্ষিতে হইবে, ভেবে আর কি কর্ণো ! ইচ্ছান্বয়ের ইচ্ছা যদি হয়—তিনি যদি হৃৎথাকে উপলক্ষ করে—আবার জননীর কাছে নিয়ে যান—তা আর কি কর্ণো, যাই এক্ষণে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলো—সাধনার সময় বুখা নষ্ট কর্ণো না। “জয় প্রভু রামচন্দ্র” বলিয়া সাধক ইষ্টদেবকে স্মরণ করিয়া সাধন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সাধনার আজ তাঁহার চিন্তা স্থির না হইয়া অত্র দিন অপেক্ষা স্থস্থির ভাবধারণ করিল দেখিয়া বিভোর প্রাণে ভগবানের শরণাগত হইলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

যোগাসনে

সাধকের চিন্তা-বিকৃতি হইলেই—মনে নানাপ্রকার সংসারভাব প্রবেশ করিলেই, প্রথমে তাঁহারা উপাসনা, ধ্যান ধারণার দ্বারা চিন্তাশুদ্ধি করিয়া যোগমার্গ অবলম্বন করেন। সকলপ্রকার চিন্তাবৃত্তির নিরোধ করিয়া ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করার নামই যোগ।

বন্ধু হৃৎখীরাম চলিয়া যাওয়ার পর হইতে পরমযোগী তুলসীদাসের প্রাণে সংসারভাব প্রবেশ করিয়াছে। এখন কি করি, কিনা করি ইত্যাদি ভাবে বিভোর হইয়া যেন সন্দেহ দোলায় ছলিতেছেন, কাজেই প্রাণের দেবতার একটা অহুমতি না। পাইলে ত মনের সাধনা হইতেছে না। তাই সাধক আজ যোগাসনে বসিলেন।

যোগ সাধনের অসংখ্য আসন—সমস্ত আয়ত্ত করা মানবের সাধ্যাতীত। জগতে যতপ্রকার জীব—ততপ্রকার আসন; মহাযোগী মহেশ্বর এসকল আসন সম্যক প্রকারে অভ্যাস করিয়াছিলেন—মানবের ইহা সাধ্যের অতীত। আর এতপ্রকার আসন শিখিবার প্রয়োজন নাই। যেক্রপ আসনে বসিলে সাধকের চিত্তস্থির হয়—মনের কোনপ্রকার চাক্ষু্য উপস্থিত হয় না—বাহ্যতে সাধক সহজেই একাগ্রচিত্ত হইতে পারেন, তাহাই তাহার পক্ষে প্রকৃত আসন—পাতঞ্জলি যোগশাস্ত্রের ইহাই আদেশ। সচরাচর সাধকগণ পদ্মাসনে বসিয়া সাধন ভজন করেন।

ভুলসীদাস দক্ষিণ উরুর উপর বামপদ এবং বাম উরুর উপর দক্ষিণপদ সমভে স্থাপন পূর্বক হস্তদ্বয় উত্থানভাবে রাখিয়া অর্থাৎ বামহস্ত দক্ষিণ উরুতে এবং দক্ষিণহস্ত বাম উরুতে সংস্থাপন করিয়া নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। জিহ্বা দন্তমূলে স্থাপিত করতঃ চিবুক ও বক্ষঃস্থল উন্নত করিয়া সূর্য ও চন্দ্রনাড়ী অর্থাৎ বাম ও দক্ষিণ নাসার মধ্য দিয়া বায়ুর পূরণ ও রেচন করিয়া সূর্য্য মধ্যে স্তম্ভিত করিয়া প্রাণায়াম দ্বারা কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ করিলেন।

শাক্ত বলেন—কুণ্ডলিনী শক্তিকে এই সূর্য্য পথে ক্রমে উত্থিত করিয়া সহস্রারে পরম শিবের মিলিত করিবার নাম যোগ; অপর সাধক বলেন—জীবাত্মার সহিত সহস্রারে পরমাঙ্গার মিলন সংঘটন করিতে পারিলেই সাধকের সকল যোগ—শিক্ষা হয়, জীব শিব হয়। সাধক সেই যোগসাধনের অমৃতধারা পান করিয়া যতদিন ইচ্ছা বাঁচিতে পারেন—অমরত্ব লাভ করেন। এই শিবশক্তি বা আত্মা ও পরমাঙ্গার যোগাযোগে যে সূক্ষ্মাকরণ হয় তাহাই মদ্য নামে অভিহিত সাধক তাহা পান করিয়া বিভোর হয়—তাহার আর বাহ্য চৈতন্য থাকে না—ইহাই মত্ত

পান। আর ক্রমের মধ্যে যে মন্ত্র বিচরণ করে—তাহার আশ্বাদ লাভ করিয়া জীবন ধন্য হয়। রসনার বাক্য সংঘমের নাম—মাংস ভক্ষণ—এই তত্ত্ব সম্যক জ্ঞাত হইলে সাধক বাকসিক হয়—তাহার মুখনিস্থত বাক্য তখন বেদবাক্য—অকাট্য, তাহার ফল মুনিচ্ছয়। সাধক তুলসীদাস যোগসাধনার এই অনীম ক্ষমতা সম্যক প্রাপ্ত হয়ে-ছিলেন। তাই সাধক যোগাসনে বসিয়া পুলকিত, রোমাঙ্কিত হইতে লাগিলেন—প্রতি লোমকূপে মৈথুনের সুখ উপলব্ধি হইয়া তিনি তন্ময় হইয়া পড়িলেন—ইহাই মৈথুন তত্ত্ব বা সমাধির অবস্থা! তুলসীদাস সমস্ত রাত্রি এই ভাবে বিভোর হইয়া রহিলেন।

সেদিন ছাত্রগণ বাড়ী গিয়াছিল—কাজেই যোগ-সাধনার কোন ব্যাঘাত হইল না। সমস্ত রাত্রি এই সমাধির অবস্থায় কাটাইয়া ভোরের সময় তুলসীদাস বিভোর প্রাণে হৃদয়-সিংহাসনে তাঁহার প্রাণের দেবতার দর্শন পাইলেন। ভগবান রামচন্দ্র বামে মা জ্ঞানকীকে লইয়া তুলসীর পবিত্র হৃদয়-দ্বারসনে আবির্ভাব হইয়া বলিলেন—বৎস! এত উত্তলা কেন? সংসার করিতে এত ভীত কেন, যাহার চিত্ত যোগে এত অমুরক্ত হইয়াছে; সংসার-ভাব যাহার হৃদয় হইতে একেবারে দূরীভূত হইয়াছে, সংসারের মধ্যে থাকিলেও তাহার পতনের সম্ভাবনা নাই। তোমার পত্নী রত্নাবলী সাক্ষাৎ শক্তি স্বরূপিণী—তাঁহার জন্যই তোমার একরূপ সৌভাগ্যোদয় হইয়াছে সেও এখন তোমার মত যোগিনী, ভোগের ভাব তাহার নষ্ট হইয়া চিত্ত ত্যাগের ভাবে বিভোর—যোগ-সাধনার তাহারও চিন্তদূত হইয়াছে। রত্নাবলী সামান্ত জীলোক নহেন—সামান্য হইলে সে তোমার সহধর্ম্মনী হইতে পারিত না। আর অননী তোমার রত্নগর্ভা; তাঁহার পদাশ্রয়ে আশ্রয় হইলে তুমি যাবতীয় যোগের ফল লাভ করিবে। বৎস!

ভয় কি, আমি যে তোর সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছি, যখনই চিত্ত কোন প্রকারে অস্থির হইয়া পড়িবে—এইরূপ যোগাবলম্বন করিস্—তাহা হইলেই আমি তোর হৃদয় মধ্যে আসিয়া সমস্ত ভ্রম দূর করিয়া দিব! তুলসীদাস আরাধনার ধনকে হৃদয়মন্দিরে দেখিতে পাইয়া “জয় সীতাপতি রামচন্দ্রকি জয়” বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। সন্ধ্যাচিত্ত অভয় প্রাপ্ত হইল—প্রাণের যাবতীয় ভীতি দূরে পলায়ন করিল। তুলসীদাস যেন বিশ্বজয়ী হইয়া প্রাতঃকালে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। বাহির হইয়া দেখিলেন—ভবানী তাহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। পূর্ণ শশধরের ন্যায় জ্যোতিবিশিষ্ট পাপমুক্ত ভবানীর সেই প্রফুল্ল বদনকান্তি দেখিয়া তুলসীদাস সাদরে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—বৎস! এখন নিজেকে কিরূপ বিবেচনা করিতেছ?”

ভবানী তুলসীদাসের চরণে পড়িয়া বলিলেন—ধন্য আপনার মঙ্গল দান—আজ আমি নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক, আমার মনে আর কোন প্রকার মলিনতা নাই—সদাই যে কি এক অভূতপূর্ব আনন্দ সাগর উখলিয়া উঠিতেছে—তাহা আমি প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিতেছি না। প্রভু! রামনামের এত গুণ?

তুলসী। এ নামের তুলনা নাই; মরজীব এই নাম জপমাল করিলে অমর হয়—পাপ তাহাকে আর কখন আশ্রয় করিতে পারে না—আর সঞ্চিত পাপ ত মনে-প্রাণে ঐক্য করিয়া জপ করিবামাত্রই ক্ষয় হইবে—এই নাম মাহাত্ম্যে স্পষ্টাক্ষরে বিবৃত হইয়াছে—

রাশঙ্কোচ্চারণেনৈব বহিনির্বাতি পাতকং।

পুনরাগমনক্ষেত্রে ন্যকারোহস্ত কবাটকম্ ॥

রামশব্দের আদ্যক্ষর রা উচ্চারণ করিতে যে মুখব্যাদান করিতে হয়— তাহাতেই জীব-দেহের সমস্ত পাপ বিদূরিত হয়—পুনর্বার আসিবার

উপক্রম করিলে মকাররূপ কবাটে বদন আবদ্ধ হইয়া যায়, তাহাতে আর বাহিরের পাপ অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না—বৎস! কলিকলুষনাশ করিতে প্রাণারাম রামনামের তুল্য আর কিছুই নাই। বৎস! চল, আজ পাপী নিস্তারিণী জাহ্নবী সলিলে স্নান করিয়া পবিত্রচিত্তে শ্রীরামের আরাধনা করিগে।

ভবানী গিশ্রের প্রাণ পুলকপূর্ণ—মন আনন্দে ভোরপুর। বিখস্তর ব্রহ্মহত্যা পাপের জন্য বাহাকে জীবন ত্যাগের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন—মাংসভূক বাক্‌সিক মহাপুরুষ তুলসীদাস তাহাকে জীবনদান করিলেন। সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ধন্য হইল। একথা রাষ্ট্র হইতে বাকী রহিল না। অল্প সময়ের মধ্যে বায়ু-বিস্তৃতির মত চারিদিকে প্রকাশ হইয়া পড়িল। সকলে বাক্‌সিক বোগীবর তুলসীদাসের ক্ষমতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইল।

স্বার্থবাগীশ বিখস্তরের জারিজুরী সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল। সমাজে তাহার প্রতিপত্তি ক্রমশ কম হইতে লাগিল। তিনি যে এখন আর ভাল ব্যবস্থা দিতে পারেন না—অন্যান্য পণ্ডিতের নিকট তাঁহার ব্যবস্থা যে অগ্রাহ্য হয়—তাহা সকলেই জানিতে পারিল। এইজন্য তাঁহার চতুষ্পাঠীতে ব্যবস্থাপ্রার্থী লোকের সংখ্যাও দিন দিন কম হইয়া আয়ের পথে কাঁটা পড়িতে লাগিল। তৈল বটাদির প্রাপ্য গুণা অত্যন্ত অল্প হওয়ায় ছাত্রগণের ভরণপোষণের অর্থাভাব হইতে লাগিল। বিখস্তর হাড়ে হাড়ে চটিয়া তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন।

তুলসীদাস সন্ন্যাসী—অর্থের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার নাই। অধিকাংশ ছাত্র ঘরের খাইয়া তাঁহার নিকট পড়িতে আসে, অনেক বড় বড় পণ্ডিতও শাস্ত্রের গুঢ়মর্ম্ম অনুভব করিতে, বেদ বেদান্তের সূক্ষ্ম বিষয় সকল

সরলভাবে বুঝিতে, তুলসীদাসের শরণাপন্ন হন। বিশ্বস্তরের নিকট আর কেহ গমন করেন না, গমন করিলেও তিনি ভক্তবীর সাধকা-গ্রগণ্য তুলসীদাসের মত এ সকল গভীর বিষয় সহজে লোকের বোধগম্য করিতে পারেন না। শুধু পাণ্ডিত্যের ভগবৎ বিষয়ের সার মর্ম বুঝিয়া দিতে পারা যায় না। তিনি যাহাকে বুঝাইবার শক্তি দিয়াছেন—সেই বুঝাইতে পারে, তাহার কথা শুনিয়া লোকের চিত্ত মুগ্ধ হইয়া যায়, অন্যের সে ক্ষমতা কোথায়? অহংকারী পণ্ডিতের সে ভাব মনোমধ্যে উদিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু তুলসীদাস আপনাকে তৃণ হইতেও লঘু মনে করিতেন। বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দিয়া কাহার নিকট অহংকারের ভাব দেখাইতেন না। তিনি সদাই নম্র প্রকৃতি লইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেন অত্যাতি ধ্যাতির ধার তিনি ধরিতেন না। যে ভগবানকে যথার্থ জানিয়াছে, হৃদয়-রাজ্য সেই রাজ্যেশ্বরের জ্ঞান বিস্তার করিয়া দাসাত্মদাস রূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছে—সামান্য দম্ভ-তেজ-অহংকার প্রভৃতি রিপুগণ কি তাহাকে আয়ত্ত করিয়া মনুষ্যত্ব নাশের পথে লইয়া যাইতে পারে? সাধকের নিকট রিপুগণের প্রভুত্ব খাটে না।

ভবানী মিশ্র আজ আনন্দিত চিত্তে গুরুদেবের সহিত গঙ্গাত্মান করিয়া ভগবানের আরাধনায় যোগদান করিল। সমস্ত দিন একাগ্রচিত্তে রামনীর পূজা-ভোগ প্রদান করিয়া সায়ংকালে হুইজনে একত্র আহার করত আপনহারা হইয়া ভজন, গান করিতে লাগিলেন। ভবানী আজ হইতে তুলসীদাসের শিষ্য গ্রহণ করিয়া কাহার ছায়ায় মত লঙ্ঘন লঙ্ঘন ঘুরিতে লাগিল। সেও সংসার ত্যাগ করিল, শাস্ত্রপাঠে তার প্রবৃত্তি প্রথম হইতেই বেশ নিবদ্ধ ছিল,

এখন হইতে সে তুলসীদাসের নিকট নানা প্রকার শাস্ত্র বিষয় আয়ত্ত করিতে লাগিল, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি যোগাঙ্গ সকলও ধীরে ধীরে অভ্যাস করিতে লাগিল। কুণ্ড খেলার নেশা সে একবারে ছাড়িয়া দিল, তাহার নাম করিলে সে এখন শিহরিয়া উঠে, সে জন্ত কেহ ডাকিতে আসিলে, সে পায়ে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে।

ষাণ্মাস পারিচ্ছেদ

নিমন্ত্ৰণ রহিত

হিংসায় মানুষকে পশুত্ব প্রদান করিয়া থাকে। হিংসার বশে মানুষ করিতে পারে না—এমন কাজ নাই। একজন বড় হইতেছে, জীবনের পথ মুক্ত করিতেছে, লোক সমাজে প্রতিপত্তিশালী হইতেছে দেখিলে—পাছে আমাপেক্ষা সে বড় হয়—এই হিংসার বশবর্তী হইয়া যাহাতে সে আর বাড়িতে না পারে, উঠিবার মুখেই তাহার পতন হয়—এরূপভাবে আঘাত করাই হিংস্রের কার্য।

বিশ্বস্তর তুলসীদাসের পশ্চাতে লাগিয়া আছেন। যাহাতে তিনি আর উঠিতে না পারেন—লোকে তাহাকে মান্তগণ্য না করে—তাহার জন্ত তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তুলসীদাস বৈষ্ণবের নিন্দাকারী, তাহার বয়স অতি অল্প, কিছু জানে না, ইত্যাদি প্রকারে তাহার নিন্দা রটাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সমাজে যাহাতে তুলসীদাস বাবাজী স্থান না পান, হয় হইয়া থাকেন—তাহার জন্ত বিধিমত চেষ্টা করিবার ক্রটি করিলেন না।

তুলসীদাস বৈষ্ণবের নিন্দাকারী—সে সময়কার লোক এ কথা

শুনিলে নিশ্চয়ই তুলসীদাসকে ঘৃণা করিবে, কারণ তখন দেশে বৈষ্ণব ধর্মের প্রাচুর্য্য খুব বেশী; বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ক্ষমতাও তখন অতুলনীয়, কাজেই একথা প্রচার করিলে তুলসীদাস সকলের নিকটই নিন্দনীয় হইবে—সমাজে অপদস্থ হইতেও বাকী থাকিবে না—সহজে কেহ আর তাহার নিকট যাইবে না বা তাহার কথা শুনিবে না—এই অহুমানের উপর নির্ভর করিয়া সশিষ্ট বিশ্বস্তর চারিদিকে তাহার গ্লানি আরম্ভ করিলেন।

ভক্তমাল রচয়িতা পরম বৈষ্ণব নাভাজীর তিরোভাব উপলক্ষে সেই সময়ে পুষ্করতীরে এক মহা ভাণ্ডারার আয়োজন হয়। দেশ বিদেশ হইতে অনেক সাধু সন্ন্যাসী এই শোক-সভায় উপস্থিত হইয়া বৈষ্ণব চূড়ামণি নাভাজীর ভাণ্ডার-উৎসব হুসম্পন্ন করিবার জন্ত নিমন্ত্রিত হইলেন। মঠাধ্যক্ষ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী বিশ্বস্তরের সহপাঠি বন্ধু; তুলসীদাস তখনকার দিনে কাশীর একজন প্রসিদ্ধ সাধু—যোগ-তপস্যায় সমুন্নত হইলেও শাস্ত্রী মহাশয় তদীয় বন্ধু বিশ্বস্তরের কথা শুনিয়া, তাহাকে সে সভায় নিমন্ত্রণ রহিত করিয়া দিলেন। বৈষ্ণবের শোক-সভায় বৈষ্ণবদেষ্টী তুলসীদাসের নিমন্ত্রণ কখনও সম্ভবপর নহে।

তুলসীদাস সন্ন্যাসী হইলেও যজ্ঞোপবীত ধারণের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি এতাবৎকাল যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া আসিতেছেন—অগ্ন্যগ্ন সাধুর মত তিনি তাহা ফেলিয়া দেন নাই এবং আচার-ব্যবহারে কোনপ্রকার ব্যভিচারও করেন নাই। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইলেই যে যথায় তথায়, যাহার তাহার হাতে থাইতে হইবে—ইহা তাহার স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল—তিনি কখনও এরূপ অনাচার করিতেন না—নিজের ব্রাহ্মণ্য বজায় রাখিয়া চলিতেন।

যখন তিনি বৈষ্ণবদেবী এবং এখনও ব্রাহ্মণোচিত আচার-বিচারে অভ্যস্ত, তখন তিনি এই সকল অজ্ঞাত কুলশীল বৈষ্ণবদিগের সহিত পুংক্তি ভোজন করিবেন কি না এই সম্মেহেও তুলসীদাস গোস্বামীর নাম সে নিমন্ত্রণ-তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছিল। বৈষ্ণবদেবী তুলসীদাস গোস্বামীর নাম বৈষ্ণব তালিকা ভুক্ত হইতে দেওয়া কাহার অভিপ্রেত হইল না এবং ঐনিবাস শাস্ত্রীও অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া বন্ধুর আদেশে তুলসীদাসের নিমন্ত্রণ রহিত করিয়া দিলেন। তুলসার কর্ণে একথা পৌছিতে বাকী রহিল না।

প্রাক্কের নির্দিষ্ট দিনে ভারতের দেশ দেশান্তর হইতে বহু সাধু সন্ন্যাসী সেই সভায় আসিয়া যোগদান করিলেন। মঠাধ্যক্ষ ঐনিবাস সকলকেই সাদর সম্ভাষণ করিয়া সভায় আসন প্রদান করিলেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রানুসারে নাভাজীর শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন হইবার পর, তাঁহার গুণানুকীৰ্ত্তন আরম্ভ হইল। নাভাজী দেশের অনেক মঙ্গল কার্য্যও করিয়াছিলেন—জনে জনে তাঁহার সেই সকল মহৎ-কীৰ্ত্তি-গাথা বিবৃত করিয়া ভগবানের নিকট তাঁহার আত্মার সদগতি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

এই সকল শোকাবহ কার্য্য সমাধা হইবার পর মঠের সুপ্রশস্ত প্রাক্কণে সাধু বৈষ্ণবগণের আহারের স্থান হইল। বৃদ্ধ বিশ্বস্তর কোন কার্য্যগতিকে আজ এ সভায় যোগদান করিতে পারেন নাই। তিনি কায়মনে কার্ধ্যের সুসম্পন্নতা প্রার্থনা করিয়া বন্ধুবর ঐনিবাসকে পত্র প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অসুস্থতার জন্য ক্রটি মার্জনা করিতে অসুযোগ করিয়াছিলেন।

সাধুগণ পুংক্তি ভোজনে বসিলেন। প্রথমে পাতা, লবণ, জল--

পাত্র দেওয়া হইল, তারপর মোটা মোটা ঘৃতভর্জিত আটার রুটী ও অড়হর ডাল পরিবেশন করা হইল। সাধুগণ ইষ্টদেব লক্ষ্মীজনাদ্বন্দ্বকে ভোজ উৎসর্গ করিয়া আহারের জন্য প্রস্তুত হইলেন। দুই তিনজন পরিবেশনকারী প্রতি পুংক্তিতে ডাল ও রুটী লইয়া ঘুরিতে লাগিল।

সাধুদিগের ভোজন আরম্ভ হইয়াছে—এমন সময় পরদেশী দুই জন অনিমন্ত্রিত সাধু তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মধ্যে একজন প্রৌঢ় আর একজন যুবা। অনিমন্ত্রিত এবং অপরিচিত বলিয়া কেহই তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিল না। আগন্তুক সাধুদ্বয় স্থানাভাবে যেখানে মহাত্মাগণের পাদুকা রক্ষিত হইয়াছিল, তাঁহারা তাহারই একপাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহাদের সাধু জনোচিত বেশভূষার কোন প্রকার পরিপাঠ্য ছিল না—যাহাতে তাঁহারা সকলের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারেন। সন্ন্যাসী বেশধারী সামান্য নাগাভিক্ষুক মনে করিয়া কেহই আর সেদিকে দৃষ্টিপাত করিল না।

রুটী পরিবেশনকারী যখন পুংক্তির প্রান্তভাগে আগন্তুক প্রৌঢ় সন্ন্যাসীর কাছে আসিল, তখন তিনি হাত পাতিয়া দুইজনের জন্য রুটী চাহিলেন। আয়োজনের অপ্রতুলতা নাই—কাছেই চাহিবারাত্র পরিবেশনকারী তাঁহাদের দুইজনকে দুইখানি করিয়া চারিখানি রুটী দিল। সেরূপ রুটী দুইখানি খাইলেই একপ্রকার উদরপূর্ণ হয়। পরিবেশন কর্ত্তা কোন আপত্তি না করিয়া ইহাদের রুটী প্রদান করিয়া অন্যদিকে চলিয়া গেলেন। তারপর একজন ডাল পরিবেশন করিতে করিতে সেইদিকে আসিলে, প্রৌঢ় সাধু ডাল প্রার্থনা করিল। পরিবেশনকারী তাহাকে অতি অন্ত্যজ ছোট লোক মনে করিয়া মুখবিকৃত করত বলিল—কোনও পাত্র আন নাই ত ডাল লইবে কিসে?

ইহার পূর্বে সেই পুস্তিতে একজন রামাং বৈষ্ণব সাধু আহারে বলিয়া প্রতি উদগারের সময় “রামনাম” অজ্ঞাতসারে উচ্চারণ করিয়া ভোজন করিতেছিলেন—তাঁহার পাছুকাণ্ড সেই স্থানে রক্ষিত ছিল। আগন্তুক সাধুদ্বয় সেইস্থানেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। পরিবেশনকারী পাত্র চাহিবামাত্র প্রোঢ় সাধু ভূপৃষ্ঠ হইতে সেই পাছুকার একখানি তুলিয়া লইয়া তাহাতেই ডাল দিতে বলিলেন।

ডাল পরিবেশনকারী প্রোঢ় সাধুর এই স্নেহোচিত ব্যবহারে বড়ই বিস্মিত হইয়া পড়িল। তাঁহার গলদেশে লঘমান যজ্ঞোপবীত, হাতে তুলসীর মালা এবং কপালে চন্দনের তিলক এবং স্বদেহে কুলি দেখিয়া তাহাকে কোন দরিদ্র বৈষ্ণব বা ব্রাহ্মণ মনে করিয়াছিল। এক্ষণে তাহার স্নেহোচিত ব্যবহার দেখিয়া অতীব ঘৃণার সহিত বলিল—ছিঃ তুমি একি করিতেছ, এত সাধু মহাস্মার সম্মুখে তুমি নিতান্ত হীনজাতির গ্রাম অস্পৃশ্য জুতার উপর আহারের জন্ত ডাল চাহিতেছ। তোমার কি মাহুঘের চামড়া গায়ে নাই ?

তখন সেই দিব্যকান্তি প্রোঢ় সন্ন্যাসী—গুরুগম্ভীর অথচ মধুরস্বরে তাহাকে সযোধন করিয়া বলিলেন—

তুলসী যাকে মুখনতে কি ধোখো আয়ত রাম।

তাকে পদকী পানহী, কে মেরে তনুকা চাম ॥

আগন্তুক তখন ভক্তি গদগদচিত্তে, প্রেমাশ্রু প্রতনেত্রে কাঁদিতে কাঁদিতে উচ্চকণ্ঠে বলিল—যাঁহার মুখ হইতে আহারের সময় অজ্ঞাতসারে রামনাম বাহির হয়, তাঁহার জুতার চামড়াকে তুলসীদাস নিজের গায়ের চামড়ার অপেক্ষাও পবিত্র বলিয়া মনে করে, অতএব ইহাতে খাইতে দোষ কি ?

সাধুর অপূর্ণ রাম ভক্তিপূর্ণ তেজস্বী কথা শুনিয়া সকলের চৈতন্য হইল। তখন সকলের দৃষ্টি সেই দুইজন সাধুর উপর পতিত হইল— প্রোট সাধুর সেই স্থধা বিজড়িত বচন, তাঁহার সেই কমনীয় জ্যোতিপূর্ণ বদনকাস্তি এবং বৈষ্ণবোচিত নম্রস্বভাব দেখিয়া, সকলেই সসন্মমে উঠিয়া দাঁড়াইল। সকলেই তখন বুঝিতে পারিলেন—এই শাস্তোজ্জল পবিত্রমূর্তি সাধকোত্তম তুলসীদাস ভিন্ন আর কাহারও নহে, এত নম্রতা সাধক তুলসীদাস ভিন্ন আর কাহারও হইতে পারে না!

তুলসীদাস স্বীয় উদারতা গুণে তাঁহাদের ভ্রম দূর করিবার জন্য ভবানী মিশ্রের সহিত বিনা আস্থানে স্বদূর কালীধাম হইতে পুষ্করের এই সাধু সম্মিলনীতে যোগদান করিতে আসিয়াছেন; বৈষ্ণব যে তাঁহার নিকট কত আদরের, কত সম্মানের তাহা বৈষ্ণবের পাছু-কাছ ডাল ভোজনের বিষয় লইয়া দেখাইয়া দিলেন। নাভাজীর পুণ্যবলে তাঁহার শোকসভা আজ তুলসীদাসের পদার্পণে সার্থক হইল দেখিয়া তখন চারিদিক হইতে সহস্র ভক্তিপুত কণ্ঠে উচ্চারিত হইল—“জয় মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রকি জয়”। তুলসীদাস ও ভবানী মিশ্র সেই পবিত্র সাধু-সম্মিলনীর পবিত্র ধূলিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে দিতে বলিলেন—“জয় সীতাপতি বিশ্বপতি কি জয়”। মঠাধ্যক্ষ তখন নিজের ধৃষ্টতা বুঝিতে পারিয়া, তৃণাদপি স্ননৌচ এমন বৈষ্ণব চূড়াগণির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং বিশ্বস্তরকে নানাবিধ দ্বিভাষ প্রদান করিতে লাগিলেন।

তুলসীদাস কাহার নিন্দাশ্রবণ করিয়া কর্ণকূহর অপবিত্র করিতে চাহেন না। তিনি বলিলেন—আমি ও সমস্ত কথা শুনিতে চাহি না। তবে আমি বৈষ্ণবদেষ্টা এ ভুল ধারণা, যেন আপনাদের মনে কখনও স্থান না পায়—আমি বৈষ্ণবের দাসাত্মদাস। পরম পবিত্র বিষ্ণুভক্তি

লাভ করিয়া বৈষ্ণব হওয়া মানুষের বহু জন্মে স্মৃতির ফল, সাতিশয় ভাগ্যবান না হইলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না। চৈতন্য মহাপ্রভুর সম্প্রদায়কে আমি ভক্তিভরে প্রণাম করি, জীবনেও আমি তাঁহাদের প্রতি ঘেঘভাব প্রকাশ করি নাই। তবে অযোধ্যার রামভক্ত বৈষ্ণব গণকে আমি এক সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়াছিলাম; ব্রাহ্মণ না হইলে এই সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে পারিবে না—ব্রাহ্মণ মাত্রেই ইহার অধিকারী হইবে। এখন প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় জাত হারা-ইয়া লোকে বৈষ্ণব হয়, যাহাদের জাতি-কুল কিছুই নাই—ধর্মের কোন ধার ধারে না, কেবল পেটের দায়ে এবং রৈকবী কাড়িবার জন্য বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেয়—আমি একদিন অযোধ্যায় এই সম্প্রদায়কে নিন্দা করিয়াছিলাম। যাহাদের ভিতর অন্তসারশূন্য, ভক্তির লেশমাত্র নাই—তাহারা আবার ভক্ত কিসের? আমি আপনাদের নিন্দা করি নাই এবং মহাত্মাদের নিন্দা করিবার শক্তি আমার কোথায়? প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য যে নিজেই প্রেমের ঠাকুর, তাঁহার সম্প্রদায় কি নিন্দনীয় হইতে পারে? তবে যাহারা তাঁহার নামে ব্যভিচার করে আমি তাহাদের নিন্দাই করিয়াছিলাম।

ভক্তবীর তুলসীদাসের সেই সরলতামাথা পবিত্র হৃদয়-ভাব, দেখিয়া শ্রীনিবাস শাস্ত্রী গলিয়া গেলেন। তাঁহাকে এবং তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত রামাং বৈষ্ণবগণকে আন্তরিক সাধুবাদ প্রদান করিলেন। সাধক চূড়ামণি তুলসীদাস তাঁহাদের সকলের নিকট যুবক ভবানী মিশ্রের পরিচয় প্রদান করিয়া, অকস্মাৎ তাহার রামনামে রতিমতির বিষয় বিবৃত করিয়া সকলের নিকট বিদায় হইলেন। সাধু সম্প্রদায় তাঁহার নকট অশেষপ্রকারে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া অভিবাদন করিলেন।

মঠাধ্যক্ষ বয়সে বড়—তাই যাইবার সময় তুলসীদাসকে অশেষবিধ আদর-আপ্যায়ন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। আজ নাভাজীর ভাণ্ডার মনোহর সব যথার্থ বৈষ্ণব-প্রীতি-ভোজে সুসজ্জা হইয়া মঠের পবিত্রতা বর্দ্ধিত করিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

বিপন্নের সহায়

“স্বার কাজ তারে সাজে, অন্মকে লাগি বাজে”। কথাটা পাবে পাবে সত্য। এই যে একটা লোক গোঁসাইগঞ্জ ও যজ্ঞাপুরের উপকণ্ঠে মাঠের ধারে রাস্তার উপর পড়িয়া গৌঁ গৌঁ করিতেছে—বোধ হয়, কাল রাতে উহাকে ডাকাতে ঘাল করিয়া এখানে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে—তাই লোকটা রক্তাক্ত দেহে রাস্তার পাশে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছে; কিন্তু কই, এত লোক ত এই পথ দিয়া যাইতেছে, ভোর হতে এত লোক ত এই পথ দিয়ে যাওয়া-আসা করছে কিন্তু কই, কেহইত উহার কষ্টে কষ্ট অনুভব করিয়া একবার জিজ্ঞাসাও করিল না—হ্যাঁগা তোমার কি হয়েছে? পাছে বিপন্নকে রক্ষা করিতে গিয়া নিজকে বিপন্ন হতে হয়—পাছে একটু গতির খাটিয়ে সেবা করতে হয় বা দুই একদিন খেতে দিতে হয়। পোড়াকালেরই স্বধর্মের—ঘোর কলি উপস্থিত কিনা, তাই বিপন্নের বিপদুদ্ধার করা, এখন ধর্ম-কর্মের খাতা থেকে কেটে দেওয়া হয়েছে—ভুলেও আর কেহ একার্থ্য করে না, এমন পরদুঃখ কাতর লোকও আর নাই।

সত্যই কি তাই—দয়াময়ের এই দয়ার বিষ কি একেবারে

দয়াশূন্য হইয়াছে, বাস্তবিকই কি এখন আর দরিদ্রের বন্ধু, বিপন্নের সহায়, অনাথের নাথ কেহ নাই? না না তাহা কি হয়? যতদিন এ বিশ্ব থাকিবে—যতদিন তাহাতে মানব সমাগম থাকিবে—ততদিন এ জগৎ হইতে মানবের মহৎগুণ দয়াধর্মের উচ্ছেদ সাধন হইবে না। দয়াহীন জীবজগতের মহত্ব—এ মহত্ব যে দিন পৃথিবী হইতে লোপ পাইবে—একটি প্রাণীও যে দিন এ গুণের পক্ষপাতী থাকিবে না—সেদিন তঁ ইহা রাক্ষসের রাজত্ব হইবে—মনুষ্য নাম সেদিন হইতে ত জগত হইতে লোপ হইয়া যাইবে? এখনও সে দিন আসে নাই—আসিবে বলিয়া ত বোধ হয় না; দয়াময়ের রাজত্ব কখনই দয়াশূন্য হইবে না। ঐ দেখ পাঠক! একজন পরম দয়ালু ব্যক্তি প্রাতঃকালে যানারোহণে যাইতে যাইতে পথিপার্শ্বে ঐ বিপন্নকে দেখিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং নিকটে আসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন—কোন দম্ব্য কড়ক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া যুবক রক্ত-স্রাবে অবসাদগ্রস্ত হইয়াছে। এখনও জীবন আছে—শুশ্রূষা করিলে বোধ হয় জীবিত হইতে পারে। তিনি ডাকিলেন—“বামাচরণ জলদি পাণি লে যাও।” গাড়ীর সহস ও কোচম্যান তাড়াতাড়ি আসিয়া বাবুর আজ্ঞা পালন করিল—তাড়াতাড়ি জল আনিতে ছুটিল। ইত্যবসরে বাবুটি পথিপার্শ্বে বনের মধ্যে গমন করিয়া কতগুলি লতার পাতা আনিয়া হস্তে মর্দন করিয়া তাহার রস ক্ষতস্থানে দিতে লাগিলেন, তাহাতে রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া গেল। তার পর ভৃত্য দুইজন বাল্টি করিয়া জল আনিতে বাবু নিজের ক্ষত হইতে মূল্যবান রেশমের চাদরখানি ছিড়িয়া জলে ভিজাইয়া রোগীর ক্ষতস্থান ভৃত্যদ্বয়ের সাহায্যে উত্তমরূপে বাঁধিয়া দিলেন। অতিরিক্ত রক্তস্রাবে যুবক এতক্ষণ অচৈতন্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন;

এইবার প্রাণে একটু শান্তি পাইয়া যুবক চক্ষু মেলিয়া চাহিল, মুখ ব্যাদন করিয়া পিপাসা জানাইলে দয়ালু ব্যক্তিটি তাহার বদনে সামান্য জল প্রদান করিলেন—তারপর ধরাধরি করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া বিপন্ন যুবককে নিজের বাটী লইয়া গেলেন। কে বলে ঈশ্বরের রাজ্য এ কলিতে দয়া-মায়া-হীন হইয়াছে; কে বলে এ জগতে আর দয়ালু ব্যক্তি নাই? “তবে যার কাজ, তাকে সাজে, অন্যকে লাঠী বাজে”। যার হৃদয় আছে; প্রশস্ত হৃদয় লইয়া যে বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরাজত্বে পরকে আপনার করিয়া মহত্ব বিস্তার করিতে আসিয়াছে—তাহার নজরে পড়িলে কি কাহার বিপদ থাকে?

বাবুটি যুবককে গাড়ীতে তুলিয়া কোচম্যানকে দ্রুত গাড়ী হাঁকাইতে বলিলেন এবং অতি সত্বর গৃহে আসিয়া তাহাকে পুনরায় ধরাধরি করিয়া নিজের সুসজ্জিত বৈঠকখানার মধ্যে, পরিচ্ছন্ন গদীর উপর শুয়াইয়া ডাকিলেন—মা সরস্বতি! শীঘ্র খানিকটা দুগ্ধ গরম করিয়া লইয়া এসো ত?

“যাই বাবা!” বলিয়া অতি রমণীয় বামাকণ্ঠে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া চকিতের মধ্যে একটা স্তন্যবতী বালিকা রোপ্য পাত্রে কর্তকটা দুগ্ধ লইয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল এবং পিতার হাতে দিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বিশ্বতনেত্রে বিপন্ন যুবকের অবস্থা দেখিতে লাগিল। কণ্ঠা বুঝিতে পারিয়াছিল—বাবা! যখন গরম দুগ্ধ চাহিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই কোন রোগীকে কুড়াইয়া আনিয়াছেন। এ গৃহস্থের যে এ সকল চিরাভ্যস্ত, চির-জানিত—তবে পিতার কথা বুঝিতে বাকী থাকিবে কেন?

বহুক্ষণ কোন আহাঙ্গাদি হয় নাই, তাহার উপর গুরুতর আঘাতে যুবক বহুক্ষণ মুচ্ছিত থাকিয়া দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে;

তাই বাবুটি আস্তে আস্তে তাহার মুখে সেই গরম দুধ ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। রোগী তাহা পান করিয়া কতকটা স্বস্থ এবং সবল হইল; মুর্ছা অপনোদিত হইলে চক্ষু গেলিয়া চাহিয়া ইত্যন্ততঃ দেখিতে লাগিল। সরস্বতী ততক্ষণ এ সংবাদ অন্তঃপুরে বহন করিয়া লইয়া গেল। এইবার যুবকের চৈতন্য সম্পাদিত হইলে সে কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিল—বউদি! আর বৃথা তোমার সন্ধান করিতে পারিলাম না, কাশীতে আসিবার সময় শুনিয়াছিলাম—তুমি পাগল হইয়া বরাবর কাশীতে আসিতেছিলে, পবে ছগনলাল চৌবে নামক জনৈক মহাত্ম্যব ব্যক্তি তোমাকে আটক করিয়া চিকিৎসা করাইতেছেন। সেই কথা শুনিয়া আমি ভগবান দাস দূরের বাড়ী খুড়ীমাকে রাখিয়া এবং দাদার সন্ধান লইয়া তোমার সন্ধানে বাহির হইয়াছিলাম কিন্তু রাস্তায় দস্যুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে একেবারে মরণের পথে আসিয়া পড়িয়াছি। বোধ হয়, এ যাত্রা আর দেখা হইল না—মনের আশা মনেই রহিয়া গেল—বলিয়া যুবক কাঁদিতে লাগিল।

বাবু পার্থে বসিয়া বলিলেন—“যুবক এখন প্রাণে বেশী উদ্বেগ আনিও না, তাহা হইলে রক্তশ্রাব আরও বেশী হইবে—জীবন আরও বিপন্ন হইবে—ভয় নাই ভগবানে বিশ্বাস কর। যুবক নিষেধাজ্ঞা শুনিয়া চুপ করিয়া উপাধানে ঠেস দিয়া শুইয়া রহিল। একজন চাকরকে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে বলিয়া তিনি নিজেই কবিরাজের বাড়ী দৌড়িলেন।

পথে যাইতে যাইতে মনে করিলেন—এ যুবকটি কে, অতি সুন্দর স্থায় গঠন; দেখিলে খুব ভাল ঘরের ছেলে বলেই বোধ হয়—আর প্রলাপোক্তিতে যা বলে—তাতে ত এ পাগলী মায়ের কোন

আত্মীয় বলিয়া বোধ হয়, আমারও নাম করিল—তবে কি সে পাগলী
 আমার সন্ধানে আসিতেছিল? ভগবান! তাই যেন হয় পাগলী মায়ের
 বিষয় মুখ আর দেখতে পারিনা। মা আমার কোন কথাই বলেন না,
 আত্ম পরিচয় কিছুই দেন না, জিজ্ঞাসা করিলে কেবল কাঁদেন—আর
 অনবরত ঠাকুর ঘরে পূজাহীন নিয়ে বাস্তু থাকেন—খাওয়া-দাওয়ার
 প্রতি, কি এই অল্প বয়সে বেশভূষার প্রতি কিছুমাত্র নজর নাই—চাঁটি
 খাইতে হয়—তাই খান, একখানা পরতে হয়—তাই পরেন, কেবল
 বাগানে ফুল তোলা, গা ধোয়া—আর দেবমন্দিরে পূজার রত থাকাই
 তাঁহার জীবনের ব্রত হইয়াছে। বাড়ীর মহলে প্রায়ই আসেন না,
 সরস্বতী যদি ডেকে আনে—আমার স্ত্রী যদি কিছু বলেন তবেই আসেন,
 নতুবা কেবল চক্ষু বুজে মন্দির ছুয়ারে বসে জপ আর দেবতার চরণে
 প্রণিপাত করেন। মরি মরি, এমন নিষ্ঠা কি এ অল্প বয়সে কারু দেখা
 যায়! পাগলি মা যেন আমার সরলতার আধার, যেন দয়ার প্রতিমূর্তি
 মন্দিরে ভিখারী আসিলে একটীও ফেরে না; এত দয়াময়ী না হলে কি
 স্ত্রীমূর্তির রমণীয়তা বাড়ে? আমি তাঁর জন্ত কেবল ইতস্ততঃ সন্ধান করে
 বেড়াচ্ছি—তার কথা বলিয়া সকলের নিকট সন্ধান নিচ্ছি—কালও
 তাঁর জন্ত যুজাপুর গিয়েছিলাম, আসিবার সময় বিপন্ন যুবককে কুড়াইয়া
 পাইলাম। বোধ হয়, ভগবান এই যুবকের দ্বারাই তাঁহার একটা
 কিনারা করিয়া দিবেন, যুবকের প্রলাপ বচনে যেন তাহারই কতকটা
 আভাস পাওয়া গেল। জয় দীননাথ, সকলই তোমার করুণা;
 এ বিশ্বসংসারে তোমার মহত্বই বলবৎ—মাহুঘ উপলক্ষ্য মাত্র।

এই বাবুটির পরিচয় লইতে বোধ হয়, পাঠকের আর আবশ্যক
 হইবে না—ইনিই আমাদের পরোপকার ব্রতপরায়ণ; বিপন্নের বন্ধু
 ছগনলাল চৌবে আর যে যুবককে বিপন্ন অবস্থার তিনি গৃহে

আনিয়াছেন—তিনি আমাদের পরমধার্মিক তুলসীদাসের প্রিয় বন্ধু—
দুঃখীরাম। বৌদির অন্বেষণে আসিয়া যে বিপন্ন হইয়াছেন—তাহা
তাঁহার প্রলাপোক্তিতেই প্রকাশ পাইয়াছে।

ছগনলাল তাড়াতাড়ি কবিরাজ মহাশয়কে ডাকিয়া লইয়া যুবকের
চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বড়বাড়ীর চিকিৎসা বৃদ্ধ, কবিরাজ
প্রাণপণে করিতে লাগিলেন এবং আশা দিলেন—জীবনের কোন
হানি হইবে না, তবে আঘাত গুরুতর বলিয়া কিছুদিন সময় লাগিবে।
ছগনলাল বলিলেন—কবিরাজ মহাশয়! সময় লাগে—তাহাতে ক্ষতি
নাই—আমি ও সেবার ক্রটি করিব না, প্রাণপাত পরিশ্রম করিতে হয়,
তাও করিব কিন্তু আপনি যত সত্বর পারেন—উহাকে আরোগ্য করিয়া
দিন।

“কোন চিন্তা নাই” বলিয়া কবিরাজ মহাশয় ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া
গেলেন। ছগনলাল তারপর ঔষধাদি খাওয়াইয়া বেলা তিনটার সময়
পূজাহিক শেষ করিয়া,—আহারে বসিলেন। স্বামীর অল্পপস্থিতিতে স্ত্রী
যশোদা আসিয়া যুবকের শিরোদেশে বসিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগি-
লেন। পাগলী মাকে লইয়া তাঁহারা প্রায় তিন মাস কাল অজস্র অর্থব্যয়
করতঃ স্বামী-স্ত্রীতে বিনিব্রনয়নে রজনীযাপন করিয়া তাঁহাকে আরোগ্য
করিয়াছেন, তিনি ভাল হইতে না হইতেই আবার একজন আসিল।
ইহাতে তাঁহারা অস্থখী না হইয়া বরং মহা স্খানুভব করিলেন—
পরের সেবা করিতে পারিলে তাঁহারা যেন জীবন সার্থক্য বলিয়া
জ্ঞান করেন, এইজন্ত বলিতে হয়—ভগবানের এ দয়্যার সংসারে কি
দয়্যালু ব্যক্তির অভাব হয়? যেদিন তাহা হইবে, সেদিন মর্ত্য নিশ্চয়ই
রসাতলে যাইবে।

দুঃখীরাম কয়েকদিন বেশ ভালছিলেন। ছগনলাল এত শীঘ্র তাহাকে

পাতা মুড়িবেন না। ভুলসীদাস

আরোগ্য হইতে দেখিয়া, প্রাণে যারপর-নাই-আনন্দ অহুভব করিতে ছিলেন কিন্তু বিগত রজনী হইতে জরের প্রকোপ অত্যন্ত বাড়িয়াছে, রোগী আবার সাতিশয় যাতনা অহুভব করিতেছে দেখিয়া, পরোপকার পরায়ণ ছগনের প্রাণ অত্যন্ত কাতর হইয়াছে। রোগী কণে কণে অচেতন হইতেছে, জরের ধমকে প্রলাপ বকিতেছে। ছগনলাল ও বশোদা সমস্ত রাত্রি আগিয়া সেবা-সুক্ৰিয়া করিয়াও রোগীর যন্ত্রণার উপশম করিতে পারিতেছেন না। তাই প্রাতঃকালেই কবিরাজ মহাশয়কে ডাকিতে পাঠাইয়াছেন—কেন এমন হইল, ভালোর দিকে আনিয়া রোগ আবার এমন করিয়া বাঁকিয়া পড়িল কেন? রোগী বিকারের ঝোঁকে নানপ্রকার ভুল বকিতেছে। ছগন বলিতেছেন—যুবক! চিন্তা কি, বেশী কথা কহিও না—তাহা হইলে অল্পক বাড়িয়া যাইবে—আরোগ্য হইতে বিলম্ব হইবে কিন্তু সে কথা শুনে কে, চৈতন্যই বা কার আছে?

যুবক এতক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন—এইবার কিছুক্ষণ ছগনের মুখের প্রতি বিলোল দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—ই্যাগা, আমি কোথা, গোসাইগঞ্জ এখান থেকে কতদূর; ছগনলালের বাটী কি তোমরা জান? আমার বৌদিদি যে সেখানে আছেন—আর বুঝি দেখা হইল না, ই্যাগা তোমরা এত করছো, একবার তাঁকে এনে আমার সঙ্গে শেষ দেখা করিয়ে দাও না?

ছগন যুবকের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—যুবক! এত অস্থিরতা প্রকাশ কর্ছো কেন, আর কিছুদিন থাক, তোমার বৌদিদিকে শীঘ্রই এখানে আনিব—তুমি একটু ভাল হও। এখন তাঁর বিষয় বেশী চিন্তা করিলে রোগ যে কিছুতেই আরাম হইবে না।

যুবক। আর আমার আরামে কাজ নাই—আপনারা যথেষ্ট করেছেন—যা মাহুষে পারে না কিন্তু বোধ হয়, এ যাত্রা আমার রক্ষা নাই; আপনি আমার বউদিদিকে একবার এনে দিন, তাঁকে সমস্ত কথা বলে আমি চিরজীবনের মত বিদায় হই—ওঃ বড় পিপাসা।

পিপাসার কথা শুনিয়া ছগনলাল ডাকিলেন—সরস্বতী মা ! একটু গরম দুধ লইয়া এসো ত? সরস্বতী এতক্ষণ দুধ গরম করিতেছিল, সে পিতার আহ্বান শুনিয়া সত্তর দুধ লইয়া আসিল। ছগন খুব সম্ভরণে রোগীকে গরম দুধটুকু খাওইয়া দিলেন। ইত্য-বসরে রামশরণের আহ্বানে কবিরাজ মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছগনলাল বলিলেন—মহাশয়! এ কয়দিন রোগী বেশ ছিল—হঠাৎ কাল রাত্রি হইতে এরূপ বাড়িয়া উঠিল কেন? “আচ্ছা দেখিতেছি” বলিয়া কবিরাজ মহাশয় নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—ভয়ের কোনও কারণ নাই, জরটা একটু বাড়িয়াছে মাত্র। অত্যন্ত মানসিক চিন্তায় জরের সময় এরূপ প্রলাপ বকিয়াছে—নতুবা নাড়ীর গতি কোন প্রকার খারাপ হয় নাই। আপনি চিন্তা করিবেন না এবং উহাকে বেশী বকিতে দিবেন না।

মহাশয়! আমি কি উহাকে বকিতে দিতেছি—পীড়ার যোঁকে নিজেই এরূপ করিতেছে। পাছে কেহ বিরক্ত করে, পরিচয় জ্ঞানিবার জ্ঞান উৎসুক হয়, এইজন্ত আমি কাহাকেও উহার কাছে আসিতে দিই না—নিজেই সমস্ত কার্য্য করিতেছি।

তাহা হইলে শীঘ্রই সারিয়া যাইবে—আপনি বেশী উতলা হইবেন না। এই ঔষধটা দিলাম, দিনে ও রাত্রিতে চারিবার খাওইয়া দিবেন। এই বলিয়া কবিরাজ মহাশয় অভয়দান করিয়া চলিয়া গেলেন।

ছগন কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন—মা! ঔষধ খাওয়াইবার পাত্রটি লইয়া আইস, আর মধুর শিশিটি ওখানে আছে, আনিয়া দাও। কন্যা তাহাই করিল—ছগন ঔষধ মাড়িতে আরম্ভ করিলেন। গৃহে অপর কেহ নাই দেখিয়া, যশোদা আসিয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁগা! কবিরাজ মহাশয় কি বলিয়া গেলেন?

ছগন। তিনি বলিলেন—কিছু ভয় নাই, জ্বরটা একটু বাড়িয়াছে বলিয়া রোগী ঐরূপ আলমাল করিতেছে, এই ঔষধটি খাওয়াইলেই ভাল হইবে।

“আহা! ভগবান যেন তাই করেন, আর যেন বাছাকে কষ্ট না দেন!” বলিয়া যশোদা রোগীর শিরোদেশে বসিয়া জননীর স্নায় পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন। সরস্বতী ঠাকুর-বাড়ীতে পাগ্‌লী মার উদ্দেশে চলিয়া গেল। সরস্বতী পাগ্‌লী মার কাছে থাকিতেই ভালবাসে, তাহার উপদেশপূর্ণ ধর্মকথা শুনিলে তাহার প্রাণ গলিয়া যায়। এই যুবকের কথা পাগ্‌লী মাও শুনিয়াছিলেন। এ বাড়ীর পরোপকার ব্রতের কথা, আর্ন্তের সেবা-শুশ্রূষার কথা পাগ্‌লী মার জ্ঞানিতে বাকি ছিল না। একজন অপরিচিত যুবকের জন্য ছগনের এরূপ ত্যাগ স্বীকারে তিনি বিশেষ কিছু বিস্মৃত হন নাই—তবে কালকের বাড়াবাড়ীর সংবাদে একটু চিন্তিত হইয়াছিলেন—তাই সরস্বতী তাঁকে রোগীর ভাল সংবাদ দিতে দৌড়িয়া গেল।

যশোদা স্বামীকে বলিলেন—দেখ, যুবক নিশ্চয়ই কোন ভাল বংশের ছেলে—আকার প্রকারে যেন সেই রকমই বোধ হয়।

ছগল চুপে চুপে বলিলেন—ভাল আর কোন ঘরের, পাগ্‌লী মার কোন আত্মীয় হবে—তাই একদিনের প্রণামবাক্যে তাহা আর

ভনেছি; পাগ্লীকে খুঁজিবার অশ্রুই বাহির হইয়া যুবক এমন বিপন্ন হয়েছে।

যশোদা। সত্য নাকি, তাহলে ত কোন কথাই নাই—
ভগবান বিনায়াসেই আমাদের প্রতি রূপা করিয়াছেন।

হগন। দেখ, এখন এত আশা করো না, আগে ভালই হউক
তারপর অন্য কথা।

যশোদা। তোমার এত প্রাণান্তিক পরিশ্রম কি তিনি বিফল
করিবেন! যুবক নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে।

হগন। উহার আর কেহই নাই—তাহাও প্রকাশ করিয়াছে।
তাহা হইলে আমাদের মনের আশা “গৃহ-জামাতা” রাখা, তাহাতেও
বোধ হয় কোন ব্যঘাত হইবে না। পাগ্লী মার কাছে এখনও ইহার
পরিচয় জিজ্ঞাসা করি নাই বা দেখা করাই নাই, পাছে অতিরিক্ত
উৎসাহে আবার রোগ বাড়িয়া যায়। এইবার আস্তে আস্তে একটু
একটু করিয়া আশার কথা বলিব। তুমি এখন ক্ষতস্থানে দিবার
অন্য প্রলেপটি তৈয়ারী করে আন।

স্বামীর অনুমতি পাইয়া যশোদা প্রলেপ প্রস্তুত করিতে অন্তঃ-
পুরে গমন করিলেন। এত দাসদাসী থাকিতে এ সকল কার্য
তাঁহার স্বহস্তেই করেন, অপরকে দিয়া বিশ্বাস হয় না—পাছে কেহ
হিতে বিপরীত করিয়া ফেলে।

চতুর্বিংশ পবিচ্ছেদ

অলৌকিক কাণ্ড

আজ সূর্য্যগ্রহণ। কাশীতে মণিকর্ণিকার ঘাটে, কেশব ঘাটে ও দশাশ্বমেধ ঘাটে লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। এই গ্রহণোপলক্ষে বহু-দূরদেশ হইতেও যাত্রিগণ মুক্তিমান করিবে বলিয়া কাশীতে আসিয়া উপ-স্থিত হইয়াছে। বেলা এক প্রহরের পর ঈশানকোণে গ্রহণ লাগিয়া সর্ব্বগ্রাস হইবে—সূর্য্যে এরূপ গ্রহণ বহুদিন লাগে নাই। তাই সাধু সন্ন্যাসী, দণ্ডী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকলেই আসিয়া আজ পবিত্র ভাগীরথী তীরে, অসি-বক্রণরের মধ্যে প্রত্যেক ঘাটে অপেক্ষা করিতেছে। আর এক একবারে “বোম বাবা বিশ্বনাথ” “জয় মা অন্নপূর্ণা” বলিয়া প্রাণের ডাকে কাশীর গগন-পবন মুখরিত করিতেছে।

কেহবা গঙ্গার পবিত্র গর্ভে বসিয়া পুরঃসরণ করিতেছে, কেহ সঙ্কল্প করিয়া ইষ্টমন্ত্র জপে মনোনিবেশ করিয়াছে। কোথাও গীতা পাঠ, কোথাও চণ্ডীপাঠ হইতেছে—অসংখ্য লোক তথায় সমবেত হইয়া সেই পবিত্র পুরাণ-কাহিনী শ্রবণ করিয়া কর্ণকুহর পবিত্র করিতেছে! হিন্দুধর্ম্মের এই একতান সাধনা দেখিয়া অন্তর্জাতীয় জনগণ মুগ্ধ হইতেছে, তাহাদের ধর্ম্মপ্রাণতা, তপস্বিতা দেখিয়া ক্ষণেকের জন্য আশ্চর্য্য হইয়া বাইতেছে, মনে মনে হিন্দুধর্ম্মের, গভীরতার গভীর ভাব উপলব্ধি করিতে গিয়া হতাশ হইয়া পড়িতেছে। ধর্ম্মের কাছে থাকিলে, ধার্ম্মিকের সঙ্গ করিলে প্রাণে

যে একটা শাস্তি আসে—তাহা কেবল হিন্দুই জানে। এইজন্য তাহারা সামান্য একটা ঘটনা উপলক্ষ করিয়া আজ সাধুজন সেবিত পুণ্যক্ষেত্র কাশীধামে আগমন করিয়া ধৃত হইতেছে, ধর্মের এমন বাধা-বাধি ভাব আর কোন সম্প্রদায়ে নাই—তাই ইহারা সামান্য একটা পার্শ্বণও বাদ দেয় না। এখন না হউক, পূর্বে হিন্দুর নিকট ধর্ম বিষয়ে কিছুই বাদ পড়িত না।

টোলের পণ্ডিত ও ছাত্রগণ আজ দলেদলে আসিয়া গঙ্গাতীরে সমবেত হইতেছে। যাহারা একটু বয়স্ হইয়াছে—যাহাদের আয়ুর্নৃত্য একটু ঘনাইয়া আসিয়াছে, তাহারা এই সূর্য্যগ্রহণে গঙ্গানানে আসিয়াছে—পতিতপাবনীর পবিত্র-নীরে অবগাহন করিয়া জীবনের পথ মুক্ত করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছে, আর যাহাদের বয়স অল্প, রক্ত এখন তরল হয় নাই, তাহারা কেহ ধর্ম করিতেছে, কেহ গল্প করিতেছে, কেহ কেহ বা শাণ্ডিল্যান্থের মীমাংসা গুরুদেব কেমন পরিপাটী রূপে হৃদয়গ্রাহী করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, তাহার পরিচয় দিতেছে। মোটের উপর যে যেখানে যে বিষয়েই কথাবার্তা বা গল্প করিতেছে, ধর্ম ছাড়া অল্প কোন ভাব তাহাদের মনোমধ্যে স্থান পায় নাই—স্থানমাহাত্ম্য এমনি সংক্রামক!

এই সময়ে কাশীর কৈদার ঘাটে বলিয়া বিশ্বস্তরের দুইটা ছাত্র কি বলাবলি করিতেছে—পাঠকগণ তাহা শ্রবণ করুন। প্রথম ছাত্র বলিল—তুমি ভাই! যাই মনে কর, আর গুরুদেব যাই বলুন; তুলসীদাস গোস্বামী যে একটা মহাপুরুষ, সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কিছু নাই!

দ্বিতীয় ছাত্র। কেনহে ভায়া, তুমি এইবার আমাদের ছেড়ে-ভবানী মিশ্রের মত তাঁর টোলে ভর্তি হবে নাকি?

১ম ছাত্র। না তা নয়—তবে গুণের আদর ত কৰ্ত্তে হবে ?
তুলসীদাস যে সকল আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখাচ্ছেন; তা কখনও সাধারণ
মানুষে দেখাতে পারে না, ভিতরে একটু ঈশ্বরতত্ত্ব না ঢুকলে, কাহারও
ঐক্যপ করবার সাধ্য নাই।

২য় ছাত্র। কি আশ্চর্য্য অলৌকিক কাণ্ড দেখলে ভায়া !

১ম ছাত্র। কেন, তুমি কি কিছু শোন নাই, সে সকল কথাত
দেশময় রাষ্ট্র হয়েছে ?

২য় ছাত্র। কথাত অনেক রটে, তবে তুমি কি স্বচক্ষে দেখেছো,
না কাকর মারকতে শুনেছ ? আমার কিন্তু ঐ সকল আজগুবী কথায়
বিশ্বাস হয় না !

১ম ছাত্র। ভাই, যা রটে—তার কতকটাও বটে, একেবারে
অবিশ্বাস করা কি উচিত ; কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখাচ্ছেন—
তা তুমি কি জান ?

২য় ছাত্র। কিরকম একবার বলই না হে, তোমার মুখে শুনি ?

১ম ছাত্র। দেখ, সেদিন একটা কুঁজোকে ধরতে হলো না, গায়ে
হাত দেবামাত্রই, তার কুঁজটা চচ্চড় করে বসে গেলো—সে সোজা
হয়ে চলতে লাগলো ; লোকগুলো দেখেই ত অবাক, কাকর মুখে
আর কোনও কথা সরলোনা, এ আমার নিজের চক্ষে দেখা, কাকর
বরাতি নয়।

২য় ছাত্র। একি কখন সম্ভব, তুমি দেখছি—তুলসীদাসের গোঁড়া
হয়ে পড়লে ?

১ম ছাত্র। ভায়া সাধনার কাছে অসম্ভব কি, সাধকের সাধন
বলের ক্ষমতা যে অসীম !

২য় ছাত্র। তাত জানি কিন্তু সে ঐরূপ সাধনা কল্পে কবে,

সেই ঘণ্টাকর্ণ যোগীর কাছে বৎসর কয়েক ছিল—তাতেই এত ?

১ম ছাত্র। সেখানে তিনি ঐ কয়বৎসর, প্রাণান্ত পরিশ্রম করে যোগশিক্ষা করেছেন। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, সকল ঋতুতে তিনি যাহা যাহা কর্তে হয়—যোগীবরের কাছে সে সব শিখেছেন, ঘণ্টাকর্ণ যোগী যোগশক্তি বিষয়ে তুলসীদাসকে নিজের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ মনে করেন। আর এখনত বাবাজীর ঐ কাজ হয়েছে—যেখানে যেখানে ভাল লোকের সম্ভান পাচ্ছেন—অমনি ছুটে গিয়ে, তাঁর কাছে শিখে আসছেন, ছেলে পড়ান এখন ত একপ্রকার ছেড়েই দিয়েছেন। সময় পেলে যা দুই এক ঘণ্টা পড়ান, তাহাতেই ছেলেদের শিক্ষা এত হয় যে অল্প টোলে পাঁচবৎসর খাটলেও তা হয়না।

২য় ছাত্র। তুমি একান্তই দেখছি আমাদের সঙ্গত্যাগ করলে, যেরূপ গোঁড়ামী দেখছি, তাতে বিশ্বস্তরের শিষ্যত্ব আর বেশী দিন নয় !

১ম ছাত্র। তুমি যদি তাই মনে কর—তাতে আর ক্ষতি কি ? তবে আমার কথায় যদি বিশ্বাস না কর—তাহলে একটু অপেক্ষা কর, আজ নিশ্চয়ই গ্রহণোপলক্ষে তিনি গঙ্গাস্নান কর্তে বেরবেন, তাহলেই একবার বুঝতে পারবে, তার বাহাদুরীটা কি এবং কত লোক তাঁর পাছু নিয়েছে, ফল না পেলে কি সহজে কেউ কারু শরণাপন্ন হয় ?

ছাত্রদ্বয় এইরূপ কথা কাটাকাটি করিতেছে, এমন সময় একটা বৃদ্ধ একটা অন্ধ বালকের হাত ধরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—
হাঁ বাবা ! তোমরা তুলসীদাস বাবাজীকে কি এই পথে আসতে দেখেছো ?

২য় ছাত্র। কেন, তোমার তাঁকে কি দরকার ?

বাবা তিনি নাকি সাক্ষাৎ দেবতার মত যাকে বা বলছেন—
তাই হচ্ছে; তাই বাবা! আমার এই একমাত্র পুত্রকে তাঁর
কাছে এনেছি, যদি কিছু কিনারা হয়, আমি অনেক দূর থেকে
আসছি, বলিয়া বৃদ্ধ পথশ্রান্তি হেতু সেইস্থানে বসিয়া পড়িল।

১ম ছাত্র। তোমাকে বেশীদূর যাইতে হইবে না; তিনি এই
পথ দিয়াই গলাঙ্গানে যাবেন—তুমি এইখানে অপেক্ষা কর। বৃদ্ধ
ছাত্রদ্বয়ের কথামত অন্ধ পুত্রকে লইয়া আশার আশ্বাসে সেইস্থানেই
বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে যখন আকাশে সূর্য্যগ্রহণ লাগিবার উপক্রম
হইয়াছে, লোক সকল স্তম্ভিত হইয়া আকাশে সূর্য্যের দিকে চাহিয়া
আছে, ঠিক সেই সময়ে অসিনদীর দিক হইতে বিপুল জনসংজ্ঞের
মধ্য হইতে “জয়সীতা রামজী কি জয়” শব্দে উচ্চরোল উত্থিত হইল।
সকলেই তুলসীদাসের আগমন হইতেছে, ভাবিয়া সসম্মমে দাঁড়াইয়া
উঠিল। ছাত্রদ্বয়ের মধ্যে প্রথম ছাত্রত পূর্ব্ব হইতে তুলসীদাসের
নামে গলিয়া গিয়াছিল, সে সোৎসুক নেত্রে করবোড়ে দাঁড়াইয়া
উঠিল, দ্বিতীয় ছাত্রও দায়ে পড়িয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল—
ব্যাপার কি? বড় বড় রাজা রাজড়ার সমাগম হইলেও ত লোকে
এরূপ ঔৎসুক্য প্রকাশ করে না, তবে এ ব্যাপার কি?

দেখিতে দেখিতে বিপুল জনবাহিনী “জয় জয় রাম রবে” গান করিতে
করিতে সেইদিকেই আসিল। সেই বিপুল জনশ্রোতের মাঝখানে ঠিক
পাগলের মত প্রেমোন্মত্ত সাধকবীর তুলসীদাস, ঐহার পাশে সেই
অম্বরক্ত ভক্ত “ভবানী মিশ্র”। যতই তাঁহার অগ্রসর হইতে লাগিলেন,
ততই “শ্রীরামচন্দ্রের জয়” রবে চারিদিক প্রাবৃত হইতে লাগিল।

বৃদ্ধ বসিয়াছিল, অন্ধপুত্রকে লইয়া সে আশাবৃত্ত হইয়া আসিয়াছে;

আজ তুলসীদাসের রূপায় তাহার পুত্রটিকে চক্ষুস্থান করিয়া লইবে। সে তুলসীদাসকে দেখিবামাত্র পুত্রের সহিত তাহার চরণে গড়াইয়া পড়িয়া বলিল—“সাধুবা! ছেলেটি আমার বুড়ো বয়সের ধন, আর কেউ নাই বাবা! দয়া কর বাবা! নইলে চরণ ছাড়বো না” বলিয়া পা জড়াইয়া পড়িল। দুঃস্থ শোকাক্ত জীবের উপকার করাই এখন তুলসীদাসের জীবনের মহাত্মত্ব হইয়াছে। তিনি বৃদ্ধকে হাত ধরিয়া তুলিয়া লইলেন এবং তাহার পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—বৎস! অন্ধ তুমি; চক্ষুস্থান হইবার সাধ, আচ্ছা! রাম রূপা-বলে দৃষ্টিশক্তি হউক তোমার”।

বাকসিদ্ধ মহাপুরুষের মুখে এই কথা উচ্চারিত হইবামাত্র, অন্ধ বালক দৃষ্টিশক্তি পাইল; “বাবা! আপনি সাক্ষাৎ ভগবান, বলিয়া তাহার পিতা তুলসীদাসের পদবন্দনা করিতে লাগিল, বালকটিও সাধুর পায়ে মাথা রাখিয়া আনন্দাশ্রু সিক্ত করিতে লাগিল। বৃদ্ধ অপরিসীম আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিল—বাবা, আজ হতে আমরা পিতা-পুত্র তোমার দাস হলাম।

তুলসীদাস বলিলেন—বৃদ্ধ! তুমি আমার পিতৃস্থানীয়—ওরূপ কথা বলো না। তোমার পুত্রকে আশীর্বাদ করি, সে দীর্ঘজীবী হউক, তুমি পুত্রকে লইয়া সংসার করগে। একাধো আমার কোন কৃতীত্ব নাই, পুত্রকে ভগবান রামচন্দ্রের ইচ্ছায় এসমস্ত হইতেছে—আমি উপলক্ষ্য মাত্র। এই বলিয়া তিনি ছাত্রগণসহ মণিকর্ণিকা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

প্রথম ছাত্রটি তখন দ্বিতীয়কে সঙ্ঘোষন করিয়া বলিল—দেখলে ভায়া! কেবলদানীটা স্বচক্ষে দেখলে ত আর কোন অবিশ্বাসের কারণ আছে কি? দ্বিতীয় ছাত্রের তখনও বিশ্বাস হয় নাই যে বাহুযে

এরূপ করিতে পারে—হয়, ইহা ভেদে, নয়—অন্ধকে সাজাইয়া আনিয়া তুলসীদাস নিজের বাহাদুরী দেখাইতেছে, লোক সমাজে বড় হইবার জন্য নানাপ্রকার কৌশল জাল বিস্তার করিতেছে। সে বলিল—ভাই! আমার যেন মনে লাগিল না, যদি ঐ অন্ধ বালকটি তুলসীদাসের দ্বারা পূর্ব হইতে এরূপ শিক্ষা পাইয়া আসিয়া থাকে, তাহাওত হইতে পারে?

প্রথম ছাত্র অতিশয় দুঃখিত অন্তঃকরণে বলিল—ভাই! তুলসীদাস বাবাজীর ত এ সকল পয়সা রোজ্জগার করিবার ফন্দি নয়? উনি ত কাহার নিকট হইতে পয়সা লইতেছেন না, তবে এরূপ করিবার আবশ্যক কি?

দ্বিতীয় ছাত্র। ভাই! তুমি যতই বল, আমার কিন্তু উহাতেও বিশ্বাস হয় নাই—যেন কোন ভেদে বলিয়া বোধ হয়।

প্রথম ছাত্র। আচ্ছা! চল, বাবাজীত বাহির হইয়াছেন—এখন ত অনেকক্ষণ নানাস্থান ভ্রমণ করিবেন, আর মুক্তিস্থানের অনেক বিলম্বও আছে, আমরা উহার সহিত ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখি চল, তাহা হইলে আরও অত্যন্ত দৃশ্য দেখিয়া তোমার না হউক, আমারও মন মোহিত হইবে। এই বলিয়া তাহারা দুইজনে তুলসীদাসের সহিত গমন করিতে লাগিল। তাহার সহিত যেন একটা বিঘাট মিছিল বাহির হইয়াছে, অসংখ্য লোক যেন মন্ত্রমুগ্ধের আশ্রয় পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছে। সূর্য্যে যে গ্রহণ লাগিয়াছে, সেদিকে কাহার দৃষ্টি নাই—সকলেই উন্মত্ত ভাবে সেই রামনামে উন্মাদ ভাবুক তুলসীদাসের সহিত চলিয়াছে।

তখন আমাদের দেশে সহমরণ প্রথা খুব প্রচলিত ছিল। পতির মরণে সতী-স্ত্রী তদনুগামিনী হইয়া জলস্তচিহ্নায় আরোহণ করিতেন।

তখন এ প্রথা সমস্ত ভারত পরিব্যাপ্ত ছিল, বলিলেই হয়। স্বামী রমণী জাতির ইহ পরকালের দেবতা। অতিশয় দুঃখের মধ্যে থাকিলেও, মুখে হাসি না আসিলেও পতি যদি হাস্য করেন—সতী হাস্য না করিয়া থাকিতে পারেন না; আবার সতী অত্যন্ত প্রকৃষ্ণিতা হইলেও স্বামীকে কোনপ্রকারে ভ্রিয়মান দেখিলে তাহার বিষাদভাব আপনি আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। রমণীজাতির মত ধর্মপরায়ণা, সাধনসক্ষমা জীব জগতে আর কে আছে? সাধক ভগবানের জ্ঞান যাহা করিতে পারেন না—স্ত্রীজাতি পতির সুখের জ্ঞান, তাঁহার মনস্তটীর জ্ঞান করিতে পারেন না, ত্রিজগতে এমন কার্য কিছুই নাই—এইজ্ঞান হিন্দু-স্ত্রী সকল স্ত্রীজাতির আদর্শ।

অনেকে বলেন—সহমরণ প্রথা বড়ই অগ্ৰায়াচরণ কিন্তু তাহার। জানেন না যে, পতির মৃত্যুতে যথার্থ সতী স্ত্রী কখনই জীবিত থাকিতে পারে না—সহমরণ বন্ধ করিলেও—সে মরিবে? বাস্তবিক এইরকম স্ত্রীর পক্ষেই সহমরণ বিধিবদ্ধ ছিল। যেখানে জোরজবরদস্তি করিয়া প্রথা বজায় রাখিতে হইবে—সেখানে তেমন প্রথা উঠিয়া যাওয়াই বিশেষ প্রার্থনীয়। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি—তখন শক্তির অংশস্বরূপা, সতী-কুলসিমস্তিনীগণের পদরেণুতে ভারত পবিত্রীকৃত ছিল বলিয়া এসকল প্রথার এত আদর ছিল। তুলসীদাস বাবাজীর দল বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় ভিন্ন পথ দিয়া একটী সহমরণ গমনোচ্ছতা যুবতী পূর্ণ ঘট কক্ষে, সুন্দররূপে সীমন্তে সিন্দূর ধারণ করিয়া, সুন্দর চণ্ডা লাল পাড়। সাদী পরিয়া এবং পদদ্বয় অলঙ্কার-রাগ-রঞ্জিত করিত স্ত্রীও পুরুষ পরিবেষ্টিত হইয়া সেই সময় হরিশ্চন্দ্রের আশানবাটে যাইতেছিলেন, অপর লোক সকল তাঁহার পতির শব লইয়া পূর্বে তথায় চলিয়া গিয়াছে।

রমণী তুলসীদাসের সম্মুখীন হইলে একজন বয়স্ক জীলোক বলিল—
মা! আজ তোমার বড় শুভদিন—আজ এই শুভ সূর্য্যগ্রহণের দিনে
পতিঅনুগামিনী হইবার সময় দেবতা-ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ গ্রহণ কর,
আর এই মুক্তপুরুষ, সাক্ষাৎ দেবকল্প মহাত্মা তুলসীদাসের চরণে প্রণাম
করিয়া অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর।

রমণী হাশু-বিষাদ-জড়িত ঢলঢল মুখখানি লইয়া গলবস্ত্রে
তুলসীদাসের চরণে প্রণত হইয়া বলিলেন—ঠাকুর! আশীর্বাদ করুন,
যেন মনোবাসনা পূর্ণ হয়!

উদার প্রকৃতি তুলসীদাস সংসারের লীলাখেলা কিছুই বুঝিতেন
না। সংসার ত্যাগ করিয়া অবধি তিনি জীজ্ঞাতির প্রতি কখন
দৃষ্টিপাত করেন নাই, আজ সহসা সেই সুন্দরী যুবতীকে পদতলে
পতিতা হইতে দেখিয়া, অতি কোমল স্বরে বলিলেন—মা! তোমার
মনোবাসনা পূর্ণ হউক, মনের আনন্দে পতিসহ স্নেহে সংসার যাত্রা
নির্বাহ কর, রাম রূপা বলে তোমাদের সংসার উজ্জ্বল হউক।

রমণী সজলনয়নে করঘোড়ে বলিলেন—প্রভু! আপনি কি
আশীর্বাদ কল্লেন। আমার পতি যে প্রাতঃকালে ইহধাম ত্যাগ
করেছেন, আমি যে তাঁহার সহিত সহমরণে যাইব বলিয়া প্রস্তুত
হয়ে এসেছি; এখন যে আমি অশানে বাছি—এরূপ অবস্থায় ঠাকুর!
আপনি কিরূপ আশীর্বাদ কল্লেন?

তুলসীদাস সহগমনের বেশভূষা কখনও দেখেন নাই—তাই বুঝিতে
না পারিয়া অকপট হৃদয়ে সরল বিশ্বাসে আশীর্বাদ করিয়াছেন।
তারপর যখন শুনিলেন—রমণী পতির চিতারোহণের জন্ত যাইতেছেন,
অথচ আশীর্বাদ করাটা অন্তরূপ হইয়াছে। বাকুলিক সাধক তাহাতে
বিচলিত না হইয়া বলিলেন—মা! তার জন্ত আর চিন্তা কি?

আমার বাক্য নিষ্ফল হইবার নয়; তোমার অদৃষ্টে বৈধব্যযোগ নাই। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার এই চিরানুগত দাসের দ্বারা আবার একটা নূতন কীর্তি দেখাইবেন—বলিয়া আমার মুখ দিয়া এমন কথা বাহির করিয়াছেন। চল দেখি, তোমার স্বামী কোথায়?

এই আশ্চর্য্য বিস্ময়কর ঘটনা দেখিয়া জনসংজ্ঞ্য বিষম আনন্দে গগনভেদী স্বরে চীৎকার করিল—“জয় প্রভু রামচন্দ্র কি জয়, জয় বাবা তুলসীদাস কি জয়”। যে বৃদ্ধটির অন্ধ পুত্র চক্ষু পাইয়াছিল, সে আনন্দে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—বাবা! তুমি সাক্ষাৎ ভগবান, তোমার অসাধ্য কিছুই নাই বাবা! যাহার কুঁজ সারিয়া গিয়াছিল—সে বলিল—বাবা! ভগবান তোমাকে এইরকম দুঃখীদের জন্তই পাঠিয়েছেন—বাবা! তুমি সব কর্তে পার! বিশ্বস্তরের ছাত্রত্বও এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিবার জন্ত লুপ্তচিত্তে তাহাদের সহিত আশানে গমন করিল। তুলসীদাসের এই অমানুষিক ক্ষমতা দেখিবার জন্ত তখন দলে দলে লোক আশানের দিকে ছুটিল, সূর্য্যগ্রহণ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, গদ্যাস্তান করিতে হইবে—ইহা ভুলিয়া অনেকেই সেই অপূর্ণ বিস্ময়কর দৃশ্য দেখিতে হরিশ্চন্দ্রের ঘাটে সমবেত হইল। যে সকল ভাগ্যবান সাধক তুলসীদাসকে জানিতেন—তাঁহার বলিলেন—সাধনবলে মানুষ দেবতার অপেক্ষাও অদ্ভুত ক্ষমতা লাভ করিতে পারে, তুলসীদাস ভক্তির অবতার, সাধকের অগ্রগণ্য, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয় সাধক, তাঁহার দ্বারা এ অসাধ্য-সাধন আর অসম্ভব কি, হায়, জগন্নাথ! কবে আমরা সাধু মহারাজ তুলসীদাসের মত ক্ষমতা লাভ করিয়া তোমার চরণ সমীপে দাঁড়াইয়া ভবের ভাবনা, যমযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইব? প্রভু! অধম আমাদের সে সৌভাগ্য প্রদান করিয়া নরজন্ম সার্থক কর; সর্বসাক্ষী দেব দিবাকর।

আমাদের এ পুরস্কার সার্থক কর। বলিয়া তাঁহারা ভাগীরথীর পবিত্র সলিলে মুক্তির স্নান করিলেন।

এদিকে বাবাজী তুলসীদাস গোস্বামী নিজবাক্য সকল করিবার জন্য স্থানে উপনীত হইলেন—অজ্ঞাত জনশ্রোত তাঁহার সঙ্গে সেই শ্মশানঘাটে আসিয়া জলদগন্তীর স্বরে রামনামে নদীসৈকত মুখরিত করিল, শববাহীগণও তাহাদের সহিত উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল—
“রামনাম সত্য হায়”।

ভক্তপ্রবর তুলসীদাসের হৃদয় চিরকালই অতি কোমল—ধুবতীর মণীর সেই বিষাদমাখা মুক্তি দেখিয়া তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইয়াছিল। তিনি আপনার প্রাণের ধনকে হৃদয়ের মধ্যে জাগাইয়া তুলিয়া বলিলেন—প্রভু! এ কার্য তোমারই; তুমি যেমন বলাইয়াছ, আমি তেমনি বলিয়াছি, এক্ষণে তোমার করুণা বলে যেন মাতৃসমা এ রমণীর বৈধব্য তিরোহিত হয়, তোমার জয়নিমিত্তে যেন ভুবন ভরিয়া যায়! তারপর রমণীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন—কই না! তোমার পতির মৃতদেহ?

রমণী সজলনয়নে—এই যে প্রভু! আমার স্বামীর মৃতদেহ, বলিয়া দেখাইয়া দিলেন।

ভক্তবীর তুলসীদাস খট্টোপরি শায়িত শবদেহের পার্শ্বে বসিয়া, তাহার গাত্রে হস্ত প্রদান পূর্বক বলিলেন—আমি যদি রামনাম জপে কিছুমাত্র পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকি, সেই পুণ্যফলে হে শব! তুমি নবজীবন লাভ করিয়া রামনাম গাহিতে গাহিতে গাত্রোত্থান কর, রামনামের প্রভাব জগতে পরিব্যাপ্ত হউক—জগৎ দেখুক, রামনামের বলে জগতে কত অসাধ্য-সাধন হইতে পারে।

সিদ্ধ সাধকের প্রাণাত্মিক প্রার্থনাবলে, তাঁহার পবিত্র হস্তের পবিত্র

স্পর্শে শবদেহ স্পন্দিত হইল—পরক্ষণে প্রাণ প্রাপ্ত হইয়া রামনাম করিতে করিতে উঠিয়া বসিল। দর্শকবৃন্দ এই বিস্ময়কর ঘটনা সন্দর্শন করিয়া আর থাকিতে পারিল না—সকলে উচ্চৈঃস্বরে রামনাম করিতে করিতে সাধকশ্রেষ্ঠ তুলসীদাসের পদধূলি গ্রহণ করিয়া ধন্য হইল। তুলসীদাস সেই নবদেহীর হস্তধারণ করিয়া রমণীকে বলিলেন—
মা! এই তোমার পতিকে গ্রহণ কর এবং পরম স্বখে সংসার যাত্রা নির্বাহ কর। স্বখে দুঃখে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নাম জপমালা করিও, তাহা হইলে সংসারে আর কোন কষ্ট থাকিবে না।

মৃতদেহে প্রাণ পাইয়া এবং রামনামের অদ্ভুত মহিমা বুদ্ধিতে পারিয়া নবদেহধারী যুবক তুলসীদাসের পায়ে ধরিয়া বলিল—ঠাকুর! যে নামের এত শক্তি, যে নাম মৃতপ্রাণে জীবন সঞ্চার করিতে পারে, সে নাম ঘরে বসিয়া হইবে না—আমি আজ হইতে আপনার সহিত ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করত সাধুসঙ্গে জীবন অতিবাহিত করিব! আপনি আমাকে শিষ্টা বলিয়া গ্রহণ করুন।

তুলসী। না বৎস! আমি তোমার সতী পত্নীর নিকট প্রতিক্ষিত হইয়াছি, অতএব তাহা হইতে পারে না, তুমি অতি নিবিষ্টচিত্তে গৃহে বসিয়া স্ত্রীক প্রভুর নাম করিলে কখনই বিফল মনোরথ হইবে না। যাও বৎস! গৃহে যাও। যোগশক্তির অপূর্বশক্তি দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া রহিল।

মাধু তুলসীদাস সেস্থান ত্যাগ করিয়া পুনরায় জাহ্নবীকূলে আর্গম্নন করিলেন। তখন সূর্য্যগ্রহণ শেষ হইয়া গিয়াছে—সকলে পূজনীয় সাধকবরের সহিত পবিত্র গঙ্গানীরে স্নান করিয়া যে যার গৃহ-যাত্রা করিল।

এই অমাহুতিক ঘটনা দেখিয়া বিশ্বস্তরের প্রথম শিষ্টা দ্বিতীয়কে

সম্বোধন করিয়া বলিল—কেমন ভায়া! এইবার বিশ্বাস হয়েছে কি! না, এখনও সন্দেহ করবার কিছু আছে?

দ্বিতীয় ছাত্র। দাদা! আমাকে ত “থ” করে দিয়েছে, ব্যাপারটা দেখে আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছি; তুলসীদাস বাবাজী দেখছি—সত্য সত্যই দেবতা! ভায়া! আর ন্যায়শাস্ত্র, বেদান্তশাস্ত্রের কচ্‌কচানী করে কি হবে—যদি এ রকম ক্ষমতা না হয়, ত মাহুয জন্মের সার্থকতা কি? আমি ত ভাই লেখাপড়া ছেড়ে যাতে এই রকম মহুয্য লাভ কর্তে পারি, এখন থেকে তার চেষ্টা করবো! এই বলিতে বলিতে দুই বন্ধুতে গঙ্গান্নান করিয়া বিশ্বয় বিষ্ময়চিন্তে গুরু গৃহে গমন করিল।

পঞ্চবিংশ পত্রিচ্ছেদ

স্মৃতি-সদনে

স্বাভাবিক ক্ষমতা অতুলনীয়। শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য কিছুই ইহার সমকক্ষ হইতে পারে না। শারীরিক শক্তি পার্থিব রাজ্যে লৌকিক কার্য্য করে, আর যোগশক্তি পার্থিব ও অপার্থিব উভয় রাজ্যে অলৌকিক শক্তি দেখাইতে সক্ষম। তাই যোগী তুলসীদাসের শক্তি এত বিস্ময়কর।

মৃতের প্রাণদানের পর তুলসীদাসের নাম ভারতের চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। তিনি যে একজন দৈবশক্তি সম্পন্ন, ঈশ্বর জানিত মহাপুরুষ—তাহা আর কাহার জানিতে বাকী রহিল না। এই ঘটনার পর হইতে প্রতিদিন দলে দলে কতলোক আসিয়া তাঁহার

নিকট কৃপা ভিক্ষা করিতে লাগিল। তবে তিনি বেশীদিন একস্থানে থাকিতেন না, কানীধাম তাঁহার প্রধান অবস্থান ক্ষেত্র হইলেও তিনি দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার অসুপস্থিতি সময়ে তাঁহার ছাত্র এবং প্রধান শিষ্য ভবানী মিশ্র কার্য্য করিতেন। তুলসী দাসের দরিত্র সেবা একটি প্রধান কার্য্য ছিল, তিনি না থাকিলেও সে কার্য্যে ব্যাঘাত হইত না। ভবানী মিশ্র ছাত্রবর্গকে লইয়া তাহা সূচাক্রমে চালাইয়া লইতেন। ভবানী এখন তুলসীদাসের প্রধান শিষ্য, গুরুর কৃপায় সাধন ক্ষেত্রে তিনিও এখন খুব উন্নতিলাভ করিয়াছেন। মহাত্মা তুলসীদাসের মত সাধকপ্রবর যাহার জীবন পথের পথ প্রদর্শক, তাহার সে পস্থা হ্রগম ও আলোকময় না হইবে কেন? সেই গুণ্ডা প্রধান ভবানীমিশ্র এখন সাধনমার্গের শীর্ষে সমাধীন বলিলেও অত্যাক্তি হয় না।

তুলসীদাস কিছুদিনের জন্য দেশ ভ্রমণে গমন করিয়াছেন। প্রাণায়াম সিদ্ধ যোগীর পথ ভ্রমণে কোন কষ্ট হয় না, দশদিনের পথ একদিনে বা তাহা অপেক্ষাও অল্প সময়ের মধ্যে যাইতে সক্ষম, অন্যের সে ক্ষমতা নাট। যোগের দ্বারা শরীর অত্যন্ত লঘু ভাবাপন্ন হইলে, বায়ুভরে তাঁহাদের গতি হইয়া থাকে এইজন্য পথের পরিশ্রম তাঁহাদের সহ্য করিতে হয় না—বতদূর ইচ্ছা, সহজে পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে পারেন।

একদিন তদানীন্তন রাজধানী দিল্লী সহর দর্শন করিবার জন্য যোগী-বর তথায় উপস্থিত হইলেন। দিল্লী প্রাচীন হস্তিনানগরী, পুরাণের কত পুরাতন কীর্তি ইহার সহিত জড়িত রহিয়াছে, হিন্দুরাজ্যগণের কত ঐতিহাসিক ঋণভর্য ইহার মধ্যে নিহীত রহিয়াছে দেখিবার জন্য কাহার না ইচ্ছা হয়? বিশেষতঃ মহাত্মা তুলসীদাস পথ পণ্ড্যনে,

সাধু সন্ন্যাসী দর্শনে এবং তাঁহাদের সহবাস সংমিলনে—চিরদিনই একান্ত অমুরাগী। মনের এ আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্য তিনি দিল্লী নগরীতে উপস্থিত হইবামাত্র হিন্দুগণ তাঁহাকে সাদরে স্বর্জন করিল।

তখন ভারতে মুসলমান রাজত্ব বিস্তৃত; দিল্লীধরো বা জগদীশরো বা নামে প্রখ্যাত হইয়া তখন পাৎসাহ আকবর দিল্লীর সিংহাসনে সমলভূত করিতেছিলেন। আকবরের রাজত্ব সময়ে হিন্দুগণের আদর যত্ন, তাহাদের খ্যাতি-প্রতিপত্তি যত অক্লুপ ছিল, তত আর কাহার রাজত্বে ছিল না। আকবর সাহ হিন্দুদিগকে সোণার চক্ষে দেখিতেন; তাহাদের আদর-অভ্যর্থনা করিতেন। তাঁহার সময়ে হিন্দু মহারথীগণ সসম্মানে সমাদৃত হইয়া উচ্চ পদবীলাভ করিতেন—গুণের আদর তাঁহার নিকট ছিল—কারণ তিনি নিজে মহাশক্তি ও জ্ঞানী নরপতি ছিলেন। মুসলমান অধিকারে এমন করিতব্য উচ্চমনা ধার্মিক নরপতি আর কেহ দিল্লীর সিংহাসনে অধিবেশন করে নাই। আকবর বাদশাহই মুসলমান নরপতিগণের মুকুটভূষণ ছিলেন—ইহা সর্ববাদী সম্মত সত্য। তিনি প্রজাবর্গকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতেন, তাঁহার রাজত্বে হিন্দুগণের সকল প্রকার স্বথের পথ মুক্ত ছিল; তিনি হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীকে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন—অনেককে নানা প্রকারে উৎসাহ প্রদান করিয়া তাঁহাদের ধর্মজীবনে অনেক সাহায্য করিয়া গিয়াছেন।

তুলসীদাস একজন মহাসাধু, সাধনবলে তিনি অনেক অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন, মৃতের জীবনদানের ক্ষমতাও তাঁহার আছে, তিনি এখন দিল্লী নগরের হিন্দু পল্লীতে হিন্দুগণের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন, ওনিয়া আকবর সাহ প্রসিদ্ধ গায়ক তাসেনকে

লইয়া একদিন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তুলসীদাস সম্রাটকে দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলেন এবং সম্রাট ভগবানের অবতার বলিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিলেন। হিন্দুপন্থীতে কিছুক্ষণ অবস্থান করিয়া তানুসেন মহাত্মা কবীর রুত কয়েকট গজল গান করিলেন, তুলসীদাস সঙ্গীতজ্ঞ না হইলেও—তাহা শ্রবণ করিয়া সান্তিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। সম্রাট আকবর, তুলসীদাসের সেই কমনীয় কাস্তি তাঁহার যোগ-প্রভাব-সম্পন্ন দৈহিক সৌন্দর্য্য দর্শনে প্রথম প্রীত হইয়া তাঁহাকে একদিন তাঁহার সভায় পদার্পণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তুলসীদাস সম্রাটের অনুরোধ উপেক্ষা না করিয়া একদিন অবসরক্রমে তাঁহার সভায় উপস্থিত হইলেন, সম্রাট সাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া সভাস্থ করিলেন।

সে দিন অনেক আমীর ওমরাহগণও মহাত্মা তুলসীদাসকে দেখিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয় করিলেন। নানাপ্রকার গীতবাদ্য, বিস্তৃত আমোদ-প্রমোদ সেই উপলক্ষে সমাহিত হইয়া সাধক-চিত্তে বিশেষ পরিতোষ প্রদান করিল। এইরূপ আমোদ-প্রমোদে উপযুগুপরি দুই চারি দিন কাটিবার পর, সম্রাটের সহিত তুলসীদাসের মেশামেশি হইলে বাদসাহ একদিন তাঁহাকে কিছু অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করিতে বলিলেন। যোগশক্তি ভোজবাজী দেখাইবার জন্য প্রদর্শিত হইতে পারে না; ভগবানের অভিপ্রেত বিশ্বের কোন হিতার্থে না হইলে একটা খেয়ালের বশবস্তী হইয়া যোগশক্তির অপব্যয় করিতে কোন্ সাধুচিত্ত সম্মতি প্রদান করে?

আকবর তাঁহাকে বারংবার অনুরোধ করিলেও তুলসীদাস তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না, বলিলেন—আমি অতি সামান্য ব্যক্তি,

আমার দ্বারা অলৌকিক ঘটনা কি প্রদর্শিত হইতে পারে? ভগবানের ইচ্ছা না হইলে জগতের কোন কার্যই হইতে পারে না, এবং সে বিষয়ে আমার নিজের শক্তি কিছুই নাই; খেলার ছলে যোগ-বিভূতি দেখান হয় না।

তুলসীদাস সম্রাটের অমান্য করায় তিনি অত্যন্ত রাগাধিত হইলেন এবং তাঁহার বাক্য অবহেলা করার জন্য তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ করিলেন। নিমগ্নিত লোক সকল একটা তামাসা দেখিতে আসিয়াছিল—তুলসীদাস তাহা দেখাইলেন না—আকবরের তাহাতে রাগ হইবার কথা কিন্তু যোগশক্তির ক্ষমতা দেখান, ভোজবিহার্য মত সহজ সাধ্য নহে। জনসাধারণ তাহা না বুঝিয়া অসন্তুষ্ট হওয়ায় বাদসাহও লজ্জিত হইয়া তুলসীদাসের প্রতি কড়া হুকুম জারি করিলেন। সাধক কারারুদ্ধ হইলেন।

সম্রাটের পক্ষে গৃহ ও কারাগার সমান। পৃথিবীহীত ভীষণ কারাগার—এই কারাগার হইতে পরিমুক্ত হইবার জন্য, ইহার গতাগতি বন্ধ করিবার জন্যই ত যোগশিক্ষা, যাহারা এই কারাগার মুক্তির জন্য ভগবানের চরণে আশ্রয় লইয়াছেন—তাঁহাদিগকে এই লৌকিক কারাগার আর কি যন্ত্রণা প্রদান করিবে? তুলসীদাস হিন্দুরাঙ্গণ, তিনি অন্নানবদনে কারা প্রবেশ করিলেন কিন্তু তিনি তথায় জলম্পর্শ করিলেন না। তিনি যখন কাহার পৃষ্ঠে অন্ন-জল গ্রহণ করেন না, সপাকে সমস্ত আহার করেন, তখন মুসলমানের অন্ন-জল গ্রহণ করিবেন কেন? যোগ-পরায়ণ যোগীগণ অন্নজল গ্রহণ না করিয়া শুদ্ধ বায়ু ভক্ষণে অনেকদিন জীবিত থাকিতে পারেন। জিহ্বার অগ্রভাগ ব্রহ্মতালুপথে প্রবেশ করাইয়া অমৃত-পানে বিভোর হইলে সাধকের অল্প আহারের আবশ্যক হয় না।

ইহা দ্বারা যোগীগণ বহুদিন যোগাসনে থাকিয়া তপস্যা করিতে পারেন। তুলসীদাস তাহাই করিলেন কিন্তু দুই চারি দিন তাঁহাকে কারাক্ষক করিবার পর রাজত্বে মহা গোলোযোগ উপস্থিত হইল। কোথা হইতে অজস্র বানরের আগমনী হইয়া দিল্লীনগরে প্রবেশ করত তাহার প্রতিবাসীবর্গকে মহা উতাক্ত করিতে লাগিল। নগরবাসিগণ প্রাণ লইয়া অস্থির সমুদ্র-স্রোতের ত্রায়, কোথা হইতে যে এত বানরের আগমন হইতেছে এবং কেন হইতেছে কেহ, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে পারিল না। রাজসভায়ও তাহাদের উপদ্রব কম হইল না, বাহিরে কিছু রাখিবার উপায় নাই—অমনি বানর আসিয়া তাহা লইয়া যায়। কাপড় বা বিছানা পত্র রৌদ্র শুষ্ক করিতে দিলে তাহা আর বানরের অত্যাচারে ঠিক থাকে না, কাটিয়া ছিঁড়িয়া, বিষ্ঠা মুত্র ত্যাগ করিয়া তাহা একেবারে নষ্ট করিয়া দেয়। ছোট ছেলে-মেয়ে বাটার বাহির হইলে তাহাদের আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া, কখন ভয় দেখাইয়া বিব্রত করে। বড় বড় বানরগণ বৃক্ষ হইতে লাফাইয়া লোকের ঘাড়ে পড়িয়া আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া দেয়। মদ্যহলুত ব্যাপার, সামান্য লাঠি-সোটায়ে ইহার কেহ কোন প্রতিকার করিতে পারে না। এই ভীষণ বানর-বিদ্রোহ ক্রমশঃ সম্রাটের কাণে পৌছিল।

তিনি প্রথমতঃ তুচ্ছ-তাজিল্য করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন—তারপর যখন অন্দর মহল হইতে এ সংবাদ শুনিতে পাইলেন; সভাধিবেশনের সময়ে যখন অট্টালিকার উপরিভাগে বানর-হুমুমানের গতাগতি দেখিতে পাইলেন—তখন তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইল। তিনি তাহাদিগকে মারিবার জ্ঞপ্তি হুকুম দিলেন কিন্তু কয়টা মারিবে—এ যে অসংখ্য! তখন তিনি কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—একি বিপদ? হঠাৎ এত পশুর

আমদানী কোথা হইতে হইল—এ সকল শাখাযুগের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় কিসে? নগরবাসীকে, শুধু তাই কেন—আমার পারিষদবর্গকেও যেরূপ কষ্ট দিতেছে—তাহাতে রাজত্ব করা দায় হইল! সম্রাট বড়ই উতলা হইয়া পড়িলেন, এ আবার কি উপসর্গ, এমন ত কখনও দেখি নাই! অন্য কেহ বিদ্রোহী হইলে সৈন্য সামন্ত দ্বারা তাহার প্রতিবিধান করা যাইতে পারিত, কিন্তু বানরগণকে প্রতিনিবৃত্ত বা সংহার করা যায় কেমন করিয়া? তাহারা ত একস্থানে থাকে না; অট্টালিকার ছাদে, বৃক্ষে-রাশ্তায় ঘাটে থানা দিয়া বসিয়া রহিয়াছে, ইহাদিগকে গোলাগুলির দ্বারা সংহার করিলে ত রাজত্ব নষ্ট হইয়া যায়। আকবর মহা ভাবিত হইয়া পড়িলেন। তিনি কিছুদিন পূর্বে তুলসীদাসকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন—তিনি যে জল স্পর্শ না করিয়া কারাগারে যোগাসনে বসিয়া আছেন—কাহার সহিত কথা কন না, কেহ ডাকিলে সাড়া দেন না—এ সকল কথা তাঁহার আদর্শ মনে নাই।

একদিন কার্যাধ্যক্ষ আসিয়া পাতসাহের নিকট কয়েদী তুলসীদাসের আশ্রয় কাহিনী বিবৃত করিল। কথা শুনিয়া সম্রাটের চমক ভাঙ্গিল, তিনি কয়েকজন হিন্দু পণ্ডিতকে ডাকিয়া তুলসীদাসের সাহসনার জন্য কারাগারে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। ইত্যবসরে একদিন রাজমহলের রাজা মানসিংহ সম্রাট আকবরের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। রাজত্বে বানরের উপদ্রব দেখিয়া হিন্দুবীর মানসিংহও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তারপর জনে জনে শুনিলেন—সম্রাট কিছুদিন পূর্বে একজন হিন্দু সাধককে বন্দী করিয়া কারারুদ্ধ করার দুই তিন দিন পর হইতেই এই উপদ্রব আরম্ভ

হইয়াছে। সাধু এখনও কারাগারে আছেন—কিছু খান না, কাহার সহিত কথা কন না—কেবল যোগে নিমগ্ন।

মানসিংহ সম্রাটের মুখেও এই কথার সত্যতা বিদিত হইয়া একদিন কারাগারে গমন করত সাধুর জিয়াকলাপ দর্শন করিলেন—হিন্দুপণ্ডিতগণ যাহা বুঝিতে পারেন নাই—বিচক্ষণ মানসিংহ যোগা-সনস্থ তুলসীদাসের তপশ্চৈর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, তিনি বুঝিলেন—এই মহাত্মার প্রতি সম্রাটের এই কঠোর দণ্ডাজ্ঞায় রাজস্ব এইরূপ দৈবতুর্কিপাক উপস্থিত হইয়াছে। সাধু মহাত্মার অপমান করাই ইহার প্রধান কারণ, তিনি সম্রাটকে বুঝাইয়া বলিলেন—যাহাকে কারা-রুদ্ধ করিয়াছেন, তিনি সাধারণ লোক নহেন; একদিন তাঁহার নিকট আপনি কিছু অলৌকিক দেখিতে চাহিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার দ্বারা এই অলৌকিক দৃশ্যের সূত্রপাত হইয়াছে। এখন তাঁহাকে সন্তুষ্ট না করিলে ইহা এরূপ ভীষণভাব ধারণ করিবে, যে আপনার রাজত্ব রক্ষা করা দায় হইবে, আর এত রাষ্ট্র-বিপ্লব নহে যে আপনি সৈন্য সামন্তের দ্বারা তাহা রোধ করিবেন—ইহা দৈবতুর্ঘটনা; সাধুর প্রতি অসম্মান প্রদর্শনই ইহার কারণ।

পূর্বেই বলিয়াছি—আকবর সাহের মত পরম বিচারী, ধার্মিক নরপতি দীর্ঘির সিংহাসনে আর কেহ উপবেশন করেন নাই। মানসিংহের কথায় তিনি সমস্ত বুঝিতে পারিলেন এবং সাধুর যোগ-সমাধিভঙ্গের জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে প্রায় অষ্টাহকাল এইভাবে থাকিয়া তুলসীদাস একদিন চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন—তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইল। সম্রাটের নিকট সে সংবাদ পৌঁছিবামাত্র তিনি মানসিংহের সহিত কারাগারে আসিয়া তুলসী-দাসকে অপ্যায়িত করিলেন এবং তিনি না জানিয়া, তাঁহাকে

কারাগারে প্রেরণ করায় বিশেষ অনুতপ্ত হইয়াছেন বলিয়া জানাইলেন।
আকবর সম্রাটের আদর্শ, গুণীর আদর তিনি চিরকাল করেন—তাহাতে
জাতিনির্বিশেষ বা পক্ষপাতিতা তাঁহার ছিল না। বিশেষতঃ সাধু
সন্ন্যাসীগণকে তিনি সাতিশয় মান্ত করিতেন—আকবর চরিত্রের
ইহাই বিশেষত্ব ছিল।

তুলসীদাসকে সাদরে কারামুক্ত করত সম্রাট এই সকল উপদ্রবের
কথা বলিয়া তাহার প্রতিকার করিবার জন্য জেদ করিলেন—
তাহাকে কারাগারে প্রেরণ করার অপরাধে যে এই দৈবদুর্ভাগ্য
হইয়াছে; সকলে তাঁহাকে বিশেষ করিয়া তাহা বলিলেন তুলসীদাস
বানরগণের অত্যাচারে শোভাময় নগরের সৌন্দর্যহানি দেখিয়া মনে
মনে ভক্তের প্রতি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের দয়ার অবধি নাই বুদ্ধিতে
পারিলেন, এবং তাহার প্রতিকার জন্য তিনি পুনরায় যোগে বসিলেন।
তুলসীদাসের দুই একদিন আরাধনার পর, শ্রীরামচরণাশ্রিত
বানামুচর তদীয় গুরুদেব মহাবীরের ধ্যানধারণার পর একদিন
কোথা হইতে কয়েকটি বড় বড় বীর হুতুমান আসিয়া ঐসকল ক্ষুদ্র
বানরকটককে বিতাড়িত করিয়া দিয়া নিজেরা অদৃশ্য হইয়া পড়িল,
তুলসীদাস ইষ্টপদে প্রণতি করিয়া যোগাসন ত্যাগ করিলেন।

মুসলমানগণ এই সময় হিন্দুসাধকের যোগ-বিভূতি দেখিয়া আশ্চর্য
হইয়া গেল। আকবর সাহ তুলসীদাসকে একজন অপূর্ব যোগী-বিভূতি
সম্পন্ন মহাপুরুষ জ্ঞানে সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিদায় দান করিলেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

দর্পচূর্ণ

ধর্মের টান বড় টান—এই টানে আকৃষ্ট হইলে মানুষ আর কোন দিকে চাহিয়া দেখে না ; কেবল ঐ একটানা শ্রোতে গা ভাসাইয়া মনুষ্য-ত্বের কুলে—ভগবানের পাদমূলে আসিয়া জীবন ধন্য করিতে চেষ্টা করে । তুলসীদাসের সেদিনকার ক্ষমতা দেখিয়া বিশ্বস্তরের ছাত্রগণ বিচলিত হইয়াছেন । তাহারা বিশ্বস্তরের টোল ছাড়িয়া তুলসীদাসের টোলে চলিয়া আসিয়াছে । বিশ্বস্তরের পাণ্ডিত্য আর তাহাদের আটকাইয়া রাখিতে পারিতেছে না । তাহারা এখন ধর্মের টানে পড়িয়া বুঝিয়াছে, শুধু পাণ্ডিত্যে জীবনের কোন উপকার হয় না । তাই তাহারা আজ মহাত্মা তুলসীদাসের শরণাপন্ন ; শরণাগত প্রতিপালক তুলসীদাসও তাঁহাদিগকে ঠিক পিতার ন্যায় কোলে তুলিয়া লইয়া অভয় দিয়াছেন, তাহাদের অন্ধকারময় হৃদয় রামনামের জ্ঞানালোকে আলোকিত করিয়াছেন ।

বিশ্বস্তরের টোলে এখন আর কোন ছাত্র নাই । কেবল তাহার প্রিয় সহচর ও ছাত্র ভানুদত্ত এখনও তাহাকে ছাড়িতে পারে নাই—সে এখনও কাষার ছাষার মত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া তাঁহার পাণ্ডিত্যের তারিক করিতেছে, তোষামোদ করিয়া তাঁহার শীর্ণ পুচ্ছ ফাঁত করিয়া দিতেছে । ধর্মভাব ত- তাহার হৃদয়ে নাই—তাই সে পাণ্ডিত্যকেই বড় দেখে—তুলসীদাসের ন্যায় গুণী-জ্ঞানীকে তাহার পছন্দ হয়না । বিশ্বস্তরের খ্যাতি প্রতিপত্তি এখন আর তত না থাকিলেও

পূর্য প্রতিপত্তির জন্য রাজস্ববর্গের নিকট যে মাসহারা বন্দোবস্ত আছে, তাহাতেই খুব স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়—দৈনিক আয়ের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না।

আজ তিনি জাতক্রোধ শাস্তির জন্য তুলসীদাসের প্রতি সামাজিক শাসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহাতে পণ্ডিত সমাজ তুলসীদাসকে মান্য না করেন—সাধু-সমাজ যাহাতে তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন—সেইরূপ একটা দোষাবহ কুৎসা রটনা করিয়া তাহাকে সমাজে রহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাই আজ তাঁহার সভাপতিত্বে কাশীতে দণ্ডী, সন্ন্যাসী, যোগী এবং পণ্ডিতগণের এক সভা আহূত হইয়াছে। বিশ্বস্তর সকলকে বলিতেছেন—মহোদয়গণ! শ্রবণ করুন, তুলসীদাস কিরূপ অন্যায়াচরণ করিতেছে; সে দুই একটা ভোজ্যবিষ্ঠা দেখাষ্টয়া এরূপ অনাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে যে সাধুও বুধ সমাজে তাহার আর স্থান হইতে পারেনা, সে একান্ত পতিত হইয়া গিয়াছে, তাহার ভ্রষ্টাচারিত্বের বিষয় আমার প্রিয় সুহৃদ ভানুদত্ত সমস্ত স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে। কেমন হে ভানুদত্ত! তুমি কি সত্য সত্যই তুলসীদাসকে সেই ব্রহ্মহত্যাকারী, বিপ্র-কুল-কলক ভবানী মিশ্রের সহিত একত্র ভোজন করিতে দেখিয়াছ?

ভানু। আজ্ঞা হ্যাঁ! আমি স্বচক্ষে তাহার ঐ অনাচার দেখিয়াছি, পরের মুখে শুনি নাই। তুলসীদাস ভবানীর সহিত একপাত্রে আহার করিতেছেন—ইহা আমার স্বচক্ষে দেখা।

সাধু সন্ন্যাসীগণ ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—কি মা-শর্ধ্য—দিনে দিনে হলো কি, দুই একটা ছোঁড়া সাধু-সন্ন্যাসী সাজিয়া আর্ধ্যশাস্ত্রের শাসন অমর্যাদা করিল—আচ্ছা, ভানু! তুমি তাঁহাকে সে সময় কোন কথা বলে না কেন?

ভাৱ। আজ্ঞা হ্যাঁ! আমি বলেছিলাম কিন্তু তিনি বলেন—
এ ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা পাপ বিমুক্ত হইয়া বিমুক্ত দেহধারী হইয়াছে, ইহার
সহিত আহায়ে কোন দোষ হইতে পারে না।

বিশ্বম্ভর। এখন তিনি নূতন যোগী কি না, তাই তাঁর এরূপ
দাঙ্গিকতা বিশ্বাসের বিষয় নহে! বিশেষতঃ তিনি ঘটাকর্ণ যোগীর
প্রধান ছাত্ররূপে পরিগণিত হয়ে, এখন চতুষ্পাঠী খুলেছেন, নূতন
ব্যবস্থার উদ্ভাবন কচ্ছেন—এরূপ আত্মাভিমান হবে বৈকি?
এখন এরূপ বিধি-ব্যবস্থার উলটপালট করে—লোকের সর্বনাশ
করেন বই কি! কিন্তু আমি এতদিন এই ঈশ্বরজ্ঞ সাধু-সন্ন্যাসী-দণ্ডী-
গণের পবিত্র পন্থাহুসরণ করে—কাশীর মধ্যে প্রধান ব্যবস্থাপক
রূপে দণ্ডায়মান রহিচ্ছি—অতএব আপনাদের অনুমতি লইয়া তাঁহার
পাপের সমুচিত দণ্ড বিধান করোঁই করোঁ—এক্ষণে সভামণ্ডলী
তাঁহার জন্য আমাকে কি আজ্ঞা করেন?

সকলে আর্ন্তবাগীশ মহাশয়ের প্রস্তাব সম্পূর্ণ অনুমোদন করি-
লেন এবং বাহাতে তুলসীদাসের দমন হয়, তাহার জ্ঞাত উপায়
উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

একজন বলিলেন—আমরা সকলে ত তুলসীদাসের অর্ধাচীনতার
কথা শুন্লেম এবং আপনার প্রস্তাবানুসারে তাঁহাকে সামাজিক
দণ্ড বিধানের প্রস্তাব আছে কিন্তু কাশীর মধ্যে ঘটাকর্ণ যোগী
প্রবীণ, সর্বশাস্ত্রজ্ঞ এবং বোগ বিশারদ; ধর্মক্ষেত্রেও তিনি কাশীর
যোগীগণ্ডলী অপেক্ষা সমধিক অগ্রসর—এ সভায় তাঁহার আগমন হয়
নাই; তিনি উহার গুরু, তাঁহার মতামত ভিন্ন ত কোন কাজ হইতে
পারে না!

ভানুদত্ত বলিল—তাঁহাকে এই সভায় সর্ব প্রথমেই আহ্বান

করা হইয়াছিল, তিনি সকলেরই প্রণামা ; তবে কেন যে তিনি আসেন নাই—তাহা জানি না, বেলা প্রায় শেষ হয়—আসিবেন কি না তাহারও স্থিরতা নাই ; বোধ হয় তুলসীদাস তাঁহার প্রিয় শিষ্য এবং তাঁহাকে রহিত করাই এ সভার উদ্দেশ্য জানিয়া হয়ত নাও আসিতে পারেন !

সকলে সম্মুখে বলিল—ভুল, ভুল, মহাভুল ! ঘটাকর্ণ সেরূপ ধরণের মহাপুরুষ নহেন, যে একজন অধাশ্রিতকে প্রাশ্রয় দিবেন, পুত্র হইলেও তাঁহার নিকট অব্যাহতি নাই, শিষ্য ত কোন ছার !

ঘটাকর্ণ যোগীর জন্য তুলসীদাসের সমাজরাহিত্য বিষয়ে কেহ কোন মতামত প্রদান করিতে পারিতেছেন না ; ঘটাকর্ণ যে এখনকার সমাজের শিরোভূষণ ; তাঁহাকে বাদ দিয়া, তাঁহার মতামত না লইয়া এত বড় একটা মহৎ কার্য্য কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না। অতএব আজ সভার কার্য্য স্থগিত থাকুক—তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠান হউক, তার পর ইতিকর্তব্যতা স্থির করা যাইবে। বুদ্ধ তিনি—অশ্রু হইয়া পড়িতে পারেন ত ? বিশ্বস্তর মহা চিন্তিত হইলেন—আজ সভার কার্য্য স্থগিত থাকিলে, হয় ত তুলসীদাস সময় পাইয়া সকলকে ঠিক করিবেন—কাঁদিয়া কাটিয়া ধরিলে—সকলে হয় ত তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন—তাহা হইলে তাঁহার মনোবাসনা সিদ্ধ হইবে না। বিশ্বস্তর বিষাদিত চিত্তে সভার কার্য্য বন্ধ করিবার জন্য একটু ইতস্ততঃ করিতেছেন, এমন সময় শিষ্য ঘটাকর্ণ যোগী তথায় সমুপস্থিত হইয়া আপনার বিলম্বের জন্য ক্রটি স্বীকার করিলেন।

সকলে অতি সমাদরে তাঁহাকে সভার মধ্যস্থলে লইয়া গেল,

এবং সভাপতি রূপে বরণ করিয়া সে দিনকার সভার কৰ্ত্তব্যকাৰ্য্য নিৰ্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। তুলসীদাসকে সমাজে রহিত করিতে হইবে, শুনিয়া ঘটাকর্ষণ জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন, তাহার অপরাধ কি ?

বিশ্বম্ভর বলিলেন—সে ব্রহ্মঘাতী ভবানী মিশ্রের সহিত একত্র পান-ভোজন করিয়াছে। এইজন্য সন্ন্যাসী ও দণ্ডী সমাজ তাঁহার সহিত একযোগে কার্য্য করিতে বা তাঁহার সহিত সমাজে চলিতে রাজি নহেন। সকলেই এ বিষয়ে একবাক্যে মত প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে আপনার অভিমত পাইলেই সর্ব্বসম্মতিক্রমে আমরা তুলসীদাসের সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে পারি।

ঘটাকর্ষণ বলিলেন—তুলসীদাস অতি অল্প বয়স হইতেই আমার নিকট মাহুয হইয়াছে, তাহার স্বভাব চরিত্র আমি ভাল জানি—সে যে সহজে একজন ব্রহ্মঘাতীর সহিত অন্নভোজন করিবে—ইহা আমার বিশ্বাস হয় না। সে পরম মেধাবী ছাত্র, বিশেষ শিক্ষিত, গুণী এবং জ্ঞানী, প্রাণায়াম সাধনায় সুসিদ্ধ মহাযোগশালী, সে যে না বুঝিয়া হঠাৎ ভবানী মিশ্রের সহিত মেশামেশি করিয়াছে—তাহা আমার বোধ হয় না, নিশ্চয়ই ইহার ভিতর কোন গুঢ় কারণ আছে। অতএব আমার অহুমতি জানাইয়া তাহাকে এই সভায় পরীক্ষার জন্ত আহ্বান করা হউক ?

সাধুর সংযুক্তিপূর্ণ বাক্য শুনিয়া সকলেই বলিলেন—বেশ বেশ—তাহাই হউক ! বলিয়া একজন তুলসীদাস বাবাজীকে ডাকিতে যাইবে ! এমন সময় দেখিল—বিষম সময়োহে অন্ধ, খঞ্জ এবং কয়েকটী বিপ্র-সম্ভান সেই পথ দিয়া বাবা বিখনাথের মন্দিরপানে প্রধাবিত হইতেছে। তাহারা সঘনে বাবা বিখনাথ ও মহাত্মা তুলসীদাসের জয় ঘোষণা করিতেছে। তাহার মধ্যে ব্রাহ্মপন্থীর রামসর্ব্বস্ব,

নিধিরাম প্রভৃতি অনেক ধার্মিক মহাত্মাও রহিয়াছেন, দেখিয়া বিশ্বস্তর জিজ্ঞাসা করিলেন—আরে রামসৰ্ব্ব স্ব ভায়া যে, ব্যাপার কি, এত সমারোহে আজ পূজার আয়োজন কেন?

রামসৰ্ব্ব। কেন, আপনি কি কিছু শুনে নাই, আমার মৃতপুত্র নিধিরাম মহাত্মা তুলসীদাস বাবাজীর কৃপায় পুনর্জীবন প্রাপ্ত হয়েছে?

বিশ্ব। বল কি! তোমার পুত্র এই নিধিরাম কি মায়া গিয়াছিল না কি?

রাম। আজ্ঞা হাঁ, গত পরশ রাতে বিস্মৃতিকা রোগে প্রাণ হারাইয়াছিল, ছাদশ দণ্ড শবদেহ রক্ষা করিয়া ইহাকে স্থানান্তরে দাহ করিতে লইয়া যাওয়া হয়—বধুমাতাও হিন্দু-রীতি অনুসারে সহমৃত্যু হইতে গিয়া রাস্তার ধারে মহাত্মাকে প্রণাম করেন—তিনি না জানিয়া “জন্মায়তী” হও বলিয়া আশীর্বাদ করেন—পরে বখন শুনিলেন—ইহার পতি মৃত, ইনি সহগমনোত্তম; তখন সাধু বলিলেন—আমার কথা অত্যাচার হইবে না, চল দেখি, বলিয়া স্থানান্তরে গমন করিয়া “রামনাম” বলে ইহাকে বাঁচাইয়াছেন, শুধু কি তাই, এই সকল অন্ধ-বিশ্বাস ও ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি ব্যাধিমুক্ত হইয়াছে। তাই! তুলসীদাস বাবাজী সাক্ষাৎ দেবতা, আমরা সপরিবারে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছি।

রামসৰ্ব্ব ভট্টাচার্য্য কাশীর একজন বিশিষ্ট বড়লোক এবং ধার্মিক, তাঁহার কথা শুনিয়া সকলে বলিল—কি আশ্চর্য্য, তবে তুলসীদাস বাবাজীকে ত সহজ লোক বলে বোধ হয় না!

বিশ্বস্তর সক্রোধে আশ্চর্য্যজনক করিয়া বলিলেন—বুদ্ধবাকী, বিধম মায়াবী, সাধু-মণ্ডলী! আপনারা আশ্চর্য্যবিত্ত হবেন না—মেটা গোড়া

থেকেই ভেঙী বিড়া শিক্ষা করে, লোকের চক্ষে ধাঁধা দিতে শিখেছে!

ঘণ্টা। পণ্ডিত জী! নিরপেক্ষতা অবলম্বন করুন, একদেশ-দর্শীতার বশবর্তী হয়ে—ক্রোধ করবেন না—বিশেষ প্রণিধান করুন।

সকলে সম্মুখে আশ্চর্য্যাব্বিত হইয়া বলিলেন—অন্ধ-খন্ড আরাম করা না হয়—ভেঙী হইল কিন্তু মৃত ব্যক্তির প্রাণদান দৈব-কমতা ভিন্ন কখন সম্ভবপর নহে।

রাম। মহোদয়গণ! ভক্তবীর তুলসীদাস নিশ্চয়ই পরম যোগী, তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন হয়ে ভগবানের আদেশে পৃথিবীর উপকার কর্তে জন্মেছেন। সাধারণ অজ্ঞ লোকের চক্ষে না হয়—তিনি ধাঁধা দিতে পারেন বা ভেঙী লাগাতে পারেন কিন্তু আপনাদের গ্রাস্ত পরম জ্ঞানীর নয়ন ত কখন প্রতারিত হবে না, আপনারা একবার মহাত্মাকে পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবেন!

ঘটাকর্ণ উচ্চৈশ্বরে বলিলেন—পণ্ডিতমণ্ডলী! আপনারা একটু অপেক্ষা করুন; সে আমার পুত্রস্থানীয় এবং প্রিয়শিষ্য তাহাকে চাকিয়া পাঠাইয়াছি; আসিলেই সমস্ত সংশয় দূর হইবে।

“যে আজ্ঞা যে আজ্ঞা” বলিয়া সকলে যোগীবর ঘটাকর্ণের কথায় অন্তঃসম্মত করিল।

কাশীর প্রধান স্মার্ত্তবাগীশ পণ্ডিত বিশ্বম্ভর বিষ্ণু ক্রোধাক্ত হইয়া রামসর্কস্বকে বলিলেন—তুমি এখন বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে পূজা দিতে পাবে না ঘটক্ষণ তাহার পরীক্ষা না হয়। ব্রহ্মঘাতীর সহিত যে একত্র আহার করে, সেই তুলসীদাসের শিষ্যের পূজা বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে দেওয়া নিষিদ্ধ!

রামসর্কস্ব রাগে জলিয়া উঠিয়া বলিলেন—দেখুন স্মার্ত্ত-বাগীশ

মহাশয়! আপনি পণ্ডিতাগ্রগণ্য বটেন, —কিন্তু যোগশক্তি আপনার কোথায়, যে আপনি বাবাজীর সমকক্ষ হইবেন? ধর্ম জগতে তুলসীদাসের তুলনায় আপনি অতি নগণ্য।

রামসর্ব্বত্র প্রভূত অর্থের অধিকারী এবং ধাশ্বিক পণ্ডিত, তিনি দাস্তিক বিশ্বস্তরকে গ্রাহ্য করিবেন কেন? তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হইয়া বিশ্বস্তরকে বেশ দুকথা শুনাইয়া দিলেন—বিশ্বস্তরের ক্রোধও সামান্য নয়—হুইজনে হাতাহাতি হয় দেখিয়া ঘণ্টাকর্ণ বলিলেন—আপনারা স্থির হউন, তুলসীদাস আসিলে আমি সমস্ত বিষয়ের মিমাংসা করিয়া দিতেছি—একটু অপেক্ষা করুন।

ইতিপূর্বে একজন লোক তুলসীদাসকে ঘণ্টাকর্ণ যোগীর আশীর্বাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য গিয়াছিল কিন্তু তিনি তাহার পূর্বে বহু জন পরিবেষ্টিত, রামনামে উন্নতবৎ হইয়া ভবানী মিশ্রের সহিত খঞ্জনী সহকারে গান গাহিতে গাহিতে তথায় উপস্থিত হইলেন, সেই হৃদয়োন্মাদকারী রাম গুণাত্মকীর্তন শ্রবণ করিয়া ভক্তমাত্রেই নয়নের জলে বুক ভাসাইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণপরে গান থামিল, তথাপি তুলসীদাসের প্রাণের, আবেগ এখনও ঘুচে নাই—ভবানীর কোলে মাথা দিয়া তখনও তিনি অচৈতন্য, এ দৃশ্য দেখিয়া বিশ্বস্তর ভিন্ন সকলেই ভক্ত তুলসীদাসকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণপরে তুলসীদাস প্রকৃতিস্থ হইয়া শ্রীগুরুচরণে প্রণাম করত অবনত মস্তকে আদেশ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

ঘণ্টাকর্ণ বলিলেন—বৎস তুলসীদাস! আজ বড় সমস্যার মধ্যে আস্থান করিয়া তোমার সাধন-ভজনে বাধা দিয়াছি বালিয়া কিছু মনে করেনা।

তুলসীদাস ভক্তি-বিমিশ্র স্বরে বলিলেন—প্রভু! আপনার পাদ-
পদ্ম দর্শনই যে মহাসাধনা; আজ বহুদিনের পর ও রাজীবচরণ দর্শন
করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম, এক্ষণে প্রভু! দাসের প্রতি কি কোন
আদেশ করিবেন?

ঘটাকর্ণ। বৎস! এই সমাগত সাধুগণ আজ তোমার প্রতি
বিরূপ, বিশেষতঃ বিশ্বস্তর স্মার্ত্যবাগীশ তোমার প্রতি অত্যন্ত বিরোধ
প্রকাশ করিতেছেন। তিনি বলেন—তুমি ব্রহ্মহত্যাকারী মহাপাপী
ভবানীর সহিত একত্র তোজন করিয়াছ; অতএব তুমি পণ্ডিত-
মণ্ডলীর ঘৃণার পাত্র হইয়াছ। এইজন্ত বিশ্বস্তর আজ এই সভার
আহ্বান করিয়া তোমার সহিত সকল সংশ্রব রহিত করত
শ্রীমন্দিরে প্রবেশাধিকার নিষেধ-আজ্ঞা প্রচার করিতেছেন। এক্ষণে
তুমি সকলের সমক্ষে গমন করত অপরাধ মোচনের উপায় উদ্ভাবন
করিয়া আমার মান রক্ষা কর।

তুলসী। ভগবন্! এই ভবানী মিশ্র শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মহত্যাকারী
নহে; পণ্ডিতজী তাহাকে জোয় করিয়া ব্রহ্মহত্যাকারী বলিয়া জীবন
ত্যাগের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। খেলার সময় ধাবন-কুর্দনে সে ব্যক্তি
পড়িয়া মারা গিয়াছে, তাহাতে ভবানীর দোষ কি? সেত ইচ্ছা
করিয়া তাহাকে বধ করে নাই?

ভানুদত্তের সহিত বিশ্বস্তর সরোষ-কটাক্ষে উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—
ভুল, ভুল, সম্পূর্ণ ভুল। সে ইচ্ছা করিয়া, রাগের বশবর্তী হইয়া
তাহাকে বিনাশ করিয়াছে—এইজন্ত শাস্ত্রসঙ্গত তাহার জীবনাস্ত
প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছিল।

তুলসী। মহাশয়! আমি যতদূর জানি এবং প্রমাণ পাইয়াছি,
তাহাতে সে ইচ্ছা করিয়া ঐ মহাপাপ করে নাই—তবে যদি আপনি

জোর করিয়া বলেন—করিয়াছে, তবে আমি তাহার প্রতিবাদ করিতে চাহি না; কিন্তু যদি ব্রহ্মহত্যাই করিয়া থাকে—তাহার জন্ত আবার একটা জীববধের ব্যবস্থা কেন? অহুতাপানলে দগ্ধ হওয়াই ভাল—তাহাকে দেখিয়া লোকের শিক্ষা হইবে, মরলেই ত সব ফুরাইয়া গেল। আমি যতদূর জানি, তাহাতে সে ব্রহ্মঘাতী নহে, অথচ মরণের জন্ত জাহ্নবী-জীবনে জীবনত্যাগ করিতে গিয়াছিল। আমি তাহাকে প্রতি-নিবৃত্ত করিয়া পক্ষকাল অনাহারে অনিদ্রায় রামনাম জপের ব্যবস্থা দিয়াছি। যে রামনাম একবারমাত্র উচ্চারণ করিলে লক্ষ লক্ষ মহাপাতক ক্ষয় হয়, আমি তাহাকে পক্ষকাল—ওহো অসংখ্য জপের ব্যবস্থা দিয়াছি। ভক্তিভাবে প্রাণের সহিত “নাম” জপ করিয়া ভবানী সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছে। “রামভক্ত বিকাল মুক্ত” এইজন্ত আমি উহার সহিত একত্র ভোজন করিয়া থাকি। ভবানী এখন যে গঙ্গা বারির মত পবিত্র!

বিশ্ব। সে বিষয় প্রমাণ কি?

তুলসী। প্রমাণ মহাশয়ের নিকট, আপনি যেরূপ ভাবে তাহাকে পরীক্ষা করিতে হয়—করুন, ভবানী তাহাতে প্রস্তুত আছে!

সকলে। বেশ কথা, ভাল কথা, উত্তম প্রস্তাব, এর বাড়া আর কি কথা আছে। পণ্ডিতজী আপনার এক্ষণে কি অভিপ্রায় রাক্ত করুন।

বিশ্বস্তর। অবশ্যই কর্ণো; এক্ষণে আপনারা অনুমতি করুন, আমি হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করি।

সকলে। আমরা কায়মনে বল্ছি—আপনি হৃদয়-ভাব প্রকাশ করিয়া ভবানীকে পরীক্ষা করুন।

বিশ্ব। হে সাধু মণ্ডলী! আপনারা আমার মনোগত অভিপ্রায়

প্রবণ করুন—এ মহাপাপী ভবানী মিশ্রের হস্তে কিছু মিষ্টান্ন এবং ফলমূল দিয়া ভগবান বিশ্বনাথের মন্দির সম্মুখে ঐ প্রস্তর নির্মিত ষণ্ডের নিকট প্রেরণ করা হউক; ভবানী ঐ সকল উপকরণ ষণ্ডের মুখের নিকট ধরিলে ঐ প্রস্তর নির্মিত ষণ্ড যদি উহা ভক্ষণ করে, তবে জানিব—যে ভবানী নিষ্পাপ হইয়াছে এবং তুলসীদাসের ব্যবস্থা দান সত্য হইয়াছে, নতুবা মনে মনে আপনাকে নিষ্পাপ জানিয়া এই মহাপাপের একটা মনগড়া প্রায়শ্চিত্ত করিলে তা চলিবে না!

সকলে সম্মুখে বলিলেন—উপযুক্ত পরীক্ষা, এ প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত বলিয়া সকলে সভাপতি ঘণ্টাকর্ণ যোগীর আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

“বিষম পরীক্ষা” ঘণ্টাকর্ণ বলিলেন—বৎস; তুলসীদাস! শুনিলে কি, সাধুমণ্ডলীর মনোগত ইচ্ছা, এক্ষণে ভবানী এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে কি?

তুলসী। প্রভু! আপনার আদেশ এবং সাধু মহোদয়গণের আজ্ঞা শিরোধার্য্য, আপনি কিছু ফলমূল ও মিষ্টান্ন আনিয়া দিতে বলুন—ভবানী পরীক্ষা দান করিবে।

সমাগত জনমণ্ডলী ভক্তবীর তুলসীদাসের ভক্তি-তেজো-গর্ভ কথ্য শুনিয়া বিশ্বয় বিক্ষারিত নেত্রে তাঁহার বদনের প্রতি চাহিয়া ভবানীর পরীক্ষা দেখিবার জগৎ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিপক্ষ সকল মনে করিল—এইবার তুলসীদাসের বাহাদুরী সকলের সমক্ষে ঘুচিয়া যাইবে, প্রস্তর নির্মিত ষণ্ড কি কখন ভবানীর হস্ত হইতে ঋণ্য দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারিবে—অসম্ভব!

ঘণ্টাকর্ণ আদেশ করিবামাত্র একটা পাত্রে করিয়া কিছু মিষ্টান্ন ও

ফলমূল লইয়া আসা হইল। তুলসীদাসের বদন তখন ভক্তিভরে অতি কমনীয় রক্তিমাত ভাব ধারণ করিয়াছে—আর ভবানীর হৃদয় ভয়ে ছুঁক ছুঁক কাঁপিতেছে। তুলসীদাসের হৃদয় তখন ভক্তি-তেজে ভরা—রামনামের অনন্ত-মহিমায় পূরা, তিনি পাত্র হস্তে করিয়া বলিলেন—বৎস ভবানী! যাও, হৃদয়-পদ্মে ইষ্টমূর্তি স্থাপন করত রামনামে মন সুদৃঢ় করিয়া যাও বৎস! ষণ্ডের নিকট; রামনাম মহামন্ত্র বলে—ঐ জড় দেহে প্রাণ সঞ্চার হইয়া তোমার প্রদত্ত খাদ্য নিশ্চয়ই ভক্ষণ করিবে। ভক্তাধীন ভগবান কখনও ভক্তের প্রতি বাম নহেন। অবশ্যই তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে।

ভবানী মিশ্রের প্রাণ বহু পূর্ব হইতেই তৈয়ারী হইয়াছিল। হৃদয় তার ভক্তিভরা, মনে তার দুর্জলতার লেশমাত্র নাই। গুরু-দেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, ভক্তি-বিশ্বাসে হৃদয় পূর্ণ করিয়া, প্রেমাক্ষ ফেলিতে ফেলিতে সে সেই পাত্রপূর্ণ খাদ্য-দ্রব্য লইয়া ষণ্ডের নিকট অগ্রসর হইল। রাম-প্রেমে বুক ভাসাইতে ভাসাইতে সে যেমন পাত্রটী প্রস্তরময় ষণ্ডের মুখের নিকট ধরিল—অমনি সকলে উচ্চৈঃস্বরে “জয় প্রভু রামচন্দ্রকি জয়” নামে গুগন বিদীর্ণ করিল—আর এ কি এ, মরি মরি এ যে অসম্ভব—সম্ভব হইল! রামনামের অসীম মহিমা দেখাইতে; ভক্তের মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিতে ঐ যে প্রস্তর নির্মিত ষণ্ড লহ লহ রসনা বহির্গত করিয়া অতি আগ্রহের সহিত ভবানী প্রদত্ত আহাৰ্য্য দ্রব্য অবাধে ভক্ষণ করিল! সকলে নির্নিমেঘ লোচনে দৃষ্টিপাত করিয়া আনন্দধ্বনি ও করতালি সহকারে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল—“জয় সীতাপতি রামচন্দ্র জীকি জয়” “জয় ভক্তবীর বাবা তুলসীদাস গোঁসাইজীকি জয়”

“জয় ভক্তপ্রবর ভবানী মিশ্রিকি জয়”। জনমগুলী আর থাকিতে পারিল না—সকলে আসিয়া তুলসীদাসের পদপ্রান্তে পতিত হইল এবং ভবানীকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া রুত রুতার্থ হইল।

ঘণ্টাকর্ণ যোগ-বিহ্বল হইয়া বসিয়া ছিলেন—এক্ষণে শিষ্যের এই অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া, তাহার অসীম ক্ষমতা—অতুলনীয় রামভক্তির বিভূতি দর্শন করত সাগ্রহে নাগিয়া আসিয়া তুলসীকে বুকে ধরিয়া বলিলেন—ভক্ত চূড়ামণি! আজ তোকে আলিঙ্গন কোণে আমিও ধন্য হলাম; ধন্য তোর রাম ভক্তি, ধন্য তোর সাধন-শক্তি। আজ ঘণ্টাকর্ণ তোর মত পরম ভক্তের গুরু হইয়া নিজেকে স্পর্দ্ধাস্থিত মনে করিতেছে। বৎস! আশীর্বাদ করি, তুই দীর্ঘজীবী হয়ে একপে জগতে শ্রীরাম মহাত্মা প্রচার করত জীবকুলের উদ্ধার সাধন কর।

তুলসীদাস তৃণাদপি স্নীহ হইয়া ভক্তি গদগদকণ্ঠে করষোড়ে বলিলেন—গুরুদেব! নররূপী সাক্ষাৎ দেবতা আপনি; দাসের বাহা কিছু শক্তি, সমস্তই ঐ পদ প্রসাদেই লাভ হইয়াছে; ইহাতে আমার কৃতীত্ব কিছুই নাই আমি অতি অজ্ঞ; জ্ঞানহীন, প্রেমভক্তি-বিহীন, রামনামের মহিমা জানা আমার সাধ্য কই প্রভু? অনন্ত অনন্ত বদনে বাহা বাক্য কর্তে পারেন না, ব্রহ্মাদি দেবগণ যে মহিমা বর্ণনে অশক্ত, ক্ষুদ্র আমি সেই মহতোমহিষানের মহিমা কিরূপে বাধ্য করিব দেব! তবে গুরু আপনি, আশীর্বাদ করুন—যেন রামপদে মতি রাখিয়া এ ছার জীবন অবসান কর্তে পারি! আবার জয়ধ্বনি সহকারে জনমগুলী উত্তেজিত হইয়া বিশ্বস্তরের প্রতি তীব্রদৃষ্টি করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ভানুদত্ত ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, তথাপি গুরুর সঙ্গ ত্যাগ করিল না।

ঘণ্টাকর্ণ বিশ্বস্তরের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—পণ্ডিতজী! তুলসী-
দাস ও ভবানীকে আর কিছু পরীক্ষা করিতে চাও কি?

জনমগুলী উচ্চৈঃস্বরে বলিল—হিঃ হিঃ!

বিশ্বস্তর লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া বলিলেন—না, আজ
হইতে আমি তুলসীদাসকে আর পরীক্ষার কথা বলিব না—ভবানী
যে নিষ্পাপ হইয়াছে, তাহা এই পরীক্ষায় স্বীকার করিলাম। তারপর
সকলে ভগবান রামচন্দ্রের, তুলসীদাসের ও ভবানীর জয় এবং
বিশ্বস্তর পণ্ডিতজীর ক্ষয় চিন্তা করিতে করিতে হুটুচিন্তে সে দিনকার
মত আপন আপন ভবনে প্রস্থান করিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

চোরের উপদ্রব

আগুন কতক্ষণ চাপা থাকে, পাংশুজালে কতক্ষণ সে আবদ্ধ
থাকিয়া আপন প্রভাব বিস্তারে অসমর্থ হয়? একটু বাতাস
আদিলেই ছাই উড়িয়া যায়—অগ্নির প্রভাব বিকাশ প্রাপ্ত হয়।
সাধক তুলসীদাসের তাহাই হইল। তিনি এতদিন নিজেকে অতি
গোপনে রাখিয়া ভগবানের পদে আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন। কেহ
ধরা-ছোঁয়া না পায়, কেহ তাঁহাকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া জানিতে না
পাবে, এইজন্য তিনি ছাই ঢাকা আগুনের মত এতদিন স্বইচ্ছায়
নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিশ্বস্তরের পরীক্ষারূপ বাতাস আজ
তাঁহার সে আবরণ ঘুচাইয়া দিল। জগত জানিতে পারিল—তুলসীদাস
একজন সিদ্ধ সাধক—মহাপুরুষ! তখন বড় বড় ধনীলোক তাঁহার

শিষ্য গ্রহণ করিতে লাগিল। তুলসীদাস বেগতিক দেখিয়া তাঁহার সে আশ্রম ত্যাগ করত, অগস্ত্যকুণ্ডের নিকট খুব একটি নিভৃত পল্লীতে গিয়া কুটীর নির্মাণ করিলেন, কিন্তু প্রকাশ হইলে কি আর লুপ্তান থাকা যায় ? ভক্তমণ্ডলী সেইখানেও গমন করিতে লাগিল। সাধু মহাত্মার কিছু আবশ্যক নাই, তিনি কাহার নিকট কিছু চাহেন না, তথাপি কোথা হইতে যে তাঁহার অর্থাগম হইতেছে—তাহা ভগবানই জানেন। এই সেদিন রামশর্মা তাহার পুত্র জীবিত হওয়ায় সাধু বাবাকে এক প্রস্তুত সোণার ও রূপার বাসন পূজার জন্য দিয়া গিয়াছেন।

তুলসীদাসের সামান্য কুটীরে ঐ সমস্ত মহামূল্য দ্রব্যাদি দেখিয়া কত লোকের লোভ হইয়াছে; দ্রব্য তত্ত্বগণ কেবল সন্ধান গ্রহণ করিতেছে—কখন তুলসীদাস বাড়ীছাড়া হইবেন, তাহারা ঐগুলি লইয়া চম্পট দিবে। তুলসীদাসের কুটীরত বড় অট্টালিকা নয়—যে তাহার মধ্য হইতে ঐ সকল দ্রব্য লইতে কষ্ট হইবে—বা সিঁদ কাটিতে পারিবে না সাধু একবার সরিলে বা দুই দণ্ড চক্ষু বুজিয়া বসিলেই কাজ হাঁসিল করা যাইবে, তুলসীদাস একবার কোথাও যাইলেই হয়।

আপনার তপঃশক্তি ক্ষয় না করিলে, মৃতের জীবন দান, প্রস্তুত নির্মিত ঘণ্ডের আহাৰ গ্রহণ ইত্যাদি অমানুষিক ক্রিয়া দেখান হয় না; আর এ সকল না দেখাইলেও প্রভু রামচন্দ্রের মহিমা প্রচার হয় না, এই জন্য তুলসীদাস এই সকল কার্যে বিশেষ তপস্কর করিয়া, এখন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাই তপস্যা না করিলে আর চলে না। ভবানী কয়েক দিন হইল, দেশান্তরে গিয়াছেন—তুলসীদাসের কোন বিশিষ্ট আবশ্যকের জন্যই তিনি গিয়াছেন। কুটীরে এখন লোক নাই—বেশ জনশূন্য। তাই তুলসীদাস আজ সন্ধ্যার পর সামান্যমাত্র জলযোগ করিয়া ভগবানের পূজায় বসিবেন।

আজিকার পূজায় আড়ম্বর নাই; ফুল-চন্দন-তুলসী প্রভৃতি দ্রব্যাদি সংগ্রহের আবশ্যক নাই। ভক্ত নিজের মন-কুস্থমে, ভক্তি-চন্দন মাখাইয়া ভগবানের পাদপদ্মে প্রদান করত মানসপূজা করিবেন। ইহাই বথার্থ পূজা—সাধক এই পূজা করিয়াই আপনার ইষ্টদেবকে প্রসন্ন করিতে পারেন, সাকারভাবে বাহ্যিকপূজা কতকটা চিত্তস্থির করিবার জন্য কিন্তু চিত্ত যার বশে আসিয়াছে—মন যার মনের মত হইয়া থাকিতে শিখিয়াছে—তাহার আর বাহ্যিক পূজার তত দরকার হয় না।

সন্ধ্যার সময় তুলসীদাস একবার উঠিয়া গৃহে দীপদান করিলেন। তারপর কমণ্ডলু লইয়া নদীতীরে স্নানার্থ গমন করিলেন। আজ সমস্ত রাজি জাগিয়া পূজার ইচ্ছা, তাই স্নান না করিলে—এই দাক্ষণ গ্রীষ্মে গৃহের মধ্যে অবস্থান করিতে পারা যাইবে না। ভক্ত ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া বাহির হইলেন। গৃহের দ্রব্যাদি সমস্ত চারিদিকে ছড়ান রহিল, কেবল দরজায় শিকলটি তুলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। গৃহী হইলে কত যত্নে, কত সাবধানের সহিত ঐসকল মহামূল্য দ্রব্য রাখিয়া যাইত কিন্তু সংসারভাগী সাধুর সে চিন্তা নাই, সোণার বাসন-কোপনে তিনি মহামূল্য দ্রব্য দেখিতে পান না, মহামূল্য তঁাহার, রামনামে; পার্থিব দ্রব্যের মূল্য তঁাহার কাছে কিছু নাই।

একটি তক্তর ওত পাতিয়া বসিয়াছিল—সাধু চলিয়া যাইলে, ঐ দ্রব্য গুলি চুরী করাই তাহার উদ্দেশ্য, তুলসী চলিয়া যাইবা-মাত্র সে সেই দাক্ষণ অন্ধকারের মধ্যে জড়সড় হইয়া গৃহে প্রবেশ করিল গৃহ-প্রজলিত আলোর সাহায্যে স্নান রৌপ্যের দ্রব্যাদি সমস্ত একত্র করিয়া যেমন বাহির হইয়া যাইবে, অমনি কোথা হইতে একটি তীক্ষ্ণ তীর আসিয়া তাহার মস্তকের উপর দিয়া

চলিয়া গেল। তস্কর দেখিল—যদূরে একটি সুন্দর সুঠাম বালক রূপের প্রভায় বনভূমি আলো করিয়া দৌড়িয়া আসিতেছে। তস্কর আর দাঁড়াইল না, অন্ধকারে বনের মধ্যে মিশিয়া গেল। এই রূপে কিয়ৎক্ষণ আর কাহার সাড়া পাওয়া গেল না—বালক আর দেখা দিল না।

লোভ সঞ্চরণ করা বড় শক্ত—বিশেষতঃ এতগুলি সোণা রূপার জিনিষ তস্করের চক্ষে পড়িলে সে লোভ যামলাইতে পারিবে কেন ? আর যখন চুরি করিবার খুব সুযোগ রহিয়াছে, তখন কি ছাড়া যায় ! রাত্রি অনেক হইয়াছে, বালক আর কতক্ষণ ঘুরিবে—এইবার সে নিজস্থানে চলিয়া গিয়াছে—এ বালক বোধ হয়, তুলসীদাসের কোন আত্মীয় হইবে। যাহা হউক, এতরাত্রে আর কেহ নাই, মনে করিয়া চোর আবার আসিল, গৃহ-প্রবেশ করিয়া আবার দ্রব্যগুলি লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিল কিন্তু কাহার পদশব্দ শুনিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল, দেখিতে দেখিতে সাধু বাবাজী কুটীর সম্মুখে আসিলেন, তস্কর আর পলাইতে না পারিয়া কুটীরের একপাশে একখানি কালো কষল মুড়ি দিয়া অন্ধকারে পড়িয়া রহিল। সে জানে বাবাজী এখন পূজায় বসিয়া ধ্যানস্থ হইবে—তাহা হইলেই সে দ্রব্যাদি লইয়া সরিয়া পড়িবে। আর হইলও তাই, ভক্তবীর তুলসীদাস ভাব গদগদ হইয়া বলিলেন—প্রভু ! আর কতকাল এমন করিয়া ছাড়াছাড়ি হইয়া থাকিব—আর কতকাল তুমি আমাকে পরের মত অকূলপাথারে ফেলিয়া রাখিবে ! পিতা ছাড়া পুত্র আর কতকাল একাকী বাহিরে বাহিরে ঘুরিবে দীননাথ ! বড় বাসনা—একবার চন্দ্রচক্ষে তোমার সেই নবদুর্বাদল-শ্রামরূপ দেখে জীবন সার্থক করবো কিন্তু কই, সে সাধ কি পূর্ণ

কর্ষে না ঠাকুর ! লীলাময় লীলাবশে কি অধমকে দেখা দিবে না ? কিন্তু তা হবে না—তুমি যত চাতুরী করিবে, আমি তত তোমার সে চাতুরী ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিব। তুমি যাবে কোথায় প্রভু ! ভক্তিরটানে তোমাকে যে আসিতেই হইবে ? এই বলিয়া একেবারে সমাধীস্থ হইয়া পড়িলেন—তাহার বাহ্যচৈতন্য কিছুমাত্র রহিল না !

“অয়মেষ সময়ঃ” এই ঠিক সময় বুঝিতে পারিয়া তস্কর গা ঝাড়া দিয়া উঠিল। রাত্রি তখন অনেক, প্রকৃতি নীরব, দাক্ষণ অন্ধকারে পৃথিবী পরিব্যাপ্ত, অগন্তকুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বের রাস্তা নির্জন, কেবল বনের মধ্যে ঝিল্লী শুধু ঝিঁ ঝিঁ করিতেছে, একটি নিশাচর পক্ষী বা পশুরও গতাগতি নাই ! তস্কর দ্রব্যগুলি লইয়া যেমন পালায়ন করিবে, অমনি সেই বালক ধনুর্বিদ্যা লইয়া দৌড়িয়া আসিতেছে—দেখিতে পাইল। তস্কর বুঝিল—সাদুবাবা ! বুঝি এই বালকটাকে চর রাখিয়াছে, এ যেরূপ ধনুর্বিদ্যা জানে, তাতে ত আমার একার দ্বারা এ কার্য্য হইবে না, যাহা হউক—আজ পালাই, আর একদিন দেখিব কিন্তু মরি মরি ! এমন বালক ত কখন দেখি নাই—যেন সাক্ষাৎ গোলোকের হরি, রূপের প্রভায় অন্ধকারে আলো ফুটেছে !

পুনরায় আর একটা ভীষণ শল্য গভীরশব্দে সেইদিকে নিক্ষিপ্ত হইলে তস্কর আর দাঁড়াইল না—প্রাণভরে উর্দ্ধ্বাসে পলায়ন করিল, তাহার এত সাধের, এত লোভের দ্রব্য সমস্তই পড়িয়া রহিল। এত তত্ত্ব হইতেছে—গৃহে চোর প্রবেশ করিয়াছে ; তথাপি সাধুর চৈতন্য নাই, তিনি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন—বাহিরে কি হইতেছে—কি না হইতেছে, ধ্যানস্থ সাধুর চিত্ত—তাহা জানিতে পারিল না, অন্তবে তিনি পরমানন্দে ভগবানের চরণ-মকরন্দের অমৃত পানে

বিভোর, তুচ্ছ বিষয়-বৈভব তাঁহার নিলিপ্ত চিত্তকে বিব্রত করিতে পারিবে কেন?

যখন ধ্যান ভাঙ্গিল—তখন প্রাতঃকাল হইয়াছে; সকলে স্ব স্ব কার্য্য ব্যাপদেশে প্রস্থান করিতেছে; কাক কোকিল এতক্ষণ গাছের ডালে, মন্দির চূড়ে বসিয়া সূর্য্যোদয়ের জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল। যাই, লোহিত লোচন ভাহু পূর্ব্ব গগনে বিকসিত হইলেন—তাহারাও অমনি আহারাঘেষণে নিজ নিজ কলরব করিতে করিতে বাসার বাহির হইল। তুলসীদাসের ছাত্রগণ আসিয়া আপনাদের বসিবার স্থান পরিষ্কার করিয়া নিজ নিজ পাঠে মন দিল। বাবাজী প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া তাহাদের সম্মুখের আসনে সমাসীন হইয়া বলিলেন—কাল তোমাদের কোন্ বিষয় সন্দেহ ঠেকেছিল, বল দেখি?

১ম ছাত্র। প্রভু! আপনি বলেছেন, ভগবান রামচন্দ্র সকল জীবের হৃদয় মধ্যে বিরাজ কচ্ছেন কিন্তু সব মানবে সেই পরমাত্মার বিকাশ ভাব দেখতে পাওয়া যায় না কেন?

তুলসী। “সবাহি ঘটমে হরি বসে, যেও গিরিসুতমে জ্যোতি।

, জ্ঞান গুরু চক্ৰমক্ বিনা কৈসে প্রকট হোতি॥”

বৎস! সকল জীবের দেহে ভগবান আত্মরূপে বিরাজ করছেন বটে কিন্তু জ্ঞান ভিন্ন তাঁহার প্রকাশ হয় না। সকল পাখরেই আঁগুণ আছে কিন্তু লৌহের আঘাত ভিন্ন যেমন তাহার প্রকাশ হয় না, তেমনি গুরুর উপদেশ রূপ চক্ৰমকি ভিন্ন মানব হৃদয়ে কি প্রকারে সেই আত্মার প্রকাশ সম্ভব? অতএব বৎস! গুরুর উপদেশ মত ভজন-সাধন কর, তাহা হইলেই ভগবানের কৃপালভ কর্তে পারবে!

ছাত্র। প্রভো! আপনি ত আমাদের মহাগুরু—উপদেশ দিন, কেমন করে ভগবান রামচন্দ্রের ভজনা করিও?

তুলসী। তুম্ জ্যায়সা রাম পর, তুম্‌সে ত্যায়সা রাম।

ডাঙ্কিনে যাওত ডাহিতে যায়, বামে যাওত বাম ॥

বৎস! গীতাতেও ভগবান এই কথা বলেছেন—তুমি তাঁকে যেমন করে ডাকবে, তিনি তোমাকে সেইরূপ ভাবেই দেখা দিবেন। অমুকুলভাবে ভজনা কর, তিনি অমুকুল হবেন—প্রতিকুল ভাবে কল্পে তিনি প্রতিকুল হবেন। অতএব চিত্ত সংযত করে ভগবানকে অমুকুল ভাবে ভজনা কর! তাহা হইলে মনোবাসনা সিদ্ধ হবে।

ছাত্র। তবে অতি সংযতভাবে, সর্বাস্তকরণে ভগবানের চরণ-পদ্মে আত্ম সমর্পণ কল্পে—তবে তিনি সদয় হবেন?

তুলসী। হাঁ বৎস!

“যো যাকে শরণ লিয়ে, সো রাখে তাকো লাজ।

উল্টা জলে মহলি চলে, বহি যায় গজরাজ ॥

যে যাহার শরণ গ্রহণ করে—সে তাহার মান নিশ্চয়ই রক্ষা করে থাকে। দেখ, জলের শরণাগত হয়ে, মৎস্য সকল অনায়াসে উজ্জান জলে ভীষণ তরঙ্গ অতিবাহিত করে যেতে পারে—উহার কত ক্ষুদ্র, কিন্তু বৃহদাকার হস্তি ভীষণ প্রতাপশালী হয়েও তাহা পারে না—তাহা ত জানে না?

ছাত্র। তাতো জানি, তবে ভগবানের শরণাগত হওয়া চাই—নতুবা কিছু হয় না?

তুলসী। হাঁ বৎস! প্রভু যে আমার শরণাগত প্রতিপালক, তাঁকে আত্ম সমর্পণ না কল্পে কি তাঁর দয়া হয়, তিনি দীন-জন-বল্লভ।

“নিজ দাসনকে ওর প্রভু, করত কৃপা অতি ভূরি।

ভক্ত কৃপা বৎসল হরি, জানত হ্যায় কবি গুরি ॥”

ভক্তবৎসল ভগবান তাঁহার অল্পগত জনের প্রতি অতিশয় কৃপা প্রকাশ করেন, তিনি যে ভক্তবৎসল এবং ভক্তাধীন—তাহা কবি ও পণ্ডিত মাত্রেই জানেন।

সাধকবীর তুলসীদাস নানা প্রকারে তাঁহার শিষ্যগণকে উপদেশ দিতেছেন। শিষ্যবর্গ গুরুদেবের মুখে সেই জ্ঞানগর্ভ উপদেশ সকল শ্রবণ করিয়া মুগ্ধচিত্তে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া আছেন, চারিদিকে নিস্তব্ধতা বিরাজিত।

এমন সময় একজন লোক “বুক গেলো” নাধু বাবা রক্ষা করো, “বুক গেলো” বলিয়া আছাড় খাইয়া তুলসীদাসের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। তুলসীদাস শিষ্য তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বলিলেন—কেন, কেন, কি হয়েছে! ভয় কি, তোমার কি কষ্ট হচ্ছে?

আগন্তুক অতিশয় কাতরতা সহকারে বলিলেন—বাবা! আমি আর এমন কাজ কখন করোঁ না, কাল থেকে আমি চারিদিকে একটা কালো ছেলের চেহারা দেখে কেবল আত্মকে উঠছি, ঘুমুতে পাচ্ছি না, যেন চারিদিকেই সেই কালো ছেলেটার চেহারা আমায় ভয় দেখাচ্ছে। তুমি বাবা, তাকে বারণ করো, আর যেন আমাকে এমন করে সে ভয় না দেখায়, আমি আর চুরি করোঁ না, তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, আমি আজ থেকে চুরি বিড়ে ছেড়ে দিলুম।

তুলসী। কে তুমি, কি বল্ছো! আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

আগন্তুক। বুঝবে কি করে বাবা! তোমার সোণা রূপের বাসন দেখে আমি চুরি কর্তে এনেছিলাম কিন্তু একটা কালো ছেলে—

আমাকে তীর মেয়ে মেরেফেল্‌বার উত্তোগ করেছিল, যতবার চুরি করে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছি, ততবারই সে তীর ছুঁড়েছে, তার পর প্রাণ নিয়ে পালিয়েও নিস্তার নাই, কেবল যেন ভয় দেখাচ্ছে, বাবা! তুমি না হয়, তোমার তাকে একবার ডাক, আমি তাঁর পায়ে ধরে ক্ষমা চাই।

তুলসীদাস বুঝিলেন—এ লোকটা তস্কর, আমার বাসন চুরি কর্তে এসেছিল কিন্তু আমিত ঘরে ছিলাম না—অন্যাসেই ত নিয়ে যেতে পারতো, কে একে বাধা দিয়েছিল; কালো ছেলে কে, আমার ঘরে ত কেউ ছিল না! হ্যাঁ বাপু! সে ছেলেটা কেমন, তার রূপ কিরূপ—দেখেছো কি?

আগন্তুক। ওগো! আমি এখন যে আব্‌ছা আব্‌ছা দেখছি, সে কালো হলেও যেন ভুবন আলো করে রয়েছে, কি তার বাণের তেজ—লাগেনি তাই, নতুবা কি রক্ষে ছিল?

তুলসী। হ্যাঁ বাপু! তুমি কাফে আমার কুটীর চৌকী দিতে দেখেছো; তার আকৃতি প্রকৃতি কি রকম বলতে পার কি?

তস্কর। সাধু বাবা! তার প্রকৃতি যেমন স্তম্ভর, দেহটীও সেইরূপ নখর, আমি তেমন খুবসুরৎ বালক কখন দেখি নি। তাই তাকে দেখে অবধি আমার কেবল তারই রূপ মনে হচ্ছে, চারিদিকেই সেই মোহন বালকের রূপ-মাধুরী দেখতে পাচ্ছি—সাধু বাবা! সে ছেলেটা কোথায়, একবার দেখাও না?

তুলসীদাস আর থাকিতে পারিলেন না। তস্করের মুখে তাঁহার কুটীর-প্রহরীর রূপ গুণ শুনিয়া ভাবমগ্ন হইয়া বলিলেন—তস্কর! তস্কর! তাই আমার, এস তোমায় আলিঙ্গন করে, আমি ধন্ত হই। আমি বেশ বুঝছি সে শ্যামবর্ণ নখর বালক আর কেহই

নয়—আমারও অন্তর মধ্যে অবস্থিত ভগবান শ্রীরামচন্দ্র। তস্কর, কে বলে তুমি তস্কর—মহাপাপী, তুমি অতি সৌভাগ্যবান—তোমার পুণ্যের তুলনা নাই; আমি আজন্ম তপস্যা করে যাকে দেখতে পাইনি—তুমি তস্কর হয়ে তাকে দেখতে পেলি! এইজন্য বলিতে হয়—তিনি যাকে দয়া করে দেখা দেন, সেই দেখতে পায়—নতুবা কেবল যোগ তপস্যাতে কিছু হয় না। হায় হায়! আমি এই সকল মূল্যবান বাসন গৃহমধ্যে স্থান দিয়ে কি কুকর্মই করেছি! প্রভুকে আমার এই ধন রক্ষার জন্য সমস্ত রাত্রি জাগরণ কর্তে হয়েছে? হায়, আমি কি নরাধম—আমার উপায় কি হবে? না আর না, আমি এসকল দ্রব্য আর ঘরে স্থান দিব না, এখনি এ সমস্ত বিতরণ করে দিবো! ভাই তস্কর! তুমি ঐ সকল দ্রব্য অনায়াসে গ্রহণ কর, স্ব-ইচ্ছায় আমি তোমাকে ঐ সকল দ্রব্য প্রদান করছি।

তস্কর। সাধু বাবা! আর আমার এমন কথা বোলো না; আমার কিছুতেই আর দরকার নেই স্ত্রী-পুত্র, সংসার আর কোন দিকেই আমার মন টান্ছে না—কেবল মনে হচ্ছে, কখন সেই কালো ছেলেটিকে আর একবার দেখবো।

তুলসী। সাধু সাধু! আমি সাধু নয়, তস্কর তুমিই যথার্থ সাধু, পূর্নজন্মের মহা সাধনা না থাকলে—কখন জীবের এ ভাব মনো-মধ্যে জাগে না। ভাই তস্কর! তোমার কোন সাধনার দরকার নাই, পূর্নজন্মের স্মৃতিফলে তুমি যাহা করিয়াছ—বহু বৎসর তপস্যাও তাহা করা যায় না।

তারপর আপনার ছাত্রগণকে ডাকিয়া বলিলেন—বৎসগণ! তোমরা ঐ সকল দ্রব্য এখনই দীন-দুঃখীগণকে বিতরণ করে এসো।

আহা! প্রভু আমার ঐ সকল ছার দ্রব্য রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া চোর তাড়াইয়াছেন! আমার ধন রক্ষার জন্য তাঁর এত কষ্ট হয়েছে। না জানি এতে আমার কত পাপ সঞ্চয় হয়েছে?

গুরু বাক্য অবহেলা করা মহাপাপ। ছাত্রগণ কি করিবেন—ঐ সকল সোণা-রূপার পাত্র গ্রহণ করিয়া দরিদ্র পল্লীতে বিতরণার্থ গমন করিলেন। গুরুদেবের ত্যাগ স্বীকার দেখিয়া তাহার মুগ্ধ হইয়া গেল এবং একজন পাপী তস্করের সৌভাগ্য দেখিয়া মনে করিল, যোগ-যোগ সকলই বুখা, সার কেবল তাঁর নাম গান—তিনি দয়া না করলে, যোগ-যোগ কিছুতেই কিছু হয় না। ভাই! তাঁকে প্রসন্ন করবার উপায় কি?

২য় ছাত্র। ভাই! তুমি যা বলেছো! নাম গান করে, কেবল কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাকা, এ ছাড়া চিত্তশুদ্ধির আর কোন উপায় নাই, এইরূপ করিলে ভগবান দেখা না দিয়ে থাকতে পারবেন না। ভাই! আমি জানি ঐ মধু সর্দার চিরকাল চৌর্য্যবৃত্তি করিয়া কাল কাটাইয়াছে; তবে—সে যখন ঘরে থাকতে, কেবল ভগবানের নাম গান কর্তো, আর ঐ চুরির ধন সব সে সংসারে লাগাতো না, কেউ খেতে না পেলে, কারুর কষ্ট দেখলে সে অকাতরে তাহা বিতরণ কর্তো। এখন তার সৌভাগ্য দেখ, বিনা আয়াসে সে সাধনার ধন ভগবানকে দেখতে পেলে।

১ম ছাত্র। আর গুরুদেবের মত ঈশ্বর জনিত ব্যক্তির সন্তোষ করেও ধন্য হলো, গুরুদেবের বাটীতে চুরি কর্তে এম-ছিল বটেই ত, নতুবা আরও কত জায়গায় করেছে—কই ভগবদর্শন হয়েছে কি? কেবল গুরুদেবের পূজার দ্রব্যাদি চুরি

করিতে আসায়, তাহার একরূপ সৌভাগ্যদয় হয়েছে, কখন কিরূপে লোকের ভাগ্য পরিবর্তন হয়—কে বলতে পারে, চোর রত্নাকর কি করে বাণ্যীকি হয়েছিল, তাতো জান ? এই বলিয়া যখন তাহার দরিদ্র পল্লীর পথে প্রবেশ করিতে যাইবে—এমন সময় সেই তস্কর আসিয়া বলিল—আপনারা দয়া করে একটু দাঁড়ান, আমার ঘরে যা কিছু মহামূল্য দ্রব্য আছে—এনে দিচ্ছি, সেগুলিও ঐ সঙ্গে বিতরণ করে আসবেন। এই বলিয়া সে দৌড়িয়া গৃহে গমন করিল এবং কতকগুলি রত্নালঙ্কার আনিয়া তাহাদের হাতে দিল। ছাত্রদ্বয় অবাক হইয়া তাহার প্রদত্ত দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া একটা স্বর্ণকাঠের দোকানে বিক্রয় করত সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ বহু দীন-দরিদ্রকে বিতরণ করিয়া ধন্য হইল। মন যখন ঈশ্বরমুখী হয়, ধর্ম-কর্মের মজিয়া পড়ে—তখন আর তাহার জাগতিক কোন বস্তুতে লোভ থাকে না। মন গড়িয়া উঠিলে তখন সাধু-তস্কর এক হইয়া যায়। কর্মফলে কেবল কিছুদিন দুর্কর্ম ভোগ হয় মাত্র।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রতিহিংসা

মন একবার কলুষিত হইলে, সহজে তাহাকে বশে আনা যায় না—তা সে পণ্ডিত হউক, আর মুর্থই হউক। মুর্থ ত কিছুতেই সুপথে আসে না, পণ্ডিতও আদিতে পারে না—আমাদের বিশ্বস্তর পণ্ডিত তাহার দৃষ্টান্ত হল। সেদিন কাশীতে সর্বসমক্ষে তুলসীদাসের পরীক্ষা, ভবানী মিশ্রের পরীক্ষা দেখিয়া সকল লোক

তুলসীদাসকে মহাপুরুষ বলিয়া নির্দেশ করত তাঁহার শিষ্য গ্রহণ করিয়াছে এবং প্রস্তরের ষণ্ড ভবানীর হস্ত হইতে খাদ্য-দ্রব্য গ্রহণ করায় সকলেই তাহাকে নিষ্পাপ বলিয়া ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়াছে, সকলেই একবাক্যে বলিতেছে—তুলসীদাসের শিষ্য হইয়া সে এই অমাহুষিক শক্তি লাভ করিয়াছে। বিশ্বস্তর এমন সাধু মহাত্মার প্রতি অকারণ নিন্দাবাদ ও তাঁহার শিষ্যের প্রতি বৃথা দোষারোপ করায়, সকলেই তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়াছে; এখন লোকালয়ে তাঁহার মুখ দেখান ভার হইয়াছে। সভাস্থলে সোদিন তুলসীদাসের নিকট তাঁহাকে অপদস্থ হইয়া হীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছে।

পাণ্ডিত্যাভিমানী বিশ্বস্তর সোদিন যাহাই করুন কিন্তু প্রাণে ঘেরূপ দাগা পাইয়াছেন, লোকের নিকট ঘেরূপ হতমান, গত-গৌরব হইয়াছেন—তাহাতে প্রতিশোধের বহিঃ তাঁহার প্রাণে এরূপভাবে প্রজ্জলিত হইয়াছে যে তিনি তুলসীর মত একজন সাধু মহাত্মাকে প্রাণে মারিতেও কুণ্ঠিত নহেন। আজ সেইজন্ত প্রিয়শিষ্য ভাষ্করদত্তের সহিত এই বৃন্দাবনের পথে আসিয়া উভয়ে ষড়যন্ত্র করিতেছেন—কিসে তাঁহাকে প্রাণে মারা যায়, কিসে অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া তুলসীদাসের নাম জগত হইতে লোপ করিতে পারা যায়!

ভবানীমিশ্র তীর্থ ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাই তুলসীদাস তাহার হস্তে চতুষ্পাঠির ভার্য্যপণ করিয়া এবং মধু সন্দারকে বিশেষরূপে ধর্মোপদেশ দিতে বলিয়া তিনি একবার কলির পরম তীর্থ শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কল্য ষড়দিনে তিনি রওনা হইবেন। ভাষ্করদত্ত এইকথা শুনিয়া আসিয়া গুরুদেব বিশ্বস্তরকে বলিল।

বিশ্বস্তর তুলসীকে মারিবার জন্য স্বেযোগ অশ্বেষণ করিতে-
ছিলেন—এক্ষণে প্রিয়শিষ্য ভাহুদত্ত প্রমুখাৎ তুলসীর বৃন্দাবন গমন
ব্যাপার শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিলেন—বৎস! হইয়াছে; এইবার
তুলসীদাসকে জগৎ হইতে সরাইবার স্বেযোগ-সুবিধা আসিয়াছে।
প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার ইহাই সুবর্ণ স্বেযোগ।

তখন কানী হইতে পদব্রজে বৃন্দাবন যাইতে হইলে কতক পথ
বনে বনে কতক বা ভালপথে যাইতে হইত, পথও বেশ স্বগম
ছিল না, স্থানে স্থানে বড়ই বিপদসঙ্কুল ছিল। কিন্তু যাহাদের প্রাণ
বিপদহারীর পদে সমর্পিত হইয়াছে—যাহারা বিপদ-সম্পদ সমান জ্ঞান
করিয়াছে, যাহারা সন্ন্যাসী-সংসারের মায়াজাল কাটিয়াছে, এবং
যাহারা অর্থাৎ লইয়া পথ চলে না, তাহাদের দৃষ্ট্য তত্ত্বের ভয়
কোথায়? তুলসীদাস মনে প্রাণে ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া
পদব্রজে বৃন্দাবন যাইবার জন্য পথে বাহির হইলেন। তিনি
শুনিয়াছিলেন—প্রভু তথায় যুগল মূর্তিতে বিরাজিত, তিনি ভক্তের
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সদাই ক্ষিপ্তহস্ত! তাই ভক্ত তুলসীদাস
আর থাকিতে পারিলেন না, ভগবানের পাদপদ্ম পূজা করিতে
বৃন্দাবনাভিমুখে রওনা হইলেন।

সমস্ত দিন পথ চলিয়াছেন, কোথাও বিশ্রাম করেন নাই। প্রাণ
টানিলে, একবার প্রাণে ভগবদ্বর্শনেই ইচ্ছা জাগিলে, ভক্তের প্রাণকে
আর কে বাধিয়া রাখিতে পারে? তখন তাহার দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য
হইয়া পড়ে, প্রাণের প্রাণ প্রাণময়ের জ্ঞান জগতের কোন বাধা-বিপত্তিকেই
গ্রাস করে না।

দারুণ রৌদ্রের পথ অতিবাহিত করিয়া ভক্তবীর তুলসীদাস বৈকালে
একটা বৃক্ষতলায় কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। সম্মুখে অরণ্য; রজনী

আসিতে না আসিতেই কোন প্রকারে এই বনভূমি পার হইতে হইবে, নতুবা অন্ধকারে বনের পথ দেখা যাইবে না—চলিবার সুবিধাও হইবে না, এইরূপ মনে করিয়া উঠিলেন—বনের পথে প্রবেশ করিয়া দ্রুতপদবিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দিবাভাগেই বন এত অন্ধকার, পথ এত দুর্গম, যে সহজে যাওয়া যায় না—রাত্রিকালে কাহার সাধ্য ইহার মধ্যে গমনাগমন করে ?

তুলসীদাস যাইতে যাইতে একস্থানে শুনিতে পাইলেন—কে যেন আর্তস্বরে চীৎকার করিতেছে, “কে আছ! আমার প্রাণ যায়, রক্ষা কর, জল দাও!” তুলসীর কোমল প্রাণে দয়া হইল, সেই কাতর স্বর শ্রবণ করিয়া তিনি সেইদিকে অগ্রসর হইলেন। পর দুঃখে কাতর প্রাণই ত সাধকের, সেই প্রাণেই ত ভগবানের রাজত্ব বিস্তার—এইজন্য সাধকগণ সর্বভূতে ভগবানের বিভূতি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। তুলসীদাস সেই আর্তস্বর শ্রবণ করিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন, অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল না। তিনি ডাকিয়া বলিলেন—“কে তুমি, বনমধ্যে বিপন্ন, কোথায় আছ, উত্তর দাও—আমি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।” বিপন্ন উত্তর করিল—আঃ গশায়! ভগবান আপনার উন্নতি, করুন, আমি বৃন্দাবন যাইবার জন্য বাহির হইয়া পথে দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছি, তাহাদের লগুড়াঘাতে আমার হস্তপদ ভগ্ন হইয়াছে, দারুণ পিপাসা—একটু জল দিতে পারেন? সম্মুখে বোধ হয় কুপ আছে, আমার উঠিবার ক্ষমতা নাই।

তুলসী। কে আপনি; কোথা হইতে আসিতেছেন?

বিপন্ন। কে আপনি, আমি জানি না—তবে আমার পরিচয় এই—আমি কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত বিশ্বম্ভর স্মার্ত্যবাগীশ—বৃন্দাবন

যাত্রার মনস্থ করিয়া রাস্তায় এইরূপ বিপদাপন্ন, জল! জল!! জল!!!
বড় তৃষ্ণা।

তুলসী। আঁ! কে আপনি, স্মার্ত্যবাগীশ মহাশয়, বলেন কি?
আমি আপনার দাসাত্মদাস তুলসীদাস। আমিও বৃন্দাবন যাইবার
জন্ত বাহির হইয়াছি; হায় হায়! কোন্ পাষণ্ড আপনার এদশা
কল্পে? কই, এ পথে ত কখন দস্যুর উপদ্রব শুনি নাই?

বিশ্ব। কে তুলসীদাস বাবাজী, আমার প্রাণের মহাত্মা
তুলসীদাস! এতক্ষণে—এতক্ষণে বুঝলাম—আমি নিশ্চয়ই প্রাণ প্রাপ্ত
হবো, এ যাত্রা আমার আর কোন ভয় নাই! বাবাজী! বড় তৃষ্ণা,
কথা কহিতে অশক্ত, জল দাও!

“যে আশ্রয়, প্রভু! এই আমি জল আনিতে চলিলাম” বলিয়া
দয়া-প্রবণ-হৃদয় তুলসীদাস পণ্ডিতের চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া
নিজের ঝুলির মধ্য হইতে জলপাত্র বাহির করত শশব্যস্তে কূপ
সন্নিধানে অগ্রসর হইলেন এবং পাত্রের গলদেশে রজ্জু বন্ধন করিয়া
ধেমন হেঁটযুগে জল উত্তোলন করিবেন। অমনি পশ্চাৎ দিক
হইতে কে আসিয়া তাঁহাকে ধাক্কা মারিয়া কূপের মধ্যে ফেলিয়া
দিয়া বলিল—“যা শত্রু পরে পরে, বেটা, বড় নষ্টামী করে, আমাদের
পশ্চাতে লাগিয়াছিলে—এইবার যমালয়ে যাও।” এই বলিয়া সে
ব্যক্তি কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল—গুরুদেব! উঠুন,
কর্ম কেয়ালো করেছি, বেটাকে কূপের মধ্যে ফেলে দিয়েছি—এইবার
আমরা নিকটক, চলুন গৃহে যাইয়া বাবা বিশ্বনাথের পূজা দিইগে।

ছলনার অবতার বিশ্বস্তর-গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন—ভাতু!
আজ যথার্থ শিষ্যের কাজ কর্বলি—তুই দীর্ঘজীবী হ।

পাঠক! ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটা বুঝিলেন কি, বিশ্বস্তরের মন

দহ্যাতঙ্কর অপেক্ষাও নীচ নয় কি? পাণ্ডিত্য তাঁহার কোথায়, হৃদয়ে তাঁহার দয়ামায়ার লেশমাত্র নাই, ইহা অপেক্ষা একজন মূর্খের হৃদয়ও যে অতি উচ্চ উপাদানে গঠিত, সেও যে উপকারীর প্রতি—একরূপ ধার্মিকের প্রতি, একরূপ ভাবে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারেনা?

বৃন্দাবন যাত্রার ভাগ করিয়া গুরু-শিষ্যে এইরূপ ঘড়ঘস্ত্র করত অমঙ্গ তুলসীদাসের গায় একজন পরমভক্তকে কিরূপ বিপন্ন করিল—তাহা দেখিলেন ত, এইজন্ত বলিতে হয়—মন কলুষিত হইলে, তাহাকে সহজে ভাল করা যায় না; তা সে পণ্ডিতই হউক আর মূর্খই হউক!

বিশ্বস্তর বলিল—দেখ ভাণ্ড! কাজ ত হাঁসিল হইল—এইবার এক কাজ কর, কতকগুলো লতা-পাতা আনিয়া কূপের মুখ বন্ধ করিয়া দাও—যদি বেটা চীৎকার করে এবং এই পথে কেউ যদি আসে, তাহা হইলে কেহ তাহার চীৎকার শুনিতে পাইবে না। এই বলিয়া তাহার দুইজনে লতা-পাতা ছিঁড়িতে অগ্রসর হইল।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়, বনভূমির অন্ধকার আরও গাঢ়তর হইয়া আসিয়াছে, কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, ভান্সদত্ত ও বিশ্বস্তর তুলসীদাসকে চাপা দিবার জন্ত যেমন কিছুদূর অগ্রসর হইয়া অন্ধকারে ঘোঁপের মধ্যে হস্তপ্রসারণ করিয়াছে। অমনি প্রথমেই ভান্সদত্ত বিকট-স্বরে বলিল—গুরুদেব! হাত যে ছাড়াইতে পারা যাইতেছে না—কিণে যেন বাঁধা পড়িয়াছে, আমাদের রক্ষা করুন—ক্রমশঃ ভীষণ ভাবে জড়াইয়া পড়িতেছি, একি হইল! বিশ্বস্তর তাহার ক্রিয়াক্ষণ পরে দারুণ কষ্টজড়িত-স্বরে বলিল—“উহঃ ভাণ্ড! আমারও যে তাই—হাত যে ক্রমশঃ টানিতেছে—প্রাণ যায়, আমাদের

রক্ষা কর।” তাহারা হাত ছাড়াইতে না পারিয়া বিষম টানাটানি ও চীৎকার করিতে লাগিল।

এদিকে মরি মরি ওকি ও, কে ঐ যুবক, সুন্দর বরবপুধারী ! তুলসীদাসকে কাদে করিয়া কূপমধ্য হইতে উপরে উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে নামাইয়া দিয়া বনের মধ্যে অন্তর্হিত হইল ? তুলসীদাস তাঁহার জীবনরক্ষককে সেই অন্ধকারে ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন না, এ কোনও দৈবশক্তি জানিয়া বলিলেন—দয়াময়, ভক্তের জীবন ! অধম সন্তানকে দেখা দিলেনা, চক্ষুচক্ষে দেখিতে পেলেম না—কেবল অভয়প্রদান করিয়া বলিলে—“উঠরে বাছনী ! কার নাথ্য তোকে বধ করে ; তুই যে আমার হৃদয়ের ধন।” তবে কি প্রভু ! শ্রীবৃন্দাবনে যাইলেই দেখা দিবে—এই কি তোমার অভিপ্রায়, আচ্ছা প্রভু ! দাসাত্মদাস তাহাতেও পশ্চাৎপদ নহে—তবে সেখানে রামজানকী মূর্তি দেখিয়া যেন নয়ন সার্থক করিতে পারি ! ভক্তবীর তুলসীদাস যেন শুনিতে পাইলেন—“বৎস ! তাহাই হইবে—কাতর হইও না।”

তখন রজনী প্রভাত প্রায় ! মনের আনন্দে তুলসীদাস যখন বনান্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিবেন—ঠিক সেই সময়ে দেখিতে পাইলেন, ভাহুদত্ত এবং বিশ্বস্তর নাগপাশে জড়িত হইয়া অসীম কষ্টভোগ করিতেছে, ইহা দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল—তিনি নিকটে গিয়া বলিলেন—একি গুরুদেব ! এ অবস্থা আপনাদের কে করিল ?

তুলসীদাস পূর্বের অবস্থা কিছুই জানেন না। ভাহুদত্ত যে বিশ্বস্তরের আদেশে তাঁহাকে কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল, এ বিশ্বাস তাঁহার সরল হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তিনি মনে করিলেন—বৃন্দাবন বাইবার পথে বোধ হয়, এই বনের অন্ধকারে তাঁহারা নাগপাশে

আবদ্ধ হইয়াছেন। তিনি সত্ত্ব নিকটবর্তী হইলে বিশ্বস্তর ভয়ে অভয় পাইয়া বলিল—মহাত্মা! তুলসীদাস, আমরা আসিতে আসিতে অন্ধকারে বনমাঝে এইরূপে নাগপাশে বদ্ধ হইয়াছি, কিছুতেই ছাড়াইতে পারিতেছি না; বৎস! তুমি মহাপুরুষ, দৈবশক্তি বলে আমাদের উদ্ধার কর, আমরা তোমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি!।

তুলসী। গুরুদেব! মহাত্মা বা মহাপুরুষ আমি নহি—সে আপনারা, তবে আমি যে শক্তিটুকু লাভ করিয়াছি, তাহা ঐ পদপ্রসাদে, আর শ্রীরাম রূপাবলে। যাও সর্পদূরে যাও, ব্রাহ্মণদ্বয়ে ঘরে মুক্ত কর; ভগবান রামচন্দ্রের রূপায় তোমাদের “জয়লাভ হউক”। বলিবারমাত্র সর্পদ্বয় ভাতৃদত্ত এবং বিশ্বস্তরের হস্ত পরিত্যাগ করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিল। পাছে তাহারা কূপের মুখ লতাগুন্ম দ্বারা আবদ্ধ করে, এইজন্ত ভগবৎ প্রেরিত হইয়া সর্পদ্বয় তাহাদের হস্ত বন্ধন করিয়াছিল, দংশন করিয়া ভবলীলা শেষ করায় নাই। তাহাদের কন্দের ফল যে এখনও অনেক বাকী!

বন্ধন মুক্ত হইয়া বিশ্বস্তর ও ভাতৃদত্ত তুলসীদাসকে বিবিধপ্রকারে আশীর্বাদ করিল। তাঁহার প্রতি তাহাদের যে আক্ৰোশ ছিল, ক্ষণতরে তাহা ভুলিয়া গিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল।

তুলসীদাস শত্রু বা মিত্র কাহার তোষামোদ বা কাহার রূপা ভিক্ষা করেন না। যাহার জন্ত তিনি জগতে আসিয়াছেন, যাহাকে পাইবার জন্ত নিশিদিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া সাধিয়া বেড়াইতেছেন, সেই সাধনার ধন রাম রঘুনন্দনের রূপা লাভই তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য! তিনি জানেন—জগতে কেহ কাহার ভাল বা মন্দ করিতে পারেনা। ভগবান যাহা করান—জীব তাহাই করে, ভ্রমবশে

মনে করে বুঝি আমিই ইহার কর্তা, কিন্তু কার্যের কর্তা যে সেই এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই।

উভয়ের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়া তাহাদের প্রণাম করত তুলসীদাস অরণোর বাহির হইয়া রাম গুণগান করিতে করিতে শ্রীবৃন্দাবন ধামের উদ্দেশে অগ্রসর হইলেন। বিশ্বস্তর ও ভাস্কর বনের বাহির হইয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে লাগিল।

উনত্রিংশ পন্নিচ্ছেদ

অতীত সিদ্ধি

শ্রীবৃন্দাবনের শোভা অতি রমণীয়—এমন নগনানন্দদায়ক ধাম আর নাই। এখনও বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে ভগবানের যে নিত্য লীলা, যে প্রকট প্রেমখেলা দেখিতে পাওয়া যায়—তাহা অতি আশ্চর্য্য। একদিন ভগবান বলিয়াছিলেন—“বৃন্দাবনঃ পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।” অধ্যাত্মিক ভাবে দেখিতে গেলে শ্রীভগবান ভক্তের হৃদয় বৃন্দাবন কখনও ছাড়েন না, ছাড়িতে পারেন না, তাঁর ছাড়িবার ক্ষমতা নাই। এইস্থানে তাঁহাকে নিত্য রাস, নিত্য দোললীলা দেখা-ইয়া ভক্তকে নিত্যানন্দ দান করিতে হয়—এই হিসাবেও তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আবার বাহিরের এই শ্রীবৃন্দাবনধাম দেখিলেও ভক্তের প্রাণ আনন্দে উথলিয়া উঠে; সেই শ্যামকুণ্ড, সেই রাধাকুণ্ড, সেই বংশীবট, সেই যমুনাতট, সকলই যেন এখনও শ্রীকৃষ্ণের মোহন বেণু-স্বরে মুখরিত—এখন যেন কুঞ্জের প্রত্যেক লতা-পাতা কালোৰূপে মাধামাশি হইয়া কালীয়দমনের প্রেমলীলা প্রকট করিতেছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণদাবন ছাড়িয়া কোথাও গমন করেন না বলিয়া
যে সকলেই তাঁহার দর্শন পায়, তাহা নহে। এইজন্য একজন
পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণদাবন দর্শন করত যমুনাতটে বসিয়া সখেদে
গাহিয়াছিলেন—

“যমুনে ! এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী ।

ও তোর বিমলতটে, রূপের হাটে, বিকাতো নীলকান্তমণি ॥

কোথা সে ব্রজের শোভা, গোলোক হ’তেও মনোলোভা,

কোথা শ্রীদাম, বলরাম, সুবোল, সুদাম ;—

কোথা সে সুনীলতরুর ধেমু, বেণু, মা যশোদা রোহিণী ॥

কোথা নন্দ উপানন্দ, মা যশোদার প্রাণ গোবিন্দ,

ধরা-চুড়া-পরা কোথা ননী-চোরা ;—

কোথা সে বসন-চুরি, ব্রজনারীর পূজিতা মা কাত্যায়নী ॥

কোথা চাক্র চন্দ্রাবলী, কোথা বা সে ভলকেনী,

কোথা ললিতা সখী, সুহাসিনী ;—

কোথা সে বংশীধারী, রাসবিহারী, বামেতে রাই বিনোদিনী ॥

কোথা সে নৃপূর-ধ্বনি, না বাজে কিঙ্কণী,

মধুর হাঁসি, মধুর বংশী, আর নাহি শুনি ;—

ও যার মোহন সুরে, উজ্জান ভরে, বইতে তুমি আপনি ॥

তোমারি তটে তটে, তোমারি ঘাটে ঘাটে,

তোমারি সন্নিবটে কই সে ধনী ;—

ও যার মানের লাগি মোহন চুড়া লুটাইত ধরণী ॥

দেখাইয়া দাও আমারে, যমুনে ! দেই বামারে,

অনাথের নাথ হৃদ-মাঝারে, পা দুখানি ;—

(পরিব্রাজক বলে) চরণতলে লুটাত শির দিন ঘামিনী ॥”

আমরা বলি—হাঁ ইহাই সেই যমুনা, ইহারই সুবিবল তটে গোপীরা পরিবেষ্টিত হইয়া যশোদার নীলমণি ক্রীড়া করিতেন। ভক্ত দেখে—রাধালতা জড়িত হইয়া বৃন্দাবনের সকল স্থানে শ্যাম-তরুর অপূৰ্ব শোভা! এ তরু তমাল, পিয়াল বা হিঙ্গাল বৃক্ষ নহে, এ সেই সারাংসার কল্পবৃক্ষ—শুধু রসনা তৃপ্তিকর ফলে ভরা নহে, ইহার আশ্রয় লইলে জীবের চতুর্বার্গ ফললাভ হয়—এই বৃক্ষ পুণ্যধাম বৃন্দাবনে ভক্তকে অভয় দিবার জন্ত আপনার আধারে আপনি সৰ্বক্ষণ দণ্ডায়মান—ভক্ত! ভয় কি, দেখ, ভগবান সৰ্ব্বত্র বৃন্দাবনের বনে বনে এখন ও ধবলী-শ্যামলী লইয়া গোচারণ করিতেছেন। হৃদয়ে চাহিয়া তারপর বাহিরে দেখ—সব ঠিক আছে, কিছুই যায় নাই—ভগবানের বাক্য সফল কিনা ভিতরে চাহিয়া দেখ যাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তাহাই আছে দেহভাণ্ডে; এই দেহভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ছাড়া নহে। হে ভক্ত এ দেহ আগে ভাণ্ডে ভগবানের রাস লীলার মহোৎসব দেখিয়া বৃন্দাবনে যাও—তবে লীলাময়ের লীলারসে রসিতে পারিবে। প্রাণ আগে ঠিক কর—তারপর তীর্থে যাইও, না যাও তাতেও ক্ষতি নাই, তোমার হৃদয়-ক্ষেত্রইত মহাতীর্থ, ইহাকে সকল তীর্থের সার ভাবিয়া তারপর বাহিরের তীর্থদর্শন কর—তাহা হইলে সকল স্থানেই তীর্থরাজের দর্শন পাইয়া চরিতার্থ হইবে।

তুলসীদাস বহুদিন পথ পর্যাটন করিয়া বহু আয়াসে আশ্রমে সেই শ্রীবৃন্দাবনধামে উপস্থিত হইয়াছেন; তিনি গোপালজীর মন্দির দ্বায়ে কয়েকজন ভক্তকে নাম সংকীৰ্ত্তন করিতে দেখিয়া আনন্দ গদগদস্বরে কহিলেন—মহাশয়গণ! এই শ্রীবৃন্দাবনধামে আমার প্রভু কোন্ শ্রীমন্দিরে বিরাজ করেছেন—বলুতে পারেন?

ব্রহ্মবাসীগণ তুলসীদাসকে একজন বিশেষাগত সম্মানী বুদ্ধিয়া

বলিলেন—বাবাজী! আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন; কোন প্রভুর মন্দিরে যাবেন।

তুলসীদাস অতি বিনীতভাবে বলিলেন—আমি কাশীধাম হইতে আসিতেছি; রামসীতার মন্দিরে যাইব; দয়া করে আমাকে বৃন্দাবন ধামের সেই মন্দিরটি দেখাইয়া দিন।

ব্রহ্ম। বাবাজী! আপনি ভ্রমে পতিত হয়েছেন; এ মন্দির মদনগোপালজীর; এখানে রামসীতা মূর্তি দেখতে পাবেন না। আপনি অন্তত যান—তাহা হইলে আপনার বাসনা পূর্ণ হবে!

তুলসী। মহাশয়! মদনগোপালের মন্দিরই আমার প্রভুর মন্দির, আমি স্বপ্নে দর্শন পেয়েছি। আপনারা দয়া করে দ্বার খুলে দিন, আমি প্রাণতরে আমার সাধনার ধনকে দেখে জন্ম সার্থক করি।

ব্রহ্ম। বাবাজী! আপনি পাগল নাকি! আমরা প্রতিনিয়ত এখানে রয়েছি, এ রামসীতার মন্দির নয়, সে মূর্তি এখানে নাই, তবে আমরা কেমন করিয়া আপনাকে সে মূর্তি দেখাব?

তুলসী! ভক্তগণ! আপনাদের পদে আমার অসংখ্য প্রণাম, আজ অধর্মের প্রতি কেন এরূপ অসম্ভব কথা প্রয়োগ করছেন।

ব্রহ্ম। অসম্ভব কি বাপু! তুমি কি আমাদের চেয়ে বেশী জান, আমরা প্রত্যহ এখানে ভগানের পূজা করছি।

তুলসী। মহাশয়! আপনারা নিত্য দেখিতেছেন—সত্য, কিন্তু আমার স্বপ্নদর্শনও ত অসত্য নয়, পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র, নিত্য-নিরঞ্জন, ব্রহ্মরূপে চরাচরে পরিব্যাপ্ত রয়েছেন—সকল স্থানেই সকলরূপে তিনি ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করেন। তবে আপনার কেন দাসকে

অবহেলা করছেন। নবদুর্বাদল-কচি, ধনুর্ধারী আমার প্রভু এ মন্দিরেই আছেন, দয়া করিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়া বাসনা পূর্ণ করুন, আপনাদের পায়ে ধরি। *

তুলসীদাসের কথা শুনিয়া ব্রজবাসীগণ কিয়ৎক্ষণ মুখামুখী করিয়া বলিল—এ ব্যাপার কি, সাধু বাবাজী পাগল না কি? আর এক জন বৃদ্ধ বলিল—দেখ, ভগবৎ প্রেমই মানুষকে পাগল কোরে তাঁহার যথার্থ সন্ধান বোলে দেয়, পাগল না হলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। এ প্রেমিক সাধু বোধ হয়—সেই পাগল, ভাব দেখে আমার মন যেন ইহাকে মহা সাধু পুরুষ বলে বোধ কর্ছে। তার পর বৃদ্ধ বলিল—সাধু বাবা! রাধাকৃষ্ণ মূর্তিতে রামসীতা দেখবেন—অকস্মাৎ আপনার অন্তরে এরূপ খেয়াল হলো কেন?

তুলসী। মহাশয়! আমি কল্য অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি—যে শ্রীবৃন্দাবনে মদনগোপালজী শ্রীরামরূপে বাসে রাধারূপিণী জানকীদেবীকে লইয়া বসিয়া আছেন। সেই স্বপ্ন দেখিয়া অবধি আমার প্রাণ বড় অস্থির হইয়াছে, তাই স্বচক্ষে প্রভুর অপরূপ রূপ-মাধুরী দেখিবার জন্য শ্রীবৃন্দাবনে দৌড়িয়া আসিয়াছি—দয়া করে দ্বার খুলিয়া দিন?

ব্রজবাসীগণ তুলসীদাসের সেই তপোক্রিষ্ট জ্যোতির্ময় মূর্তি দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিল—ইনি নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ হইবেন ভাবিয়া আর বিরক্তি করিলেন না; শশব্যস্তে মন্দির দ্বার উদঘাটন করিয়া বিস্ময় পুলকনেত্রে সেই মূর্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হ্রদয়ে বলিলেন—যা ভাবিয়াছিলাম—তাই, এই যে রামসীতার যুগলমূর্তি! তাঁহারা, শশব্যস্তে বলিলেন—আহুন, আহুন ভক্তবীর আজ আমাদের প্রভু আপনার জন্ম অপরূপ রামরূপে সিংহাসন উজ্জ্বল করিতেছেন।

তুলসীদাস অগ্রসর হইয়া দেখিলেন—মন্দির সিংহাসনে শ্রীরাম

সীতামূর্তি বিরাজিত কিন্তু চূড়া ও বংশী ত্যাগ করেন নাই, তাই ভক্তি
গদগদ ভাবে বলিলেন—

প্রভো ! কহে ছবি আজকী ভুলেব্ নেছো নাথ ।

তুলসী মন্তক তব্ নোয়ে ধনুসবাণ লেও হাত ॥

হে নাথ ভক্তবৎসল ! আজ আপনার অপূর্ব এইরূপ বর্ণনার
অতীত—কিন্তু হে প্রভো ! চূড়া বংশী ত্যাগ করে, ধনুসবাণ ধারণ
না করিলে তুলসী ত চরণে মন্তক নত কর্কে না ।

অভক্ত যাহা বিশ্বাস করে না, মনে ভাবিতেও পারে না, ভগবান
ভক্তের সে অসাধ্য সাধ অচিরে পূর্ণ করেন । ভক্তবীর তুলসীদাসের
প্রার্থনায় তৎক্ষণাৎ সেই তেজোময় মূর্তি ধনুসবাণধারী রূপে বিরাজিত
হইলেন—দৈবমায়া কে বুঝিতে পারে ? আমি তুমি অভক্ত, ভগ-
বানের এ অদ্ভুত লীলা বিশ্বাস করিতে না পারি কিন্তু যে ভক্ত,
সে ভগবানের এ খেলায় কখন অবিশ্বাস করিবেন না । সকলে
এই অপূর্ব কাণ্ড দেখিয়া বিশ্বয় বিহ্বলচিত্তে গগনভেদী স্বরে
চীৎকার করিল—

জয় রাধা মদন গোপাল জী কি জয় ।

জয় শ্রীরামচন্দ্র! জানকী মায়িকী জয় ॥

তুলসীদাস করুণাময়ের এই অপূর্ব করুণা খেলা দেখিয়া ভক্তি-
ভরে দগুবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন :—

রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে ।

রঘুনাথায় নাথায় সীতায়ঃ পতয়ে নমঃ ॥

সীতার চরণে:—

দ্বিভূজাং স্বর্ণবর্ণাভাং রামালোকন-তৎপরং ।

শ্রীরাম-বনিতাং সীতাং প্রণমামি পুনঃ পুনঃ ॥

তুলসীদাস কৃতাজলিপুটে বলিলেন—ভগবন্, ভক্তবৎসল ! দাসের অপরাধ ক্ষমা কর, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্ত সাজ পরিবর্তনে কত কষ্ট কর্বলেন, দাস তজ্জন্য ক্ষমা ভিক্ষা কর্বুছে।

দৈবদায়ী হইল—“বৎস ! ভক্ত আমার প্রাণ, ভক্ত আমার সর্বস্ব ধন—ভক্তের জন্য আমি দাহন যন্ত্রণা, বিষভক্ষণ, অস্ত্রাঘাত প্রভৃতি অহরহ সহ্য করি—এমূর্তি পরিবর্তন ত কোন ছার ! এজন্ত তুমি কিছু মনে করো না, আজ তোরা মত পরম ভক্তকে দর্শন করে কৃতার্থ হলাম।

সকলে তুলসীদাসের ভক্তিবল দর্শন করিয়া তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। তুলসীদাস গাত্রোথান করিয়া ভক্তবৃন্দের প্রতি ঘোড়হস্ত বলিলেন :—ভক্তবৃন্দ ! আমি নরাদম, কেবল আপনাদের রূপাবলে আজ আমার আরাধ্য পদ দর্শন হলো—এজন্য আপনাদিগকে কোট কোটী নমস্কার করি ! বলিয়া তাঁহাদের পদধূলি লইতে উদ্যত হইলেন।

তাঁহার “নমঃ নারায়ণায়” বলিয়া সন্নিহিত দাঁড়াইলেন, তারপর বলিলেন—মহাত্মন ! আপনার ভক্তির ইয়ত্তা নাই, আজ আপনার দর্শনে আমরাও কৃতার্থ হইলাম।

অভীষ্ট সিদ্ধি হইবার পর তুলসীদাস আরও কয়েকদিন পবিত্র বৃন্দাবনে ভক্তবৃন্দের সহিত প্রেমরসলাপে কালযাপন করিয়া সানন্দ-চিত্তে পুনরায় বারাণসী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আরোগ্য লাভ

সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিলে তাহার সাফল্য ভগবান সাহায্য করেন। সকলের ভাল করিব, দীনদুঃখীর দুঃখ মোচন করিয়া অর্থের সদ্ব্যয় করিব—ছগনলালের এইরূপ সদিচ্ছা হৃদয়ে বদ্ধমূল আছে বলিয়া তাঁহার সূকল কার্য্যই সফল প্রসব করে। দুঃখীরামের অবস্থা ঘেরূপ সাংঘাতিক হইয়াছিল, যে ভীষণ জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থল হইতে ছগন তাহাকে কুড়াইয়া আনিয়াছিলেন—তাহাতে বাঁচিবার কোন আশাই ছিল না। কেবল তাঁহার ও যশোদার ঐকান্তিক যত্নে ভগবান দুঃখীকে এ যাত্রা ফিরাইয়া দিয়াছেন। দুঃখী ক্রমশঃ আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতেছে। কবিরাজ বলিতেছেন—সমস্ত দুর্দ্দৈব কাটিয়া গিয়াছে, আর ভয় নাই।

দুঃখীরাম এখন ভাল করিয়া কথা কহিতে পারেন—আহারে বেশ রুচি হইয়াছে। তিনি একদিন তাহার প্রাণদাতা ছগনকে বলিলেন—মহাশয়! আপনি বলেছিলেন—একটা পাগলী মেয়েকে আনিয়া ভাল করিয়াছি; তিনি আপনার বউদি হন কিনা, একদিন দেখাইব। এখন দয়া করে, একবার তাঁহাকে দেখান, সত্য সত্য যদি তিনি আমার বউদি হন, তাহা হইলে আমি সকল চিন্তার হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য হয়ে উঠি, নতুবা আপনার রূপায় প্রাণ পাইলেও, তাঁহার দারুণ চিন্তা আমাকে জড়ীভূত করিয়া ফেলিতেছে।

ছগন। আচ্ছা! সেজ্ঞ আর ভাবনা কি, অণু রজনী অধিক হইয়াছে, তিনি শিবালয়ে পূজা-জপে নিমগ্ন, এসময় বাধা দিব না; কল্যাণাহারাদির পর দেখা করাইয়া দিব। দুঃখীরাম আর কোন কথাই কহিলেন না—মনে মনে ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া রাত্রি যাপন করিলেন।

পরদিন আহাৰাদির পর ছগন যখন দুঃখীরামের কাছে আসিয়া বসিলেন, শারীরিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন—দুঃখীরাম তখন বলিলেন—আজ্ঞে! হাঁ, খুব ভালই আছি আর কোনও গ্লানি নাই—তবে মনোমধ্যে কেবল ঐ এক চিন্তা।

“কিসের চিন্তা যুবক!” ভগবান তোমাঞ্চে রক্ষা করিয়াছেন—তজ্জ্ঞ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ হৃদয়ে আপনার ভক্তিভাব জ্ঞাপন কর! বলিয়া ছগনলাল দুঃখীকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। “ভগবান ত মূল্যধার” কিন্তু আপনি বাহা করিয়াছেন—তাহার প্রতি-শোধ কি জীবনে কখন দিতে পারিব? একজন পথের ভিখারীর জ্ঞা এমন নিঃস্বার্থভাবে উপকার, মানুষ কখনও করিতে পারিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। আমি চিরদিন আপনাদের পদে বিক্রীত থাকিব, এক্ষণে কল্যাকার সেই সাধটা মিটাইয়া আমাকে দারুণ চিন্তার হাত হতে মুক্ত করুন।

ছগনলাল। কি সাধ যুবক, তুমি কি চাও?

দুঃখী। সেই যে আপনার আশ্রিতা পাগলিনী মেয়েটীকে একবার দেখাইবেন বলিয়াছিলেন। যাহার অন্বেষণে আসিয়া আমি বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম—তিনি আমার বউদি কিনা একবার দেখিব।

ছগনলাল। ওঃ হাঁ হাঁ, তার জ্ঞা আর চিন্তা কি, আমি এখনি জাকিতেছি, বলিয়া তিনি কণ্ঠা সন্মতীকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন—

মা! দেখো ত, পাগলী মায়ের পূজাদি এবং খাওয়া হয়েছে কিনা, তাহলে একবার তাঁকে সঙ্গ কর, এখানে নিয়ে এসো ত ?

সরস্বতী আহাৰাদির পর, অপর একটা কামরায় বসিয়া তাহার সহ্যের জন্ত কতকগুলি তুলসীর মালা গাঁথিতেছিলেন। পিতার কথা শুনিয়া উঠিলেন এবং শিবালয়ে যাইয়া তাহার প্রাণের সহকে লইয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন।

দুঃখীরাম সেই মাত্র আহাৰ করিয়া বালিসে ঠেস দিয়া বসিয়াছিলেন। পাগলিনীকে সঙ্গে লইয়া সরস্বতী পিতার নিকট আসিলে, তিনি পাগলী মাঝে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—
মা! এই ভদ্রলোক বহুদিন পীড়িত অবস্থায় এখানে রয়েছেন ; কেবল তোমাকে দেখবার জন্ত আমাকে অনবরত ব্যস্ত করেন—
দেখতো, ইনি তোমার পরিচিত কিনা ?

বহুদিন রোগ ভোগ করিয়া যুবকের দেহের অনেক বৈলক্ষণ্য হইয়া গিয়াছে, সহজে চিনিবার উপায় নাই, তথাপি যাহারা বহুদিন একত্র কাটাইয়াছে, তাহানের মধ্যে অচেনা থাকা যায় না। পাগলিনী ভাল করিয়া দেখিয়া অতীব আগ্রহের সহিত বলিলেন—“কে ও ঠাকুরপো! তোমার এ দশা করলে কে, হায়! হায়! আর যে চেনা যায় না?” দুঃখীর সেই অবস্থা দেখিয়া পাগলী মা কাঁদিতে কাঁদিতে ছগনকে বলিলেন—
বাবা! বাবা! তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ, আমার ঠাকুরপোকে বাঁচাও ?

রোগজীর্ণ দুঃখীরাম তাহার নিকৃদ্ধিষ্টা বৌদিকে হৃদয় অবস্থায় দেখিয়া অতীব আগ্রহের সহিত বলিলেন—বউদি! পায়ের ধূলা দাও, চিন্তা করোনা—এই মহাপুরুষের কৃপায় আমি এখন বেশ সুস্থ

হয়েছি। বাঁচিবার আশা ছিল না ; কেবল এই—বলিয়া কৃতজ্ঞতার অশ্রু মুছন করিলেন।

ছগনলাল বলিলেন—যুবক ! এত উত্তেজিত হইও না, এখনও তুমি ঠিক ভাল হইতে পার নাই ; এই ঔষধটা খাও—বলিয়া কবিরাজ প্রদত্ত একটা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিলেন।

দুঃখীরাম ঔষধ সেবন করিয়া বলিলেন—মহাশয় ! যখন বউদিদিকে পেয়েছি, তখন আমার মরিলেও কোন ক্ষতি নাই। যার অশেষণের ক্ষমতা ডাকাতের হাতে আমার প্রাণ যাচ্ছিল—তাহাকে পেয়েছি, আর দাদার সন্ধানও পেয়েছি, তিনি কাশীতে আছেন, খুড়ীমাকে কাশীতে ভগবান দাস দোবের বাটীতে রেখে এসেছি, এইবার বৌদিকে তাদের কাছে পৌছে দিতে পারিলেই হয়।

ছগনলাল দুঃখীকে ঔষধ খাওয়াইয়া বস্ত্রাদি পরিবর্তন করিতে করিতে বলিলেন—যুবক বেশী উতলা হইও না, আর তোমার জীবনের কোন ভয় নাই—যাহা ছিল, তাহা কাটিয়া গিয়াছে, এক্ষণে ভগবান তোমাকে আরোগ্যের পথে নিয়ে যাচ্ছেন। তারপর তিনি গাড়ী প্রস্তুত করিতে বলিয়া গৃহেব বাহির হইলেন ; যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—মা ! তোমারা যুবকের নিকট কথাবার্তা কও কিন্তু উঠিতে দিও না ; আমি একবার আসি ! এই বলিয়া শকটারোহণে কার্য্য স্থানে গমন করিলেন।

অপরিচিত স্থানে বহুদিনের পর কোনও আত্মীয়কে দেখিলে প্রাণের মধ্যে এমন একটা আনন্দ হয়, যাহা সহজে চাপিয়া রাখিতে পারা যায় না। রত্নাবলী স্বামীর অদর্শনে হতাশ হইয়া পাগল হইয়া ছিলেন ; সে ভালবাসার পবিত্র স্মৃতি প্রাণের মধ্যে আকুলি-বিকুলি করিয়া তাহাকে পাগল করিয়াছিল। ছগনলাল বহু চিকিৎসায় আরাম

করিয়া স্বামীর সহিত মিলাইয়া দিবেন, আশা দিয়া তাঁহাকে আবার প্রকৃতিস্থ করিয়াছেন। এক্ষণে দুঃখীরামকে তাঁহার আলয়ে দেখিয়া, তাহার মুখে স্বামী ও শাস্ত্রীর কুশল সংবাদ শুনিয়া রত্নাবলী জিজ্ঞাসা করিলেন—ঠাকুরপো! তোমাকে এমন করে মাল্লে কে, তুমি কোথায় যাচ্ছিলে; বেশী উতলা হয়োনা, আন্তে আন্তে বল?

দুঃখী। বউদি! দাদার অশেষণে বাহির হয়ে, প্রথমে তোমাকে আন্তে তোমার বাপের বাড়ী গেছলাম—সেখানে গিয়ে শুনলাম, তোমার মাথা খারাপ হয়ে কোথায় চলে গেছো, তোমার মা, কান্নাকাটী কচ্ছেন; দেখে আর কি কর্ণো, খুড়ীমাকে সংবাদ দিয়ে বরাবর কাশী গিয়ে দাদার সন্ধান পেলাম। তিনি তখন সেখানে ছিলেন না—তবে তিনি একজন বড় পণ্ডিত এবং খুব ভক্ত হয়েছেন, অনেকগুলি ছাত্র রেখে টোল খুলেছেন শুনে—বাড়ী গিয়ে খুড়ীমাকে আনলাম; পথে আসবার সময় কতকগুলি লোকের মুখে শুনলাম,—একটি সোমন্ত মেয়ে পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল—গোসাইগঞ্জের ছগনলাল চৌবে তাঁহাকে নিয়ে গেছে, তাদের কথা শুনে তোমার কথা মনে হলো, তারপর খুড়ীমাকে কাশীতে রেখে, মনে করলুম—একসঙ্গে বউদিদি ও খুড়ীমাকে দাদার কাছে পৌঁছে দিবো, এই মনে, করে—তাঁকে ভগবানদাস দোবের বাটীতে রেখে এসে, তোমার অশেষণে বাহির হয়ে, পথে এই দুর্দশা, ভাগ্যে এই পরম দয়ালু মহাপুরুষের নজরে পড়েছিলাম, নতুবা আমার আর জীবন থাকতো না—আমি প্রায় জ্ঞানহারা হয়েছিলাম।

রত্না। ভগবান রক্ষে করেছেন, ঠাকুরপো! এখন তোমার কি কষ্ট হচ্ছে?

দুঃখী। বউদি, এখন আমার আর কোন কষ্ট নাই—বেশ

আছি, একটু উঠে-ইটে বেড়াতে পারলেই তোমাকে নিয়ে যাই ;
খুড়ীমা কি মনে কচ্ছেন জানিনা !

রত্না ! ঠাকুরপো ! ভগবান যখন তোমাকে এখানে এনে দিয়েছেন—
তখন আর ভাবনা নেই, তুমি আর বেশী কথা কইও না, এই
দুধটুকু খেয়ে একটু বিশ্রাম কর, আমি আবার রাত্রে আসবো
এখন। এই বলিয়া রত্নাবলী সরস্বতীর ~~কক্ষ~~ অন্তরে প্রবেশ
করিলেন। তাঁর প্রাণ আজ হর্ষযুক্ত, হৃদয় আশার ভরা !

আর দুঃখীরামও খুব আনন্দিত। যাহার জন্ম তিনি প্রাণপণ করিয়া
বাহির হইয়াছিলেন—আজ ভগবান তাঁহাকে চক্ষের সম্মুখে আনিয়া
দিয়াছেন ; ইহাতে কার না আনন্দ হয় ? এইবার একটু উঠিতে
পারিলেই, তিনি তুলসীদাসের সংসার-বিরাগ চূর্ণ করিয়া দেশে লইয়া
যাইবেন। ভগবান রামচন্দ্র অল্পকাল হইয়াছেন—আর ভয় নাই।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পরিণয়

প্রাণের আবেগ-উদ্বেগ কাটিয়া গিয়াছে, দুঃখীরাম দিন দিন
মেঘমুক্ত শশধরের তায় আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইয়া কান্তিপুষ্ট হইতে
লাগিলেন। দুঃখীর দৈহিক সৌন্দর্য্য অতি পরিপাটী—এই অনিন্দ্য-
সুন্দর রূপ-জ্যোতি দেগিয়াই সৌন্দর্য্যপ্রিয় তুলসীদাস দুঃখীর এত
বশীভূত হইয়াছিলেন—প্রাণের বন্ধু বলিয়া তাঁহার তিলেক অদর্শন
অসহ্য বোধ করিতেন। তুলসী যেমন সুরূপ—দুঃখীরামও তদনুরূপ,
তাই তাঁহাদের প্রাণের ভালবাসা এত গাঢ় হইয়াছিল। অভাব গ্রস্ত

দুঃখীরামকে তাই তিনি মার পেটের ভাইয়ের মত অর্থাদিনানে প্রতিপালন করিতেন—কখনও কোনপ্রকার কষ্ট সহ করিতে দিতেন না নিজেও ষে রূপ ভাবে থাকিতেন—দুঃখীকেও সেইরূপ ভাবে রাখিতেন। তাই দুঃখীরাম দাদা বলিতে অজ্ঞান হইত—প্রাণ দিয়াও তাহার উপকার করিতে ছাড়িত না, পাঠক ! দুঃখীরামের কার্য কারণ দেখিয়া বোধ হয়, সে বিষয়ে কোনপ্রকার সন্দেহ করিবেন না, আজকাল জগতে এরূপ বন্ধুত্ব সুদূরলভ !

রোগ সারিয়া গেলে—দৈহিক সৌন্দর্য্য ফিরিয়া পাইতে কত দিন লাগে ? দুঃখীরাম কয়েক সপ্তাহ মধ্যে বেশ হুটপুট, কাস্তিবিশিষ্ট হইলেন। সে সৌন্দর্য্যজ্যোতি দেখিয়া দুঃখীরামকে সকলেই ভাল বাসিতে লাগিল। তাহার অমায়িকতা, সরলতা সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিল—দুঃখীরাম সামান্য দিনের মধ্যে সকলের এমন কি দাস-দানীর পর্য্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িলেন। ছগনলালের ত কথাই নাই, তিনি যুবককে মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচাইয়া, আজ এমন সৌন্দর্য্যশালী করিয়াছেন—ভগবান তাহার সংকল্পের ফলদান করিয়া মুখরক্ষা করিয়াছেন। ছগনলাল দুঃখীরামকে আর ছাড়িতে পারেন না, তিনি চলিয়া যাইলে পাগলী মাও আর থাকিবে না ; এত মাখামাখী, এত একপ্রাণতা, ইঠাৎ কেমন করিয়া ভূলা যায় ?

দুঃখীরাম প্রাণের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া যত যাইবার জন্ত প্রার্থনা করেন, ছগন ও যশোদা তত বলেন—বাবা ! এখনও ভাল করে অস্থখ সারে নাই—আরও কিছুদিন থাক, জলে ত আর পড়ে নাই ?

সে কথা শুনিয়া দুঃখীরাম কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে বলিতেন—সে কি মা ! জলে পড়া কি, আমি ঠিক স্বর্গে আছি ; পিতামাতার আদর-ভালবাসা

আমি জীবনে কখন পাই নাই—তঁাহারা অতি শৈশবেই আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন—ভগবান আমাকে এক্ষণে সেই অজ্ঞানিত আদর-যত্নে স্থখী করিতেছেন—আপনারা যে আমার পিতামাতা, ছেলে বাপ-মায়ের কাছে কি আবার কষ্ট পায়?

যশোদা ও ছগন দুঃখীরামের এই নম্রতায় গলিয়া যাইতেন—যাইবার কথা বলিলে—কাঁদিয়া ফেলিতে—একদিন ছগন ও যশোদা রত্নাবলীকে ডাকিয়া কি পরামর্শ করিলেন—তখন সরস্বতী কার্য্যান্তরে কোথায় গিয়াছিল। রত্নাবলী বলিলেন—খুব ভাল হয়, যুবক জাত্যাংশে যে খুব ভাল, সে বিষয় আমি জানি; আমাদেরই আত্মীয় তবে গরীব—আমাদের যজ্ঞমানের আয়েই উহার ও উহার মামীর ভরণপোষণ নির্বাহ হয়, দরিদ্রতা ব্যতীত দুঃখীরাম সর্ব্বাংশেই সরস্বতীর উপযুক্ত।

যশোদা—বলিলেন মা! দরিদ্র বলিয়া কি হইবে, আমরা ত উহার কাছে কিছু আকাজক্ষা করি না বরং আমাদের এই বিশাল বৈভবের ঐ একমাত্র মালিক হইবে! আমাদের আর কে আছে মা; ছেলেটা দেখছি, সর্ব্বোত্তমভাবে সরস্বতীর উপযুক্ত!

রত্ন। সে পক্ষে সন্দেহ নাই, ইচ্ছা যদি হয় ত করুন না—ভালই ত!

ছগন। মা! ইচ্ছা খুব, তবে তোমাকে দুই জনের মতামত গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা ত কিছু বলিতে পারিব না?

সে জন্য চিন্তা নাই—আমি সব ঠিক করিব। এই বলিয়া তিনি সরস্বতীর নিকট গমন করিলেন। তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, প্রত্যহ তঁাহারা এই সময় পুষ্করিণীর বাঁধঘাটে গমন করেন, ফুল তোলেন, তার পর গাত্র ধৌত করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসেন।

আজও সেইরূপ করিবার জন্য রত্নাবলী সরস্বতীকে ডাকিলেন। সরস্বতী অন্যান্য দিনের মত সইয়ের সহিত বাগানে গমন করিয়া ফুল তুলিলেন।

রত্নাবলীর আজ আনন্দ ধরেনা। প্রিয়বস্তুর সন্ধান পাইয়াছেন, প্রাণের দুঃখী স্বামীর অবেষণ করিয়া তাহাকে লইতে আসিয়াছে। বহুদিন পরে প্রিয়দর্শন, ~~হা~~ হাতে স্ত্রীলোকের আনন্দ হইবে না ত কি? রত্নাবলী যে স্বামীকে হিতকথা বলিতে গিয়া বিপরীত করিয়া ফেলিয়াছিলেন এক্ষণে কেমন করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিবেন, এই চিন্তায় বিভোর হইয়া সতী আজ সরস্বতীকে ছাড়িয়া ভিন্ন দিকে চলিয়া আসিছেন। ক্রমশঃ যে রাত্রি হইতেছে, সে দিকে ক্রক্ষেপ নাই।

রত্নাবলীকে দেখিতে না পাইয়া সরস্বতী উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল—
সই—সই—ও সই !

রত্নাবলী সাড়া দিয়া বলিল—কেন সই।

সরস্বতী। তুমি কোথা সই?

রত্ন। আমি প্রায় জলসই?

সরস্বতী বলিল—ভাই, গাছতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছো ;
আর উকি মেরে কি দেখছো?

রত্ন। কি আর দেখবো, দেখছি তোমার বর!

সরস্বতী আহ্লাদে বলিল—তুই তবে মর।

রত্ন। কেন ভাই, তোমার বর কি আমার পর?

সর। তবে বা খুসী তাই কর, আমি চলে যাই ঘর।

রত্ন। ভাই, হতে না হতেই এত, হলে না জানি কত হবে?

সরস্বতী একটু মুখভার করত সানবাধান ঘাটের চাতালে

আসিয়া ফুলগুলি রাখিয়া রত্নাবলীর অপেক্ষা করিতে লাগিল। এমন সময় রত্নাবলীও সজ্জিত ফুল লইয়া সেই গাঁদায় মিশাইয়া দিয়া বলিল—আজ অনেক ফুল হয়েছে! ঠাকুরের মালা খুব জ্বর হবে। এই বলিয়া দুইজনে মালা গ্রহণে লিপ্ত হইয়া রত্নাবলী তাঁহার মনের অভিপ্রায় ধীরে ধীরে ব্যক্ত করিলেন। তাহাতে সরস্বতী বাহ্যিক রাগ দেখাইয়া রত্নাবলীর কানাল টিপিয়া দিল বটে কিন্তু মনে মনে বলিল—এমন দিন কবে হবে, যে এমন ললিত ললাম-কান্তি পতি লাভ করিয়া ধন্য হব—সদাশিব কি আমার সে বাসনা পূর্ণ করবেন। যে দিন হইতে যুবক ভাল হইয়া ইতস্ততঃ করিতেছেন, সেইদিন হইতে ভগবানের নিকট ঐ প্রার্থনাই ত জানাইয়াছি, দেবতা কি তবে সত্য সত্যই বাসনা পূরণ করবেন? সেই যখন এ কথাটা উত্থাপন করছে, তখন নিশ্চয়ই ও সমস্ত জানে, যুবক ওর আত্মীয় এবং বাবা মারও বোধ হয়—ইচ্ছে আছে নতুবা সই, আজ হঠাৎ এ কথা তুলিবে কেন? ভগবান তুমি সত্য!

মালা গাঁথিয়া শেষ করিতে এবং সরস্বতীর মনোভাব অবগত হইতে আজ অনেক রাত্রি হইয়া গেল। অন্যদিন সকাল সকাল তাঁহারা বাড়ী ফিরিয়া যান, আজ এখনও দেখা নাই দেখিয়া যশোদা ঘাটে আসিয়া ডাকিলেন—ইঁাগা মায়েরা, আজ কি এখনও গা ধোওয়া হয় নাই? এত রাত্রি অবধি জলে পড়ে থাকলে অস্বস্তি করবে, উঠে এস।

যশোদাকে দেখিয়া তাঁহারা তাড়াতাড়ি জল ছাড়িয়া উঠিয়া আসিলেন এবং ঠাকুরের জন্য গাঁথা মালা দুই ছড়া লইয়া অন্তর্যামিত্তিতে চলিলেন। সরস্বতী শীঘ্র বাড়ী গিয়া কাপড় ছাড়িয়া আজ তাড়াতাড়ি শিবমন্দিরে প্রবেশ করিল। সদাশিবের চরণপূজায় আজ তাহার আগ্রহ কিছু বেশী।

সরস্বতীর মনোগত ভাব বশোদাকে জ্ঞাপন করিয়া রত্নাবলীও কাপড় ছাড়িতে নিজকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

এখন দূতীগিরির অনেক বাকী, সবেমাত্র আজ সরস্বতীর মন জানা হইল। জ্বীলোকের মন সহজেই নরম করা যায়, বিবাহে জ্বীজাতিকে রাজী করিতে বেশী সময় লাগে না, যদি বর মনের মত রূপবান হয়, তাহা হইলে রমণী, তাহাতে সহজেই মজিয়া যায়। দুঃখীরামের গায় রূপবান পাত্রে আত্মসমর্পণ করিতে কে না রাজি হইবে?—এ পুরুষ রতনের পদসেবা করিয়া ধন্য হইতে কার না ইচ্ছা, কিন্তু এক্ষণে দুঃখীরামকে রাজী করা শক্ত; সে কি এ অবস্থায় আমার অনুরোধ রক্ষা করিবে? দেখি ভগবান কি করেন।

দুঃখীরাম আজ রাত্রে কিছুই খাইবে না। বেলায় আহার করিয়া বেশী কিছু খাইতে ইচ্ছা নাই—প্রকাশ করায় রত্নাবলী একবাটী দুগ্ধ লইয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলেন—ইচ্ছা, এই সময় তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন। যে দিন হইতে বউদিদির সহিত দুঃখীরামের দেখা হইয়াছে; সেইদিন হইতে তিনিই প্রায় তাঁহাকে জলখাবার প্রদান করেন। কেবল অন্ন ভোজনের সময় তিনি বশোদার নিকট জননীর আদবে আহার করিয়া থাকেন।

দুগ্ধ হস্তে কক্ষে প্রবেশ করিয়া রত্নাবলী বলিলেন—ঠাকুরপো! আজ এত কি খাইয়াছ যে, রাত্রে কিছু খাইবে না?

দুঃখীরাম বলিলেন—মা! আজ জেদ করিয়া দ্বিগুণ আহার করাইয়াছেন, তাই এখনও আহারে ইচ্ছা হয় নাই, বৌদি! যাহা ইউক, মায়ের আদর বটে!

রত্নাবলী। তা আর বলতে, এমন উদার-হৃদয়, পরদুঃখকাতর পরিবার আমি আর কোথাও দেখি নাই!

দুঃখী। নাই, তা দেখবে কি, আমি ত এত দেশ ঘুরেছি, আমিই দেখি নাই—তা তুমি !

রত্নাবলী সময় বুঝিয়া বলিলেন—ভাই ! আজ আমার একটা অনুরোধ তোমাকে রাখতে হবে ?

দুঃখী। কি অনুরোধ বউদিদি, এখানে আমি তোমার কি অনুরোধ রাখতে পারি ?

রত্নাবলী। সে এমন কিছু নয়—যদি রাখ ত বলি ।

দুঃখী। সাধ্য হয় রাখবো—তুমি বলোনা !

রত্নাবলী সাহসে ভর করিয়া বলিলেন—দেখ, আজ সকালে বাবা (ছগন) বলছিলেন—সরস্বতীর এখনও বিয়ে হয় নাই—মনের মত পাত্র পাওয়া যায় না বলে, তাঁর বিয়ে দেন নাই। এখন আমার মুখে তোমার পরিচয় পেয়ে, তাঁরা তোমার সহিত সন্ধর্ষ রাখতে ইচ্ছা করেন, তা হলে আমার সহিতও তাঁদের সন্ধর্ষ চির অক্ষুণ্ণ থাকে—এক্ষণে তোমার সে বিষয়ে মত কি ?

দুঃখী। বউদি ! তুমিত জ্ঞান—আমার অবস্থা, আমি একপ্রকার তোমাদের অন্তরেই প্রতিপালিত, দাদা দয়া করে শিষ্টা-যজ্ঞমানের ভার দিয়েছেন—তাই চলে, তার উপর এমন একটা ধনীর কণ্ঠা বিয়ে করে, আমি কেমন করে চালাব ? আর আমার মত দরিদ্রের সহিত কি সরস্বতীর বিবাহ শোভা পায়, বউদি ! তুমি একপ্রকার অন্তায় অনুরোধ করছো কেন ?

রত্না। ভাই ! ইহারা ত ধনী-দরিদ্র দেখিবেন না, ইহারা সংপাত্র চান, এঁদের অর্থের অভাব কি ? একমাত্র সরস্বতীরই সব—আর ইহাদের পুত্র-কণ্ঠা নাই। তোমার স্বভাব চরিত্র দেখে বড় পছন্দ হয়েছে, তাই আমাকে বলতে বলেছেন ; তুমি ইহাদের

দ্বারা যেরূপ উপকার পেয়েছ—তাতে ইহাদের কথা ঠেলিয়া ফেলা উচিত নয়! আর আমিও সইয়ের বিয়ে তোমার সঙ্গে দিতে পারলে খুব খুশী হব, কারণ মেয়েটী নামেও যেমনী—গুণেও তেমনী, ভাই! তুমি আর অগ্রমত করোনা—কৃতজ্ঞ প্রদর্শনের এই সুবর্ণ সুযোগ! এই বলিয়া রত্নাবলী আনন্দচিত্তে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

দুঃখীরাম শয্যায় শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন—ইহাতে আমার কৃতজ্ঞপ্রদর্শন করা কি হইল? এত আমার সৌভাগ্য, ছগনলালের ত্রায় মহাত্মার জ্ঞামাতা হওয়া বহুভাগ্যের বিষয়; দাদা ও বউদিদির মিলন করিয়া কাণ্ডাটী সমাধা করিলেই ভাল হইত কিন্তু যেরূপ জেদ দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় বিবাহ অগ্রেই হইবে—তথাপি একবার বলিয়া দেখিব, যদি বাধা দিতে পারি!

শুভ্র শাশুড়ী প্রকারান্তরে জনক-জননী সমান-শাস্ত্র এই কথা বলেন। এমন মহৎসুদয়ের ছায়াতলে থাকিলে যে জীবন ধন্য হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তারপর সরস্বতী, বউদিদি যখন বলিলেন—অমন মেয়ে আর হয়না, তখন আর কথা কি? জানিনা ভগবান আমাকে কোন দিক দিয়া কিরূপ কার্যে ব্রতী করিবেন—তবে তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। মামুষ আমরা তাঁহার কলের পুতুল—যেমন চালাইবেন, তেমনই চলিতে হইবে—নিজস্ব ত কিছু নাই?

আনন্দে সমস্ত রাত্রি দুঃখীরামের নিদ্রা হইল না, কাকালের ছেলে আজ রাজা হইতে চলিয়াছে। ছগনলালের অতুল বিষয়ের উত্তরাধিকারী হওয়া বড় সহজ সৌভাগ্য নয়! দুঃখীরাম কিছুদিন পরে রাজজ্ঞামাতা হইবেন—তাঁহার ত্রায় পরদুঃখকাতর ধার্মিক যুবক, ভগবানের দিক হইতে গুণের ঠিক পুরস্কার প্রাপ্ত হইল! ভাগ্য

যে কাহার কখন কিরূপ ভাবে পরিবর্তিত হয়—তাহা কে বলিতে পারে ?

রত্নাবলীর মুখে উভয়ের মতামত শুনিয়া ছগনলাল সরস্বতীর বিবাহে মহা উৎসবের আয়োজন করিতে লাগিলেন। একমাত্র কন্যা, অর্থেরও অভাব নাই—ইহাতে কিরূপ সমারোহ হওয়া উচিত পাঠক তাহা মনে মনে চিন্তা করুন। দুঃখীরাম উদ্যোগ আয়োজন হইতে দেখিয়া আপনার মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন—বলিয়াছিলেন—বউদিকে দাদার সহিত মিলাইয়া দিয়া এই কাথা করিলে ভাল হইত। তাহাতে ছগনলাল বলিলেন—বাবা! সে আর বেশী কথা কি? যখন সমস্ত সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তখন দুই এক সপ্তাহ বিলম্ব হইলে, আর ক্ষতি কি হইবে?

যে প্রাণ দান করিয়াছে—তাহার মুখের উপর কথা কথা যুক্তিসঙ্গত নয়। দুঃখীরাম আর কোন কথা कहিলেন না। চৌবেজীর বাড়ীতে বিবাহের খুব ধুম পড়িয়া গেল। আত্মীয়-স্বজন আসিয়া অট্টালিকা সরগরম করিল—নহবৎ খানায় নহবতের সাড়া পড়িয়া গেল। গৌসাইগঞ্জ গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সরস্বতীর বিবাহে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া খাটা-খাটুনি করিতে লাগিল।

শুভদিনে শুভক্ষণে বিবাহ কার্য্য সমাধা হইল। সরস্বতী মনোনত পতি পাইয়া স্থিখিনী হইলেন—আর দুঃখীরাম আশার অতিরিক্ত লাভ করিয়া ভগবানকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ছগনলাল ও যশোদা আজ মনোমত সৎপাত্রের কন্যা সম্প্রদান করিয়া জীবনের একটা মহা দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। আর রত্নাবলী তাঁহার সহকে আপনার করিয়া লইয়া প্রাণের ভালবাসা দানে কৃতার্থ হইলেন। সরস্বতী যেমন গুণবতী, দুঃখীরামও তেমনি;

“যোগং যোগেন যজ্ঞাতে”। ভগবান আজ এ রাজযোটক মিলনের কৰ্ত্তা হইয়া পরম ধাৰ্মিক ছগনলালের মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন।

এ বিবাহ-উৎসবের জের বহুদিন ধরিয়া চলিতে লাগিল। যে ছগনলাল সামান্য একটী কার্য্য উপলক্ষে, বহু ব্যয় বাছল্য করেন—আজ তাঁহার একমাত্র কন্যার বিবাহে এরূপ আশাতীরিক্ত না হইলে মানাইবে কেন? বিবাহে যে যাহা চাহিল—ছগন কাহাকেও বিমুখ করিলেন না। জামাতা দুঃখীরামকে উপঢৌকন আর কি দিবেন, বলিলেন—বাবা! আজ হইতে এ বিষয়-বৈভব সমস্ত তোমাদের, তোমরা সুখে সংসার কর, আমরা এইবার উভয়ে পরকালের চিন্তায় নিরত হইব। আর কেন, সময় ক্রমশঃ ত নিকটবর্তী হইতেছে?

“কার ভাগ্যে কি লেখা, লিখেছে হে সখা, না জায় চক্ষে দেখা, বুঝে উঠা দায়”। আজ আবার ভক্তের এই গানটী আমাদের মনে পড়িল; দুঃখীরামের ভাগ্যে যে এরূপ লেখা ছিল—তাহা কে জানিত? দুঃখীরাম অতুল ধনের অধিপতি হইয়াও নিজের দীনতা হারাইলেন না, তিনি যেরূপ নম্র প্রকৃতি লইয়া জন্মিয়াছিলেন—যেরূপ পুত্ৰ-চরিত্রে তিনি সকলের উপকার করিতেন, এখন এ বিষয়-সম্পত্তি পাইয়া সে বিষয়ের খুব উন্নতি হইল। দীন দরিদ্র অতুল বিষয়-বৈভব পাইলে যেমন অহঙ্কারে মত্ত হয়, দুঃখীরামের তাহা হইল না—তিনি—“যথা পূৰ্ব্বং তথা পরং” বরং তাহা অপেক্ষা অরাজ্য নম্রভাব ধারণ করিলেন।

ষাতিংশ পন্নিচেহুদ

পথিমধ্যে

প্রাণের প্রাণ প্রাণময়কে দর্শন করিয়া তুলসীদাস ভাবে গদ-
গদ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। কোন্ পথ দিয়া কোথায়
আসিতেছেন—তাহার স্থিরতা নাই। মন উদাস হইলে, প্রাণ
ভাবসাগরে ডুবিয়া পড়িলে—ভক্তের প্রাণ জগতের কোন বিষয়
বুঝিতে পারে না—সব ভুলিয়া যায়। তুলসীদাস পথ ভুলিয়া
গিয়াছেন; কোথায় যাইতে—কোথায় যাইতেছেন, তাঁহার চৈতন্য
নাই—অনবরত চলিয়াছেন। ভক্ত জানেন—সকল স্থানেই যখন তাঁহার
প্রাণের দেবতা বর্তমান—তখন তাঁর স্থান-অস্থান কোথায়?

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন একটী পর্বত সান্নিধ্য আশ্রিয়া
তুলসীদাস উপস্থিত হইলেন, রজনীর গাঢ় তিমির যখন চারিদিক
অন্ধকার করিয়া সাধকের গমনে বাধা প্রদান করিল; পর্বতবাহিনী
ক্ষুদ্র শ্রোতস্বতী যখন তাঁহার সম্মুখে তরঙ্গের রঙ্গ দেখাইতে লাগিল,
তখন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল—ভাবিলেন এ কোনদিকে আসিয়া
পড়িলাম? দারুণ অন্ধকার ছাইয়া পড়িল, কই পথ ত নাই, এ বে
দুর্গম গিরিসঙ্কট—দারুণ বন! রাত্রি উপস্থিত, যাই কোথায়? এ
অচেনা স্থানে ত লোকালয় দেখিতেছি না, তবে আশ্রয় লইব
কোথায়? আর ত অগ্রসর হওয়া উচিত নয়, পর্বত-পাদদেশ দৌত
করিয়া তরঙ্গিনী তরঙ্গ লক্ষনে ধাইতেছে। তবে কোথায় আশ্রয়
গ্রহণ করি! তুলসীদাস দুর্ভেদ্য অন্ধকারে দিকভ্রান্ত হইয়া ভাবি-

তেছেন, এমন সময় একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পর্বতের গহ্বর হইতে আলোক হস্তে বাহির হইয়া বলিলেন—বৎস তুলসি! দিকভ্রান্ত হইয়াছে বলিয়া ভয় হতেছে কি? বৎস রে! প্রভু রামচন্দ্রের কৃপায় তোমার সকল দিকই যে মুক্ত, তবে দিকভ্রান্তির ভাবনা কেন? আয় বাপ; তোমার জন্ত আজ আমিও এইস্থানে আসিয়া বাস করিতেছি।

পরিচিত স্বর শুনিয়া তুলসীদাস অগ্রসর হইয়া, যাহা দেখিলেন— তাহাতে তাঁহার হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া গেল, গল-লগ্নীকৃত-বাসে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া, বলিলেন—গুরুদেব! আজ আপনার কৃপায় আমার অভীষ্টপূর্ণ হইয়াছে; এতদিন পরে স্বচক্ষে প্রভুর যুগল-মূর্তি দেখিয়া কৃত কৃতার্থ হইয়াছি; প্রভু পদধূলি প্রদানে দাসকে পবিত্র করুন। আজ হঠাৎ এখানে আপনার আগমন কি জন্য প্রভু?

বৃদ্ধ। বৎস! এই আমার আশ্রম; আমি প্রত্যহ এইস্থান হইতেই কানীধামে রামায়ণ গান শুনিতে যাইতাম—এ অতি দুর্গম স্থান; তাই তোমাকে এখানে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, আজ বহুদিন পরে আনুমনে এখানে আসিয়া পড়িয়াছ দেখিতেছি; সমস্তই প্রভু রামচন্দ্রের কৃপা। ভয় কিরে বাছনী! আয় গুহামধ্যে; তোমার আসিবার আশা দেখিয়া আমি পূর্ব হইতেই ফলজল সমস্ত সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি, আয় পিপাসার শাস্তি কর!

আজ বহুদিন পরে মহাবীর হনুমানের দর্শন পাইয়া তুলসীদাস ইষ্ট-দর্শন অপেক্ষাও আনন্দ লাভ করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই মহাবীরের দ্বায়া, তাঁহারই অহুগ্রহে আজ তুলসীদাসের এইরূপ সৌভাগ্যদয়, পিশাচের কথায় তুলসী-

দাস যদি এই মহাবীর হুমানের দেখা না পাইতেন, তাহা হইলে কি আজ তাঁহার শ্রীরামচন্দ্র হয়? ভক্তবীর মহাবীরের অব্যর্থ রূপাই যে তুলসীদাসের সিদ্ধিলাভের একমাত্র কারণ, আজ সেই কারণরূপী গুরুদেবের সাক্ষাৎ পাইয়া তুলসীদাস আনন্দবিভোর প্রাণে গুহা-প্রবিষ্ট হইলেন এবং হুমানের আদেশ মত ফল-জল খাইয়া ক্ষুৎপিপাসার শাস্তি করিলেন। সেদিন আর কোথাও যাইবার উপায় নাই। তুলসীদাস শ্রীগুরুর চরণ-ছায়ায় পড়িয়া রহিলেন।

মহাবীর জিজ্ঞাসা করিলেন—বৎস! শ্রীবৃন্দাবনধাম হতে স্বচ্ছন্দে প্রত্যাবর্তন করেছো, দেব-দর্শনে কোনপ্রকার বাধা হয় নাই?

তুলসী। প্রভু! ভগবানের পরমভক্ত যাহার গুরু, দেবতার দর্শনে তাহার বাধা-বিঘ্ন কেন হইবে? তবে চর্য্যচক্ষে দেখিয়া, বাহ্যিক কথাবার্তার আশা মিটিল না—পুত্র যেমন জনক-জননীর কাছে ঘুরিয়া ফিরিয়া আব্দার করে—কই, তাহা ত হইল না? তবে আসিবার কালে কাণে কাণে কে যেন বলিয়া দিল—বৎস! “সজ্জীক পাইবে দেখা স্বধামে তোমার” স্বর শুনিয়া দেহ কণ্টকিত; প্রাণ পুলকিত হইল—চারিদিক চাহিয়া দেখিলাম কিন্তু আর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। প্রভু! সর্বজ্ঞ আপনি—বলুন, কোন্ পাপে আমার মনোমাধ পূর্ণ হইতেছে না, যতবার প্রভুর দর্শন পাইতেছি—ততবারই অস্তরে, বাহিরে পাই না কেন? মহা। বৎস তুলসীদাস! এখনও পাপের ভয়? প্রভু আমার, যাহার অলঙ্কিতে সজে সজে ফিরিতেছেন, যাহার দৌত্যকার্য্যে তিনি সর্বদা নিয়োজিত, এখনও তার পাপের ভয়? যাহার কথার—মৃত শরীরে প্রাণ পায়, পাষাণে চেতনা সঞ্চার হয়, চির অন্ধ নয়ন প্রাপ্ত হয়—এখনও তার পাপের ভয়? এ বড় অসম্ভব কথা! কিন্তু বৎস!

একটা আশঙ্কা যেন আমার মনের মাঝে আসিয়া সন্দেহ জন্মাইয়া দিতেছে।

তুলসীদাস শশব্যস্তে বলিলেন—কি আশঙ্কায় সন্দেহ জন্মাইতেছে, বলুন প্রভু! যদি সেইজন্য কোন পাপ হয়ে থাকে, তাহা হইলে আমি এখনি তাহার প্রতিকার করিতে প্রস্তুত হই?

মহা। বৎস! প্রভুর মুখে শুনিয়াছ ত—“সদ্বীক স্বধামে তাঁহার দেখা পাইবে?”

তুলসী। হা! তাত বৃন্দাবন থেকে আসতে আসতে শুনেছি।

মহা। বৎস! শাস্ত্রে বলে—সদ্বীক ধর্ম আচরণ করিতে হয়। তোমার পতিব্রতা পত্নী রত্নাবলী—তোমার জন্ম সকল সুখ শাস্তি বিসর্জন দিয়ে পথে পথে পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধর্ম-পত্নীর ধর্মরক্ষা করা যে তোমার মহাধর্ম—তাহাতে অবহেলা করেছে; আর তোমার বৃদ্ধ জননী, একমাত্র পুত্রশোকে কঁদে, কঁদে অন্ধ হয়ে কোথায় পড়ে রয়েছেন, তুমি তাঁহাকে ছেড়ে এসে অত্যন্ত অধর্ম করেছ। তাঁহার উষ্ণ নিখাসই বোধ হয়—তোমার সিদ্ধিপথ রোধ করেছে! পিতা মাতার সেবা, দেব-সেবা অপেক্ষাও মহৎ—পুত্রের কাছে পিতামাতা দেবতার চেয়েও বড়, অতএব তুমি তাঁহার সম্ভাষণ বিধান করে—সদ্বীক ধর্মাচরণ কর, প্রভু এই জন্তই ঐরূপ আদেশ করেছেন। বৎস! তুমি অচিরে ইহাদের অনুসন্ধান কর; তাঁহারা কেমন আছেন, তাহার সংবাদ গ্রহণ কর—তাহা হইলে প্রভু তোমাকে নিশ্চয়ই দেখা দিবেন।

তুলসী। দেব! আপনার আদেশ শিরোধার্য্য কিন্তু ভয় হয়, পাছে আবার সংসার-প্রলোভনে পড়িয়া পরমার্থ চিন্তা তুলিয়া যাই; পাছে সার ছাড়িয়া, অসার চিন্তায় আবার বৃথা সময় নষ্ট করিতে হয়?

মহা! বৎস! ভগবদ্ভিষ্ণুর বিরুদ্ধাচরণ পাপকাৰ্য্য কিন্তু তুমি এখনও তাহা করিতেছ না? জননী ও পত্নীকে লইয়া ধর্মের সংসার পাতিবে—ইহাতে আর ভয় নাই বরং ঈশ্বরের অভিপ্রেত কাৰ্য্য সম্পাদন করিয়া, তাঁহার সৃষ্টিকার্য্যে সহায়তা করতঃ আশীর্বাদ ভাজন হইতে পারিবে! জননীর ত কথাই নাই—ধর্মপত্নীও কখন স্বামীর ধর্মপথের কটক হইতে পারে না, বা তাহার দ্বারা ধর্মপথে কোন বাধা-বিঘ্ন উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। আজ যে তুমি প্রভুর মহাভক্ত হইয়াছ, প্রভু যে তোমার প্রতি এত সন্তুষ্ট হইয়াছেন, সে কার গুণে; কার গুণে তোমার মন প্রাণ একরূপভাবে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে? ভাবিয়া দেখিলে সত্যী রত্নাবলীই কি, তোমার অন্ধকারময় জীবনপথে আলোক প্রদানের স্বরূপাত করে নাই, প্রাণ কি সংসারের জঞ্জালজাল ছিড়িয়া তাহার প্ররোচনায় এতদূর অগ্রসর হয় নাই? তবে বৎস! সহধর্মিনী ধর্মপথের কটক কিসে? তুমি পুনরায় যাহাতে ধর্ম-কর্ম মতিমান হইতে পার, কাৰ্য্যক্ষেত্রে বীবত্ত প্রদর্শন করিতে পার—এইজন্ত উহা প্রভুর আদেশ—এ কথা আমি অনেকবার তাঁহার নিকট শুনিয়াছি,—আজ সেই কথা আমার মুখ দিয়া শুনাইয়া প্রগাঢ় বিশ্বাস স্থাপন করাইবার জন্তই তিনি তোমাকে এমন করিয়া বিপথে আনিয়াছেন। রজনী প্রভাত হইয়াছে, যাও বৎস! তাঁহার আদেশানুসারে কাৰ্য্য করগে! তাহা হইলে অচিরে বাসনা পূর্ণ হইবে।

তুলসীদাস রামদাস হুম্মানের চরণে প্রণিপাত করিয়া ও পদধূলি লইয়া সেস্থান হইতে বাহির হইলেন, এতদিন পরে তাঁহার ভ্রমসংশোধন হইল। বিবাহিত স্ত্রীকে ছাড়িয়া সংসারধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া বিবাগী হইলেই যে মহাদার্শনিক বলিয়া পরিগণিত হওয়া যায় এবং তাহা হইলেই যে ধর্ম-

পথে সাফল্য লাভ করা যায়—এ মহাভ্রান্তি এতদিনে তুলসীদাসের হৃদয় হইতে দূরীভূত হইল। তুলসীদাস ভাবিতে লাগিলেন বাস্তবিক রত্নাবলী যদি সেদিন তাহার চৈতন্য সম্পাদন না করিয়া দিত, তাহা হইলে ত এতদিন তাহার রূপ-গুণে মজিয়াই ত আমাকে মল্লম্ব হারাইতে হইত, জীবনের শেষ দিন অবধি ত তাহারই বাহুমূলে আবদ্ধ থাকিয়া নিতান্ত পশুর মত জীবন যাপন করিতে হইত; আজ সে পশুত্ব ঘুচাইবার মূল কারণই ত রত্নাবলী। হায়! আমি তাহাকে ত্যাগ করিয়া কি কুকাঁজই করিয়াছি; সে এখন কোথায়? সেদিন দুঃখীর মুখে শুনিয়াছিলাম,—সে পাগলিনী হইয়া মনের দুঃখে কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। মাও আমার জন্ত কাদিয়া কাদিয়া অন্ধ হইয়াছেন। বাস্তবিক আমি পূণ্য সঞ্চয় করিতে গিয়া গোড়ায় কত মহাপাপ সঞ্চয় করিয়াছি; আর সেইজন্য প্রভুর রূপ লাভে বার বার বঞ্চিত হইতেছি, নতুবা তার দেখা পাই পাই—পাইনা কেন? এত কাছে কাছে, এত ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে থাকিয়াও সে রাতুল চরণ দর্শনে বঞ্চিত হইবার কারণ নিশ্চয়ই এই সকল পুঞ্জীকৃত পাপরাশি! আহা! মা আমার, জীবনের সমস্ত সুখশান্তি বিসর্জন দিয়া, এমন কি মৃত্যুকে পর্যন্ত তুচ্ছজ্ঞান করিয়া আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন! শেষদশায় আমি তাঁর কি করিলাম—হায়, দেবি! আজ তুমি কোথায়? হা শ্রিয়ে রত্নাবলী, তোমার চমকপ্রদ-হিতকথায় আমার চৈতন্য হইল, ধর্মপথে অগ্রসর হইয়া জীবন ধন্য করিলাম কিন্তু এ হতভাগাকে স্বামীহে বরণ করিয়া তোমার কি হইল? কেবল দুঃখভোগই কি সার—আর কি তোমার দর্শনলাভ করিয়া ক্ষমা ভিক্ষায় তোমার তুষ্টিসম্পাদন করিতে পারিব না?

তুলসীদাস যাহাকে এতদিন অনার ভাবিয়াছিলেন—যে সংসারের

শীতল ছায়ায় তিন দারুণ মোহকর রোদ্ৰতাপ সদৃশ মনে করিতেন—যে জননী-পত্নীর সংসর্গ তিনি ধর্মসাধনার অন্তরায় বলিয়া সকলকে উপদেশ দিতেন—আজ প্রবুদ্ধমনে তাহা একান্ত প্রার্থনীয় বলিয়া তুলসীদাস কাতরপ্রাণে আবার তাঁহাদের অশ্রুধারা ছুটিলেন। কিন্তু কোথায় তাঁহারা—আর কোথায় তিনি? আজ বহুদিন যে সে সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া, তাঁহাদের অনাথা-আশ্রয়হীন করিয়া ছাড়িয়া আসিয়াছেন। হায়! এতদিন কি সে কোমলপ্রাণা রত্নাবলী কি আমার অমিত অত্যাচারে জীবিতা আছে? মা অন্ধ জীবন্ত হইয়া আছেন—দুঃখী বলিয়াছিল, তবে তাঁহাকে রাজাপুর হইতে সৈ কাশীর কোন স্থানে আনিয়া রাখিয়াছে; তাহার সন্ধানও কিছু জানিনা। দুঃখীরাম যে সেই চলিয়া গিয়াছে, কই আর ত দেখা করিল না; তবে কি অভাগার প্রতি প্রাণের দুঃখীও বিক্রপ হইল? এতদিন পরে সংসারভাব আবার তুলসীর হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করিয়া অশেষ দুঃখপ্রদান করিতে লাগিল, তুলসী দুঃখিত অন্তরকণে স্বধামে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। প্রাণ আজ তাঁর বড়ই ভাবময়, প্রভুর আদেশ অমান্য করিয়া হৃদয় আজ বড়ই মর্মান্বিত! ক্রমশঃ দুইদিন পথ অতিবাহিত করিয়া যখন তিনি জৌনপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—তখন রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে। পথশ্রান্তিহেতু পিপাসায় কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, আজিকার এ পরিশ্রান্তি তুলসীদাসকে বড়ই লাগিয়াছে। যে তুলসীদাস ক্ষুধা-তৃষ্ণা গ্রাহ্য করিতেন না—শরীরের কষ্ট ষাঁহার নিকট কষ্ট বলিয়াই অনুভূত হইত না, আজ তিনি শারীরিক কষ্টে একান্ত মুহমান হইয়া রাত্রি যাপন মানসে একটা অতিথিশালায় আশ্রয় লইলেন।

জনৈক ধনী ব্যক্তি পথিকদিগের সুবিধার জন্য এই অতিথি-

শাল। খুলিয়া দিয়াছেন। তুলসীদাস তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলে মঠাধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিল—আজ আপনার কি আহাৰ হইবে? তুলসীদাস বলিলেন—আমি কাহারও হস্তের পাক করা অন্ন গ্রহণ করিনা, আমার নিকট সমস্ত আছে, আপনি কেবল অণুকার মত একটু থাকিবার নিভৃত স্থান দান করুন। মঠাধ্যক্ষ অন্তরের নিকট একটা নিভৃত স্থান দান করিল এবং বাটীর জ্বীলোকদিগকে বঙ্গিয়া দিল—নাথুবাবার কিছু আবশ্যক হইলে—তোমরা পূরণ করিও, এই বলিয়া তিনি অগ্র কার্যে প্রস্থান করিলেন।

জোনপুরে হিন্দুস্থানীদের বড় বড় কারবার এবং জমিদারী আছে, এখানে অনেকেই দান-পয়সা করেন। বিদেশীয় পণ্থিকদিগকে আশ্রয়দান করা ইহাদের একটা মহৎকার্য্য, এজন্য এখানকার সকলেই মুক্তহস্ত, পশ্চিমাঞ্চলে এখনও এসকল কার্য্যের জন্য অনেক দাতা আপনার ধনের স্হায় করেন। তুলসীদাস তথায় আসিয়া প্রথমে স্নান করিয়া সন্ধ্যাত্তিক সমাপন করত রন্ধনকার্য্যে ব্রতী হইলেন। তুলসীদাস একাধে বিশেষ পাকা না হইলেও একপ্রকার চলনসই গোছের রান্না রাঁধিতে পারিতেন, অনবরত রান্না করিয়া তাহার এ বিষয়ে একপ্রকার অভ্যাসও হইয়া গিয়াছিল।

তুলসীদাস রন্ধনকার্য্যে ব্রতী হইলে দুইজন সুন্দরী জ্বীলোক অধ্যক্ষের আদেশমত তাহার সহায়তা করিতে লাগিলেন। মিটি মিটি করিয়া আলো জ্বলিতেছে—কিছুই ভাল দেখিতে পাওয়া যায় না। একটা জ্বীলোক অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রভুজী! আপনার কি কি দ্রব্য আবশ্যক—অন্নমতি করুন? তুলসীদাস বলিলেন—আমার ঝুলিতে সমস্ত দ্রব্যই আছে, আমরা উদাসীন লোক—কখন কোথায় থাকি, কোথায় যাই, তাহার ত হিরতা নাই—এইজন্য

সমস্তই সংগ্রহ আছে। রমণী বলিলেন—লবণ-লঙ্কা আনিয়া দিব কি? তুলসীদাস বলিলেন—তাহাও আছে। তখন রমণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—যদি লঙ্কা-মরিচ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত দ্রব্য আপনার ঝুলির মধ্যে আছে, তবে জ্বীকে সঙ্গে গ্রহণ করেন নাই কেন, ইহাতে আপনার কি ক্ষতি হইত? কথাটা তুলসীদাসের মর্মে আঘাত করিল, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই অনিন্দ্যসুন্দর রমণীর প্রতি চাহিয়া আবার চক্ষু নামাইয়া লইলেন, পরস্পর প্রতি দৃষ্টিপাত ঘে সন্ন্যাসধর্মের বিরুদ্ধ কিন্তু একি! রমণীর সেই রমণীয়মূর্তি তুলসীর নয়নপথে পতিত হইয়া একি ভাবান্তর করিল? তাহার প্রাণ আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল। সেই একখানি মলিন সাড়ী পরা, দীনবেশা রমণীমূর্তি তাঁহার চক্ষে এত সুন্দর দেখাইল কেন, এবং তাঁহাকে দেখিয়া অবধি তুলসীর মন এত চঞ্চল হইল কেন? কোনও পোষাক-পরিচ্ছদ নাই, রমণী সধবা হইলেও ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারিণী, তথাপি রূপ যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। অপরটী তত না হইলেও যৌবন জুয়াড়ে অঙ্গ ঢলঢল, নদী যেন দুকুলভরা।

সন্ন্যাসী কিছু চাহিলেন না, কাজেই তাঁহার আর অপেক্ষা না করিয়া অন্তরে প্রবেশ করিলেন। অন্ধকারে সন্ন্যাসীকে দেখিবার সাধও তাঁহাদের মিটিল না। পরদিন প্রভাত হইতে না হইতেই তুলসীদাস জোনপুরের অতিথিশালা ত্যাগ করিয়া বারাণসী অভিমুখে ধাবিত হইলেন, আর কোথাও অপেক্ষা করিলেন না। জননী ও পত্নীর জন্য তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়াছে কিন্তু কোথায় তাঁহারা আর কোথায় তিনি, প্রাণের বন্ধু দুঃখীরামই বা কোথায়?

কাশীতে আসিয়া তিনি প্রাণের আবেগে দুই তিন দিন জননীর অন্বেষণে কাশী-সহরটা তন্ন তন্ন করিয়া বেড়াইলেন, কত লোককে

জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু কোন সন্ধানই পাইলেন না, তুলসীদাস হতাশ হইয়া আশ্রমে ফিরিলেন। হায়! আর বুঝি জননীর সে পবিত্র মূর্তি দেখিয়া, তাঁহার সেই চরণপদ্ম পূজা করিয়া আর জীবন সার্থক করিতে পারিব না? স্বর্গের নিধিকে কত অশ্রদ্ধা করিয়াছি, অবহেলা করিয়া কত দুঃখ-কষ্ট দিয়াছি, কোমলপ্রাণে মা আমার এত অত্যাচার সহ করিয়া কি জীবিত আছেন? প্রাণের একমাত্র আশাভঙ্গে বোধ হয়—দুঃখিনী আত্মহত্যা করিয়াছেন, সে পাপের ভাগী তিনি নহেন, অধম আমিই তাঁর এ শোচনীয় মৃত্যুর কারণ! দুঃখেভাই ত বলে গিয়েছিল—খুড়ীমা! কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়েছেন, বোধ হয় শীঘ্র তোমার দেখা না পеле, আর বাঁচবেন না। হায়! তাই কি হইল? আর প্রিয়া রত্নাবলীর সংবাদ ত সে দিতেই পারে নাই, আমি গৃহত্যাগী হইবার পর সেও পাগল হয়ে কোন দিকে চলে গিয়াছে, জীবিতা কি মৃত্যু কেহ বলিতে পারেনা। নিশ্চয়ই মৃত্যু, কোমলপ্রাণা-হরণী নিদারুণ ব্যাধের অত্যাচারে কি আর এতদিন জীবিত আছে? হায়! আমি কি করিলাম—পুত্র হইয়া নিজের পবিত্র বংশটাকে এমন করিয়া নষ্ট করিলাম; শেষে ইতোনষ্ট ততোদ্রষ্ট হইয়া ভগবানের করুণা লাভে বঞ্চিত হইলাম।

প্রথম দুই একদিন ছাত্রবর্গ গুরুদেবকে এমন বিমর্ষভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়া বড়ই চিন্তিত হইয়াছিলেন। যিনি তিলমাত্র নিরানন্দ থাকিতেন না, শ্রীকৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার একি পরিবর্তন হইল! কিন্তু কয়েক দিবস পরে আবার আত্মসংবরণ করিয়া তুলসীদাস শিষ্যবর্গের নহিত হাসিমুখে কথা কহিলেন,— তবে তাঁহার প্রাণের আগুণ নিভিল না, তিনি ভিতরে ভিতরে জননী ও পত্নীর সন্ধান করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ পশ্চিচ্ছেদ

পুত্রাবাসে

এখন কাশীর যেখানে অনাথ-আশ্রম নির্মিত হইয়াছে, তাহার অনতিদূরে লাক্ষা নামক স্থানে ভগবানদাস ছুবার বৃহৎ শাস্তি-নিকেতন প্রতিষ্ঠিত ছিল—লোকে তাহাকে আরামবাগ বলিত, কারণ সেখানে তখন ভগবানদাসের সমগ্রত খোলা ছিল—দুঃস্থ নরনারী তথায় আসিলে আহার ও বাসস্থান পাইত।

ভগবানদাস অল্প দেশবাসী হইলেও এইস্থানে এই কীর্তি স্থাপন করিয়া কত লোকের যে আশীর্বাদ ভাজন হইয়াছিলেন—তাহা বলা যায় না। ভগবানদাস খুব সাধুর প্রকৃতির লোক ছিলেন; অর্থ যে তাঁহার খুব বেশী ছিল, তাহা নহে, তথাপি তিনি কাজকর্ম যাহা করিতেন—অনেক বড়লোকেও তাহা করিতে সাহস করিত না। এ জগতে সাহসই মূল্যবান, সংকার্যে সাহস করিয়া লাগিতে পারিলে, অনেক সামান্য লোকের দ্বারা বড় বড় কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে দেখা গিয়াছে, সংকার্যে যে ভগবান সহায়—ইহার আর ভুল নাই।

ভগবানদাস এবার সামান্য দিনের জন্য কাশীতে আসিয়াছেন; জননীকে রাখিয়া আবার শীঘ্র চলিয়া যাইবেন কিন্তু তাহা হইতেছে না; তাহার কারণ কাশীতে আসিবার সময় হুলসীদেবী ও দুঃখী রাম তাঁহার সঙ্গ লইয়াছিল। এই পরদুঃখ-কাতর ধনী ব্যক্তির সঙ্গ না জুটিলে বৃদ্ধা হুলসীদেবীকে লইয়া দুঃখীরামের কাশী আগমন করা দুষ্কর হইত। ভগবান দাস পথে যান-বাহনের সাহায্য

করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নিরাপদে এত শীঘ্র এখানে পৌঁছিয়াছেন এবং এখনও তাঁহারই আশ্রয়ে আছেন।

দুঃখীরাম কাশী আসিয়া ভগবান দাসের আশ্রয়ে তুলসীদেবীকে রাখিয়া আজ দুই মাস হইল, সেই যে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন—তাঁহার আর কোন সংবাদ নাই! এদিকে বৃদ্ধা বড়ই কাতর হইয়াছেন, যত দিন যাইতেছে—তাঁহার কাতরতা যেন তত বৃদ্ধি পাইতেছে। তিনি ভাল করিয়া খান না—ভাল করিয়া নিদ্রা যান না, কেবল ক্রন্দনই সার করিয়াছেন। ভগবান তাঁহাকে অতীব যত্নে, ঠিক জননীর মত আদর করিয়া রাখিয়াছেন—তথাপি তাঁহার শাস্তি নাই—প্রাণে ক্ষুতি নাই, এমন কি পবিত্র কাশীধামে আসিয়া একদিনের জন্ম তাঁহার দেব-দর্শনের ইচ্ছা হয় নাই, কেবল হা তুলসী; হা তুলসী বলিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। দুঃখীরামকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন—হ্যাঁ বাবা দুঃখী! তুই যে কাশীতে আমার বাছার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিবি বলে আনুলি, তা না করে, তুই এই অচেনা জায়গায় আমায় একা ফেলে কোথায় পালালি বাপ? বউমার সন্ধান কর্তে সেই যে গেলি, আর দেখা নাই—তবে কি তোর সমস্ত কথাই মিথ্যা? এই বলিয়া বুড়া কেবল কাঁদে—খায় না—শোয় না; কেবল মনমরা হইয়া একধারে বসিয়া থাকে।

ভগবানদাস ইহাঁকে লইয়া বড়ই বিব্রতে পড়িয়াছেন—দুঃখী না আসিলে বা তাঁহার পুত্রের সন্ধান করিয়া দিতে না পারিলে, কেমন করিয়া তাঁহাকে ফেলিয়া যান? আর দুঃখীর অপেক্ষা না করিয়া ভগবানদাস এখন নিজেই তাঁহার পুত্র তুলসীদাসের সন্ধান করিতেছেন কিন্তু কাশীর মত জনাকীর্ণ বড় সহরে তুলসীদাস দ্বিবেদীর মত নগণ্য একজন যুবককে খুঁজিয়া বাহির করা কি সহজ? তিনি নানা স্থানে

সন্ধান লইয়াছেন কিন্তু তুলসীদাস দ্বিবেদী বলিয়া কোন লোকের সন্ধান কেহ দিতে পারে না। তবে সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে তুলসীদাস গোষ্ঠামী বলিয়া একজন মহাপুরুষ আছেন, তিনি কখন কোথায় থাকেন—সহজে তাঁহার ধরা পাওয়া যায় না। আর বুড়ীর ছেলে তুলসীদাস কি এ তুলসীদাস হওয়া কখনও সম্ভব, ভগবানদাসের তাহা বিশ্বাসই হয়না। তিনি মন্ত সাধু, কাশীশুদ্ধ লোক তাঁহার নামে যোড়হস্ত—তিনি সাধুমহাত্মা; বুড়ীর ছেলে সামান্য একজন লোক, দুঃখে-কষ্টে পড়িয়া হয়ত সংসার ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছে—ইনি কি কখন সে তুলসী হইতে পারে? কাজেই হতাশ হৃদয়ে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া একদিন হুলসীকে বলিতেছেন—মা ! দুঃখীরাম ত এলো না, আমি তোমার ছেলের জন্ত অনেক চেষ্টা করছি কিন্তু তুলসীদাস দ্বিবেদীর নাম কেউ বলতে পারে না; তাকে কেউ জানেও না, তবে সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজন তুলসীদাস গোষ্ঠামী আছেন—তিনি মহাপুরুষ, তিনি কি আপনার পুত্র হবেন ?

হুলসী। তা কি জানি বাবা ! তুমি যে সাধু-সন্ন্যাসীর কথা বলছো, সে কি অত বড় লোক হয়েছে; তবে দুঃখী বলেছিল,— সে নাকি কি “বেদনা” পড়ে খুব পণ্ডিত হয়েছে।

ভগবান। তাতো কই শুন্সাম না, তবে তিনি খুব সাধু—এমন কি মরা মানুষ জেস্ত কর্তে পারেন, কত কাণা-খোড়াকে ভাল করছেন, কাশীতে তাঁর খুব নাম আছে; তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, সব বলতে পারেন—একপ্রকার ঈশ্বরজ্ঞানিত লোক বলেই হয়।

হুলসী। না বাবা ! তুমি যে আমার এতদূর হয়েছে, তা শুনি, তবে বাবা ! তুমি যে তুলসীদাসের কথা বলছো, তিনি

যদি অমন গণ্ডতে পারেন, তা তাঁকে দিয়ে একবার গণিয়েই দেখোনা, যদি আমার বাছার কোনও সন্ধান বলতে পারেন?

ভগবান। সে কথাও মন্দ নয়—কত লোক তাঁর কাছে যাচ্ছে, তিনি অসিনদীর কাছে থাকেন, আজ সন্ধ্যার সময় যখন বেশী ভিড় থাকবেনা, সেই সময় না হয় একবার তোমাকে নিয়ে যাব—তোমারও কাজ হবে, আর আমারও সাধু দর্শনে মহাপুণ্য লাভ হবে, এমন সাধু দেখলেও ত পরম লাভ আছে?

হুলসী। হাঁ বাবা! সেই ভাল, এককাজে দু-কাজ হবে; বাঁচালি বাবা! তাই কর বাবা! আমাকে একবার তাঁর কাছেই নিয়ে চল, দুঃখী ত আর এলো না—যদি বাবা! তোর দ্বারা বাছার কোনও কিনারা হয়—বাবা! তোকে আর কি বলে আশীর্বাদ করো?

ভগবান। মা! উতলা হবেন না, আজ সন্ধ্যার পরই আপনাকে সেখানে নিয়ে যাব; বেলা আর বেশী নাই, আপনি প্রস্তুত হন, আমি সন্ধ্যাল্লিক সেরে আসছি।

হুলসীদেবী আনন্দে গদগদ হইয়া বলিলেন—এস বাবা! এস, আমিও জপটা সেরে নিই, আর বাবা! জপে কি মন লাগে; বাছাই যে আমার জপ তপ, বাছা যে আমার জীবন, আজ কতদিন হলো যে বাছার চাঁদবদন দেখিনি, তার মুখে মা-বলা শুনিনি, আমার বড় কঠিন যান—তাই এখনও বেঁচে আছি। এই বলিয়া হুলসীদেবী বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া জপে বসিলেন। কিন্তু প্রাণ যার পুত্র-চিন্তায় অস্থির—ইষ্ট-চিন্তা তার কোথা? বাৎসল্য-প্রতিমা জননীর নিকট পুত্রের চিন্তা, তাহার দর্শনাকাজী যে ইষ্ট-চিন্তা অপেক্ষাও বেশী! বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি নিয়মকর্ম প্রতি-

পালন করিয়া বাহিরে আসিলেন এবং ভগবানদাসকে গাড়ী লইয়া অপেক্ষা করিতে দেখিয়া, তিনি বানারোহণ করিলেন। গাড়ী গন্তব্য স্থানে চলিল এবং কিছুক্ষণ পরে যখন তুলসীদাসের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল—তখন অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছে, চারিদিকে সাঁঝের বাতি জলিয়াছে।

কাশী খুব বড় সহর। অজানা ব্যক্তি আসিয়া সহজে কাহারও বাসস্থান খুঁজিয়া লইতে পারে না। ভগবানদাস বুঝাকে গাড়ীর মধ্যে রাখিয়া আপনি পদব্রজে দুই একটা লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন—
হাঁ মহাশয়! তুলসীদাস বাবাজীর আশ্রম কোথায়?

একজন দেখাইয়া দিল—এয়ে আট্‌চালা দেখিতে পাইতেছেন, কতকগুলি ছাত্র বেদধ্যয়ন করিতেছে—উহাই বাবাজীর আশ্রম।

ভগবান। তিনি এখন আশ্রমে আছেন কি?

পথিক। তা বলতে পারিনা, তবে সন্ধ্যার পর তিনি বড় একটা কোথাও যান না, কাশীর মধ্যে তিনি একজন সিদ্ধসাধক, যাহার কিছু আবশ্যক হয়—তিনি নিজেই আসিয়া জানিয়া যান, বাবাজী কাহার দ্বারস্থ হন না!

ভগবান আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না—আন্তে আন্তে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন—তারকাবেষ্টিত শশধরের ত্রায় ছাত্র পরিবেষ্টিত একটা সন্ন্যাসীমূর্তি, ভগবানদাস অহুমানে তাঁহাকে তুলসীদাস জানিয়া প্রণাম করিলেন।

তুলসীদাস জিজ্ঞাসা করিলেন—কে আপনি, আবশ্যক কি?

ভগবান। মহাশয়! আমি তুলসীদাস বাবাজীর সহিত দেখা করিব—আপনিই কি তিনি?

তুলসী। সকলে দয়া করে আমাকে এই নামেই ডাকে।

ভগবান। আজ আমি ধন্য হলাম, আপনার ন্যায় মহাত্মার দর্শন লাভ করে চরিতার্থতা লাভ করলাম।

তুলসী। কি অভিপ্রায়ে আগমন হয়েছে?

ভগ। মহাশয় আপনি গুণী, জ্ঞানী ও পণ্ডিত চূড়ামণি, আপনার অপূৰ্ণ যোগ-প্রভাব-দর্শনে কাশীবাসী জনগণ বিমোহিত; আপনার দ্বারা যে কত লোকের কত মহৎ উপকার সাধিত হয়েছে তাহা বলা যায় না। আপনি জ্যোতিষ শাস্ত্রেও নাকি মহা পণ্ডিত, ভূত-বিষয়-বর্ত্তমান নাকি আপনি সুন্দররূপে নির্দ্বারণ করে দিতে পারেন—তাই শুনে একটা বুদ্ধাকে সঙ্গে করে এনেছি, ইনি দেখিতে পাননা, কৃপা করে এর দৃষ্টিশক্তি দান করুন, ইহার একমাত্র পুত্র নিরুদ্ধিষ্ট—তারজন্ম কেঁদে কেঁদে অভাগিনীর এই দশা হয়েছে, দয়া করে বলে দিন—ইহার সেই পুত্র জীবিত আছে কিনা এবং যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে কোথায় আছে—দয়া করে বলে দিয়ে ইহার জীবন দান করুন।

তুলসীদেবীকে দ্বারবান হাত ধরিয়া আনিল; তিনি আসিয়া কাদিতে কাদিতে বল্লেন—আর বাবা! বলে দাও আমি কবে মরবো—আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে নেই, পাঁচ বৎসর বাছাকে হারিয়ে কেবল আশায় বুক বেঁধে আছি কিন্তু আর পারি না—বাবা!

তুলসীদাস ভগবান দাসকে জিজ্ঞাসা করলেন—মহাশয়! ইনি কি আপনার কোনও আত্মীয়?

ভগ। না, মহাশয়! তবে আমি ইহাকে জননী অপেক্ষাও ভক্তি ও মায়া করি; সম্ভ্রতি ইনি আমার ভবমেই আছেন। প্রতিবাসী কোন যুবকের সহিত ইনি পুত্রের সন্মানে কাশীতে

আসিতেছিলেন—পথিমধ্যে উহার কষ্ট দেখিয়া আমি গাড়ীতে তুলিয়া লই। সেই অবধি ইনি আমার পোষ্যভূক্তই আছেন।

তুলসী। পূর্বের কি কোন পরিচয় জানেন না?

ভগ। আজ্ঞে না! পথেই দেখা, পথেই আলাপ হয়, সেই যুবকটিও কিছুদিন আমার বাড়ীতে ছিল, ইহার পুত্রের সন্ধান করিয়া দিবে বলিয়া সেই যে আশা দিয়া চলিয়া গিয়াছে, প্রায় একবৎসর হইল—তাহারও আর দেখা নাই।

তুলসীদাস বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মা! আপনার ছেলে কি রাগ করে বাড়ী থেকে চলে গেছে, আপনাদের নিবাস কোথায়?

হুলসী। হাঁ বাবা! সে বৌমার সঙ্গে ঝগড়া করে চলে গেছে, আমার বেহাইয়ের বড় ব্যায়রাম হয়েছিল, সেইজন্য বৌমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে ছিলাম বলে—দুইজনে কি ঝগড়া করে চলে গেছে।

তুলসী। মা! আপনার ছেলের নাম কি, বাড়ী কোথায়; আপনাকে কে কাশীতে এনেছিল?

হুলসী। বাবা! আমার ছেলের নাম তুলসীদাস, রাজাপুত্র আমাদের বাড়ী; দুঃখীরাম বলে একটি ছেলের সঙ্গে কাশীতে এসে এই ভগবানদাসের বাড়ীতে আছি! হ্যাঁ বাবা! আমি বাছাকে আর পাবো কিনা—গুণে বল বাবা! বলিয়া হুলসীদেবী বাবাজীর হাতে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

তুলসীদাস ভাবমগ্ন হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে—মা! মা!! মা!!! দাসের অপরাধ ক্ষমা করুন, এই অধমই আপনার নরাদম পুত্র বলিয়া তুলসীদাস তাহার চরণধূলি মাথায় লইয়া আমার সকল দোষ মার্জনা করুন—আপনার প্রাণে ব্যাথা দিয়ে আমি যে পাপ সঞ্চয় করেছি, সেই

পাপরাশি আমার সাধনার পথে বাধা প্রদান কচ্ছে। মা জননি ! এই মহাপাপী সন্তানের জন্ত কেঁদে কেঁদে আপনার চক্ষু গিয়েছে, অহো কি নরাধম আমি, প্রভু, রামচন্দ্র ! আমার জননীর দৃষ্টিশক্তি প্রদান কর ঠাকুর ! এই বলিয়া মহাপ্রাণ সাধক জননীর চক্ষে হস্ত প্রদান করিলামাত্র বৃদ্ধা দৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত হইলেন। তুলসীদাস মাতৃ-চরণে পতিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

হুলসীদেবী দৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত হইয়া—বাপ আমার, মাণিক আমার, এমনি করে কি মাকে কাঁদাতে হয় ? এই বলিয়া পুত্রকে বক্ষে ধারণ করিলেন।

তুলসী। মা ! তোমার এ হতভাগ্য পুত্রের সকল অপরাধ মার্জনা কর, বলিয়া পায়ের ধূলা গ্রহণ করিলেন।

তুলসীদাসের চক্ষের জল মুছাইয়া জননী বলিলেন—বাপ ! তুলসীমণি আমার, চিরজীবি হও বাপ, আমি যেন তোমার চাঁদ-মুখ দেখতে দেখতে এই কাশীর গঙ্গাতীরে স্থখে মরতে পারি।

তুলসী। মা ! আমি যে তোমাকে এতদিন কষ্ট দিয়ে অসীম পাপ সঞ্চয় করেছি, তার জন্ত আমাকে ক্ষমা কর।

হুলসী। বাবা ! এতদিন আমার যা কষ্ট হয়েছিল—আজ তোকে নীরোগ শরীরে দেখে আমি সে সব কষ্ট ভুলে গেছি, পাপ কি বাবা ! উঠ, আর পায়ে ধরে কাঁদতে হবে না—আমি তোমার সকল দোষ মার্জনা করিলাম।

তুলসী। আহা ! আজ আমি ধন্য, দেবী কৃপা-লাভে কৃতার্থ হলাম

ভগবানদাস দোবে এতক্ষণ অবাক হয়ে মাতা পুত্রের দুঃখ-কাহিনী শুনিতেছিলেন এবং ভগবানের অপূর্ব কৌশলে তাঁহাদের এই অভাবনীয় মিলন দেখিয়া মনে মনে তাঁহার চরণে কোটি কোটি প্রণাম করিতেছিলেন।

এইবার তুলসীদাস ভগবানদাস দোবেকে করঘোড়ে আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন—মহাঅন! আপনার ঋণ আমি জীবনে কখনও পরিশোধ কর্তে পারবো না, আপনি এতদিন আমার বৃদ্ধা জননীর রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আমাকে অসীম ঋণ-জালে জড়িত করিয়াছেন,—প্রভু! রামচন্দ্র আপনার সর্বদ্বন্দ্বী মঙ্গল বিধান করুন।

ছাত্রগণ মাতা-পুত্রের মিলন দেখিল। যেমনি পুত্র, জননীও তাঁহার তেমনি স্নেহবতী। তারপর মাতা-পুত্রের কত কথা—সে আর ফুরায় না, পাঁচ বৎসরের প্রাণের কথা কি দুই এক ঘণ্টায় শেষ হয়? রাত্রি অধিক হওয়ায় ভগবানদাস সেদিন তুলসীদাসের ভবনেই আহারাদি করিয়া বিদায় হইলেন, তাঁহার। আজ উভয়ে বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ! তুলসী বলিলেন—ভাই! যে যুবকটি মায়ের সঙ্গে আসিয়াছিল—সে যদি আপনার বাটীতে আসে, অথবা তাহার যদি কোন সন্ধান পান—তাহা হইলে দয়া করিয়া আমাকে জ্ঞাপন করিবেন। “নিশ্চয়ই প্রভু! আজ আমি ধন্য হলাম” বলিয়া ভগবানদাস গৃহাভিমুখে গমন করিল।

তারপর মাতা-পুত্রের সহিত ছাত্রগণের কত আদর-আপ্যায়ণ, কত আনন্দ-অভিনন্দন হইল তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, তুলসীদেবী বলিলেন—বাবা! আর পাগলামী করিস্ না—এইবার বউমাকে সন্ধান করে ঘরবাসী হবি চ, আহা! মা আমার ভেবে ভেবে পাগলের মত হয়ে, কোথায় চলে গেছে, কে তার সন্ধান করে দিবে? দুঃখী যে তাহাকে খুঁজতে গেলো, কই বাবা! সেও ত আর আজও কিরিল না তুলসীদাস বলিলেন—মা! ভগবানের ইচ্ছায় আবার সব হবে—তুমি আশীর্বাদ কর। সেদিন সকলের মনের আনন্দে সমস্ত রজনী বসিয়া বসিয়াই কাটিয়া গেল।

চতুঃশ পৰিচ্ছেদ

বন্ধুসনে

একদিন দাক্ষিণ্য গ্ৰীষ্মের প্রাতঃকালে সমস্ত রাত্রি নিদ্রা না হওয়ায় দুঃখীরাম বাগানের বাঁধাঘাটে আসিয়া উপবেশন করতঃ নিদাঘ-যজ্ঞণা বিছুরিত করিতেছেন, সরোবর-সলিল-সংপৃক্ত সমীরণ স্পর্শে শরীর শীতল হইয়া একটু তন্দ্রার আবেশ হইতেছে। কিন্তু কাজ অনেক—এ সময় নিদ্রা যাইলে সমস্ত মাটি হইবে। চৈত্রমাসের এ সময় ত চূপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না? একা ছিলাম বেশ ছিলাম—কোন বজ্রাটাই ছিল না। আমি একা মাতুষ, একা ছিলাম—যেখানে ইচ্ছা, সেখানে যেতাম—যা ইচ্ছা হতো তাই করতাম, কোন দায়িত্ব নিষে এমন করে আমার বিব্রত হতে হতো না। বৌদিহিত যত কাল করলেন। ঘাড়ে এমন একটা বোঝা চাপিয়ে দিলেন—যে জীবনে নামান দায়।

ছগনলাল বাবু অতি ভদ্র এবং ধার্মিক লোক, তিনি আমার ও বৌদির জীবনদাতা, আমাদের প্রতি তাঁর অসীম দয়া না হলে, এতদিন দুজনেই মারা যেতাম। কেবল তাঁর এবং মাতৃদয় শোভাদার যত্নে আমরা এ যাত্রা প্রাণ পেয়েছি। এমন একজন ধার্মিক ভদ্রলোকের সঙ্গে আত্মীয়তা করা মহা সৌভাগ্য, এইজন্য তাঁর অনুরোধেও এই বাঁধন সহ্য কর্তে হলো, না করলে মহাশয় থাকতেন না—ধর্ম পতিত হইতে হইত, কাজেই সরস্বতীকে বিবাহ কর্তে হলো। কিন্তু আমার যেন কেমন বাধা বাধা ঠেকছে, চিরকাল

একা থাকা অভ্যাস—এখন এত দায়ীত্বের মধ্যে থাকায় যেন কষ্টের এক-শেষ হয়েছে। আমার হাতে মেয়েটিকে সোঁপে দিয়ে কর্তা-গিন্নিতে ত হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন, চিরদিনের আশা তৃপ্তি করবার জন্য এতদিন ফাঁকে ফাঁকে ঘুরিয়া এইবার ধর্মকন্ঠে মজে পড়লেন—পরকালের পথ-মুক্ত করতে লাগলেন। এখন মর বেটা তুই, তোর ঘাড়ে সমস্ত চাপিয়ে দিলুম। এই সব নিয়ে আমি এত কাজে জড়িয়ে পড়েছি যে, দাদার কাছে একদিন দেখাও কর্তে পারি না। বৌদির কঁাদ কঁাদ মুখ হাসিমাখা কর্ণো, তা আর হচ্ছে না, যতই মনে করি—আজ যাব, ততই যেন কাজ জড়িয়ে ধরে। এইজন্যই ভাললোকে বিষয়-আশয়ে এত মজতে যায় না—আর কি? এতে মজলে মানুষ একেবারে আত্ম-হারা হয়ে সব ভুলে যায়। যাই হউক, আজ যতই কাজ পড়ুক, আর থাক্‌চি না—আজ দাদাকে দেখতে যাবই যাব। বৌদির দুঃখ আর দেখতে পারি না, আজীবন এত করে, শেষটা কি একেবারে গুলিয়ে ফেলবো,—তা কখনই নয়?

ওদিকে অনেকদিন হয়ে গেল, বুড়িকে আশা দিয়া, সেই যে ভগবানদাসের বাটীতে ফেলে এসেছি, তিনি পুত্রশোকে এতদিন বেঁচে আছেন কি মরেছেন—তারও ঠিক নাই—হায় হায়! আমি কি করছি? কর্তা-গিন্নী এখনকার সমস্ত ভার আমার উপর চাপিয়ে দিয়ে, সেই যে জোনপুরে গিয়ে বসে রইলেন—আর আসবার নামটা করেন না—সেখানে কেবল দেবসেবা-অতিথিসেবা নিয়েই ব্যস্ত রইলেন। এই চৈত্ৰমাস, কাকে কি দিতে হবে—কোথায় থেকে কি 'আদায় কর্তে হবে—তাও বলে গেলেন না। বৌদিকে ও নিজের মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলেন—পাছে আমার কষ্ট হয়—খাওয়া পরায় অসুবিধা হয়—সেজন্য তাঁহাদের পাঠিয়ে দিলেন—

কিন্তু নিজেরা আস্‌বার নাম করেন না—এসময় কিন্তু আসা একবার দরকার—আজ একখানা পত্র লিখে, আস্তে বলি—তাঁরা আসুন। ইতিমধ্যে আমি একবার দাদার ও খুড়ীয়ার সংবাদ নিয়ে আসি।

দুঃখীরাম তাড়াতাড়ি বৈঠকখানায় আসিয়া একখানি পত্র লিখিয়া লোকদ্বারা পত্রখানি পাঠাইয়া দিয়া অন্ধরে প্রবেশ করিলেন। আজ দুঃখীরামের কাজ বড় বেশী। তিনি একবার কাশী যাইবেন শুনিয়া সরস্বতী শীঘ্র স্বামীর আহ্বারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। দুঃখীরাম আহ্বারে বসিলেন—সরস্বতী স্বামীর কাছে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল। দুঃখীরাম আহ্বারের সময় বড় তাড়াতাড়ি করেন—অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া থাইতে তিনি কখনই পারেন না। আজ তাঁহাকে আহ্বারে তাড়াতাড়ি করিতে দেখিয়া সরস্বতী বলিলেন—দেখ, সমস্তদিন কিছুই খাওয়া হবে না—আজ আহ্বারে বেশী তাড়াতাড়ি করে না—বসে বসে খাও—কেন, বেলা ত আর বয়ে যাচ্ছে না? এই ত মোটে নয়টা, এখনও অনেক দেরি।

“দেরিত অনেক জানি সরস্বতি! কিন্তু কাজও যে অনেক;” বলিয়া দুঃখীরাম আহ্বারাদি শেষ করিয়া এক বাটী দুগ্ধ পান করিলেন। সরস্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি ত কাশী যাচ্ছ, বাবাকে আসিতে পত্র লিখে দিলে না কি? “হাঁ দিয়াছি” বলিয়া দুঃখীরাম আশ্রয় করিয়া আসিলেন। সরস্বতী বলিল—না, লিখলেই হতো; কাজ-কর্ম কি আর চালাতে পারতে না? কর্মচারীরা সকলেই বিশ্বাসী, তাদের নিয়ে কাজ করলেই চলতো, বাবা মাকে এখন আর এতে জড়ান কেন, তাঁরা ছেনে শুনেই ত উপযুক্ত কর্তা নিযুক্ত করে চলে গেছেন।

“কর্তা যত উপযুক্ত হ'ক আর নাই হ'ক, গিন্নী ত পাকা ;” বলিয়া হাসিতে হাসিতে দুঃখারাম স্ত্রীর গালে একটি মৃদু চপেটাঘাত করিলেন। সরস্বতী হাসিতে হাসিতে বলিল—কর্তা পাকা হলে গিন্নী আর কোথায় কাঁচা থাকে? তুমি না হয় আমাকে সহকারী করে—কাজ কর্ম চালাও, দেখ পারি কি না পারি? “সরস্বতী কে বল্লে তুমি পারবে না?” আচ্ছা! ফিরে এসে তোমাকেই না হয় সহকারী করো, তার আর ভাবনা কি? বলিয়া দুঃখারাম কাপড় পরিবর্তন করিয়া বাহির বাটীতে আসিলেন।

ইত্যবসরে রত্নাবলী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বউ! ঠাকুর পো কি চলিয়া গেলেন, তিনি কি আজ কাশী যাচ্ছেন নাকি?

সর। হাঁ, আজ আর তিনি কিছুতে বাধা মান্বলেন না; আজ বড় ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করে—তবে অন্য কাজ; এই বলে বেরলেন।

রত্ন। চলে গেলেন কি; না এখন দেরী আছে?

সর। কেন, তোমার কিছু দরকার আছে নাকি দিদি, ডেকে দেবো?

রত্ন। হাঁ, যদি না গিয়ে থাকেন, তাহলে একবার ডাক্তো বোন্।

বিবাহের পর হইতে রত্নাবলী ও সরস্বতী দুই ভগ্নীর মত কালযাপন করিতেছেন। রত্নাবলী বড়, সরস্বতী ছোট; দুইটা যেন মার পেটের বোন্—এতদিন এই ভাবে ছিল। বিবাহের পর বড় যা হইয়াছেন—রত্নাবলী আর ছোট হইয়াছেন সরস্বতী। রত্নাবলীর কথা শুনিয়া সরস্বতী পদীর আড়াল হইতে স্বামীকে ডাকিল—ই্যাগা! তুমিত এখনো যাও নাই?

দুঃখী। কেন, আবার পাছু ডাক্তো এলে?

সর। দিদি একবার তোমাকে ডাকছেন।

দুঃখী। তোমাদের জালায় আর কিছু হবে না দেখছি
যেমন পা-টা বাড়িয়েছি—অমনি ডাক, শুভ কাজত এইজন্যই পণ্ড
হয়, একেত সহস্র কাছ ফেলে যাচ্ছি, তাতে আবার পা বাড়াতে
না বাড়াতেই বাধা।

সরস্বতী বলিলেন—এতে কোন অমঙ্গল হবে না—“নাম্নে
চেয়ে পিছু ভাল যদি ডাকে মায়” মাতৃসমা দিদি ডেকেছেন—
আমি নয়—যে তোমার কর্তৃপণ্ড হবে!

“সরস্বতী যেন যাক্কাৎ সরস্বতী। মুখে থৈ ফুটছে, কথায়ত পারবার
যো নাই”—এ বলিয়া! নিভতে স্বীর গোলাপী গওদেশ চুষনে রক্তাভ
করত হুঃখীরাম গৃহে প্রবেশ করিয়া ডাকলেন—বৌদি! তুমি কি
আমাকে ডাকছো?

বহু। রাগ করোনা ঠাকুরপো! তুমি যে যাত্রা করে বেরিয়েছ—
তা জানিনা; বউ বল্ল—এখনও তিনি বৈঠকখানায় আছেন—তাই
ডাকছি!

দুঃখী। বার হুই নাই বটে, তবে কি বলছো বল—আর দেবী
কল্লো, আজ সেখানে পৌছাতে পারবো না!

বহু। ঠাকুরপো! আমি শুনলাম, তুমি নাকি কানী যাচ্ছ?
আমি মনে করছি—তোমার সঙ্গে যাব, আর কতকাল এমন করে
থাকবো, আর যে থাকতে পারি না ভাই?

দুঃখী। তাতো দেখছি বউদি! কিন্তু কি করো বলো, ভগবান
যত দিন সরয় না হন, ততদিন কিছু হয় না, তা না হলে আমিই
বা এমন করে দস্যুর হাতে পড়ে নাকানী-চোবানী খাবো কেন?

বহু। ভাই! তোমার শরীরের কষ্ট অনেক হয়েছে সত্য কিন্তু

এটা ও ভগবানের একান্ত দয়া বলতে হবে—তা না হলে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হতো 'কেমন করে?'

দুঃখী। সেকথা কি আর একবার করে বলতে বউদি! তোমাকে দেখতে পেয়ে, আমার দারুণ রোগ-যন্ত্রণা কোথায় পালিয়ে গেলো; নতুবা কি আমার রোগ এত শীঘ্র ভাল হতো?

৭ রত্ন। ভগবান যে মুখ রঞ্জে করেছেন—এই আমার ভাগ্য, ভাই! এখন আমায় সঙ্গে লইবার মত আছে কি বলো!

দুঃখী। বউদি! আজ অনেক দিনের পর যাচ্ছি; তিনি কোথায়—কি রূপ অবস্থায় আছেন, তাঁকে না দেখে, তার মনোগত ভাব না বুঝে, একেবারে তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া কি ভাল? তারপর খুড়ীমাকে সেই ভগবানদাস দোবের বাটীতে রেখে এসেছি—তাঁর কি হলে:—না হলো, এসব না জেনে—শুনে, তোমাকে কোথায় নিয়ে যাব; আগে সমস্ত সন্ধান নিয়ে আসি, তার প তোমায় নিয়ে যাব; তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে, যদি দেখা না পাই, বা কোনপ্রকার অমত করেন—তাহা হলে অনেক ফেবে পড়তে হবে।

রত্ন। ফেরে আর কি পড়বো ভাই! এবার যদি তাঁর দেখা না পাই এবং যদি দেখা পেয়েও, তিনি অগ্রাহ্য করেন—তা হলে আমার থাববার অনেক যায়গা আছে।

দুঃখী। কোথায় থাকবে বউদি! তবে কি তুমি বাপের বাড়ী যাবে?

রত্ন। বাপের বাড়ী যাব কেন, আর সেখানেই বা কে আছে? এবার মা-গঙ্গার-কোলে একেবারে স্থান নেবো; আর কত দিন এমন করে থাকবো?

দুঃখী। বৌদি! সেত শেষের কথা, সোজা পথ পড়ে রয়েছে, কিন্তু আমি কি সেইজন্তই তোমাকে এত কষ্ট করে ডাকাতের হাত থেকে বাঁচালাম; দেশ-বিদেশে ঘুরে দাদার এত সন্ধান করলাম, তারপর নিজের জীবনকে এরূপ সঙ্কটাপন্ন করলাম কি তোমাকে মা গঙ্গারজলে বিসর্জন দিতে? যে কোন রকমে হউক তোমাকে এবার দাদার সঙ্গে মিলন করে দেবোই দেবো! তুমি ভেবোনা বউদি! এতদিন সহ্য করেছ, আর দশ পনের দিন থাক, এবার আমি এর একটা কিনারা নিশ্চয়ই করে আসবো।

রত্ন। তবে আজ কেন আমাকে মাঘের কাছে নিয়ে চল না?

দুঃখী। তাই বা কেন করে হয়—আজ প্রায় বৎসরাবধি তাঁকে সেখানে রেখে এসেছি, তার সন্ধানটা না নিয়ে তোমাকে সঙ্গে করে কোথায় নিয়ে যাব, যদি তিনি সেখানে না থাকেন বা একটা ভালমন্দ হয়ে থাকে?

রত্নাবলী আর কোনও প্রকার জেদ না করিয়া বলিলেন—
ঠাকুরপো! তুমি যা ভাল বুঝ তাই কর, কিন্তু এটা যেন মনে থাকে, জামি আর বেশীদিন এমন করে থাকবো না।

“না না—তুমি স্থির হও; তোমার চিন্তা অপেক্ষা, আমার চিন্তা খুব বেশী” এই বলিয়া দুর্গানাম স্মরণ করতঃ দুঃখীরাম কাশী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দুঃখীরাম কাশীতে আসিয়া তাঁহার পূর্ব পরিচিত স্থানে গমন করিলেন কিন্তু সেখানে এখন আর কোনও আশ্রম নাই দেখিয়া মনে করিলেন একি হইল! তবে কি দাদা টোল তুলিয়া দিয়া কাশীধাম ত্যাগ করিয়াছেন, আমার এত চেষ্টা কি সমস্ত ব্যর্থ হলো, তবে কি আর তাঁকে পাওয়া যাইবে না?

পূর্বেই বলিয়াছি—তুলসীদাস এখন একজন কাশীর বিখ্যাত লোক—তঁাহার নাম জানে না, এমন লোক সেখানে কেহই নাই—আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা তাঁর নামে পাগল। দুঃখীরাম যখন বিরসবদনে অসিঘাটের নিকট বসিয়া ভাবিতেছেন, তখন একজন স্ত্রীলোক সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। সে দুঃখীরামের মত একজন ধনী যুবককে তথায় ঐরূপ অবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল—হাঁ বাছা ! তুমি এই অন্ধকারে এমন ভাবে বসে রয়েছ কেন, তোমার কি কিছু হারিয়েছে ?

দুঃখী। না মা, 'কিছু হারায় নি, তবে হারানোর চেয়েও বেহুদ। প্রাণ হারানোও এত কষ্ট হয়না—মাজ আমি তার চেয়েও বেশী জিনিষ হারিয়েছি।

স্ত্রী। কি হারিয়েছ বল—তুমি কি কাহাকেও খুঁজছো ?

দুঃখী। হাঁ মা, এইখানে যে টোল ছিল, সেই টোলে এক বাবাজী থাকতেন, তাঁকেই খুঁজছি ! আমি বড় আশা করে, তাঁর কাছে এসেছিলাম।

স্ত্রী। তোমার বুঝি কিছু গণাতে হবে—তা সে গুণংকার বাবাজী, এখন আর এখানে থাকেন না, তাঁর এখন খুব ভাল হয়েছে—তিনি এখন কাশীর মধ্যে একজন নামজাদা বড়লোক হয়েছেন। মরা মানুষ বাঁচাতে শিখেছেন, পাষণকে প্রাণ দিতে পারেন—এখন তিনি একজন মহাপুরুষ, তবে এ বনের মধ্যে আর থাকবেন কেন ? এখন ঐ অগস্ত্যকুণ্ডের ধারে তাঁর খুব বড় চতুষ্পাঠী হয়েছে ; কত লোক যাওয়া-আসা করছে, তুমি যাওনা বাবা, এখনি দেখা হবে।

বৃদ্ধা সন্ধান বলিয়া দিলেন। দুঃখীরাম হরষিত-মনে সেই দিকে

প্রস্থান করিলেন এবং অতিরে তুলসীদাসের আশ্রমসমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—বাস্তবিকই তাঁহার অবস্থা কিরিয়াছে। পূর্বের জ্ঞায় সে ভাঙ্গা বেড়া, দরমায় ঘেরা ঘর নাই—দিকি পরিষ্কার গৃহ হইছে ; চারিদিকে ফুলের বাগান ! দুঃখীরাম যখন সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন দেখিলেন—ভগবানদাসও তথায় উপস্থিত আছেন—ভগবানদাসের সহিত এখন তুলসীর খুব ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে। তিনি প্রায়ই এখানে আসেন—অবসরক্রমে তুলসীদাসও তাঁহার বাটী পদার্পণ করিয়া তাঁহাকে ধন্য করেন।

দুঃখীরাম ভগবানদাসকে দেখিয়া দূর হইতে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক নমস্কার করিয়া বলিলেন—ভগবানবাবু! আপনি কেমন আছেন ? ভগবানদাস দুঃখীরামকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন এবং অতিশয় আগ্রহের সহিত নিকটে আসিয়া বলিলেন—আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন, আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া যখন বৃদ্ধা হতাশ হইলেন—কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণত্যাগে সঙ্কল্প করিলেন—তখন আর কি করিব, আমি সহস্র কাজ ফেলিয়া অনবরত একমাস অন্বেষণ করত আজ কয়েকদিন হলো বৃদ্ধাকে তাঁহার পুত্রের নিকট আনিয়া দিয়াছি !

দুঃখীরাম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন—দাদা, তাহাতে কোনপ্রকার বিধিক্তি করে নাই ?

ভগবান। না, বরং আমি তাঁহাকে আনিয়া দিয়াছি বলিয়া, বিশেষ আপ্যায়িত হইয়া আমার প্রতি যথেষ্ট রূপা প্রদর্শন করিতেছেন, এত বড় একজন সাধু মহাত্মা হইয়া প্রায়ই আমার বাড়ীতে পায়ে ধুলা দিতেছেন, আপনার জন্ত তিনি এখন বড়ই কাতর হইয়াছেন, চলুন চলুন—আহা! আজ মহাত্মা আপনাকে

দেখে কত খুসী হইবেন। এই বলিয়া দুইজনে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

তুলসীদাস একাহারী, সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে আহাৰাদি সমাপন করেন। ভগবানদাস ও দুঃখীরাম যখন আশ্রমে প্রবেশ করিলেন—তখন তুলসীদাস সবেমাত্র আহাৰ করিয়া চতু-
পাঠীতে আসিয়াছেন ; ছাত্রগণ সকলেই পাঠ সমাপন করিয়া বাড়ী
গিয়াছে।

যত দিন চক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করুক না কেন, পিয়বস্তুকে
দেখিলে তাহাকে সহজেই চিনিয়া লওয়া যায়! তুলসীদাস ইদানিং
যোগক্লিষ্ট হইয়া অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন—সহজে চেনা যায়
না, আর দুঃখীরাম বড়লোকের জামাই হইয়া, খুব তোয়াজে থাকিয়া
বেশ মোটা-মোটা হইয়াছেন—তথাপি তুলসীদাস তাঁহাকে দেখিবামাত্র
চিনিতে পারিয়া, অ্যা একে, আমার দুঃখে ভাই! আয় আয়
ভাই! তোকে দেখতে না পেয়ে আমি বড় কষ্টে আছি, কত
স্থানে কত সন্ধান নিয়েছি, কিছুতেই দেখা কর্তে পারি নাই—
মনটা যে কিরূপ খারাপ হয়েছে—তা বলতে পারিনা, আজ ভগবান
আমাকে একটা মহা ভাবনার হাত থেকে মুক্ত করলেন—তা ভাই
দুঃখী, কেমন আছি! ভাই!

দুঃখীরাম। থাকাকালি আর কি দাদা! যা হয়েছিল, তাতে
এ যাত্রা আর দেখা হবার আশা ছিল না—তবে ভগবান রক্ষা
করেছেন, একটা পরম দয়ালু মহাত্মার সেবায় এ যাত্রা জীবন
পেয়েছি, আমি অনেকদূরে গিয়ে পড়েছিলাম—তা দেখা হবে কি
করে? সেই যে দিন তোমার সঙ্গে দেখা হলো, তার পরদিনই এই
কাণ্ড; আজ মাস্থানেক স্থব্ধ হয়েছি। এই বলিয়া দুঃখীরাম

সমস্ত ঘটনা, তার পর তাহার বিবাহ, বিষয়াদি লাভ প্রভৃতি সমস্ত বিবৃত করিলেন। তার পর বলিলেন—দাদা ! আমার বিবাহ কর্ত্তে আদৌ ইচ্ছা ছিল না, তবে কি কর্কে—এমন উপকারী জীবনদাতার কথা ত ঠোলিয়া দেওয়া যায় না, কাজেই না করে থাকতে পারিলাম না। তবে অতিরিক্ত কষ্ট হয়েছে—এই বিষয়াদির ছেঁপাজাং লইয়া, গরীবের ছেলের এ সকল কি সাজে ? দুঃখীরাম সমস্তই বলিলেন—কেবল রত্নাবলীর কথাটা গোপন রাখিলেন—মনে মনে কি মন্তব্য আছে—তাহা তানই জানেন।

তুলসীদাস বলিলেন—তাতে আর কি হয়েছে—বিবাহ করেছো, তাহার বিষয় লাভ করেছো, এত একপ্রকার ভগবানেরই দেওয়া—এতে নারাজ হলে চলবে কেন ? এমন সময় হুলসীদেবী আসিয়া দুঃখীকে দেখিয়া তাহার গলা জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—বাবা ! তুই এতদিন কোথায় ছিলি দুঃখি ! তোর জন্মই আজ আমি আমার তুলসীমণিকে আবার দেখতে পেয়েছি। তোর এত দেবী কেন হলো বাবা ? দুঃখীরাম হুলসীদেবীকে সমস্ত বলিলেন—কিন্তু তাহার কাছেও রত্নাবলীর কোন সংবাদ দিলেন না।

হুলসীদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন—হারে দুঃখী ! বউটী কেমন হলো—তাও একবার দেখতে পেলাম না, তোর শশুর-শাশুড়ী কেমন মাহুষ, তাও ত জানতে পার্লেম না ?

দুঃখীরাম বলিলেন—খুড়ীমা ! সেইজন্যই ত তোমাদের নিতে এসেছি ; দাদাকে, তোমাকে এবং ভগবানদাস বাবুকে সেখানে যেতে হবে—তোমাদের পায়ের ধূলা না পেলে, আমার যে কিছুই হবে না।

হুলসী। তা সেখানে গেলে বউমাকে এবং তোর শশুর-শাশুড়ীকে দেখতে পাব তো ?

দুঃখী। তার আর পাবে না কেন? কালই তোমাদের যেতে হবে।

হুলসী। হ্যাঁ বাবা। সব ত হলো, ভগবান শেষ দশায় সমস্ত করলেন—কিন্তু কই বাবা! আমার বউমার ত কিছু কিনারা হলো না—সে কি তবে নাই? এই বলিয়া বুড়ী চক্ষের জলে বুক ভাসাইতে লাগিলেন, বলিলেন—বাবা! আমার যাবার সময় হয়েছে—এইবার আমার মাকে পেলেই যে আমি স্থখে মরতে পারি—ভগবান রামচন্দ্র কি আমার শেষ আশাটা পূর্ণ করবেন না? বলিয়া বুড়ী চক্ষের জল মুছিলেন।

দুঃখীরাম দেখিলেন—দাদা জননীর ঐ কথায় কোনপ্রকার বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না—বরং তাহারও যেন মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল, অপরে কেহ না বুঝুক—দুঃখীরাম বুঝিয়াছিল।

বহুদিনের পর প্রাণের বন্ধু দুঃখীরামকে পাইয়া তুলসীদাস বড়ই আনন্দানুভব করিলেন। সমস্ত রজনী আনন্দে কাটিয়া গেল। ভগবানদাস আজ এ আনন্দের অংশভাগী হইয়া সেইখানে রাত্রি বাস করিলেন। প্রাতঃকালে কথা হইল—দুই চারদিনের মধ্যে ভগবানদাস তুলসীদেবীকে লইয়া গোসাইগঞ্জে দুঃখীর শশুরবাটা যাইবেন—তুলসীদাস অবসর ক্রমে একাকীই তথায় গমন করিবেন। এইরূপ স্থির হইলে দুঃখীরাম তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় হইয়া মৌন-পুর গমন করিলেন—দুই একদিনের মধ্যে সে শশুর-শাশুড়ীকে লইয়া বাড়ী করিবে।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কর্মফল

অান গেল—সম্ম গেল—তবে আর প্রাণ কিসের জন্য ; বলিয়া
জনৈক ভট্টাচার্য্য কাশীর বাঙ্গালী টোলায় একটা গলির রাস্তা দিয়া
রজনীর ঘোর অন্ধকারে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন রজনী প্রভাত
হইতে আর বেশী বাঁকী নাই, কিন্তু অন্ধকার গাঢ়তররূপে তখনও
সেই গলির মধ্যে রাজত্ব বিস্তার করিতেছে—লোকজন তখনও
কেউ শয্যা ত্যাগ করে নাই, দারুণ শীতে তখনও লোক সকল গৃহে
আবদ্ধ। এমন সময় একটা যুবক আসিয়া ভট্টাচার্য্যকে প্রণাম
করিল। তিনি যুবককে শশবাস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—কই, বৎস
ভানু ! এখন কতদূর ; গুণ্ডাঘাই বা কোথায় ?

প্রতিহিংসা মনে জাগিলে মানুষ পশুর অধম হয়ে পড়ে—
ধর্ম্মাধর্ম্ম তখন আর তার জ্ঞান থাকে না, পাঠক ! ভট্টাচার্য্যবেশী
বিখস্তর আর ভানুদত্ত আজ কি ভীষণ কাজে লিপ্ত হইয়াছে,
একবার দেখুন !

তুলসীদাসের অভাদয়ে বিখস্তরের মান-সম্ম সময় নষ্ট হইয়াছে
তাঁহাকে এখন আর কেহ বড় পণ্ডিত বলিয়া মানে না—তাঁহার
ব্যবস্থাও আর কেহ গ্রাহ্য করে না, এখন তাঁহার দিন চলা
একপ্রকার দায় হইয়াছে।

এইজন্য পণ্ডিতের মাথা বিগড়াইয়া গিয়াছে—কিসে তুলসীদাস
নিপাত যায়—কিসে তাহার প্রাণ নষ্ট করিতে পারেন—এখন

গুরুশিষ্যের কেবল সেই চিন্তাই প্রবল। অনবরত নানাপ্রকার কৌশল-জাল বিস্তার করত বিকল মনোরথ হইয়া “আজ আবার নূতন কৌশল বিস্তার করিয়াছেন। তুলসীদাস আজ ভোরের সময় গৌসাইগঞ্জ যাইবার জন্য বাহির হইবেন শুনিয়া পাষণ্ড দম্ভা দ্বারা তাঁহাকে নিহত করিবেন—এই চেষ্টায় ভানুদত্তকে তাঁহার সংবাদ লইতে পাঠাইয়াছিলেন।

ভানুদত্ত আসিয়া বলিল—বাবাজী বাড়ীর বাহির হইয়া এই পথেই আসিতেছেন। বিশ্বস্তর বলিল—তবে গুণ্ডাঘর কোথায় গেল, এর পর রাত্রি পোহাইলে যে আর কাজ হাসিল হইবে না! ভানু বলিল—প্রভু! আপনি ভাবিবেন না—আমি সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছি। তাহার গলির মোড়ে একটা ভাঙ্গা বাড়ীতে লুকাইয়া আছে। আপনি এইবার অন্তরালে যান—আমিও গা ঢাকা দিই—কেউ না জানতে পারে।

“বাবা! ঠিক হবে ত, দু-দুশো টাকা ব্যাটারী হজম কর্বে না ত ছোটলোকের কথা বিশ্বাস নেই—বতক্ষণ না কাজ হাসিল হয়।” এই বলিয়া বিশ্বস্তর গা ঢাকা দিবার চেষ্টা করিলেন—মন কিন্তু তাঁর সন্দেহ পূর্ণ; যত সময় যাইতেছে, ততই তিনি বিষম সন্দেহ-কূল হইতেছেন। দুই শত টাকা, ভট্টচাষি বামুন কত কষ্টে উপায় করেছে, এই দুঃখের সময় এ টাকার মায়া কি ছাড়া সহজ, যদি কার্যোদ্ধার না হয়?

ভানুদত্ত গুরুদেবকে আশা দিয়া বলিল—প্রভু! কোন চিন্তা নাই—আপনি সরে পড়ুন, এখনই কেহ দেখিয়া কেলিবে, আমিও যাই। এই বলিয়া ভানুদত্ত গুণ্ডাঘরকে যথাস্থানে রক্ষা করিয়া আপনি সন্নিয়া পড়িল। সন্দেহ যার হৃদয়ে রাজত্ব বিস্তার করিয়াছে, তাহার

শান্তি কোথায়? আজকাল বিশ্বস্তর প্রাণের ছায় ভাষ্যবস্তকেও আর তত বিশ্বাস করে না। সময় খারাপ হইলে, লোকের মতিচ্ছন্ন এইরূপই হইয়া থাকে, তখন জগৎ শুদ্ধ লোককে তাহার পর বলিয়া বোধ হয়, কাহাকেও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি থাকে না। মৃত্যুর প্রাক্কালে এইভাবে জীবের হৃদয়ে বন্ধমূল হইয়া প্রাণটাকে অশান্তির আগার করিয়া তুলে। বিশ্বস্তরের আজ তাহাই হইয়াছে—এত কষ্ট, এত নিন্দা সহ করিয়াও যে ভানুদত্ত অটল অচলভাবে গুরুপদে আবদ্ধ রহিয়াছে, পাপ-পুণ্য কিছু গ্রাহ্য করে না; সদাই অমুগত দাসের মত ন্যায়-অন্যায় সমস্ত কার্য্য অগ্নান বদনে প্রতিপালন করিতেছে, আজ সেই অনন্যশরণ শিষ্যের প্রতিও পাষাণের সম্মেহ—সে টাকা দিয়া গুণ্ডার ব্যবস্থা করিয়াছে কি না! ভানু লোকলজ্জার ভয়ে যখন অন্ধকারে সমস্ত ঠিক করিয়া লুকাইয়া পড়িল। বিশ্বস্তর তখন মনে করিল—একবার আগ্ বাড়াইয়া গলির মোড় অবধি দেখিয়া আসি—গুণ্ডার আছে কি না, তার পর ঐ স্থানে লুকাইয়া পড়িব। এই বলিয়া ভানুদত্তের কথার সত্যতা প্রমাণ করিতে অগ্রসর হইলেন?

গুণ্ডার যেইখানেই লুকাইয়া আছে—তাহারা ত কাহাকেও চিনে না,—কে বিশ্বস্তর, কে তুলসীদাস তাহা ত তাহাদের জ্ঞান নাই—পূর্ব হইতে দেখেও নাই। অতএব বিশ্বস্তর যেমন ভানুদত্তের কথার সত্যতা প্রমাণ করিতে গিয়া গলির মোড় অবধি অগ্রসর হইয়াছে, গুণ্ডার মনে করিল—এই তুলসীদাস, তাহারা স্বরিত পদবিক্ষেপে আসিয়া বিশ্বস্তরের বুকে সেই তীক্ষ্ণাধার ছুরিকা আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল।

বিশ্বস্তর বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়া—ও: গেলাম, মলাম, জগদীশ

রক্ষা কর, যাই—“আর কথা বাহির হইল না—রক্তাক্ত কলেবরে সেইখানেই লুটিয়া পড়িল।”

“ধাক বেটা” বলিয়া গুণ্ডাঘর ধীরে ধীরে গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। পূর্বে কাশীতে গুণ্ডার দ্বারা এইরূপ ভীষণ কার্য্য সকল সংজ্ঞাটিত হইত, অর্থ পাইলে তাহারা এইরূপ পবিত্র স্থানেও লোকের প্রাণসংহার করিত। ভাষ্কর তাহাদিগকে অর্থের দ্বারা বশ করত তুলসীদাসের বধার্থে নিযুক্ত করিয়া ঐ স্থানে রাখিয়া আসিয়াছিল। তাহারা ত তুলসীদাস ও বিশ্বস্তরকে পূর্বে দেখে নাই, এই পথে তুলসীদাস আসিতেছে—আর কেহ বাহির হয় নাই—তোমরা সাবধানে থাকিয়া তাহাকে হত্যা কর। ভাষ্কর তাহাদিগকে এই কথা মাত্র বলিয়া গুরুদেবকে সাবধান করত আপনি অগৃহস্থানে গা ঢাকা দিয়াছে, কিন্তু বিশ্বস্তর যে তাহার প্রতি এত সন্দিহান হইয়া, তাহারা আসিয়াছে কিনা দেখিতে যাইবে—তাহা কে জানে? ইহা সেই চক্রীর চক্র, পরের মন্দ চেষ্টায় ফাঁদ পাতিতে গেলে, আপনাকেই সেই ফাঁদে পড়তে হয়—ইহা যে নীতি সঙ্গত কথা। অনবরত একজন মহাপুরুষের অনিষ্ট করিলে, ভগবান সহ্য করিবেন কেন? ধার্মিককে পদে পদে অপদস্থ করিলে, তাঁহার ধর্ম্ম-কথ্যে বাধা প্রদান করিলে—ঈশ্বরের ন্যায়-চক্র যে স্বভাবতই তাহার উপর পতিত হইবে? ধার্মিক চূড়ামণী তুলসীদাস কতবার কত বিপদ হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন, এবং আত্মীবন গুরুর মত মান্ত করিয়া আসিতেছেন, তথাপি পাষণ্ডের এই প্রতিহিংসা কিসের? তুলসীদাস ভুলেও কখন বিশ্বস্তরের অনিষ্ট চিন্তা বা অপবাদ ঘোষণা করেন নাই। তাঁহার অভ্যুদয়ে বিশ্বস্তর ক্রমশঃ হীনপ্রভ হইতেছেন, তাঁহার পসার প্রতিপত্তি কমিয়া যাইতেছে—স্বার্থের হানী হইতেছে, দেখিয়া তিনি আপনার

জীবনদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন না করিয়া বরং স্বার্থ-প্রণোদিত প্রতিহিংসার বশে আজ তাঁহার প্রাণনাশের সংকল্প করতঃ নিজেই প্রাণ হারাইলেন। উপরে যে একজন পাপ-পুণ্যের বিধান কর্ত্তা রহিয়াছেন—তাঁহার স্মৃতি বিচারেই আজ বিশ্বস্তরের ত্রায় একজন বিখ্যাত পণ্ডিত গুণ্ডা দ্বারা প্রাণ হারাইল। ভগবানের বিচারে আজ এই শোচনীয় অপমৃত্যু কাশীর সদর রাস্তার উপর সংঘটিত হইল। ধর্ম্মের জয়—অধর্ম্মের ক্ষয় হইল, এতদিনে যথার্থ একজন গুপ্ত ধর্ম্মধ্বজীর বিনাশ সাধন হইয়া, ধর্ম্মের বিজয় নিশান উজ্জীয়মান হইল।

ভানুদত্ত নিকটেই ছিল—সে প্রাণের অক্ষুট আর্তনাদ শুনিয়া “শত্রু নিপাত হইল” দেখিবার জন্য দৌড়িয়া আসিয়া অন্ধকারে এদিক ওদিক অন্বেষণ করিয়া যাহা দেখিল—তাহাতে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল, প্রাণ অস্থির হইয়া পড়িল—সে চীৎকার করিয়া বলিল—হায় হায়! কি সর্ব্বনাশ, গুরুদেব খুন, দুরাভাগণ! তোরা কি করলি—যাহার টাকা খেলি—তাহাকেই খুন করলি? এ কথা আমি এখনই চারিদিকে প্রকাশ করিয়া দিব। গুণ্ডা দ্বয় তখনও পলায়ন করিতে পারে নাই। ভানুদত্তের এইরূপ কু-অভিপ্রায় বৃদ্ধিতে পারিয়া তাহারা আর স্থির থাকিতে পারিল না, গ্রেপ্তার হইবার ভয়ে তাহারা ভানুদত্তের বৃকে ছুরিকাঘাত করিয়া স্থান ত্যাগ করিল, ভানুও গুরুর সহিত পঞ্চদ্ব প্রাপ্ত হইল। পাণীকে সাহায্য করিলেও তাহাকে সেই বা তদধিক ফল লাভ করিতে হয়।

তারপর প্রভাত হইলে ঘটনাস্থলে বহু লোকের আমদানী হইল। সকলেই সর্ব্বজন বিদিত বিশ্বস্তর পণ্ডিত ও তাঁহার ছাত্রের অপমৃত্যু দেখিয়া হায় হায় করিতে লাগিল। ভগবানদাসের সহিত জননীকে

গোঁসাইগঞ্জে পাঠাইয়া দিয়া, মণিকর্ণিকার ঘাটে প্রাতঃ-সন্ধ্যা সমাপন করত মহাত্মা তুলসীদাসের আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল। পক্ষে অতিরিক্ত লোক সমাগম দেখিয়া তিনি ঘটনাতলে উপস্থিত হইলেন এবং বিশ্বস্তর ও তদীয় শিষ্যের এই শোচনীয় মৃত্যু দেখিয়া যারপর নাই কাতর হইলেন। হায়! ঘটাকর্ণ যোগীর পুরাতন শিষ্য বিশ্বস্তরের আজ এরূপ শোচনীয় মৃত্যু কে করিল? ঘটাকর্ণ দেহাবসান সময়ে বিশ্বস্তরের সহিত তুলসীদাসের কোনপ্রকার মনো-মালিন্য না থাকে—উভয়ে পরস্পর বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া কাল-যাপন করে—এইরূপ সম্ভাব সংবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন। তুলসীদাস গুরুদেবের অনুমতি আজীবন পালন করিয়া আসিতেছেন কিন্তু বিশ্বস্তর তাহা করেন নাই, গুরুদেবের আজ্ঞা লঙ্ঘনও যে এই মহাপাপের একটা প্রধান কারণ, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

বিশ্বস্তরের হৃদয়ভাব তুলসীদাস একদিনও অবগত হন নাই, তাঁহার হৃদয়মধ্যে যে বিষের ছুরি তুলসীদাসের জীবননাশের জন্ত অহরহঃ লুকায়িত রহিয়াছে, উদার-হৃদয় তুলসী সে সন্দেহ একদিনও করেন নাই—করিবার কোন কারণও ছিল না। ভগবান যার রক্ষার জন্ত পাছু পাছু ঘুরিতেছেন, এজগতে সে আবার ভয় করিবে কার ?

তুলসীদাসের গমনে বাধা পড়িল। তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া ইহাদের মৃত্যুর জন্ত শোক-প্রকাশ করিলেন এবং যাহাতে সম্ভব এই শোচনীয় দৃশ্য লোকচক্ষু হইতে অস্তূর্হিত হয়—সেজন্ত চেষ্টা করিলেন। সকলে মহাত্মার সাহায্য করিতে লাগিল, প্রায় দুই ঘণ্টা পরে কোত্তালীর আদেশ অনুসারে শবদ্বয় স্থানান্তরিত করিবার আদেশ হইল। তুলসীদাস দাহকার্য্যের জন্ত লোকজনের ব্যবস্থা করিলেন—এবং

শব চিত্তাঙ্ক হইল দেখিয়া তিনি. আনুমনে এই শোচনীয় মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে গম্ভীয়া স্থানে প্রস্থান করিলেন। ইহজন্মের কষ্টের ফলভোগ এখানেই পরিসমাপ্তি হইল—পরজন্মে কি হইবে—তাহা ভগবানই জানেন!

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

গোসাইগঞ্জে

হুগনলাল ও যশোদাদেবী মহাত্মা তুলসীদাসকে দেখিবার জন্ত, তাঁহার পদধূলি লইয়া দেহমন পবিত্র করিবার জন্ত জৌনপুর হইতে নিজ বাটীতে আসিয়া আজ অতি প্রত্যুষ হইতে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। বত বেলা হইতেছে, ততই নিজ জামাতা দুঃখীরামকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—কই বাবা! মহাত্মা ত এখনও আসিতেছেন না; তোমার কাছে তিনি বাক্যদান করিয়াছেন ত? দুঃখীরাম বলিলেন—গাজে হাঁ! তা না হলে কি আর আমি আপনাদের লইতে ততদূর যাই; তিনি কথা দিলে—তাহা কখন নড়চড় হইবে না, বাক্সিদ্ধ মহাপুরুষ কখন কথার অগ্রথা করেন না। তবে কি জানেন—তিনি বাটীর বাহির হইলে, একবারে চলিয়া আসিতে পারেন না, কত পরিচিত ভক্তের সহিত দেখা হয়—তাহাদের সহিত কথা কহিতে অনেক বিলম্ব হইয়া যায়, এইজন্য এইরূপ হইতেছে—পথে হরত কাহার সহিত দেখা হইয়াছে।

জামাতার যুক্তিসঙ্গত কথা শুনিয়া হুগনলাল আশাপথ চাহিয়া রহিলেন। আজ তুলসীদাসের শ্রাদ্ধ মহাত্মার পদস্পর্শে তাঁহার বাটী

পবিত্র হইবে, তাঁহার কুল পবিত্র হইবে—তিনিও ধন্য হইবেন—
এরূপ সাধুসমাগম কি সহজে লোকের ভাগ্যে ঘটে ? আজ তাঁহার
পাগলী মার একটা কিনারা হইবে—অভাগিনী আজ বহুদিনের
পর পতিস্থখে স্থিতি হইবে—শাশুড়ীর আদর-যত্ন পাইয়া বহুদিনের
নিরাশ হৃদয় আশাসিক্ত হইবে—ভাবিয়া ছগন ও যশোদার আনন্দ
আর ধরে না। সরস্বতীও আজ পূজনীয়া রত্নাবলীর পতি ও
শাশুড়ীকে দেপিয়া জীবন সার্থক করিবে বলিয়া, আশাভরা প্রাণে
অপেক্ষা করিতে লাগিল।

বেলা নয়টার পর একখানি বৃহৎ অশ্বখান আসিয়া ছগনলালের
দেউড়িতে লাগিল। দ্বারবানগণ শশবাস্তে উঠিয়া অভ্যর্থনা করিল।
একজন আধাবয়সী হিন্দুস্থানী ও একটা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক গাড়ী হইতে
অবতরণ করিলেন। গৃহস্থামী ছগনলাল অতি বিনীতভাবে গমন করিয়া
তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিলেন। ইহারা ভগবানদাস
ও হলসীদেবী ?

বৃদ্ধা অতিশয় আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—আমার দুঃখী-
রামের শ্মশুর কই ?

ছগনলাল অতি নম্রস্বরে করষোড়ে বলিল—এই যে মা, কি
অনুমতি হয় !

হলসীদেবী বলিলেন—তুমি বাবা, আমার দুঃখীর শ্মশুর—আহা
বাবা ! তোমার স্বর্ণ আমি জীবনে কখন শুধিতে পারবো না, তুমি
আমার বউমাকে বাঁচিয়েছো, আমার দুঃখীর জীবনদান দিয়ে তাকে
জামাতা করেছো, আহা ! এমন না হলে কি পরোপকারী দয়ালু হওয়া
যায় !

ছগনলাল ততোধিক করষোড়ে বলিলেন—দেবি ! এ সকল

আপনাদের ঠায় প্রাতঃস্মরণীয় মহিমাময়ী মায়ের আশীর্বাদ, নতুবা আমার এমন কি ক্ষমতা আছে ?

বৃদ্ধা ছগনলালের নম্রতা দেখিয়া বিশেষ মুগ্ধ হইয়া বলিলেন—
বাবা ! দুঃখী আমার কোথায়—তাকে ডেকে দাও : “অজ্ঞা হাঁ,
বাবাজী ! এখনি আস্বেন” বলিয়া ছগনলাল ভগবানদাসকে বসি-
বার জগ্ন আসনদান করিলেন এবং যারপর নাই নম্রতা স্বীকার
করিলেন। ভগবানদাস একরূপ ধনীলোকের একরূপ সৌজন্মে একান্ত
বাধিত হইয়া আসনোপবেশনে আলাপ-পরিচয় করিতে লাগিলেন।

তারপর দুঃখী আসিয়া খুড়ীমার পায়ে ধূলি লইয়া মাথায়
দিলেন। হুলসীদেবী বলিলেন—বাবা দুঃখী ! একবার আমাকে
অন্দরে নিয়ে চ, আর যে বোমাদের না দেখে—স্থির থাকতে
পারছি না।

দুঃখীরাম খুড়ীমার হাত ধরিয়া অন্দরে লইয়া গেলেন। বহুদিন
পরে শান্তুড়ী বোয়ের মিলনে আনন্দের কান্না পড়িয়া গেল, বউ শান্তুড়ীর
পায়ে ধরিয়া কাঁদে, শান্তুড়ী বউয়ের গলা ধরিয়া কেবল মুখচুষন
করেন আর বলেন—দেবতার রূপায় আর এই মায়ের কল্যাণে
(যশোদাকে দেখাইয়া) আমার ঘরের লক্ষ্মীকে আবার ফিরে
পেয়েছি। যশোদা স্বামীর অলুরূপা বিনম্র প্রকৃতিশালিনী, তিনি
বৃদ্ধার পায়ে ধূলি লইয়া বলিলেন—মা ! আমাদের কৃতীত্ব কিছুই নাই—
সমস্তই ভগবানের। তারপর হুলসীদেবী দুঃখীর বউটিকে কোলে লইয়া
বলিলেন—আহা ! দিকি বউটি, সরস্বতীই বটে ! চিবুক ধরিয়া চুম্বা
খাইতে খাইতে বলিলেন—মা ! জন্মায়ত্তি হও, পাকা চূলে সিদ্ধুর পর,
দুঃখীর মত স্বামী বড় সৌভাগ্য না হলে হয় না,—আশীর্বাদ করি দুই-
জনেস্বখে ঘরকন্না কর ! সরস্বতী পদধূলি লইল।

কালাকাটা যখন খামিয়া গিয়াছে, আসনে বসিয়া কথাবার্তা হইতেছে, সেইসময় দুঃখীরাম আসিয়া বলিলেন—খুড়ীমা! বউ পছন্দ হয়েছে, সরস্বতী লজ্জায় সরিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধা বলিলেন—এমন বাপ-শায়ের মেয়ে যে, সে আর অপছন্দ হয় বাবা!

দুঃখী বলিলেন—দেখ খুড়ীমা! দাদা এলে আমি একটু চালাকী খেলিব, নতুবা বউদির কিনারা হইবে না, তুমি কিছু প্রকাশ করো না। হুলসীদেবী সেকালের জীলোক, অত তত্ত্ব কিছুই জানেন না, তিনি বলিলেন—না-না বাবা! তা কেন করোঁ, তুই যা ভাল বুঝিস, তাই করিস—তবে তার মনোগত ভাব এখন বুঝেছিস ত?

দুঃখী। মনটা অনেক নরম হয়েছে, এখন বৌদিকে বোধ হয় আর ঠেলতে পারবেন না, যদি ঠেলেন—সেইজন্য আগে থেকে একটা কৌশল করোঁ, তাতে আর তিনি ভিন্নমত কর্তে পারবেন না, এখন যে একবার এলে হয়!

হুলসী। সেত অনেকক্ষণ বেরিয়েছে—এত দেৱী হচ্ছে কেন বল দেখি?

দুঃখী। এখন দাদা ত আর সে দাদা নেই, পথে বেরুলে কতলোকের সঙ্গে দেখা হবে, কতলোকে পায়ের ধূলা খাবে, তবে ত আসবেন, এইজন্তই দেৱী হচ্ছে।

হুলসী। আসবে—ঠিক জানিস ত?

দুঃখী। বাকসিদ্ধ পুরুষ কি কথার খেলাপ করে খুড়ী, এই দেখ না, এসে পড়লেন বলে! এই বলিয়া দুঃখীরাম বাহিরে গেলেন।

যশোদা বলিলেন—বাবাজীর আমার এত কন্দীও আছে, দেখ না, আজ আবার একটা কি নূতন বুদ্ধি খাটায়।

হুলসী। মা! ওর গুণে কি নূন দিতে আছে, ওর জন্তেই আমি বেঁচে আছি এবং ওর জন্তেই আজ ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। বলিয়া সকলেই দুঃখীরামের তারিফ করিতে লাগিল। রত্নাবলী একধারে বসিয়া কেবল ইষ্ট চিন্তা করিয়া চক্ষের জলে বুক ভাসাইতেছিলেন। আজ মা জানকীর অগ্নি-পরীক্ষা, অদৃষ্টে কি আছে—সত্যীর কেবল সেই চিন্তা।

সাধু মহাত্মার দর্শন জন্ম সকলেই উদগ্রীব হইয়া বসিয়া আছেন। তুলসীদাস ত আর যে সে লোক নহেন, তাঁহার দর্শন বহু ভাগ্য সাপেক্ষ। ছগনলাল একবার ঘরে যাইতেছেন, একবার বাহির বাটীতে আসিতে-ছেন, ভগবানদাসও আজ বিশেষ ব্যস্ত। যত বেলা বেশী হইতেছে, ততই সকলের মনে সন্দেহ হইতেছে—বুঝি বাবাজী আর আসিলেন না। কিন্তু দুঃখীরাম সকলকে আশ্বাস দিতেছেন—দাদার এখন যে অবস্থা, তাহাতে মিথ্যাকথা তাঁহার মুখ হইতে কখনই বাহির হইতে পারে না, আপনারা বিচলিত হবেন না, তিনি নিশ্চয়ই আসবেন।

বেলা যখন মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ, শীতের জড়তা কাটায়া যখন প্রচণ্ড মার্ত্যও দেব মধ্য গগণে উদ্ভিত, ঠিক সেইসময় বাবাজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন—বাড়ীময় একটা অশ্রু-সোর-গোল পড়িয়া গেল। ছগনলালের শিবালয়ে গোঁসাইজীর জন্ম বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। বৃহৎ ঠাকুরবাড়ী, লোক সঙ্কলনের অভাব হইবে না।

হুলসীদেবী আসিয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন, দুঃখীরাম অতি বিনীতভাবে আসিয়া দাদার অভ্যর্থনা করিতে ছাড়িলেন না। ছগনলাল আসিয়া প্রভুর পদে প্রণিপাত করিলেন। বহুলোক আজ এই মহাপুরুষকে দেখিয়া জন্ম সার্থক করিল। রত্নাবলী ও সরস্বতী

গবাক্ষ হইতে সেই মূর্তি দেখিয়া বলাবলি করিতে লাগিল—দিদি ! সেদিন জোনপুরে তুমিই ত ইহাকে রাধিবার উদ্যোগ করিয়া দিয়াছিলে—এবং বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলে—যদি ঝুলির ভিতর সমস্ত আছে, কিছুই অভাব নাই—তবে নিজের পত্নীকে লইতেই যত দোষ, এ কিরূপ সাধুগিরি ? সেকথা শুনিয়া উনি ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন, আমরা অন্দরে চলিয়া গেলাম, সেদিন সেকথা বলা ত তবে ভাল হয় নাই ?

রত্নাবলী। ভাই ! সেদিন আলোক-আধারে তত চিনিতে পারা যায় নাই ; আর উনিই যে অমন করে আমাদের সেখানে অতিথি হবেন, তা কেমন করিয়া জানিব ? চেহারার যে ঘোর পরিবর্তন ; পূর্বোক্ত সঙ্গ তুলনাই হয় না—যাহা হউক, ভাই ! ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, যেন দাসী পুনরায় ঐ পদের অধিকারী হতে পারে। আজ যদি কোনপ্রকারে বিফল মনোরথ হই, তাহা হইলে আর এ প্রাণ রাখিবো না।

সরস্বতী। দিদি, অত উতলা হচ্ছে। কেন, তোমার দেবরত বলেছেন, আজ যে রকমে পারি—দাদা-বউদির মিলন করিয়া দিবই।

রত্ন। ' হাঁ, কিন্তু অদৃষ্ট যে ভাল নয় ভাই ?

সরস্বতী। প্রভু রামচন্দ্র কি চিরদিনই এই রকম রাখবেন, তিনি যে অনাথ নাথ !

রত্ন। তুই যা বলি সরস্বতী, এখন ভরসা কেবল তাঁর, তিনি ভিন্ন দাসীর দুঃখ দূর করিতে আর কেহই নাই।

সকলে সাধু-দর্শন করিয়া গেল, ঠাকুরবাড়ী নির্জন হইল। তারপর সন্ধ্যার সময় তুলসীদাস অগ্ন্যাগ্ন দিনের মত স্নানাহ্নিক

সমাপন করিয়া ভগবান সদাশিবের পূজা ও আরতি করিলেন। তার পর আহাৰাদি হইল। নানাপ্রকার উপাদেয় আয়োজন হইয়াছে। হুলসীদেবী আজ পুত্ৰকে কাছে বসাইয়া খাওয়াইলেন। তুলসীদাসের আহাৰ হইলে অপর সকলে আহাৰ করিলেন। আহাৰাদির পর ক্রিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে তুলসীদাস দুঃখীরামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—দুঃখে ভাই! কই, তোর বউ দেখালিনি, এই সময় বাহিরের লোক কেউ নাই—একবার আননা—দেখি কেমন বউটা হলো?

দুঃখীরাম সাগ্রহে বলিলেন—হাঁ দাদা! এইবার আনিব; এখন ত আর অপর লোক কেহ নাই, যাই আনিগে। বলিয়া দুঃখীরাম চলিয়া গেলেন—সকলে এইবার ভগবানের নাম জপ করিতে বসিল। তারপর কিরূপ কৌশলজাল বিস্তার করিয়া আজ রত্নাবলীকে দাদার নিকট লইয়া যাইবেন—দুঃখীরাম তাহা প্রকাশ করিলেন, সকলেই অবাক হইয়া রহিল।

দুঃখীরাম নূতন বউকে দেখাইবার ভাণ করিয়া রত্নাবলীকে সাজাইয়া লইয়া আসিতেছেন—সঙ্গে সঙ্গে জননী হুলসীদেবীও চলিয়াছেন। যশোদা ও ছগনলাল আজ কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—হে ভগবন্! আজ আমার চিরদুঃখিনী পাগলী মা যেন স্বামী কর্তৃক গৃহীতা হন; হে মধুসূদন! দুঃখিনীর দুঃখ মোচন কর প্রভু! তুমি ভিন্ন অতীষ্ট ফলদানে দুঃখিনীর দুঃখমোচন করিতে আর কেই নাই।

রত্নাবলীর প্রাণ গুর গুর করিয়া কাঁপিতেছে, ভয়ে আত্মা-পুরুষ শুধাইয়া গিয়াছে, মনে মনে বলিতেছেন—দীনবন্ধু! আজ দাসীর প্রতি সদয় হও, প্রাণের ধনকে সম্মুখে পাঠাইয়া যেন হতাশ করিও

না—তাহা হইলে এ প্রাণ রাখিব না। হয় পতিপদে স্থান দান কর, না হয় জীবনগ্রহণ কর, আর এ চর্য্যই যন্ত্রণা-ভার সহ করিতে পারিব না ঠাকুর!

তুলসীদেবী আগে আগে চলিয়াছেন, মধ্যে রত্নাবলী ঠিক নববধূটির মত ধীর-পদবিক্ষেপে চলিয়াছেন, পশ্চাতে ছগনলাল, তদপশ্চাৎ দুঃখীরাম! গৃহমধ্যে যশোদা ও সরস্বতী মনে মনে ভগবানকে ডাকিয়া বলিতেছেন—যেন মনস্কামনা সিদ্ধি হয় প্রভু!

তুলসীদাস মন্দির দ্বারে কুশাসনে বসিয়া আছেন; সম্মুখে ভগবান দেবাদিদেব—মন্দির মধ্যে বিরাজিত। রত্নাবলী এতদিন কায়মনে তাহার পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া কেবল পতিসন্দর্শন প্রার্থনা করিয়াছেন, কত কাঁদিয়াছেন, চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া কত আবেদন-নিবেদন করিয়াছেন। আজ ভগবান সন্নাধিব সুপ্রসন্ন—তাই তাঁহার প্রার্থের ধন আজ তাঁহারই মন্দিরদ্বারে; সত্যি আজ সেই পতিসহ মিলিতে যাইতেছেন—সতীপতি-বিশ্বনাথ! আজ অভাগিনীর মনোরথ পূর্ণ কর, আজ তুলসীদাসের মতি ফিরাইয়া দাও!

তুলসীদাসের সম্মুখে ভগবানদাস বসিয়া আছেন—নানারূপ ধর্ম্ম প্রদত্ত হইতেছে। এমন সময় জননাসহ অবগুষ্ঠনাবৃত্তা রত্নাবলী ও পশ্চাৎ ছগনলাল মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। ভগবানদাস একটু সরিয়া বসিলেন। তুলসীদেবী বধূমাতাকে প্রণাম করিতে বলিলেন। আলোক-আধারের সংমিশ্রণে তখন দেবালয় তত উজ্জলীকৃত নহে। রত্নাবলী প্রণাম করিল—তুলসীদাস নূতন বধূ মনে করিয়া, “চিরায়ুস্বতী হও, স্বামাসহ স্থখে কাল যাপন কর” বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। দুঃখীরাম বলিলেন—দাদার, আমার অমোঘ আশীর্বাদ, এ আশীর্বাদ কখন অগ্রথা হবার নয়।

রত্নাবলী আশীর্বাদ বচন শুনিয়া আর থাকিতে পারিলেন না, বহুদিনের আরাধ্যপদ সম্মুখে পাইয়া আর চূপ করিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল। একসময় এই আরাধ্যপদ তাঁহার নিত্য সেবার সামগ্রী ছিল, সত্য নিত্য ইহার পূজা করিয়া ধৃত হইতেন; আজ বহুদিন পরে তাহা সম্মুখে পাইয়া আর কি চূপ করিয়া থাকিতে পারেন—অবেগভরে তাহা বক্ষে তুলিয়া লইয়া বলিলেন—“স্বামীন্ ! প্রভো ! ক্ষমা করুন, দাসী আপনার চরণে চির অপরাধিনী ! তার ফল ধখেষ্ট ভোগ করেছি—আর সহ্য কর্তে পারিনা, চরণে স্থান দিন।” বলিয়া রত্নাবলী তাঁহার বক্ষ আবরিয়া ধরিবামাত্র কি এক অসীম আনন্দে আত্মহারা হইয়া অচেতন হইয়া পড়িলেন।

রত্নাবলীর মধুর অধরে অতুলনীয় ভক্তিমাধা “স্বামীন্-প্রভো !” সোধোদন শুনিয়া তুলসীদাসের হৃদয় আকুল হইল, তিনি বলিলেন—ওহো এ কে এ, আমার সাধনপথের সাহায্যকারিণী, রত্নাবলী নাকি ? দুখে ভাই, এ সমস্তই তোমার চক্র দেখেছে ?

দুঃখীরাম হাসিতে হাসিতে বলিলেন—দাদা ! এ আমার চক্র নয়—এ সেই চক্রের চক্র, যার চক্রে এই বিশ্বত্রাণ্ড পরিবর্তিত হচ্ছে, যার চক্রে মানব-অদৃষ্ট নিরন্তর সুখ-দুঃখের বোঝা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আজ সেই চক্রের চক্রে দাদা, তুমি আমার বউদকে অমোঘ আশীর্বাদ করেছো ; বাক্যসিদ্ধ মহাপুরুষ তুমি ! এইবার নিজ বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন কর।

রত্নাবলী চৈতন্যলাভ করিয়া কাদিতে কাদিতে বলিলেন—দেবতা আমার, ধর্ম আমার, সহধর্মিনীরূপে দাসীকে পদে স্থান দিয়া কেন আমার অধর্মের পথে ঠেলিয়া দিতেছ প্রভু !

তুলসীদাস অতীব আগ্রহের সহিত বলিলেন—রত্নাবলী, দেবী-

প্রতিমা! তোমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই—সে পক্ষে আমিই ঘোরতর অপরাধী। তোমার অমূল্য উপদেশে আজ আমার জীবনের পথ মুক্ত, আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মোচিত, মঙ্গলময়ী দেবি! আজ তোমারই কৃপায় আমার মানবজন্ম সার্থক হয়েছে, আমি ধন্য হয়েছি! আমি যদি কোন অপরাধ করে থাকি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর?

রত্ন। প্রভুকে ক্ষমা করিবার শক্তি দাসীর কোথায় দেব! এক্ষণে দাসীকে চরণে স্থানদানে কৃতার্থ করুন!

হুলসী। তুলসীমণি, আর আমার ননীরপুতলী বৌমাকে কঁাদাস্নেহ বাবা! আহা! বাছা আমার তোর জন্তে কৈদে কৈদে পাগল হয়ে কত কষ্ট পেয়েছে।

তারপর ছগনলাল অগ্রসর হইয়া করপুটে বলিলেন—সাধকবর! আজ আমি ধন্য হলাম, আজ এই শিবালয়ে সাক্ষাৎ দেবাদিদেব শঙ্করের সম্মুখে পিতামাতার এই মহা মিলন দেখিয়া কৃতার্থ হলাম; আমার পাগলীমাকে আমি রাস্তা হইতে ধরিয়া আনিয়া বহুকষ্টে এবং বহু চিকিৎসায় আরোগ্য করিয়াছি; আরোগ্যালাভের পর জ্ঞানোদয় হইলে উনি কেবল জীবনত্যাগ করিতে উত্ততা হন “কিসের জন্ত আর এ জীবনরক্ষা করিব—আমি স্বামীকে গৃহত্যাগী করিয়া কোন্ স্থানে আর বাঁচিয়া থাকিব” বলিয়া কেবল জলে ডুবিতে যাইতেন, আমি কেবল নানাপ্রকার ষ্টোকবাক্যে, অতি সাবধানে ইহাকে রক্ষা করিয়াছি। তারপর ভগবৎ কৌশলে জামাতা বাবাজী উহার অন্বেষণে বহির্গত হইয়া, ডাকাত কর্তৃক আক্রান্ত এবং মৃতপ্রায় অবস্থায় পথের ধারে পড়িয়া থাকেন, দেবতার কৃপায় তাঁহাকেও কুড়াইয়া আনিয়া আরোগ্যালাভের পর পাগলীমার অনুরোধে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনায় একমাত্র ছুঁহিতা রত্নদান করিয়া আজ আপনার কুটুম্বস্থানীয় হইয়াছি।

এক্ষণে মাকে আমার পদাশ্রয়ে স্থান দিয়া ভগবানের শুভ উদ্দেশ্য সফল করুন!

তুলসী। মহাঅন্ন! আপনি নরাকারে দেবতা, এ জগতে যে আত্মবিস্মৃত হইয়া পরের উপকার করিতে পারে—পীড়িতের পীড়ার শাস্তি করিতে অজস্র অর্থব্যয় ও ত্যাগস্বীকার করিতে পারে—মর্ন্তে তিনিই ত দেবকল্প মহাপুরুষ! আপনার গুণের কথা, আমি শুধু দুঃখীরাম কেন, বহুজনের নিকট শুনিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কৃতার্থ হইব—এইরূপ আশা করিয়াছিলাম, আজ প্রভু রামচন্দ্র আমার সে আশা পূর্ণ করিলেন।

ভগবান। সাধুবাবা! মাকে আমার অভয় দিন; তিনি সদাই সঙ্কুচিত হইতেছেন।

তুলসী। মহাআগণ! বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে জ্বীলোকের মুখদর্শন পর্য্যন্ত নিষেধ এবং কোন দ্রব্যে লোভ করাও বৈরাগ্যধর্মের প্রতিকূল—একান্ত ত্যাগী না হইলে বৈরাগী হওয়া যায় না।

এই সময় অলক্ষিতে রমণীকণ্ঠে পশ্চাৎ দিক হইতে কে বলিল—
এত যদি ত্যাগ, তবে ঝুলির মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড কেন, সেদিন জোনপুরে অতিথি হইয়া ঐ ঝুলির মধ্য হইতে নংগৃহীত সমস্ত দ্রব্য বাহির করিয়া পাকা দি করিলেন, কেমন করিয়া প্রভু? সকলে দেখিল—এ আর কেহ নহে—হৃগনলালের বাক্চাতুর্য্য-পরায়ণা দুহিতা সরস্বতীদেবী।
তুলসীদাস চিনিতে পারিয়া মস্তক নত করিলেন।

রত্নাবলী করঘোড়ে বলিলেন—প্রভু! দাসী দাসীর মত থাকিবে, এ জীবনে আর অত্র কোনও সাধ নাই; আপনার ধর্ম-কর্ম্মে সহায় হইয়া “সহধর্ম্মিণী” নাম সার্থক করিব, দাসীকে আর কাদাবেন না।

মন্দির মধ্য হইতে গুরু গম্ভীর স্বরে ধ্বনিত হইল—“যুগলে পাইবে

দেখা স্বধামে তোমার" তুলসীদাস ! প্রভুর আদেশ অমান্য করিও না—
সতী স্ত্রী কখনও ধর্ম পথের কণ্টক নহে, রত্নাবলীর মত সতীর সাহায্যে
তোমার যুগল মূর্তি দর্শন স্থনিশ্চিত। তুলসীদাসের ঐতন্য হইল,
তিনি শির নত করিয়া ভগবান সদাশিবের আদেশ গ্রহণ করিলেন।

উপস্থিত জনমণ্ডলী ভগবান সদাশিবের প্রত্যাদেশ বাক্য শ্রবণ
করিয়া ধত্ত হইল। আজ সাধু তুলসীদাসের কৃপায় সকলে দেববাক্য
শ্রবণ করিয়া গদগদ প্রাণে প্রভুর জয়নাদ কহিতে লাগিল।

তুলসীদাস গলগলীকৃতবানে প্রণাম করিয়া বলিলেন—এই জন্যই
অপেক্ষা করিতেছিলাম—আজ আমি ধত্ত, পরম ত্যাগী বৈরাগী
মহাদেবের আদেশ অমান্য করিবার ক্ষমতা ত্রিলোকে যখন কাহার
নাই—তখন আমি কোন ছার ! তুলসীদাস তদগতচিত্ত হইয়া
জপে বসিলেন। আজ পরিজন সম্মে তুলসীদাস প্রভু ভোলানাথের
মন্দির দুয়ারে তন্ময়। যে কয়টি ভক্ত আজ শিবালয়ে সমবেত—
সকলেরই প্রাণ ভক্তিময়, সকলেই সাধন ক্ষেত্রে অগ্রসর, ইহার
মধ্যে সকলেই দেবতা-পরায়ণ এবং পরোপকার ব্রতে জীবন পণ
করিয়া মনুষ্যজ্ঞ অর্জন করিয়াছেন। তুলসীদাস সাধন করিয়া সিদ্ধি-
লাভ করিয়াছেন, আর ছগনলাল প্রভৃতি বাহ্যিক কর্মযোগ সাধনে
সুসিক্ত, ভূত-ভাবন ভবানীপতি ইহাদের প্রতি চির সদয়।

তুলসীদাস আর কোনপ্রকার দ্বিধাক্তি করিতে পারিলেন না।
ভগবান শিবের আদেশ, এবং কিছুদিন পূর্বে প্রভু মহাবীরেরও এই
আদেশ শিরধার্য্য করিলেন। “যখন প্রথমেই তিনি চির আয়ুস্মতি
হও। স্বামী সহ স্বখে সংসার কর” বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন—
তখন স্ত্রীকে লইতেই হইবে—নতুবা বাক্যের অন্যথা করিলে বাকু-
সম্বত্তা থাকিবে কোথায় ?

রত্নাবলী আমাকে বলিলেন—প্রভু! আমি আপনার সাধনার সাহায্যই করিব—আমার দ্বারা সাধন কার্যে আপনার কোনপ্রকার বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হইবে না। এই অঙ্গীকার করিয়া সতী পতিপদে আশ্রয় লাভ করত ধন্য হইলেন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বদানুতা

শ্রীগ্লী-মা আজ পাগল বাবার সঙ্গে মিলিয়াছেন—দেখিয়া ছগন-লাল ও যশোদার আনন্দের সীমা রহিল না। এই অপূর্ণ মিলনের পর তাঁহারা কিছুদিন তাঁহাদিগকে আপনার ভবনে রাখিয়া সেবা করিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন। ভক্তের ইচ্ছা অপূর্ণ রহিল না—তুলসীদাস তাঁহাদের এই পুণ্যব্রত দেবালয়ে কিছুদিন অবস্থান করিবেন—এই কথা শ্রীচার হইবামাত্র দলে দলে লোকসমাগম হইতে লাগিল, গৌসাইগঞ্জের শিবাজ্রমে এই সাধক-দম্পতীকে দেখিয়া সকলে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিল।

দুঃখীরাম ও সরস্বতী আজ প্রাণ ভরিয়া তাঁহাদের নিকট পরমার্থ বিষয় উপদেশ লইয়া সংসারে স্বর্গের সূখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। রত্নাবলী এতদিন প্রাণ খুলিয়া কোন কথা কহিতেন না, সদাই বেন ত্রিয়মানভাবে কাল কাটাইতেন—তাঁহার সে বিরসভাব সকলের প্রাণে বিষম বিষাদ সমুৎপন্ন করিত, সকলেই কায়মনে দেবতার স্থানে প্রার্থনা করিত—ভগবান! দুঃখিনীর দুঃখ-রজনী অবসান কর, আহা! এমন সরলপ্রাণা সত্যার মনোকষ্ট তুমি নষ্ট না করিলে আর কে দেখিবে প্রভু?

এতদিনে তাহাদের মনোবাসনা পূর্ণ হইয়াছে—সতী স্বামীপদে আশ্রয় পাইয়া, আপনার স্বভাবপ্রফুল্ল ভাব প্রকাশ করিয়া সৎসঙ্গের সহিত কমণীয়ভাবে আলাপ-পরিচয় করিতেছেন।

ধর্ম-কর্ম্ম এবং পরোপকারে ছগনলালের মত মুক্তহস্ত, তখন কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যাইত না। ভগবান তাঁহাকে যেরূপ ধনের অধিকারী করিয়াছিলেন—তাহার সন্ময় করিতেও তিনি তাঁহাকে সেই প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। ধনবানের এরূপ সৌভাগ্য প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। ধন অনেকেরই থাকে কিন্তু সংকর্ম্মে এরূপ মুক্তহস্ত হইয়া খরচ করিতে কয়জন ধনী অভ্যস্ত হইয়াছেন? ধনবানের অর্থ প্রায়ই অকাজে-কু কাজে খরচ হইয়া থাকে। ছগনলালকে ভগবান সেরূপ প্রবৃত্তি আদৌ প্রদান করেন নাই, এমন কি তিনি নিজের ভোগবিলাসের জন্তও বেশী কিছু খরচ করিতেন না। যাহা না হইলে নয়—ভদ্রগৃহস্থ যেরূপ ভাবে খরচ করিলে ভদ্রতা বজায় থাকে—ছগন তাহার অতিরিক্ত কিছুই খরচ করিতেন না। জীও কত্যাটীও ঠিক সেইরূপ ভাবে শিক্ষালাভ করিয়া আপনাদের চরিত্র গঠন করিয়াছিল—বিলাসিতা তাঁহাদের মধ্যেও স্থান পাইত না; বেশভূষা দেখিলে সামান্য গৃহস্থের রুমণী বলিয়াই অনুমান হইত।

এইরূপে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গেলে, ছগনলাল কাশীতে প্রভুর মঠ ও দেবালয় নির্মাণ করিয়া দিবার জন্ত অহুমতি চাহিলেন। তুলসীদাস বলিলেন—আমি সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বন করিয়াছি—স্বাধ-অটালিকায় আমার আবশ্যক নাই। মন্দির নির্মাণ করিয়া যদি তাহাতে রামসীতার যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা কর—তাহা হইলে তাহাতে আমরা আজীবন দাসদাসীর মত সেবাইত রূপে অব-

স্থান করিতে পারি। নতুবা অল্পরূপ বিলাস-বাসনা বা ঐশ্বর্য ভোগ আমাদের সাধন পথের কণ্টক হইবে—তাহাতে মজিয়া থাকিতে আর আমাদের ইচ্ছা নাই। তবে যদি তোমার ও দুঃখীর একান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে—আমাদিগকে কাছে কাছে রাখা, তাহা হইলে ঐরূপ ভাবে সীতারামের প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পার।

সাধকের ইচ্ছানুসারে তাহাই হইল। ছগনলাল ও দুঃখীরাম অজস্র অর্থব্যয় করিয়া মন্দির নির্মাণ করিয়া তথায় ভগবানের মূগল মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলেন, মহাবীরের মূর্তিও সেইস্থানে সংরক্ষিত হইল। মঠবাড়ী নির্মাণ করিয়া তাহাতে অতিথিসেবারও বন্দোবস্ত হইল। দেবালয় সম্মুখে গঙ্গার উপর একটি স্থলর ঘাট “তুলসীঘাট” নামে নির্মিত হইল। সমস্ত প্রস্তুত হইয়া গেলে তুলসীদাস পত্নী ও জননীকে লইয়া সেইস্থানে আগমন করত ইষ্টমূর্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলেন। প্রত্যহ হৃদয়ের ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া সাধকদম্পতী সেই রামসীতা মূর্তিকে এমন সজাগ করিয়া তুলিয়াছিলেন—যে সহসা দেখিলে জীবন্ত মূর্তি বলিয়াই অহুমান হইত। তুলসীদাস ও রত্নাবলী প্রত্যহ চন্দ্রচন্দ্রে রাম-জানকীর সেই অপূর্ণমূর্তি দেখিয়া, তাঁহাদের চরণে প্রাণের আবেদন-নিবেদন জ্ঞাপন করিয়া তাঁহারা পূর্ণানন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন। তুলসীদাস পূর্বে দৈববানীর দ্বারা শুনিয়া-ছিলেন—তোমার স্বধামে সঙ্গীক আমার দেখা পাইবে। আজ তাহা সকল হইয়াছে দেখিয়া তিনি রত্নাবলীর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইলেন, তাহাকে প্রীতিচক্ষে দেখিতে লাগিলেন। উভয়ের মধ্যে কামভাব আর তিলমাত্র বর্ধমান ছিল না—সাধকদম্পতীর প্রেম তখন স্বর্গীয় প্রেমে পূর্ণ হইয়াছিল। সামান্ত ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য অকিঞ্চিৎকর ভোগ-

লালসা তাঁহাদের একেবারে তিরোহিত হইয়াছিল। এ সময় তাঁহাদের দেখিলে মুর্ত্তিমান দয়ার অবতার বলিয়া প্রতীয়মান হইত।

রত্নাবলী সামান্য জ্ঞালোক নহেন। এতদিন স্বামী বিরহে কাতর হইয়া তিনি কেবল ইষ্টমন্ত্র জপে তন্ময় হইতেন, অনবরত প্রার্থনা করিতেন—দয়াময়! দয়া করিয়া আমার জীবনধনকে মিলাইয়া দাও—না বৃদ্ধি দিয়া কত অপরাধ করিয়াছি—তাই তিনি আমাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমি জ্ঞী হইয়া তাঁহার অদর্শনে কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিব! জগৎ স্বামান্, প্রভু! দাসীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। দিবানিশি এই চিন্তায় বিভোর হইয়া রত্নাবলী পাগল হইয়া গিয়াছিলেন স্বামীর দর্শন জন্ত গৃহ ছাড়িয়া কেবল পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়া ছিলেন। সকলে মনে করিয়াছিল,—ছুড়ীর বয়স কাঁচা, তাই স্বামীর জন্ত পাগল হইয়া গৃহত্যাগী হইয়াছে; এইবার বোধ হয়—কুলের বাহির হইয়া পড়িবে। স্বামীও জ্ঞীর প্রণয়ের মধ্যে যে ভগবানের গুঢ় ভাব নিহিত রহিয়াছে, দাম্পত্য প্রেমই যে পাকা হইলে প্রেমিক সাধককে অনায়াসে প্রেমময়ের দরবারে পৌছিয়া দিয়া ধন্ত করিতে পারে—যাহারা তাহা বুঝে না। পতি-পত্নীর প্রণয় কেবল আসঙ্কলিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্ত, এই প্রণয় কেবল ভোগ বাসনার প্রদমন করিবার জন্য যাহাদের এই ধারণা তাহারা মনে কারল—রত্নাবলী স্বামীর অদর্শনে, যৌবনের বিবম্ভ্রানন্দ-তাড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া বাস্তবিকই কুলে কালী দিল। কিন্তু রত্নাবলী স্বামীকে কি চক্ষে দেখিতেন—তুলসীদাস যে রত্নাবলীর নিকট কিরূপ দেবভাবে পূজিত হইতেন, তাহা প্রকৃত সত্য না হইলে অপরে কেমন করিয়া বুঝিবে, কেমন করিয়া বুঝিবে রত্নাবলী কেন পাগল হইয়া ছিলেন?

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেইত প্রথমে প্রেমভক্তি শিক্ষার সূত্রপাত হয়। মনকে প্রেমভক্তিরসে আগ্রুত করিয়া ভগবন্মুখী করিবার জন্যইত আমাদের বিবাহ! প্রথমে দুইটি স্বতন্ত্র প্রাণকে প্রেমভক্তির বিনাসুতে বীধিয়া এক করিয়া দিবার জন্যইত হিন্দুর বিবাহ-পদ্ধতি। দুইটি প্রাণ এক হইয়া যাওয়া, দুইটি আত্মা স্বাতন্ত্র্যাহিত্য হইয়া একটাতে পরিণত হওয়া কেবল হিন্দু-বিবাহেই আছে—আর কোথাও নাই! এইজন্য একটির বিরহে আর একটির অস্থিত থাকে না, তাই একটা আপন ভুলিয়া আর একটাতে আত্মসমর্পণ করে—ইহাতে স্ত্রী পুরুষ ভেদ নাই। স্ত্রীও যেমনি, পুরুষও তেমনি কিস্তি, আমরা স্ত্রীর পতিভক্তিকে পাতিব্রত্য বলিয়া সূখ্যাতি করি, আর স্বামীর স্ত্রীভক্তিকে স্ত্রৈণ্য বলিয়া নিন্দা করি। পুরুষ যদি স্ত্রীতে বেশী আসক্ত হয়—তাহা হইলে আমরা তাহা দোষ বলিয়া মনে করি কেন? যেখানে যথার্থ প্রেম-রাজ্য বিস্তার-লাভ করিয়াছে, প্রেমের অল্পভূতি যেখানে ঠিকরূপে অল্পভূত হইয়াছে—সেখানে পুরুষও এইরূপে স্ত্রীর প্রেম-সাগরে আপনা ভুলিয়া আত্ম-বিসর্জন দেয়। যে যথার্থ প্রেমিক, তাহার নিকট এইরূপ ভাবই হইয়া থাকে—এই ভাবই যথার্থ মজিয়া যাইবার ভাব। এইভাবে মজিলেই দাম্পত্য-প্রেমের সার্থকতা—আর এই সার্থকতাই একদিন ঠাকুর বিলম্বজলের মত, সাধক চণ্ডীদাসের মত প্রেমিক সাধককে প্রেমময়েব প্রেমের দরবারে পৌছাইয়া দিয়া ধন্ত করিয়া দিবে!

সাধক তুলসীদাস যে আজ এত বড় সাধক, আজ যে তিনি ভগবানের এত প্রিয়পাত্র—সে কার গুণে? রত্নাবলীর প্রতি প্রগাঢ় আসক্তিই কি তাঁহাকে এতদূর উন্নত করিয়া, সাধকত্বের শীর্ষসীমায় তুলিয়া রামসীতার পদারবিন্দে অর্পণ করেন নাই।

প্রেমের যথার্থ শিক্ষা তুলসীদাস রত্নাবলীর নিকটই শিক্ষা করিয়া-

ছিলেন। তারপর সাধনার দ্বারা তাহার গাঢ়তা সম্পাদন করত
ভাবে পরিণত হইয়া আজ তাঁহাকে এতদূরে আনিয়াছে।
নতুবা নিরস হৃদয়ে প্রেমভক্তি শিক্ষা করিয়া কি মানুষ এত শীঘ্র
সেই মহাদেশের সীমান্তস্থিত ভাব-রাজ্যে ভাবের ঠাকুরের দর্শনলাভ
করিতে পারে? তুলসীদাস এতদিনে তাহা বুঝিয়াছেন—তাই
তাঁহার দিন দিন এত উন্নতি; জ্ঞীকে ছাড়িয়া তিনি সাধ্যবস্তুর
দর্শন জ্ঞাত করিয়াছেন—কত ঘুরিয়াছেন—কত কাঁদিয়াছেন
কিন্তু তাঁহার দয়া হয় নাই। আজ শক্তিস্বরূপিণী, প্রেমময়ী রত্নাবলীর
সাহায্য লাভ করিয়া সামান্য দিনেই তাহা লাভ হইল। স্তৈশ্য
তুলসীদাস এতদিন পরে আবার বেশী করিয়া জ্ঞীর বশীভূত হইয়া
পড়িলেন।

ছগনলালের বয়স হইয়াছে; এতদিন অমুঢ়া কন্যাটির জন্য
তাঁহারা বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া ভগবানে চিত্ত স্থির করিতে
পারেন নাই; কেবল শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম্মের দ্বারা মনের মালিন্য দূর
করিতেছিলেন। এইবার কন্যা পাত্রস্থ হইয়াছে; সরস্বতী আজ
স্বামীস্থখে স্থিণী হইয়াছে, তাহাকে বথার্থ সংপাত্রে অর্পণ করি-
য়াছেন—দুইজনের মিলনে আর কোন বিঘ্ন উৎপাদনের সম্ভাবনা
নাই দেখিবা, তাঁহারা একদিন তুলসীদাসের নিকট দীক্ষাগ্রহণ
করিলেন। তারপর কন্যা ও জামাতাকে তাঁহাদের বিপুল বিষয়ের উত্ত-
রাধিকারী নিযুক্ত করিয়া জোনপুরের নিভৃত নিবাসে পরমার্থ চিন্তায়
কালান্তিপাত করিতে গমন করিলেন। সংসারে কোলাহল হইতে দূরে
বাইয়া মনে-প্রাণে ভগবানে আত্মনিয়োগ করাই—এ গমনের উদ্দেশ্য।

দুঃখীরামত চিরকাল তুলসীদাসের শিষ্য—এখন পতি-পত্নী উভয়ে
সাধক তুলসীদাসের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া যতদূর সম্ভব ধর্ম কৰ্ম্মে

মনোযোগ দিলেন। তবে যখন সংসার কোলাহলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া তাঁহারা একান্ত অধীর হইতেন—সময়ে সময়ে একঘেষে সংসারভাব যখন বড় কষ্টদায়ক হইত, তখন একবার দাদা ও বউদির চরণতলে আসিলেই সমস্ত অধীরতা, সমস্ত মলিনতা, সমস্ত কর্কশাস্থি বিদূরিত হইয়া যাইত, তাঁহাদের হৃদয়-তৃপ্তিকর উপদেশে সকল জালা-যন্ত্রণার নিবৃত্তি হইত! কিছুদিন এইরূপে গুরু ও গুরুপত্নীর সুশীতল চরণছায়ায় কাল কাটাইয়া আবার ছগন ও যশোদার মত তাহারা সংসারে আসিয়া পরোপকারে প্রাণ উৎসর্গ করিতেন।

অষ্টত্রিংশ পদ্বিচ্ছেদ

সজ্ঞানে গঙ্গালাভ

শেষ রক্ষাই বড় রক্ষা। মনুষ্য জীবনের শেষে মনের আনন্দে, শাস্তি স্থখে কাল কাটাইতে পারিলেই পরম সৌভাগ্য, নতুবা যৌবন সময়ে যখন দেহে বল-বীৰ্য্য থাকে, অর্থ-সামর্থ্যের ক্রটি থাকে না—সে সময় সহজেই কষ্ট সহ্য করিতে পারা যায়—তখন তত অসহ্য বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু যখন গণা দিন ফুরাইয়া আসে, জীবনের কালবেলায় যখন শরীর বার্কক্যের জড়তায় ভ্রিয়মান হইয়া পড়ে—সে সময় দুঃখ ভোগ নিতান্তই অসহনীয়। এইজন্ত বলে—“শেষ রক্ষাই বড় রক্ষা,” আর এইসময় যে ব্যক্তি শাস্তিময় জীবন অতিবাহিত করিয়া পুত্র পৌত্রের কোলে স্থখে নয়ন মুদিত পাবে—তাহারই জীবন ধন্য! সাংসারিক হিসাবে—সেই পরম সৌভাগ্যবান।

ভুলসীদেবীর প্রথম জীবন স্বামী-সোহাগে, ধার্মিক স্বামীর

আদর যত্নে খুব সুখেই কাটিয়াছিল। তারপর তুলসীদাসকে পাইয়া মনে করিয়াছিলেন—জীবন খুব সুখে কাটিবে কিন্তু তাহা তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই, পুত্রের গৃহত্যাগে কেবল হাহা করিয়াই অতি-বাহিত হইয়াছে, একদিনের জ্ঞান মনের সুখে কাল কাটাইতে পারেন নাই। এখন শেষ জীবনে ভগবান আবার তাঁহার অবস্থা কিরা-ইয়া দিয়াছেন—কুলপ্রদীপ তুলসীদাস আজ সাধনবলে বংশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, চারিদিকে তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভের সাদা পড়িয়া গিয়াছে; এখন তুলসীদাস একজন স্বনামপ্রসিদ্ধ কবি এবং সাধক,—তুলসীদেবী তাঁহারই জননী—এইজন্য সকলেই তাঁহাকে রত্নগর্ভা বলিয়া কত আদর করিতেছে,—তুলসীদাসকে দেখিতে আসিয়া অগ্রে তাঁহার পদধূলি লইয়া সকলে কৃতার্থতা অনুভব করিতেছে। শেষ জীবনে তাঁহার সুখের অবধি নাই—কিন্তু সুখ ত চিরস্থায়ী নহে? যদি অদৃষ্টচক্র কোন-প্রকারে বিকৃতি লাভ করত আবার তাঁহাকে পাকচক্রে ফেলিয়া কষ্ট দেয়; তাই তুলসীদেবী আজকাল প্রত্যহ তাঁহার ইষ্ট-দেবতার নিকট আপনার মরন কামনা করেন, বলেন—প্রভু! আপনার কৃপায় আমার সুখের অবধি নাই—এত সুখে আবার যে দাসীকে আপ্যায়িত করিবে—তাহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। এক্ষণে শেষরক্ষা কর ঠাকুর! আমি আমার সহমুতা হইতে দেন নাই। “তুলসীকে মাহুয করিয়া তবে তুমি আমার নিকট আসিও” বলিয়া অনুমতি করিয়াছিলেন। ঠাকুর! আপনার কৃপায় আমার তুলসী আজ যথার্থ মাহুয হইয়াছে, মাহুয অর্জুন করিয়া তোমার পদে স্থান পাইয়াছে। এক্ষণে আর কেন, আমাকে আমার হৃদয় দেবতার চরণতলে পৌঁছিয়া দাও—আমি হাঁসিতে হাঁসিতে বাছার কোলে মাথা রাখিয়া সজ্ঞানে গঙ্গাতীরে এ দেহের অবসান করি।

সতীর এ প্রাণের প্রার্থনা দেবতার কাণে পৌছিতে বেশী বিলম্ব হইল না। হুলসীদেবী অত্যন্ত বৃদ্ধা হইয়াছেন—বয়সও অনেক হইয়াছে, তবে আর কেন,—“জীব মাত্রেই ত ইচ্ছা মৃত্যু” ইচ্ছা না করিলে কাহার মৃত্যু হয়? হুলসীদেবী এইবার পতি সদনে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। স্বামীর সেই সৌম্যমূর্তি অহরহঃ তাঁহার প্রাণে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি যেন আর একদণ্ডও পৃথিবীতে থাকিতে রাজী নহেন। সাংসারিক কোনপ্রকার দুঃখে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইতেছে না—হুলসীদেবী পুত্র ও বধুরষত্রে খুব স্বখে আছেন, তথাপি তাঁহার দেহ যেন দিন দিন লাষণ্যবিহীন হইয়া পড়িতে লাগিল, আহারে আর তেমন রুচি নাই, বসিলে আর উঠিতে পারেন না। রত্নাবলী শাশুড়ীর ভাব গতক দৈখিয়া বলিলেন—মা! তুমি দিন দিন এইরূপ হইয়া যাইতেছ কেন? কোন অসুখ হইয়াছে কিনা বল তাহা হইলে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করি?

হুলসীদেবী বলিলেন—বউ মা! অনেকদিন আসিয়াছি, আর এক-বেয়ে স্বখ-সৌন্দর্য্য ভাল লাগে না; আমি এখন তোমাদের গুণে অতি মাত্ৰায় স্বখভোগ করিতেছি—এমন যে হইবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই—এইবার আস্তে আস্তে তোমাদের কোলে মাথা রেখে সরিতে পারিলেই বাঁচি; কি জানি মা, ভাগ্যের কথাত বলা যায় না? আমার এখন ঠিকই সময় হয়েছে, তুলসীমণি আমার অসংখ্য পরমায়ু নিয়ে তোমার সঙ্গে এইরূপ ধর্ম্মজীবন অতিবাহিত করুক, তোমরা রামসীতার পদতলে আত্মহারা হইয়া মানবজীবন ধস্ত কর—আমি এই দৈখিয়া মরিতে পারিলেই অক্ষয় স্বর্গলাভ করিব; মা! আমার কি এ বয়সে আর চিকিৎসা করাইবার সময় আছে? এখন প্রভু রামচন্দ্রের চরণামৃতই আমার পক্ষে একমাত্র ঔষধ, যে কয়দিন বেঁচে থাকি, তুমি আমাকে ঐ পরমৌষধ পান করাও।

শাশুড়ীর কথা শুনিয়া রত্নাবলীর প্রাণ ধারাপ হইয়া গেল ; তিনি স্বামীকে এই সমস্ত বিষয় বিবৃত করিলেন—তুলসীদাস জননীর পীড়ার কথা শুনিয়া বলিলেন—মা ! তুমি দিন দিন এমন শুখাইয়া যাচ্ছ কেন, কি অসুখ হয়েছে বল ?

হুলসীদেবী বলিলেন—বাবা ! আমার এখন কোনও অসুখই নাই—মন শাস্তিতে পূর্ণ রহিয়াছে ; তবে যে আমাকে একটু মলিন দেখিতেছ—সে কিছুই নয়, বাবা ! এখন আমার কর্তার কাছে যাবার জন্য মন বড় উতলা হইয়াছে ।

তুলসী । যখন আসিয়াছ, তখন ত যাইতেই হইবে মা ! তবে এত উতলা কেন ?

হুলসী । বাবা ! কর্তার আদেশ প্রতিপালন করিয়াছি—তুমি আমার মাহুষ হইয়াছ ; আমাকে অহুল স্তূথে স্তূখী করিয়াছ ; তাই এইবার তাঁর কাছে যাবার জন্য মন ছটফট করিতেছে, সর্বদা যেন সেই সৌম্যমূর্তি চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি, তিনি আমাকে যাইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন ।

জননীর মৃত্যু-ইচ্ছা যখন প্রাণের মধ্যে জাগিয়াছে, তখন আর তাঁহাকে রাখা যাইবে না । তুলসীদাস সেইদিন হইতে সাধন-ভজন ভুলিয়া আরাধ্য দেবী জননীর সেবার তৎপর হইলেন । ইহার তুল্য সাধনা যে জগতে আর নাই—তুলসীদাস এতদিন পরে—তাহা বুঝিয়াছেন । তাই আজ তিনি মায়ামোহের অতীত, সংসার বিরাগী হইয়াও আহার নিভ্রা ত্যাগ করত জননীর শয্যাপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিয়াছেন । এখন হুলসীদেবীর আর উষ্ণতার শক্তি নাই—পুত্র ও পুত্রবধূ বাহার একান্ত অহুগত, দেবার মত পূজায় রত, তাঁহার আর সেবার ভাবনা কি ?

দুঃখীরাম খুড়ীমার অবস্থার বিষয় শুনিয়া সঙ্গীক আসিয়া

সেবায় ব্রতী হইলেন। ছগনলাল ও যশোদা এখন তুলসীদাসের পরম আশ্রয়—শিষ্য ও শিষ্যানী, কাজেই হুলসীর পীড়ায় তাঁহারা আসিয়া প্রাণাস্তকর সেবা করিতে লাগিলেন। ভগবানদাস কানীতে নাই—তিনি হুলসীকে পুত্রের করে প্রদান করিয়া দেশে চলিয়া গিয়াছেন,—নতুবা তিনিও যে হুলসীদেবীকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য তথায় উপস্থিত থাকিতেন—সে বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

তুলসীদাসের ন্যায় সাধকের জননী কিরূপ ধর্ম্মলীলা, মৃত্যুর জন্ত কিরূপ প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন—তাহা সহজেই বিবেচ্য। মৃত্যু ভয় তাঁহার হৃদয়ে কিছুমাত্র নাই—তাহার যে কিরূপ যজ্ঞা, একদিনের জন্ত তাহা ভুগিতে হয় নাই। যাহারা আজীবন পাপকাজে রত, একদিনের জন্য যাহারা ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রাণের ডাকে ভগবানকে ডাকে নাই—মরণের প্রাক্কালে তাহারাই মৃত্যু-বিভীষিকা দেখিয়া আঁৎকাইয়া উঠে; ভীষণ ভয়ে বিষম চীৎকার করিয়া থাকে, নানা প্রকার প্রলাপ বকে কিন্তু যাহারা আজীবন ধর্ম্মজীবন অতিবাহিত করিয়া জীবননদীর কূলে—মৃত্যুরদ্বারে আসিয়াছেন—তাঁহাদের ভয় কিম্বা, তাঁহারা ত এই দ্বার-অতিক্রম করিলেই একেবারে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে আত্মারামের পদে মিশিবেন, হুলসীদেবীর পূজনীয় আত্মারাম যে আজ কয়েকদিন হইল—তাঁহাকে ডাকিতেছেন। এ ডাক—স্বামীর এ প্রীতির আহ্বান, সতীর কর্ণে পৌছিয়াছে, তবে তিনি আর কি থাকিতে পারেন? কর্তব্যাকর্ম্ম যখন শেষ হইয়াছে, তখন আর কেন—সংসারে মজিয়া থাকা, কলির গর্ত্তই যে ধন্য!

ভবানুমিত্র এতদিন গুরুর আদেশে তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়া ছিলেন। আজ কয়েক দিন হইল, তিনিও আসিয়া উপস্থিত হই-

ঘাছেন; প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া তিনিও দেবীসদৃশা তুলসীদেবীর সেবা-শুশ্রূষা করিতেছেন। আজ প্রাতঃকাল হইতে না হইতেই তুলসী জানিতে পারিয়াছেন—আজ তাঁহার জীবনের শেষ দিন। তাই পুত্রকে বলিতেছেন—বাবা! এইবার চল গঙ্গাস্নানে যাই? জননীর অবস্থা বুঝিয়া, তাঁহার প্রাণের ঐকান্তিকতা দেখিয়া, তুলসীদাস তাঁহাকে ভাগিরথীর সলিল-সল্লিকটে আনিয়া, তারকব্রহ্ম রামনাম শুনাইতে লাগিলেন। দুঃখীরাম খুড়ীমার শিয়রে বসিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইতে লাগিলেন। রত্নাবলী, যশোদা ও সরস্বতী আকুলপ্রাণে কাঁদিয়া ধরাতল অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। তুলসীর চক্ষে জল নাই, তিনি কাঁদেন নাই—পুণ্যবতী জননীর শেষের এই অবস্থা, তাঁহার এই আনন্দময় ভাব দেখিয়া, রামসীতার পদে তাঁহার প্রগাঢ় আত্মনির্ভর দেখিয়া বিস্মৃত হইয়াছিলেন। আজীবন সাধন করিয়া তিনি যাহা করিতে পারেন নাই, তুলসীদেবী ঘরের কোণে বসিয়া, অহরহঃ সংসারধর্ম্মে মজিয়া থাকিয়া, তাহা অপেক্ষা বেশী শিখিয়াছেন—মরি মরি, এ যে অতি রমণীয়! তুলসীদেবী শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বলিতে লাগিলেন—“জয় জয় রাম, জয় জয় রাম, সীতাপতি রাম—” বলিতে বলিতে তাঁহার নেত্র উর্দ্ধে উঠিল—একবার করঘোড়ে বলিলেন—“যাই প্রভু, যাই।” আর তাঁহার মুখে কথা সরিল না বুদ্ধা নিজের প্রতিশ্রুতি মত, স্বজ্ঞানে মা গঙ্গার গর্ভে, সাধক পুত্র তুলসীদাসের জোড়ে মাথা রাখিয়া সকলকে আশীর্ব্বাদ করত পরিণত বয়সে ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। তরু তুলসীদাস কিয়ৎক্ষণের জন্ত নির্ব্বাক-নিষ্পন্দ হইয়া জননীর পারত্রিক পরিত্রাণ হেতু ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন। তার পর মণিকর্ণিকারঘাটে জননীর পবিত্র দেহ স্নানোদ্ভূত করিয়া সাধক সিদ্ধাসনে সমাসীন হইলেন। আজ তিনি

জগতের এমনি প্রধান যায়ার শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। জননীর ইচ্ছা-মৃত্যুতে তাঁহার শোক করিবার কিছুই রহিল না।

জননীর শ্রাদ্ধকাৰ্য্যে তুলসীদাস কিছু আড়ম্বর করিবার মনস্থ না করিলেও—হুঃপীরাম, ছগনলাল প্রভৃতি শিষ্যবর্গ তাহা হইতে বিরত হইলেন না। অজস্র অর্থব্যয় করিয়া তাঁহারা ব্রাহ্মণভোজন ও কান্দালী বিদায় করত প্রেতের তৃপ্তি সাধন করিলেন।

ভক্ত এতদিনে মাতৃহারা হইলেন—জননীর অভাব যে কি তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি শোকহুঃখে অধীর না হইলেও বুঝিলেন—যাহারা মা আছে—তার সব আছে, জগতে যার মা নাই, তাহার বুঝি কেহই নাই। ঠিক এমনটী করিয়া, এমন প্রাণপুরা স্নেহ-ভালবাসা দিয়া, পুত্রের জন্য জননী যেমন করেন, জগতে তেমন আর কেহ করিতে পারে না।

জগতে জন্মাইলে সকলেরই এই গতি—এমন কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর পর্য্যন্ত এই একই নিয়মে বাঁধা—তবে, কিছু অগ্রে আর কিছু পশ্চাতে। প্রভেদ মাত্র এই!

অনেকে হয়ত বলিবেন—তুলসীদাস মরা বাঁচাইতে পারেন, আর আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু-ভীতি নিবারণ করিতে পারেন না। এই কথার উত্তর এই যে—যাহারা মৃত্যুর জন্ম ভয় পায়—তাহাদের জন্য সাধক রামনামে অসাধ্য-সাধন করিতে পারেন কিন্তু যিনি মৃত্যুকে ভয়ের সামগ্রী না ভাবিয়া, কেবল বাল্য-যৌবন-জরার ন্যায় অবস্থান্তর ভাবিয়া, তাহাতে হাসিতে হাসিতে আত্মসমর্পণ করেন—তাহাদের জন্য আর উপায় উদ্ভাবন কেন, মরণ-বাঁচনত তাহাদের পক্ষে এক! এইবার তুলসীদাস আত্মচিন্তায় রত হইলেন—কলির প্রকোপ বাড়িতেছে, ধর্ম-কর্ম একপ্রকার লোপ হইবার উপক্রম হইতেছে,

বিজাতীয় রাজার অত্যাচার ক্রমশঃ বাড়িতেছে ; মুসলমান রাজাগণ ক্রমশঃ উদ্ধত প্রকৃতি হইতেছে—অতএব রাজ্যের আর শ্রেয় নাই। জননীর মৃত্যুর পর সাধক একাগ্রচিত্তে কেবল হৃদয় মন্দিরে ইষ্ট-দেবতার পদে আত্ম-নিবেদন করিতে লাগিলেন।

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

জন্মভূমি দর্শন

তুলসীদেবীর মৃত্যুর পর তুলসীদাস কেমন বিমনা হইয়া পড়িলেন, সাধন-ভজন ভিন্ন আর কোন কাজে উত্তম-উৎসাহ দেখাইতেন না। দুঃখীরাম এই সকল দেখিয়া প্রায়ই দাদার কাছে কাছে থাকিতেন। বহু জমীদারীর কার্য্য তাঁহার স্বন্ধে ন্যস্ত থাকিলেও তিনি এ বিষয়ে ঔদাস্য প্রকাশ করিতে পারিলেন না। নায়েব গোমস্তাকে ঐ সমস্ত বিষয়ের ভার প্রদান করিয়া তিনি দাদার অলুজা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তুলসীদাসও এখন দুঃখীকে এবং ভবানীকে প্রাণের প্রিয় বন্ধু বলিয়াই নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার উপদেশে দৌহাবলীর অধিকাংশই প্রায় এই সময় রচিত হইয়াছিল। ভবানী ও দুঃখীরাম কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে—তিনি তাহার উত্তরে গভীর জ্ঞানের পরিচয় স্বরূপ অতি সরল হিন্দুস্থানী ভাষায় ঐ ধর্ম্মতত্ত্বের দৌহা সকল প্রকাশ করিয়া উপদেশ প্রদান করিতেন।

এই সময় তিনি তুলসীঘাটে বসিয়া তাঁহার রচিত রামায়ণ এমন মনমোহন হুরে পাঠ করিতেন—বাহা শুনিয়া বনের পশুপক্ষী পর্য্যন্ত

মুগ্ধ হইয়া যাইত। শুনা যায়—মহাবীর হনুমানও মুগ্ধ হনয়ে ভক্তের রচিত এই ভক্তিমাথা রামগুণ গান অলঙ্কিতে শ্রবণ করিতে আসিতেন, তুলসী তাঁহাকে দেখিলে আরও ভাব-বিভোর হইয়া রামায়ণ পাঠে তন্ময় হইতেন। তারপর পূজার সময় স্বামী-স্ত্রীতে তাঁহাদের প্রাণের দেবতার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া কত মনের কথা, প্রাণের ভাষা ব্যক্ত করিতেন—যাহা মানবীয় ভাষায় লিপিবদ্ধ করা যায় না।

“জননী জন্মভূমিষ্ঠ স্বর্গাদপি গরীয়সী” একথা সকলেরই নিকট সমানভাবে সমাদৃত, বিশেষতঃ সাধক মাঝেই দ্বাদশ বৎসর অন্তর এক একবার জন্মভূমি দর্শনে স্বর্গ দর্শনের সাধ মিটাইয়া লয়েন। বহু তীর্থ পর্যটন করিলে যে ফল—দ্বাদশ বৎসর অন্তর একবার জন্মভূমি দর্শন করিলে তদপেক্ষা সহস্রগুণ ফললাভ হইয়া থাকে—এইজন্ত জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও গরীয়সী, শাস্ত্র মুক্তকণ্ঠে তাহা প্রচার করিয়াছেন। তুলসীদাসের একবার সেই জন্মভূমী দেখিবার সাধ হইল—দুঃখীরামকে তাহা ব্যক্ত করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার সঙ্গী হইলেন। একদিন অতি প্রত্যাষে দুঃখীরাম ও তুলসীদাস বহুদিনের পর জন্মভূমি রাজাপুর দর্শনে চলিলেন। ভবানীর প্রতি যঠের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত হইল।

একদিন যেমন দরিদ্রভাবে গ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলেন—ঠিক সেইরূপে আজ দুই বহুতে রাজাপুরে দ্বিবেদীর সেই শ্রামশম্প-সম্বিত, কোকিল-কুজন-কুজিত, মনোহর শাস্তি নিকেতনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্রামের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে—যেসকল ব্যক্তি তখন গ্রামের শেষ শোভাবর্দ্ধন করিত—সমাজ যাহাদের দ্বারা সুশিক্ষিত হইত—এখন তাহাদের অনেকেই কাল-কবলে কবলিত হইয়াছেন। কাজেই অনেকে

তাঁহাদের চিনিতে পারিল না—কেবল দুঃখীরামের মামী অতিশয় বৃদ্ধা হইলেও চিনিতে পারিলেন। তিনি একপ্রকার জরা-বার্দ্ধক্যের কবলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। তিনি ইহাদের দেখিয়া পরম পুলকিত চিত্তে আদর যত্ন করিলেন। আরও জন কয়েক বৃদ্ধা তাঁহাদের চিনিতে পারিয়া কত দুঃখ করিতে লাগিল, বলিল—বাবা! তোরা সব বুনিয়াদী বংশ, এমন করে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছিস বলে—রাজাপুর যেন বনালয় হয়ে গেছে। আগেকার শ্রী-মৌন্দর্য্য সব নষ্ট হয়েছে, তা বাবা! তোরা আবার আয়, এসে ঠিক করে নে না—সব ত ঠিকই আছে, কেবল লোক নাই—গ্রামকে দেখে এমন পুরুষমানুষ কেহ নাই; আর কি তুলসী! তোর বাপ্ আত্মারাগ আছেন—না নৃসিংহদাস আছেন—যে গ্রামকে দেখবে—ভেঙ্গে চুরে গড়বে। আহা! তারা থাকতে কত কীড়িই এই গ্রামে হতো।

তুলসীদাস ও দুঃখীরাম সকলকে যথাযথ অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন—বাহাতে গ্রাম আবার পূর্বের মত হয়—আমরা তাহাই করিতে আসিয়াছি। আপনারা আশীর্বাদ করুন। এতদিন যে যুবকটির উপর দুঃখীরাম সমস্ত ভার দিয়া গিয়াছিলেন—সে অতি ভাল বংশের ছেলে—এতাবৎকাল দুঃখীর আদেশ মত সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিয়াছে। কোনপ্রকার ত্রুটি করে নাই—লোভের বশবর্তী হইয়া কোন জমীজমা নষ্ট করে নাই।

দুঃখীরাম পাড়ার মণ্ডল মহাশয়কে ডাকিয়া তাঁহার এবং তুলসীদাসের বাবতীয় জমীজমার উপসত্ত্ব হইতে একটি মঠ স্থাপনের ব্যবস্থা করিলেন। “দ্বিবেদীর মঠ” নামে একটি দরিদ্র-নিবাস স্থাপিত করিয়া যুবকটির উপর তাহার তত্ত্বাবধানের ভার দিলেন এবং মণ্ডল মহাশয়কে কোষাধ্যক্ষ করিয়া দিলেন—বাহাতে এই অনাথ-

আশ্রয় ভাল করিয়া চলে। প্রতিবাসী সমস্ত লোক তাহার উন্নতির জন্য বদ্ধ পরিকর হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল। তুলসীদাস দুঃখীকে লইয়া এইবার ধর্মপুরে গমন করিলেন। দীনবন্ধুর বিষয়-আশয় কি আছে, তাহার সন্ধান লইলেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর কণ্ঠার শোকে বহুদিন হইল, লক্ষ্মীদেবী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। কন্যা-জামাতার বহু অন্বেষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন-প্রকার সন্ধান করিতে না পারিয়া তিনি হতাশ হৃদয়ে কিছুদিন মনমরা হইয়া কালযাপন করেন—তারপর নানাপ্রকার পীড়াগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। স্বামীর যে সকল বিষয়-আশয় ছিল—তাহাতে তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের কোনপ্রকার কষ্ট হয় নাই।

জৈনিক আত্মীয় অসময়ে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিল, বলিয়া তাঁহার বিষয়ের যাবতীয় উপসম্ব ভোগ করিবার ক্ষমতা তিনি তাহাকে দিয়া গিয়াছিলেন এবং বলিয়া গিয়াছিলেন—যদি আমার কণ্ঠা বা জামাতা জীবিতাবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া উহার গ্রহণ করে, তাহা হইলে তুমি বাহিরের বাগান ও জমী লইয়া সমস্ত তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবে, আর যদি তাহারা না আসে—তাহা হইলে এসমস্ত তোমারই রহিল—তুমি পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে উহার ভোগ-দখল করিও।

তুলসীদাস শাস্ত্রভীর দানে কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করিলেন না, বরং সন্তুষ্টচিত্তে ঐ ব্যক্তিকে বাহিরের বাগান ও জমি ছাড়িয়া দিয়া, বাস্তব উপসম্ব একজন লোককে প্রদান করিলেন এবং তাহার যাবতীয় আর “দ্বিবেদীর মঠের” সাহায্যার্থ প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

দুঃখীর মামী মনিয়াদেবীর কেহ ছিল না, দুঃখীই তাহার সব—তিনি মামীকে আর একাকিনী এখানে রাখিতে রাজী হইলেন

না, বলিলেন—মায়ী! আমি কখন কোথায় থাকি—তাহার ত স্থিরতা নাই; আর তুমিও যারপর নাই বৃদ্ধা হইয়াছ, অতএব যদি আমার সহিত গোসাইগঞ্জে যাইতে চাও—তাহা হইলে চল, সেখানে বধূর সহিত একত্র থাকিলে—আর তোমাকে কোনপ্রকার কষ্ট পাইতে হইবে না; অন্তিমকালেও সদগতি হইবে। মনিয়া-দেবীর স্বদেশ ছাড়িয়া যাইবার ইচ্ছা না থাকিলেও তাঁহার অবস্থা তাঁহাকে যাইতে বাধ্য করাইল—অগত্যা তিনি স্বীকৃতা হইলে—দুঃখীরাম ও তুলসীদাস আত্মীয়-স্বজনের আদর-আপ্যায়নে জন্মভূমির পবিত্র কোলে কিছুদিন বাস করিয়া মাতুলানী সহ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

তাঁহাদের ব্যবস্থা শুনে এবং উপযুক্ত লোকের হস্তে পড়িয়া “দ্বিবেদীর মঠ” বেশ সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হইয়া, বান্দা জিলার দীন-দরিদ্রগণের অভাব মোচন করিতে লাগিল। অনেক অনাথ, আতুর, দুঃখীরাম এবং তুলসীদাসের কল্যাণে সেই মঠে থাকিয়া স্বপ্নে কাল কাটাইতে লাগিল। এরূপ সুব্যবস্থায় পরিচালিত মঠ বান্দা-জেলায় আর একটাও ছিল না। এই অনাথ আশ্রম বহুদিন ধরিয়া তুলসীদাসের এবং তদীয় পিতার নাম অক্ষুন্ন রাখিয়াছিল। তার পর মুসলমান রাজত্বের শেষে তাহা উঠিয়া গিয়া সেইস্থানে নীলকুটা স্থাপিত হইয়াছিল। এখন যে তথায় কি হইয়াছে, তাহা কেহই অবগত নহে। তাহার নাম পর্য্যন্ত বোধ হয় আর নাই—তাহার নিকট রাজাপুর পোষ্টাফিস স্থাপিত হইয়া এখনও তাহার শোভাবর্দ্ধন করিতেছে।

চত্বারিংশ পদ্বিচ্ছেদ

দেহত্যাগ

দুঃখীরাম আসিয়া শুনিলেন—জোনপুরে তাঁহার স্বপুত্র সাংঘাতিক-রূপে পীড়িত। তিনি আর অপেক্ষা করিলেন না—মামীকে রাখিয়া জ্বর সহিত জোনপুর গমন করিলেন। ছগনলাল আদর্শ কর্মী, তাহার দানকার্যের তুলনা নাই, এরূপ একজন মহাত্মার অসুস্থ সংবাদ শ্রবণে দেশের অনেক লোক হায় হায় করিতে লাগিল—ভগবানের নিকট তাঁহার আরোগ্য প্রার্থনা করিতে লাগিল কিন্তু রোগ যখন ধ্রুগতি ধারণ করে, যখন মানুষের ইহ সংসার ত্যাগের সময় হয়, তখন চিকিৎসাদিতে তাদৃশ ফল হয় না।

ছগনলাল তাহার জ্ঞাত কাতর নহেন—মৃত্যুর জ্ঞাত তিনি একদিনের জ্ঞাত ভীত হন নাই। প্রাণ যার ধর্মবলে বলীয়ান—মন ধীর, ভক্তিরসে আপ্লুত হৃদয় যার সদা সর্বদা পরহিত ব্রতে রত—তাহার মৃত্যুর ভয় কোথায়?

একবার গুরুদেবকে দেখিবেন—তাঁহার পদে মাথা রাখিয়া ছগন ইহ সংসার ত্যাগ করিবেন—এক্ষণে এই তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে; অনবরত কেবল গুরুদেবের জ্ঞাত ব্যাকুল হইতেছেন দুঃখীরাম তুলসীদাসকে লষ্টয়া যাইবার জ্ঞাত কালী আসিলেন কিন্তু তুলসীদাসের তখন ডাবান্নের ইচ্ছা, তিনি আর কোথাও যান না, কাহার সহিত কথা কন না—আহারাদির প্রতিও তত আস্থা নাই, সদা সর্বদা কেবল যোগাসনে বসিয়া আপনার ইষ্ট-চিন্তায় রত; প্রত্যক্ষ দর্শনে দেবদেবীর পদে সদা অবনত,

তাঁহার কোথাও যাইবার ক্ষমতা আর নাই—যেন একপ্রকার স্ববির হইয়া পড়িয়াছেন। দেবতার প্রবল শক্তি মানবহৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিলে মানুষ অসীম শক্তি সমন্বিত হয়—আবার সময়ে সময়ে আত্মভোলা হইয়া স্ববির হইয়া পড়ে, নখরজগতের কিছু প্রীতি আর তাঁহার আস্থা থাকে না।

হুঃখীরাম আসিয়া শ্বশুরের পীড়ার সংবাদ—তাঁহার বাঁচিবার আর আশা নাই, তিনি একবার তাঁহাকে দেখিতে চাহেন, ইত্যাদি বিষয় অবগত করাইলে, তুলসীদাস আর না বাইয়া থাকিতে পারিলেন না। জোনপুর গমন করিয়া শিশুর অস্তিম অবস্থা দেখিয়া সাহস প্রদান করিলেন, বলিলেন—বৎস! তোমার মত মহাত্মার ভীত হইবার কোন কারণ নাই : যাহারা আজীবন অপকর্ষ করিয়া জীবন কাটাইয়াছে—মৃত্যু তাহাদের নিকট ভীতিপ্রদ—অশেষ যন্ত্রণাদায়ক ; আর যাহারা আজীবন ভগবানের আদেশ প্রতিপালন করিয়া, তাঁহার প্রিয়কর্ম্য সম্পাদন করিয়াছে—মৃত্যু তাহাদের ভবাক্ষ উত্তরণের উপায়, ভব-সমুদ্রের সেতু স্বরূপ ; এই সেতু পার হইলেই পরপারে শান্তির রাজ্য বিস্তৃত ; বৎস! ঐ দেখ, তোমার জন্ম পরপারে কত যাত্রী দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনার জন্ত প্রস্তুত রহিয়াছে ; তাহার মাঝে ঐ কে দেখিতেছ ?

হগনলাল বলিলেন—প্রভু ! মহাবীর ঐ দলের নেতা হইয়া আমাকে ডাকিতেছেন, গুরো ! এইজন্য আপনার সাক্ষাৎ আবশ্যক বোধ করিয়াছিলাম—আপনি যে আমার ঐহিক, পারত্রিক নিস্তার কর্ত্তা ভবার্ণবের নাবিক, পাদপদ্মে আশ্রয় দিন, আশীর্বাদ করুন, আমি যেন সত্বর ঐ স্থানে গমন করিয়া প্রভুর পদে লীন হইতে পারি।

তুলসী। বৎস ! জগতের জন্য তুমি প্রাণ তুচ্ছ করিয়া অকা-

তবে পরোপকার করিয়াছ, তোমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই, তুমি হেলায় এ দুস্তর ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবে।

ছগনলাল সম্মানে জপে বসিলেন—আর দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্রাণবায়ু অনন্তের অনন্তকালে মিশিয়া গেল। তাঁহার ভাবে মৃত্যু হইল, কামনা-বাসনা কিছুই রহিল না;—ভবে আসা যাওয়ার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া ছগনের পুণ্য-পুত আত্মা পরমাশ্রায় লীন হইল। গুরুদেবের অন্তিম আশীর্বাদ সফল হইল।

একে একে সব যাইতেছে দেখিয়া তুলসীদাস বড়ই আনন্দিত, জগতে আসা কেবল যাইবারই জন্য কিন্তু পুনরাগমন বন্ধ করিয়া যাইতে পারিলেই না যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভ হয়, আর তাহাই না নির্বাণ মুক্তি! তিনি জোনপুরে আর বেশী দিন অপেক্ষা না করিয়া নিচ্ছ আশ্রমে ফিরিলেন। গুরুদেবের ভাব দেখিয়া প্রিয় শিষ্য ভবানী এখন কাছে কাছেই থাকেন—প্রায়ই সঙ্গ ছাড়া হন না। আজ কয়েকদিন হইল, জোনপুর হইতে আসিয়া গুরুদেব ঘেন আরও উদাস হইয়া গিয়াছেন।

আহাণাদি আর তত করেন না, অনবরত কেবল রামায়ণ পাঠ করিয়া প্রেমাশ্রজলে অভিষিক্ত হইতে থাকেন, সে রামায়ণ পাঠ যে শুনিত, সেই মনে-প্রাণে তন্ময় ভাবের স্বর-লহরী যাহাঁর কর্ণে প্রবেশ করিত, সেই ধন্য হইত, সকলে মনে করিত—বোধ হয় বীণার স্বরও এত মধুর নহে, তুলসীদাস যে স্বরে রামায়ণ পাঠ করিতেন, তাহা শুনিবার জন্ত সিংহাসনে রামসীতার মূর্তি ঘেন সজীব হইয়া ভক্তের সেই করুণ-কণ্ঠের সুধার ধারা পান করিতেন।

এইরূপে পূজা আরতি জপ এবং রামায়ণ পাঠ এখন তুলসীর নিত্যকর্ম হইয়াছে। আরত কোন কাজ তিনি করেন না; সঙ্গ

সর্বদাই এইভাবে বিভোর হইয়া থাকেন; রত্নাবলী স্বামীর ঈদৃশ ভাব দেখিয়া কাছ ছাড়া হন না, তিনিও আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন। ভবানীমিশ্র তুলসীদাসের প্রিয়শিষ্য, তাহাকে তিনি অনেক প্রাণের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। সাধকের উপস্থিত যে ভাব হইয়াছে, যে ভাব-সমাধি অহরহঃ তাঁহার প্রাণে জাগিতেছে—ইহা আর ভক্ত হইবে না; এই ভাবের অবস্থাতেই তুলসীদাস লীলা সম্বরণ করিবেন।

ভবানী এ কথা কাহার নিকট প্রকাশ না করিলেও, তিনি নিজের প্রাণে বড় দাগা পাইতেছেন ভবানীর যে আর কেহ নাই, তুলসী যে তাঁহার জীবন সম্বল; তিনি না থাকিলে ভবানী আর কাহার তেজে তেজীয়ান হইয়া সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিবেন? কিন্তু যতদিন তিনি সংসারে আছেন—ততদিন হতাশ হইলে ত চন্নিবে না!

তুলসীদাসের এখনকার ভাব অতি রমণীয়। শরীরকাস্তি দৈব-সুখমা-মণ্ডিত, দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়, সে স্বন্দর বদন-প্রতিভা হইতে নয়ন ফিরান যায় না; তার উপর তাঁহার সেই মধুর বাক্যাবলী শ্রবণ করিলে, অতি বড় ক্রুর স্বভাবও ক্রুরতা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পদানত হইতে স্বীকৃত হয়, কুবি মানব-কণ্ঠ এমন সুধা উদগীরণ করিতে পারে না।

তাঁহার গুণের বিশিষ্টতা এই যে, তাহার কাছে যে, যেভাবে আসিত, তিনি তাহাকে সেইভাবে উপদেশ দিয়া সন্তুষ্ট করিতেন, শত্রু-মিত্র তাঁহার কেহ না থাকিলেও এ সময় তিনি সকলকেই সমান চক্ষে দেখিতেন, সমস্ত ব্রহ্মে ব্রহ্ম দর্শন করিয়া তিনি ব্রহ্মভাবে মজিয়া গিয়াছিলেন। সামান্য খিড়াল কুকুরকেও তিনি আদর করিয়া কোলে বসাইতেন—মুখচুষন

করিতেন; আবার কিয়ৎক্ষণপরে ভগবান রামচন্দ্রের পূজা করিয়া একে-
বারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন। সাধকের এই ভাবই যথার্থ বৈষ্ণবত্ব,
সর্বজীবে ব্রহ্মদর্শনই মুখ্য সাধকের চরম জ্ঞান—ইহাতেই তাহার
পরম পরিণতি। এ অবস্থায় মাল্লু পাগল ভিন্ন আর কিছুই নয়,
ভগবতের সাধারণ লোক ইহাকে পাগল ভিন্ন আর কি বলিবে?

তুলসীদাস এক একদিন বাবা বিবেশ্বরের মন্দিরে যাইতেন—পূজাদি
না করিয়া কেবল ফ্যাল ফ্যাল করিয়া সেই অনাদি লিঙ্গ মূর্তির পাদু
চাহিয়া অশ্রু অশ্রুবর্ষণ করিতেন। তারপর সমাগত যাত্রীবর্গের
পদধূলি মাথায় দিয়া মন্দিরে গড়াহুটী খাইয়া চলিয়া আসিতেন।
ভবানী সঙ্গে সঙ্গে থাকিত—গুরুর এই ভাব দেখিয়া সে নিজে
আত্ম বিম্বত হইয়া পড়িত মনে করিত—পূর্বজন্মে কত স্মৃতি করিয়া-
ছিলাম, তাই এমন মহাত্মার রূপালাভ করিয়াছি।

তুলসীদাস অদৈতবাদী ছিলেন—একমেবা দ্বিতীয়ঃ তিনি
শ্রীরামচন্দ্রকেই পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া সর্বজীবে তাঁহার সম্বাস্তব করিতেন।
তুলসীদাসের রামায়ণ আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ,—তাঁহার রামায়ণ বাস্তবিকই
অমৃতের প্রস্রবণ;—এই রামায়ণ ছাড়া তিনি যত দৌহা রচনা
করিয়াছিলেন—তাঁহার অধিকাংশই এই সময় রচিত। এই ভাবের
ঘোর তিনি দৌহারূপে ভবানীকে অনেক কথা বলিতেন—তাই সেগুলি
ভক্তি ও নীতিতে এত মধুর হইয়াছিল।

প্রথম ঘোবনে তুলসীদাস পত্নী রত্নাবলীকে বত ভালবাসিতেন।
এখন তাহাপেকাও ভালবাসা অধিক—কিন্তু তাহাতে লালসার নাম
গন্ধ ছিল না, কেবল ভক্তি-প্রেম-শ্রদ্ধায় তাহা হইতে স্বর্গের মন্দাকিনী
প্রবাহিত হইত “রত্ন” বলিতে তুলসীর নয়নে প্রেমধারা প্রবাহিত
হইত, এখন তিনি তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবী বলিয়া মনে করিতেন।

একদিন তুলসীদাস সমাধীস্থ হইয়া সমস্ত দিনের পর গভীর রজনী-যোগে চৈতন্ত প্রাপ্ত হইয়া বলিতেছেন—মা! অত্যন্ত ক্ষুধা পাই-
যাচ্ছে, শিপাসায় প্রাণ অস্থির। কাছে কেহ ছিল না, সিংহাসন
হইতে হস্ত প্রসারণ করিয়া মা জ্ঞানকী বলিলেন—বাবা! এই যে
সমস্ত প্রস্তুত—নাও, আহার কর! তুলসীদাস সন্তান-বৎসলা ভগবতী
সীতাদেবীর হস্ত প্রসারিত উপাদেয় দ্রব্য সামগ্রী আহার করিতে
লাগিলেন।

এমন সময় রত্নাবলী আসিয়া বলিল—প্রভু! এই যে আমি
তাড়াতাড়ি আসিতেছি, ভবানী এতক্ষণ কিছু খায় নাই—তাহাকে
আহার দিতে গিয়াছিলাম।

তুলসীদাস বলিলেন—দেবি! এই তোমার প্রদত্ত খাদ্য দ্রব্য
পাইয়াছি, আজ আহার করিয়া যেরূপ তৃপ্তিলাভ করিলাম—জীবনে
কখনও তেমন তৃপ্তিলাভ করি নাই। রত্নাবলী এই আমার শেষ
আহার।

ভবানী আহালাদি করিয়া আসিল। রত্নাবলীও কাছে বসিয়া
আছেন, মন্দির মধ্যে সিংহাসনে ইষ্ট দেবতার যুগল মূর্তি ঘেন
সাধকের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছেন।

কোন পীড়া নাই—শরীরের কোন মালিন্য নাই—মনের কোন
অবসাদ নাই—প্রাণের কোনপ্রকার চাঞ্চল্য নাই, সাধক বসিয়া
বসিয়া রত্নাবলীর কোলে ঢলিয়া পড়িলেন, সকলে মনে করিল—
প্রভু বুঝি পুনরায় সমাধীস্থ হইলেন—কিন্তু তাহা নহে, এই সমাধি
উত্থার জীবনের শেষ সমাধি—আর তাহা ভঙ্গ হইল না সাধক
ভাবের ঘোরে আত্মারামের সহিত আত্ম বিনিময় করিলেন—সংসার
লীলা উত্থার এইখানে শেষ হইল। বিশ্বজননী—ভগবতী সীতাদেবীর

প্রদত্ত আহারে তাঁহার ভবের ক্ধা মিটিয়া গিয়াছে, যাহার জন্য সাধনা ভজনা, তাহারও চরমলাভ হইয়াছে, তবে আর কেন ?

১৬৮০ সালের শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে প্রাতঃস্মরণীয় ভক্তবীর সাধক চূড়ামণী তুলসীদাস ৮৭ব্রাহ্মীতে অসি সঙ্কমে সেই ভাব-সমাধীতে ইহ-সংসার ত্যাগ করিলেন।

রামায়ণের অনুবাদক লিখিয়াছেন :—

সম্বৎসোরশেপি অসীগঙ্গকে তীরে।

শ্রাবণ শুক্লাসপ্তমী, তুলসী ত্যজৌ শরীর ॥

তুলসীদাসের দেহত্যাগ বার্তা প্রাতঃকালে যখন চারিদিকে প্রচারিত হইল, তখন সাধু ভক্ত সকল সেই মহাত্মার দেহ স্পর্শ করিয়া জীবন সার্থক করিবার জন্য দলে দলে তথায় সমবেত হইতে লাগিলেন।

সাধকের দেহত্যাগে কাশীধাম যেন শোক-চিহ্ন ধারণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। যে শুনিল—সেই কাঁদিয়া আকুল হইল—বিশেষতঃ অন্নপূর্ণার মন্দিরও আজ শোক-সমাচ্ছন্ন। প্রিয় ভক্তকে স্বর্গে পাঠাইয়া তাঁহারাও যেন মর্ত্য-বান্ধবমত শোক-চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিলেন। তারপর দলে দলে সংকীৰ্ত্তনের দল আসিয়া প্রভুর নাম গান করিতে লাগিল। যে শুনিল—সেই সাধক চূড়ামণী তুলসীর শেষ দর্শন জন্ম ছুটিয়া আসিল। দুঃখীরাম ও সরস্বতী আসিয়া রাস্তায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সতী রত্নাবলী আজ স্বামী কোলে করিয়া বসিয়া আছেন—তাঁহার নয়নে শোকের চুচিক মাত্র নাই। যাহার বিরহের ভয় নাই—তাঁহার শোক কিসের ? স্বামী যখনই চলিয়া গিয়াছেন—সতীর প্রাণ ত তখনই তাঁহার সহিত যাইতে উন্মত্ত হইয়া বহুক্ষণ হইল চলিয়া

গিরাছে—তবে সকলে সে বর অঙ্গে সৌন্দর্য্য জ্যোতি দেখিয়া মনে করিতেছে—সতী বুঝি জীবিতা আছেন কিন্তু তাহা কি হইতে পারে—অর্দ্ধেক ঘাইলে অর্দ্ধেক কি থাকিতে পারে ?

তুলসীদাসের মৃত্যু সংবাদে বৈষ্ণব সম্প্রদায় সাতিশয় মুহুমান হইল,—যাহারা প্রত্যহ তাঁহার শ্রীমুখে নানাপ্রকার মধুর উপদেশ শুনিয়া সাধন পথের কটক মোচন করিত,—তাহারা সকলে যেন পিতৃহারা—গুরুহারা, একজন মহা উপদেষ্টা হারা হইয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। একদিনের জন্ত রোগভোগ হইল না—একদিনের জন্ত শরীর কোনপ্রকার মলিনতা প্রাপ্ত হইল না, প্রকৃ এত শীঘ্র ধরাধাম হইতে চলিয়া গেলেন। মৃত্যু ষাঁহার হাত ধরা—ইচ্ছা করিলেই যিনি মৃত্যুর কবলস্থ হইতে পারেন—তাঁহার আবার সময় অসময় কি ? তিনি বুঝিলেন—পৃথিবীতে আর থাকিবার আবশ্যক নাই—তাই সাধক নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন। পতি-গত-প্রাণা সাধ্যা-সতী রত্নাবলীও স্বামীর অমুগমন করিলেন।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে স্বামী ও স্ত্রী একঅঙ্গে অভেদ আত্মা ; স্ত্রী পুরুষের শক্তি, আর পুরুষ স্ত্রীর শক্তি। একটী যাইলে আর একটী থাকে অসম্ভব। কাশীবাসী সকলে এই আদর্শ দম্পতীর মহা প্রয়ানে বিষম শোকাবুল হইয়া হায় হায় করিতে লাগিল। যে শুনিল—সেই বলিল—কলিতে এমন তেজস্বী বৈষ্ণব সাধক আর জন্মগ্রহণ করিবে না। দেহরক্ষার সময়ে সাধকের বয়স প্রায় শত বৎসর হইয়াছিল। তিনি কলির পূর্ণ পরমায়ু পাইয়াছিলেন।

একচত্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

উপসংহার

দুঃখীরাম ও স্বরস্বতীদেবী আসিয়াছেন—তঁাহারাই সাধক সম্পত্তির সংস্কারের ব্যবস্থা করিলেন। শ্রিয় শিষ্ট ভবানী মিত্র এতদিনে বাস্তবিক নিরাশ্রয় হইল। তিনি তুলসীদাসকে আশ্রয় করিয়া জগতের সমস্ত ভুলিয়াছিলেন,—বিবাহ করেন নাই—সমস্ত বিষয় আশ্রয়ে জলাঞ্জলি দিয়া কায়ার ছায়ার মত তাঁহার পাছে পাছে ঘুরিয়াছিলেন—পরম যোগী তুলসীদাসের কৃপায় ব্রহ্মহত্যা পাতক হইতে মুক্ত হইয়া অদ্যাবধি তিনি শ্রীগুরুর আশ্রয়ে কাল কাটাইতেছিলেন,—তুলসীদাস তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া অকপটে সমস্ত শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। ভবানী এখন যোগ মার্গে বেশ পাকা হইয়াছেন, গুরুর কৃপায় তিনিও অশেষ কৃমতাশালী হইয়াছেন, প্রাণের ডাকে তিনিও এখন দেবতার প্রসন্নতা লাভ করিয়া ধন্ত হইয়াছেন কিন্তু আরও কিছুদিন এই মহাপুরুষের সঙ্গে থাকিলে জীবন ধন্ত হইত, পৃথিবীর যাওয়া-আসা হইতে মুক্ত হইয়া নির্কীর্ণ পদ প্রাপ্ত হইতেন—কিন্তু হায়! তাহা হইল না। আশার পরিতৃপ্তি হইতে না হইতেই গুরুদেব দেহরক্ষা করিলেন। এইখানেই ভবানীর সকল আশার মূলচ্ছেদ হইল। তবে তিনি আশা দিয়া গিয়াছেন—ভবানী সাধনা কর, উদ্ধার হওয়া না হওয়া সকলেই নিজের হাত, ভাল করিয়া সাধনা করিতে পারিলে, দেবতার আশীর্বাদ তোমার উপর বর্ষিত হইবে, কিছুই অভাব হইবে না।

আত্মা ত অবিনশ্বর—তাঁহার ত মৃত্যু নাই, গুরুদেব পাঞ্চভৌতিক দেহই পরিত্যাগ করিয়াছেন—আমার অভাব হইলে স্তম্ভ শরীরে যে দেখা দিয়া তাহা পূর্ণ করিবেন না—তাহা কে বলিতে পারে ? ভবানী আশ্বস্ত হইয়া গুরু ও গুরু-পত্নীর অন্তেষ্টির আয়োজন করিলেন। যুগল মূর্ত্তি তাঁহার আশ্রমের সন্নিহিতে তুলসী ঘাটে চন্দন কাষ্ঠের চিতায় দাহ করা হইল। ঠিক সেই সময়ে আর একটি মল্ল্যাসীমূর্ত্তিকে গঙ্গাগর্ভে আনিয়া তীরস্থ করা হইল—তাঁহার তেজঃপুঞ্জ কলেবর দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে দেখিতে ছুটিল। দুঃখীরাম গিয়া দেখিলেন—আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—এ কে ! এ যে আমার দাদার পালক পিতা—পরম গুরু নৃসিংহদাস গোষামী—হায় হায় তিনি এতদিন কোথায় ছিলেন ? তখনও সাধকের প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া যায় নাই। দুঃখীরাম করঘোড়ে নিকটাবর্ত্তী হইলে তিনি তাহাকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন—দুঃখি ! যাহাকে প্রাণপাত করিয়া মাহুয করিয়াছিলাম, তাহাকে কি এ ভীষণ ভবের কূলে এক ফেলিয়া যাইতে পারি—তাই তাহার উন্নতির কথা শুনিয়া, যোগ-জীবনের অপূর্ণ কাহিনী দেখিতে সুদূর হিমালয় হইতে কাশীতে আসিয়াছিলাম—আজ তাহাদের দুইজনকে সঙ্গে করিয়া আমিও মহাযাত্রা করিলাম। সাধক আর কথা কহিলেন না, ভাবের ঘোরে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। দুঃখীরাম বলিলেন—গুরু বটে ; গুরু যে ঐহিক-পারত্রিক-চিন্তার কর্ত্তা, ভবার্ণব নাবিক—আজ নৃসিংহদাসের শেষ কথা গুলিতে তাহা বেশ বুঝিতে পারা গেল।

আজ কাশীর আশ্রমে যে কয়েকটি জীব ভীষণ অগ্নিমুখে চিত্তাভস্মে পরিণত হইল ; কাশীর গগনপবন যাহাদের শেষ নিশ্বাসে পরিভ্রীকৃত হইল—তেমনটী বোধ হয় আর কাহার দ্বারা হইবে না।

যে পাইল, সেই চিতাভস্ম অঙ্গে মাখিয়া পবিত্র হৃদয়ে বাড়ী ফিরিল। দুঃখীরাম ও ভবানী গুরুদেবের অন্তেষ্টি-ক্রিয়া সমাধা করিয়া শূন্যপ্রাণে বাড়ী ফিরিলেন। কয়েকদিন তাঁহাদের প্রাণ এত খারাপ হইয়াছিল—মন এত উদাস ভাবাপন্ন হইয়াছিল যে, সে ভাব সামলাইতে তাঁহাদের বহুদিন লাগিয়াছিল—আমাদের বোধ হয়—এ অভাবের পূরণ তাঁহারা এ জীবনে কখন করিতে পারেন নাই। গুরুর অভাব কি শিষ্য কখন পূরণ করিতে পারে? এ যে মানবজীবনের দুর্লভ ধন—পূরণ হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব নহে!

গুরু ও গুরু-পত্নী ত চলিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহাদের স্মরণার্থ ত কিছু করা চাই? ভবানী দরিদ্র সন্ন্যাসী, অর্থাৎ তাহার ত কিছু নাই কিন্তু দুঃখীরাম যে তাঁহাদের আশীর্বাদে আজ অতুল ধনের অধিশ্বর! তিনি গুরু ও গুরু-পত্নীর শ্রাদ্ধবাসরে বিশেষ ভাণ্ডার ব্যবস্থা করিলেন। দেশ বিদেশ হইতে সাধুসমাগম হইল। দুঃখীরাম আজ তাঁহারই আশ্রমে, তদীয় রামসীতার জাগ্রত মূর্তির সম্মুখে গুরু ও গুরু-পত্নীর পারত্রিক উন্নতির জন্য অজস্র সাধুভোজন, বহু সংখ্যক কাঙ্গালী বিদায় করিয়া শ্রাদ্ধকার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন।

ভবানী এখন তাঁহার গুরু ভাই, তিনিও এখন একজন প্রকৃত সাধু, দুঃখীরাম গুরুদেবের নিকট ভবানী সংক্রান্ত যে সকল অভিনব উপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছিলেন—তাহাতে ভবানী যে একজন মহাত্মক; রামনামে যে সে একজন প্রকৃত উদাসী—তাঁহা তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন। তাই গুরুদেবের স্মৃতি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তিনি তদীয় আশ্রম ও দেবালয়ের ভার ভবানীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। এজন্য অর্থের যত্ন বাহ্য আবশ্যক হইবে—তিনি অকাতরে তাহা সরবরাহ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

ভবানী এখন তাঁহার আপনার জন, তাঁহার রক্ষাবেক্ষণ
অভাব অভিযোগের ভার তিনি গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে নানা-
প্রকারে আশ্বাস প্রদান করিয়া সাধন-পথে বিশেষভাবে দৃঢ়তা
অবলম্বন করিতে সাহস প্রদান করিলেন, বলিলেন ভাই ! ভবানী
আজ হইতে তুমি আমার ভাই, আমি যতদিন জীবিত থাকিব—
তোমার কোন অভাব হইবে না। তুমি গুরুদেবের সময় যেরূপ
ভাবে প্রাণ খুলিয়া ভগবদারাধনা করিতে, এখনও সেইরূপ কর,—
কিছুরই অভাব হইবে না। যাহা আবশ্যক হইবে—আমাকে
জানাইলেই তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিব। দুঃখীরামের আশ্বাস
বাক্যে ভবানী গুরুদেবের ক্রিয়া কলাপ সকল বজায় রাখিয়া সেই
আশ্রমেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। তুলসীদাসের জীবন-কাহিনী
এইখানেই শেষ হইল—অতঃপর আমরা পরিশিষ্ট অধ্যায়ে তাঁহার
মনোমুগ্ধকর দৌহাবলী যথা সম্ভব প্রদান করিয়া এই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি
করিব।

পারিশিষ্ট

তুলসীদাস সাধকের অগ্রগণ্য ত ছিলেনই—কবিরও অগ্রগণ্য ছিলেন। পূর্বে বলিয়াছি—কবিশ্রেষ্ঠ বাম্বিকী মুনি নিজের রামায়ণের প্রচারে সন্তুষ্ট না হইয়া পুনরায় 'তুলসীদাস' রূপে জন্মগ্রহণ করত সে সাধ পূর্ণ করিয়াছিলেন। তুলসীদাস কৃত রামায়ণ ভারতের ২৩ লোক পাঠ করেন—অন্য কোন পুস্তকের পাঠক তত নাই; ভক্তকবি তুলসীদাসই এক সময় বলিয়াছিলেন—

সাধক সিদ্ধ বিমুক্ত উদাসী।

কবি কোবিদ বিমুক্ত সন্ন্যাসী।

যোগী সুর অরু তাপস জ্ঞানী।

ধরম নিরত পণ্ডিত বিজ্ঞানী ॥

বাম্বিকী রামায়ণ অপেক্ষা অনেক আধ্যাত্মিক বিষয় ভক্তকবি তুলসীদাস তাঁহার রামায়ণে গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন। বাম্বিকী রামায়ণ কেবল কয়েকজন পণ্ডিতের ঘরে আবদ্ধ থাকে, সাধারণে তাহা বুঝিতে পারেনা—এইজন্য কবি তুলসীদাস রূপে পুনর্জন্ম লইয়া তাহা এত সরল ও সরস করিয়া গিয়াছেন যে অতি সামান্ত শিক্ষিত ব্যক্তিও সেই রস মাধুর্যময় সুললিত রামায়ণ পড়িয়া প্রাণে অপার শান্তি, অপরিমিত আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন।

এই রামায়ণ ব্যতীত ভক্তকবি সাধকবর তুলসীদাস আরও কয়েক শ্লোক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন—তখন মুন্সী যাহার বিশেষ প্রচলন না থাকায়—সুত্র ছয় খানি গ্রন্থের নিদর্শন পাওয়া না যাইলেও, তাঁহার

লিখিত কবিত্ব রামায়ণ, বিনয় পত্রিকা, গীতাবলী, পার্বতী মঙ্গল, জ্ঞানকী মঙ্গল, চৌপাই রামায়ণ, কুণ্ডলী রামায়ণ, কড়কা রামায়ণ, বৈরাগ্য সন্ধিপনী ব্যতীতও দৌহাবলী পশ্চিম ভারতের হিন্দুস্থানীদের গৃহে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তবে তাহার মধ্যে সাধক-কবির দৌহাবলীই সর্বশ্রেষ্ঠ। বাদ্বালার মহাকবি চাণক্যের শ্লোক যেমন প্রসিদ্ধ, নীতি-পূর্ণ, এবং অত্যাবশ্যকীয় ; সাধকপ্রবর রামপ্রসাদের গান যেমন প্রাণারাম এবং ভক্তিভাব পূর্ণ, বলিয়া বাদ্বালীর ঘরে ঘরে প্রচলিত—ইহার একটি না একটি জানে না, এমন লোক যেমন বাদ্বালায় নাই, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তুলসীদাসের দৌহাও তেমনি জানেনা—এমন লোক অতি বিরল, শুধু উত্তর পশ্চিমাঞ্চল কেন—তুলসীদাসের রামায়ণ ও দৌহাবলী এতদঞ্চলেও বিশেষ পরিচিত—তাহার ধর্মময় উপদেশপূর্ণ দৌহাবলী, এত মধুর এবং সুনীতি পূর্ণ এবং এমন সহজ ও সরল ভাষা লিখিত ; যে ধর্মপথে অগ্রসর হইতে হইলে, তাহা না জানিলে প্রাণের পরিতৃপ্তি হয় না—বুঝি সাধনপথে অগ্রসরও হওয়া যায় না, তাই আমরা সেই সকল দুঃখাপ্য দৌহাবলী ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক হইতে যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়া তাহার সরল বাদ্বালা বাখ্যা প্রদান করিতেছি—তুলসীদাস এই সকল নীতিপূর্ণ উপদেশ কথা ছলে সকল সময়ে তাহার শিষ্যগণকে বলিতেন। পাঠকগণ তাহা পাঠ করিয়া ধর্মের সরল পন্থা অহুসরণ করুন।

কাঁহাকো ধন ধাম হেয়, কাঁহাকো পরিবার।

তুলসী আয়সে দীনকো, সীতারাম আধার ॥ ১ ॥

অগতে ধন-জন, গাড়ী-বাড়ী, পুত্র-পরিবার প্রভৃতি বিষয়ের সুখভোগেই সকলে আনন্দ উপভোগ করেন ; আত্মীয়-স্বজনে পরিবেষ্টিত হইয়া বিষয়-সুখ উপভোগ করাই অগংবাসী সার সর্ব্ব

জ্ঞান করেন কিন্তু তুলসীদাসের গ্রাম সাধক ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের
পাদপদ্মই প্রধান অবলম্বন বলিয়া মনে করেন।

চম্পায় হেয় তিন গুণ, রঙ, রূপ আউর বাস।

এক অবগুণ হেয় যো, ভ্রমর না যাওয়ে পাশ ॥ ২ ॥

চাঁপা ফুলের তিন ভাল গুণের মধ্যে রঙ, রূপ আর সুবাস
কিন্তু উহার আশ্বাদ এত কটু যে ভ্রমর ভুলেও ঐ ফুলে বসে না।
ইহার তাৎপর্য্য এই যে—যতই গুণ থাক না কেন, একটা মহা-
দোষেই সে সমস্ত গুণ নষ্ট করে।

তুলসী উই। যাইয়ে, যাঁহা আদর না করে কোই।

মান্ ঘাটে মন মরে, রামকো স্মরণ হোই ॥ ৩ ॥

মান বড় উপায়ে জিনিষ—লোকে প্রাণাপেক্ষা মানকে বড় বলে
কিন্তু সাধু সজ্জনেরা মান চাহেন না। তাই তুলসীদাস বলিতেছেন—
যেখানে কেউ তোমাকে মানিবে না, সর্বদা সেইস্থানে যাইবে।
যেখানে আদর পাইবে—সেখানে যাইলে যদি মান না পাও, তাহা হইলে
তোমার প্রাণ দুঃখসাগরে ডুবিয়া পড়িবে, মন ছোট হইয়া যাইবে—তাহা
হইলে ভগবানের নাম তোমার স্মরণ পথে উদয় হইবে না।

বিজু বন্ মিলে না লকড়ি, সায়ের মিলে না নীর।

পড়ে উপবাস কুবের ঘর, যও বিপক্ষ রঘুবীর ॥ ৪ ॥

বিজ্ঞান বনে গমন করিলেও রন্ধনকাঠ পাওয়া যায় না, অগাধ
জলধীতেও জল পাওয়া যায় না, কুবের সদৃশ বড়লোকের বাড়ী
গেলেও উপবাস করে মর্ত্তে হয়—যদি রঘুবীর বাম হন, অর্থাৎ
ভগবান প্রতিকূল হলে কোথাও সুখ পাওয়া যায় না।

গঙ্গা যমুনা সরস্বতী, সাত সমুদ্রের ভরপুর।

তুলসী চাত্‌ককে মতে, সোয়াং বিনে সবধূর ॥ ৫ ॥

জগতে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী প্রভৃতি নদী এবং সপ্ত সমুদ্র
বিদ্যমান—অগাধ জলে তাহা পরিপূর্ণ কিন্তু চাতক যেমন প্রাণান্ত হলেও
তাহা পান না করিয়া জনদ-জলের আশা করিয়া বসিয়া থাকে।
সেইরূপ ভক্ত-চাতক তুলসী ভগবানের প্রেম-জল ভিন্ন অস্ত্র জলের
আকাঙ্ক্ষা করে না। অর্থাৎ জগতে সে ভগবানের প্রেমবারি পান
করিতে পারিলেই ধন্ত হয়—অস্ত্র সলিলের আশা করে না।

কলহ ন জানব ছোট করি, কঠিন পরম পরিণাম।

লাগত অনল অতি নীচ ঘর, জারত ধনিক ধন ধাম ॥ ৬ ॥

সামান্য লোকের সহিত ঝগড়াকেও সামান্য বলিয়া মনে করিবে
না, কালে সেই কলহই ভীষণ হইতে পারে—যেমন সামান্য কুঁড়ে
ঘরে আগুন লাগিলে সে ধনীর অট্টালিকাও ধ্বংস করিতে পারে।
অর্থাৎ ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে কখন ক্ষুদ্র মনে করিও না, কালে সেও
বলবান হইয়া প্রবল হইতে পারে—ইহাই তাৎপৰ্য।

ধন-আরু ঘোবনকো, গরব কবহু করিয়ে নাহি।

দেখ্ তহি মিট্ যত হেয়, যব বাঁদরকে ছাহি ॥ ৭ ॥

ধন-ঘোবন নিশার স্বপনের মত ক্ষণস্থায়ী, কদাচ ইহার গর্ভ
করা উচিত নয়। মেঘের ছায়! যেমন বেনীকণ থাকে না—দেখিতে
দেখিতে বিনাশপ্রাপ্ত হয়, ধন-ঘোবনও তদ্রূপ।

কই কুদ্‌কে সাগর উতারা, কোই কিয়া মিৎ।

কোহি ওখ্‌ ডা গিরি দরখৎ, কোহি শিখায়া নীৎ ॥

ক্যা কহেজা সীতানাথকো, মেয়নে কিয়া চোরি।

সোহি কুল্‌ উত্তব মেরা, বেদিয়া ধিঁচে ডোরি ॥ ৮ ॥

কোন সময়ে একটা বেদিয়া একটা বাঁদরের গলায় দড়ি বাঁধিয়া
ধারে ধারে খেলা করিয়া পরস্পর বোজগার করিতেছিল বাঁদরটা

স্তবন অতিশয় দুঃখের সহিত কহিতেছে—হায়রে ! একলম্বে এই আমারই বংশের কেহ লক্ষ প্রদান করিয়া সাগর পার হইয়াছে ; কেহ বা ভগবান রামচন্দ্রের সহিত মিত্রতা করিয়া জন্ম সার্থক করেছে, কেহ বা বাহুবলে বড় বড় পাহাড় উৎপাটন করেছে, আবার কেহ বা চির নীতিজ্ঞ ভগবানকে নীতি-শিক্ষাও প্রদান করিয়া আপনাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছে। কিন্তু আমি সেই মহৎ বংশে জন্মগ্রহণ করে, সীতানাথকে বলি—হে রামচন্দ্র ! আমি এমন কি কুকর্ম করেছি যে অতি হীনজাতি বেদিয়া আমার গলায় দড়ি দিয়ে টানাটানি কর্ছে ? তাৎপর্য্য এই যে, একদিন উন্নতির উচ্চ সোপানে উঠিলেও অদৃষ্ট ক্রমে অধঃপতনের সময়—সামান্য ব্যক্তিরও লাথি সহ্য করিতে হয়।

চৌদহ চার আঠার হো, পড়ে শুনে ক্যা হোয়।

তুলসী আপন রামকো, যব্ লগ্‌লমে ন কোয় ॥ ৯ ॥

চতুর্দশ শাস্ত্র, চারি বেদ, অষ্টাদশ পুরাণ প্রভৃতি অধ্যয়ন করে কি ফল হইবে, যদি ভগবানের দর্শনলাভ করিতে না পারিল। তুলসীদাস বলিতেছেন—শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া জ্ঞানলাভ করার উদ্দেশ্যে আত্মারামের দর্শন ; যদি তাহা না হইল—তবে সমস্তই নিরর্থক। অর্থাৎ তুমি শাস্ত্র পড় আর নাই পড়, যদি মূর্থ হইয়াও ভগবানের দর্শনলাভ হয়, তাহা হইলেও জন্ম সার্থক হইবে।

যো পরবিস্ত হরে সদা, সো কহ দান কিয়া ন কিয়া।

যো পরদার হরে সদা, সো বহু ভৌর্য গয়া ন গয়া ॥

যো পর আশ করে সদা, নো বহু দিন জিয়া ন জিয়া।

যো মুহ্মে পর চুকলি ওগারত, সে মুহ্মে হরিনাম

লিয়া না লিয়া ॥ ১০ ॥

যে পরের চুরি করে দান করে—তাহার দান করায়, না করায়

সমান ; যে সর্বদা পরদার রত, তাহার পক্ষে তীর্থ ভ্রমণ করা আর না করা সমান। যে ব্যক্তি পর প্রত্যাশী হয়ে জীবন ধারণ করে, তাহার বেঁচে থাকা আর মরা সমান কথা। আর যে সর্বদা পর নিন্দা করে—তাহার মুখে প্রভুর নাম সংকীৰ্ত্তন করা আর না করা একই কথা।

মন মগ্নন হরদম্ করো, বয়ঠো সভা সং সং।

যো সং চাহে সৌহ করো, সংগুরু হেয় পরশং ॥ ১১ ॥

সর্বদা শাস্ত্র আলোচনার দ্বারা চিন্তের ময়লা-মাটি ধোত কর, সাধুজনের সহিত সভা করিয়া সংসঙ্গে সংকথায় কালঘাপন কর, তাহার। যে পথে যাইতে উপদেশ দেন—সেই পন্থা অনুসরণ কর, তাহা হইলেই তোমার জীবন ধন্য হইবে—কারণ সাধু পুরুষই গুরুপদ বাচ্য।

জানী মারে জান্‌সো, ব্যাধ মারে তীর।

সদ্‌গুরু মারে শব্দসে, শালে সকল শরীর ॥ ১২ ॥

ব্যাধের। যেমন ধনুকে শর সন্ধান করে পাখী মারে, জানীর। তরুণ জ্ঞান-শলাকা দ্বারা মনের মালিন্য দূর করিয়া থাকেন; সদ্‌গুরু উপদেশ পূর্ণ বচনাবলীর দ্বারা অঙ্গ সমূহ বিদ্ধ করিয়া থাকেন, তাহাতে ইঞ্জিয় সমূহ পরাভূত হইয়া সংবশালী হয়।

সব্‌মে রসিয়ে সব্‌মে বসিয়ে, সব্‌কা লিজিয়ে নাম্।

হাঁজি হাঁজি কর্তে রহিয়ে, বসিয়ে আপন ঠাম ॥ ১৩ ॥

কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও ভক্তিকাণ্ড ইত্যাদি যে কোন বিষয়ের কথাই হউক না সমস্ত কথাতেই রস লাভ করিবে। যে কোন সম্প্রদায়ের লোক হউক, তাহার সহিত আনন্দে মত্ত হইবে—কাহাকেও পৃথক মনে করিবে না, ঈশ্বর উপাসনার ক্রম সমস্ত আলাহিদা হইলেও

মূলে কিছু সমস্ত এক, ভাবিয়া প্রীতিলাভ করিবে—কখন আত্মবিস্মৃত হইবে না।

অলি পতঙ্গ যুগ যীন গজ্জ, ইয়াকো একই আঁচ।

তুলসী ওয়াকো ক্যা গৎ, যাকো পিছো পাঁচ ॥ ১৪ ॥

ভ্রমর, পতঙ্গ, হরিণ, মৎস্ত, হস্তী ইহারা ক্রমাগত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপ রস গন্ধ স্পর্শ, শব্দ এই পাঁচ বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া যুত্থামুখে পতিত হয়। তুলসি! তাহাদের সঙ্গে এই সকল অনবরত থাকে—তাহাদের গতি কিরূপ হইবে বল দেখি?

দয়া ধরম কি মূল হৈয়, নরক মূল অভিমান।

তুলসী মৎ ছোড়িয়ে দয়া, যও কণ্ঠাগত জান্ ॥ ১৫ ॥

দয়াই সকল ধর্মের মূল, অভিমানই নরক গমনের একমাত্র কারণস্বরূপ, অতএব হে তুলসীদাস! তোমার প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও দয়া বিসর্জন দিও না।

শাকট্, শূকট্, কুকরা তিন্কে মত এক।

কোটি ভাঁতি সমঝাও, তৌ ন ছোড়ে টেক্ ॥ ১৬ ॥

শূকর, কুকুর ও পায়ু এই তিনের মত একই রকম। উহা-দিগকে কোটি কোটি উপদেশপূর্ণ শ্রিয়বাক্য প্রয়োগ কর, তথাপি তাহারা কিছুতেই নিজের গর্ভ ছাড়ে না।

রাজা করে রাজ্য বশ, যোদ্ধা করে রণ জই।

আপ্না মনুকো বশ করে ঘো. সবকো সেরা ওই ॥ ১৭ ॥

রাজা রাজ্য শাসন করিয়া সকলের শ্রেষ্ঠ হয়—যোদ্ধা যুদ্ধ জয় করে, সকলের কাছে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করে কিন্তু যে দুর্দান্ত মনকে আপনার শাসনাধীনে রাখিতে পারে—তাহার তুল্য বীরপুরুষ আর নাই, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ গৌরব লাভের উপযুক্ত।

শাকট সঙ্গ ন কিজিয়ে, দুঃখি যাইয়ে ভাগ ।

বাসু করো ন পাণিয়ে, তঁও কতু ন লাগে দাগ ॥ ১৮ ॥

পাপী ব্যক্তির সঙ্গ করিবে না, দূরে পলায়ন করিবে—কখনও বিশ্বাসও করিবে না। ঘটনাক্রমে যদি তাহার সহিত বাসই করিতে হয়—তাহা হইলে সাবধান, তাহাকে স্পর্শ করিও না—তাহা হইলে কলঙ্কিত হইতে হইবে।

ওছে নরকি পেট্টমে, রয়ে ন কোটী বাৎ ।

আধসের কি পাত্রে, কৈসে সের সমাৎ ॥ ১৯ ॥

আধসের ধরিবার পাত্রে যেমন একসের জিনিষ রাখা যায় না, সেরূপ ভাবভার পূর্ণ বাক্য সামান্য লোকের উদরে কখনই ধরিতে পারে না। ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তি কখনও কি বিজ্ঞ জ্ঞানীর বাক্য বুঝিতে পারে?

বৃন্দাবন ও বৈকুণ্ঠকো, তলে তুলসীদাস ।

ভারী যে সো ভূতল বসো, হাল্কা চড়হো আকাশ ॥ ২০ ॥

বৃন্দাবন ও বৈকুণ্ঠকে ওজন করিয়া তুলসীদাস দেখিয়াছেন—যেটা ভারি সেই নীচে পড়ে আছে, যেটা হাল্কা সেইটা উপরে উঠিয়াছে। ইহার তাৎপৰ্য্য যে, জগতে প্রেমভক্তিই সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ—মুক্তি ইহার কাছে লাগে না।

তুলসী হয়ে সংসারমে, কাহাঁকো ভক্তি ভেট ।

তিন বাৎসে লাটপাট্ট হেয়, দামড়ি চামড়ি পেট ॥ ২১ ॥

জগতে শিশ্নোদর ও ধন এই তিনটি লইয়া সকলে দিন ঘামিনী চিন্তা করিয়া অস্থির হইতেছে, অতএব হে তুলসি! তুমি এই সংসারে থাকিয়া আর কতদিনে ভক্তি-ধনে ধনবান হইবে?

বাণে ভক্তি না হোতা হেয়, ছোড় দেহ চতুরারি ।

কাকাসে হংস না ছোড়া হয়, ছুঙ্ক্যা মিলায়ি ॥ ২২ ॥

কাককে যেমন বহবার ছুফ্ফ দ্বারা স্নান করাইলেও হংসের মত
সাদা করিতে পারা যায় না—সেইরূপ কেবল বাক্যের দ্বারা ভক্তি
পাওয়া যায় না, চকুরালি ছাড়িতে হয়।

তুলসী ভাই! না যাইয়ে, যাহা নাহি বরণ বিবেক।

রাং রূপা কয় ভূয়া, শ্বেবৎ অশ্বেৎ সব এক ॥ ২৩ ॥

হে তুলসীদাস, সেইরূপ স্থানে যাইও না—যেখানে গুণের বিচার
নাই, যেখানে রাং-রূপা, নিরেট-কাঁপা, সাদা-কাল সব এক, সেখানে
যাইলে পাত্রোচিত সম্মান লাভ করিতে পারিবে না।

বড়া বড়া সব কই কহা, বড়মে তাল আউর খজুর।

বয়ট্‌নেকো ছায়া নেই মিলতা, কল তো বড়ি দুয় ॥ ২৪ ॥

দেশের অনেকে বড়লোক বলে অহঙ্কার করে কিন্তু তাহারা বড়
কিসে? তাহারা যদি বড় হয়—তাহা হইলে তাল আর খেজুর
গাছও ত খুব বড়—যাহার কাছে বসিবার ছায়া পাওয়া যায় না—কল
পাওয়া ত দূরের কথা! তাহা কত উচ্চে তার স্থিরতা নাই। ইহার
তাৎপর্য্য এই যে টাকা থাকলেই বড়লোক হয় না—দাতা না হলে।

বিন বিন মিলে লকড়ি, বিন সায়ের মিলে নীর।

মিলে আহার দরিদ্র ঘর, যণ্ড সপক্ষ রঘুবীর ॥ ২৫ ॥

প্রভু রামচন্দ্র অমুকুল থাকিলে দরিদ্রের ঘরেও উৎকৃষ্ট খাদ্য
পাওয়া যায়; মরুভূমে সলিল এবং বৃক্ষাদিশূন্য স্থলেও যথেষ্ট
কাষ্ঠ পাওয়া যায়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদি জগদীশ্বর প্রীত
থাকেন, তাহা হইলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অনাটন হয় না, বরং
অভাবেরই অভাব হয়।

রাম রাম সব কোই কহে, টক ঠাকুর কা চোর।

বিনা প্রেমসে রীকৎ নহি, তুলসী নন্দকিশোর ॥ ২৬ ॥

হে তুলসি! কি শাস্ত কি দুর্দাস্ত সকলেরই মুখে রাম নাম শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার সেরূপ নাম লইয়া তাদৃশ কোন ফল প্রাপ্ত হয় না। কেন না, প্রেমভক্তি ব্যতীত অন্য কিছুতেই সেই নন্দ কিশোর শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারা যায় না।

হস্তী চলে বাজারমে কুস্তা ভূখে হাজার।

সাধুনকে দুর্ভাব নহি, ঐও নিন্দে সংসার ॥ ২৭ ॥

বাজার অর্থাৎ নগরের মধ্যে হস্তী গমন করিলে যেরূপ হাজার হাজার কুকুর তাহার পাছু পাছু শব্দ করিতে করিতে ধাবিত হয়। কিন্তু হস্তী যেমন তাহাতে ভ্রম্পেপ করে না, বরং অবিচলিত মনে নিঃশঙ্ক ভাবে, সাহসবদ্ধ হৃদয়ে গমন করে, সেইরূপ সাধু ব্যক্তিকে সংসারের লোক একত্র হইয়া নিন্দা করিলেও তাহাতে তাঁহার মনের কিছুমাত্র বিকার জন্মে না বরং তিনি পূর্ববৎ একভাবেই অবিচলিত চিত্তে অবস্থান করেন।

সঙ্গত করিয়ে সাধুকি, অস্ত কয়ে নিবাহ।

শাকট সঙ্গ ন কিজিয়ে, অস্ত হোয় বিনাহ ॥ ২৮ ॥

নিরস্তর সাধুসঙ্গ করা উচিত, কারণ, সাধুসঙ্গ দ্বারা মন প্রাণ সংযমিত হইয়া স্থিরভাব ধারণ করে, কোনরূপে কোনদিকেই নমিত হইয়া পড়ে না। পাষণ্ড সঙ্গ সর্বদা ত্যাগ করিবে, কারণ তাহাতে চিত্ত মন ক্রমশঃ প্রবল তরঙ্গে আকুল হইয়া শেষে পরম সুখেরও বিনাশ সাধন করিয়া থাকে।

বুঁদ আঘাত সহৈ গির জায় সে।

খলুকে বচন সন্ত সহৈ ত্যায় সে ॥ ২৯ ॥

প্রবল বেগবতী নদীর স্রোত পর্বতে ষতই কেন আঘাত করুক না, গিরি অনায়াসে তাহা সহ করে, কখনই তাহার অঙ্গ

বিকৃতি পরিলক্ষিত হয় না, খলোয়া যতই কেন বিযাক্ত বাধ্যবাণ প্রয়োগ করুক না, সাধু ব্যক্তি সকলই সহ্য করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার চিত্ত বিকার জন্মিবার ভয় থাকে না।

সস্ত বড়ে পরমার্থী, শীতল্ উনকি অং ।

তপন্ বুঝাও ত আউরুকে, ধরাও ত আপ্না রং ॥ ৩০ ॥

শান্তশীল সাধু ব্যক্তিই পরমার্থ তত্ত্ববেত্তা হইয়া থাকেন। তাহার দেহকাস্তি স্নানর স্নানিষ্ঠ, তাহাতে তাপের লেশমাত্র বিদ্যমান থাকেনা। তিনি জপ-তপ প্রভৃতির ফল অপরকে বুঝাইয়া তাহাকে নিজের মত স্নানীল করেন ও নিজের গায় কাস্তিপুষ্ট করিতে চেষ্টা করেন।

গুরু লোভী শিশ্ লালচি, দোনো খেলে যাও ।

দেনো বপুরা ডুব মরে, চড়হে পথিরুকে নাও ॥ ৩১ ॥

যে গুরু অর্থলুরু এবং যে শিষ্য সংসার-সুখে একান্ত অভিলাষী হইয়া দুইজন যদি একত্র পরামর্শ করত ভবসাগরাভ্যন্তরে পাষণবৎ দৃঢ়তর জ্ঞাননৌকাতে আরোহণ পূর্বক পার হইতে যাচ্ছেন, তাহা হইলে দুইজনে ডুবিয়া মরিয়া যাইবেন, উহাদের মধ্যে কেহই ভবসাগরের পরপারে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না।

সরেশ্ নিরেশ্ নব্ হোতে হৈয়, সময় পায় সব কোই ।

দিন্মে হোতো প্রকাশ্বরি, চন্দ্র মন্দ ছাতি হোই ॥ ৩২ ॥

দিবাভাগে দিবাকর যেরূপ অতীব তেজঃরূপে প্রকাশিত হন। আর চন্দ্রমা নিস্ত্রভ হইয়া পড়েন, সেইরূপ নিজ নিজ সময় অহুসারে মহেশ্বেরা যাহার দুঃসময়, তাহাকে হীন এবং যাহার সুসময় তাহাকে মহৎ বলিয়া জ্ঞান করেন।

পণ্ডিত ও মশালচি, ইনুকি গত কথা না যায় ।

পরকে দিয়া দেখায়কে, আপ আধারে যায় ॥ ৩৩ ॥

তত্ত্বজ্ঞান হীন ধর্মার্থী ও দীপধারণক ব্যক্তি এই দুইজনের হৃদশার কথা বলা যায় না, ইহারা উভয়ে কেবলমাত্র পরের জন্তই শাস্ত্রীয় শ্লোক ও দীপালোক দ্বারা বিষয়ী ব্যক্তিগণকে প্রদর্শন করিয়া আপনারা অন্ধকারে ঘুরিয়া মরে।

রাগী বাগী পাখী, নাবী আউর নাব্।

এ পাঁচকো গুরু হেয় নৈ, উপজ্ঞে অঙ্গ স্বভাব ॥ ৩৪ ॥

সংগীত শাস্ত্রের রাগতাল ও লয় বিষয়ের অভিজ্ঞতা, কবিত্ব, স্বর্ণ রত্নাদির পরীক্ষকতা, নাবিকতা ও তাত্ত্বিকতা এই পাঁচটি বিষয়ের শিক্ষা দেয়, এমন গুরু প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। যাহার অদৃষ্টে থাকে, সেই এই পাঁচটিতে আপনাপনি সিদ্ধ হয়।

এমন রসনা সাক্ষ্য করো, ধরো গরিবী বেশ।

এ শীতল বোলি লই চলো, সবহি তোমরা দেশ ॥ ৩৫ ॥

হে মন! প্রথমে রসনাকে সংশোধন কর, পরে দীনবেশ ধারণ করত স্নিগ্ধ বাক্য সম্বল পূর্বক যথেষ্ট স্থানে গমন কর। এইরূপ করিলে বিদেশও স্বদেশবৎ জ্ঞান হইয়া থাকে অর্থাৎ তৎকালে আর তোমার আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের অভাব বোধ করিতে হইবে না।

তুলসী ইয়ে সংসারমে, পাঁছোরতন্ হেয় সার।

সাধু সঙ্গ হরি কথা, দয়া দীন উপকার ॥ ৩৬ ॥

হে তুলসিদাস! সাধুসঙ্গ, হরিকথা শ্রবণ বা কীর্ত্তন, দয়া প্রদর্শন, দীন ভাবধারণ ও পরোপকার, জগতে এই পাঁচটিই সারসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

নধ বিন্ কাটা দেখে, শীশ ভারী জটা দেখে,

যোগী কান ফাটা দেখে, ছার লায়ে তনুমে।

মৌনী আনুবোল দেখে, সেওড়া জির ছোল দেখে,

কর্ত্তো কলোল দেখে, বলধণ্ডী খন্মে ॥

বীর দেখে শূর দেখে, গুনী আউর দূড় দেখে,

মায়াকে পুর দেখে, ভুল রহে ধনুমে ।

আদি অন্ত স্থখী দেখে, জনমহিকে দুখী দেখে,

পরুষে ন দেখে, জিন্কে লোভ নহি মনুমে ॥ ৩৭ ॥

জগতে নিরন্তর ভ্রমাবৃত দেহ, নতনথ, দীর্ঘ জটা মণ্ডিত,
বিদারিত কর্ণ যোগী দর্শন করিয়াছি, কেশ-রহিত মৌন ব্রতধারী
সন্ন্যাসীও দেখিয়াছি, বনধণ্ডী বনে বহু কৌশলবেত্তা ক্রীড়কও
অবলোকন করিয়াছি, অনেকানেক শূর, বীর, বিদ্বান্ ও মূর্খ দর্শন
করিয়াছি, ধনাঙ্ক হইয়া কামবশে ভবসংসারে ঘুরিতেছে, একুণ মানবও
দেখিয়াছি ; চির স্থখী ও চির দুঃখী ব্যক্তিও নেত্রপথে পড়িয়াছে ;
অধিক কি বলিব—জগৎ সংসারে সকল অবস্থার লোকই নেত্রপথে
পড়িয়াছে ; কিন্তু লোভহীন ব্যক্তি কখনও দেখি নাই ।

বেহা বেহা সবকোই কহে, মেরা মনুমে এহি ভায় ।

চড় খাটোলি ধো ধো লগড়া, জেহেলু পরু লে যায় ॥ ৩৮ ॥

সকল ব্যক্তিই আনন্দে “বিবাহ বিবাহ” এই কথা মুখে উচ্চ-
রণ করে, কিন্তু যৎকালে বরকে চৌদোলায় চড়াইয়া বাদ্য সহকারে
লইয়া যায়, তখন আমার মনে এই ভাব উদয় হয় যে, সে, যেন, ঐ
ব্যক্তিকে আজন্ম বন্দী রাখিবার জন্তই প্রথম কারাগারে লইয়া
যাইতেছে ।

বোল্কেমোল্ নাহি, যো কহেনে জানে বোল্ ।

হৃদয় তরাজু তৌল্কে, তহ বোল্কে খোল্ ॥ ৩৯ ॥

যে কথা কহিতে জানে—তাহার বাক্য অমূল্য রত্ন স্বরূপ, স্তব্ধতাং
প্রথমে পরস্পরের হৃদয় তরাজু অর্থাৎ পরিমাণ যজ্ঞে পরিমাণ করিয়া
তৎপরে বাক্য প্রয়োগ করিবে। ইহার তাৎপর্য এই যে, পরের

মনোগত ভাব না জানিয়া যদি কথা বলা যায়, তবে সে কথায়
কোন ফল হয় না।

তোম্ জায়্‌সা রাম পর, তোম্‌সে ত্যায়্‌সা রাম্।

ডাহিনে যাওতো ডাহিনে যায়, বামে যাওতো বাম্ ॥ ৪০ ॥

তুমি যেইভাবে রামকে ভজনা করিবে, রামও তোমায় সেই
ভাবে ভজনা করিবেন, অর্থাৎ যেরূপ ভক্তিতে তুমি তাঁহাকে ভজিবে,
ভগবান সেই অনুসারে তোমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবেন। যদি
জ্ঞান চাও, ত তিনি তোমাকে জ্ঞান দিবেন, আর যদি বিষয় চাও, ত
বিষয় পাইবে।

যো যাকো শরণ্‌ লিয়ে, সোরাখে তাকো লাজ্‌।

উলট্‌ জলে মছ্‌লি চলে, বহি যায়্‌ গজরাজ্‌ ॥ ৪১ ॥

একচিন্তে যে যাহার শরণাগত হয়, সেই আশ্রয়দাতা সেই
শরণাগতের সেইরূপে লজ্জা নিবারণ করেন। তাহার দৃষ্টান্ত এই যে, জল
জীবন মৎশেরা অবহেলে উজানজলে যাতায়াত করে, কিন্তু মহাবল
হস্তী তাহা পারে না, স্রোতে পড়িলে ভাসিয়া যায়।

একরাহমে হোতে হৈয়্‌, তুলসী মৃত্‌ আউর পুত্‌।

বাম্‌ ভজ্তো পুত্‌ই, নহিতো মৃত্‌শা মৃত্‌ ॥ ৪২ ॥

হে তুলসি! মৃত্র আর পুত্র এক পথ হইতেই বাহির হয়। কিন্তু
যে পুত্র সংসারে আসিয়া ভগবান্‌ শ্রীরামের আরাধনা করে,
তাহাকেই প্রকৃত সংপুত্র বলা যায়; নহবা! অধাৰ্মিক মৃত পুত্র
মৃত্রের ও মৃত্র অর্থাৎ তাহাকে মৃত্র অপেক্ষাও হীন বলিয়া
জানিবে।

তুলসী পিন্‌নে হরি মেলেতো, মেয়্‌ পেঁদে কুঁদা আউর ঝাড়্‌।

পাথর পূজনে হরিমেলেতো, মেয়্‌ পূজে পাহাড়্‌ ॥ ৪৩ ॥

যদি কতকগুলি তুলসীর মালা কণ্ঠে ধরিলে পরাংপর জগদীশ্বর হরিকে লাভ করা যায়, তাহা হইলে আমি কণ্ঠে তুলসীর একটা কুঁদা ধারণ করি কিম্বা তুলসী গাছের ঝাড় কণ্ঠে ঝুলাইয়া রাখি। যদি কেবল পাষাণের অর্চনা করিলেই মহেশ্বরকে পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমি পর্বতের অর্চনা করিতেও প্রস্তুত আছি।

দুঃখ পাতয়ে তো হরিভঞ্জে, সুখে না ভঞ্জে কোই।

সুখ্মে যো হরিভঞ্জে, দুখ্ কাঁহাসে হোই ॥ ৪৪ ॥

লোকের দুঃখে মগ্ন হইলেই ঈশ্বরের নাম জপ করে ও তাঁহাকে স্মরণ করে, সাধারণতঃ এইরূপই দেখা যায় কিন্তু সুখের সময় কেহই জগদীশ্বরকে স্মরণ করে না। পরন্তু সুখের সময়ে ঈশ্বরের আরাধনা করিলে যে কাহাকেও দুঃখ পাইতে হয়না, ইহা কাহারও মনে উদ্ভিত হয়?

সুখ্মে বাজ্ পড় দুখ্কে বলিহারি যাই।

অ্যায় সে দুখ্ আওয়ে যো, ঘড়ী ঘড়ী হরিনাম সোঁরাই ॥ ৪৫ ॥

জগৎপাতা হরিকে ভুলিয়া সংসারের সুখভোগে বজ্রপাত হউক, এরূপ অবস্থায় দুঃখেরই প্রশংসা করি। যাহাতে আমি প্রতি মুহূর্ত্তে হরিকে স্মরণ করিতে পারি, এমন দুঃখ আমাকে নিরন্তর আক্রমণ করুক।

হরিকে হরিজন বহুং হৈয়্, হরিজনকো হরি এক।

শলীকে কুমদন্ বহুং হৈয়্, কুমদন্কো শলী এক ॥ ৪৬ ॥

অসংখ্য ধেমন্ কুমুদিনী শশধরের প্রিয়তমা, কিন্তু একমাত্র চন্দ্রমা ব্যতিরেকে কুমুদিনীর প্রিয়তম আর দ্বিতীয় নাই, তদ্রূপ সংসারে বহুসংখ্যক ভক্ত বিদ্যমান আছে, কিন্তু ভক্তের একমাত্র ধন, হরি ভিন্ন আর দ্বিতীয় কেহ নাই।

চন্দ্র ছপে না তারক উজোর, সুরজ্ ছপে না বাদরু ছাই ।

রগ্ পড়ে কাঁহা রক্তপূত ছপে, দানী ছপে কাঁহা মাগন ঘাই ।

নারীকে চঞ্চল নয়ন্ ছপেনা, নীচ ছপেনা বড় পণ্ গাই ।

সিক্কু কো ভিতরু পাপ্ ছপেনা, দাস ছপেনা হরিগুণ গাই ॥ ৪৭ ॥

সমুজ্জল তারকাপুঞ্জমধ্যে চন্দ্রমা, বর্ষাকালীন দুদিনে সূর্য্য প্রভা,
সমরাক্ষণে বীরপুরুষ, ভিক্ষকের মধ্যে দাতা, অবগুষ্ঠনের মধ্যে রমণীর
চপল নয়ন, সভাতলে আত্মাভিমানী অভদ্র-ভদ্র পরিচায়ক নীচতা,
সাগরমধ্যে পতিত মল, এই সকল যেরূপ কদাচ ছাপা থাকে না, সেইরূপ
যে ব্যক্তি জগৎপাতা শ্রীহরির দাস, তিনি নীচ-উচ্চ চিহ্ন বিসর্জন দিয়া
গুপ্তবেশে থাকিলেও কদাচ অপ্রকাশিত থাকিতে পারেন না ।

সব্ কি ঘটমে হরিহেয়, পহছানতো নাহি জোহি ।

নাভিকে স্নগন্ধ মৃগ নহি জানত চুঁড়ত ব্যাকুল হোই ॥ ৪৮ ॥

মৃগ সমূহ যেরূপ আপনার নাভিস্থ স্নগন্ধির উপলব্ধি করিতে
না পারিয়া ব্যাকুল অন্তরে এক অরণ্য হইতে অরণ্যান্তরে সেই গন্ধদ্রব্যের
অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, তদ্রূপ সকলের শরীরেই জগৎপাতা জগদীশ্বর
পরমাত্মরূপে বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু অজ্ঞানতা বশতঃ লোকে তাহা
লক্ষ্য করিতে না পারিয়া যেখানে সেখানে নানাপথে পরিভ্রমণ করে ।

সদগুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে জ্ঞান করে উপদেশ ।

তত্ কয়লাকি ময়লা ছোট্টে, যব আগ্ করে পরবেশ ॥ ৪৯ ॥

কয়লার মধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিলে যেমন তাহার সমস্ত মলিনতা
বিদূরিত হইয়া যায়—তেমনি অদৃষ্টক্রমে সদগুরু পাইলে, তাহার দ্বারা
ভালমন্দ কার্য্যাকার্য্যের ভেদ ভাব বুঝিতে পারিলে, তখন শিষ্যের
সমস্ত চিত্ত-বিকার দূরীভূত হইয়া মন মলিনতা শূন্য হয় এবং
ঐশ্বরীক ভাবে বিভোর হইয়া পড়ে ।

তুলসী যব্ জগমে আয়ো, জগো হাসে তোম্ রোয় ।

আয়সে করি করচলো কি, তোম্ হাসো অগো রোয় ॥ ৫০ ॥

হে তুলসীদাস ! যখন তুমি জননীজঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলে—তখন তোমাকে দেখিয়া সকলে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল, হাসির তুফানে গৃহপ্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়াছিল কিন্তু তুমি কেবল অনবরত রোদন করিয়াছিলে, এখন তুমি এইরূপ সংকার্ষা সকল সম্পাদন কর, এবং সংকীৰ্ত্তি সকল রাখিয়া ধরা হইতে অপহৃত হও, যাহা স্মরণ করিয়া লোকে সৰ্বদা ক্রন্দন করিতে থাকুক— আর তুমি হাসিতে হাসিতে এ জগৎ হইতে অপহৃত হও ।

তুলসী জপ্ তপ্ পূজিয়ে, সব্ গোড়িয়াকি খেল ।

যব্ প্রিয়সে সরবর হোয়ি, তো রামপেটারী মেল ॥ ৫১ ॥

জপ, তপ, পূজাৰ্চনা এ সমস্তই বালিকাদিগের সাংসারিক কৰ্ম্ম শিক্ষার একটা দৃষ্টান্ত মাত্র, কিন্তু যখন ঐ বালিকা কুল বিবাহিত হইয়া পতির সহিত মিলিত হইবে—তখন ঐ সমস্ত পেট্রার মধ্যে পুরিয়া রাখিয়া স্বামীর গৃহ-সংসার করিতে হইবে। হে তুলসি ! যত দিন জগৎপতির সহিত তোমার সহবাস না ঘটে, ততদিন পর্য্যন্ত তুমি ঐ প্রতিমা পূজা দিতে রত থাক ; তাঁহার সহিত মিলন হইলে ঐ সমস্ত ছাড়িয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ ভগবানকে জানিতে পারিলে আর কিছুই দরকার নাই ।

ভাট্কা ভালা বোলনা চলনা, বহুড়ীকা ভালা চূপ ।

ভেক্কা ভালা বর্ষা বাদল, অজ্জকে ভালা ধূপ ॥ ৫২ ॥

ভাটের পক্ষে নানাপ্রকার কথা কহা এবং অধিক পথ চলা ভাল ; কারণ অধিক কথা কহিয়া লোকের সম্ভাবসাধন করিতে না পারিলে তাহাদের উপায় উপার্কজন হইবে না ; বহু দূরদেশে যাইয়াও

তাহাদের এই কাজ করিতে হইবে। আর কুলবধুগণের পক্ষে চূপ করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকাই ভাল—তাহা হইলে সকলেই তাহাদের স্বখ্যাতি করিবে। ভেকের সম্বন্ধে বর্ষাবাদল—আর ছাগলের সম্বন্ধে রৌদ্র তাপ যেমন আনন্দদায়ক—ইহার তাৎপর্য্যও সেইরূপ।

যাকে ঈও হোতো বিধাতা বাম, তাকে ধনমেক ধুরি সম।

জনক আদি ধম, তাহি ব্যাস সম দাম্ ॥ ৫৩ ॥

বিধি বাদী হইলে স্বমেকের তুল্য ধন থাকিলেও তাহা কোন কার্য্যকারী হয় না—ধুলির মত অকর্ষণ্য হইয়া যায়। তখন পিতা প্রভৃতি গুরুজনকে যমের মত এবং হৃন্দর পুষ্পমালাকেও সর্প বলিয়া ভ্রম হয়।

ভক্তি বীজ পল্টে নহি, যৌ যুগ যায় অনন্ত।

উচনীচ ঘর আওতরে, কেশ সন্তকে সন্ত ॥ ৫৪ ॥

ভক্তের হৃদয় ক্ষেত্রে একবার ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হইলে—তিনি প্রকৃত সাধক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। যুগ যুগান্তর অতীত হইলেও তাহার আর পরিবর্তন ঘটে না, তিনি অনবরত স্বত্মমুখে পতিত হইয়া কখন নীচ কখন উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহার হৃদয়ভাব পূর্ব্ববৎই থাকে—তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

তুলসী জগৎমে আইয়ে, সবমে মিলিয়া ধায়।

না জানে কোন ভেকসে নারায়ণ মিল যায় ॥ ৫৫ ॥

ভগবান কখন কোন বেশে আসিয়া যে ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করেন—তাহার ত স্থিরতা নাই—এইজন্য হে তুলসীদাস! জগতে সকলের সহিত সমানভাবে মিলিয়া মিশিয়া কাজ কর, অর্থাৎ কোন সম্প্রদায় বা কোনও উপাসককে ঘৃণা বা নিন্দা করিও না।

ধনমদ্ তনমদ রাজমদ বিজ্ঞামদ অভিমান ।

এ পাঁচকো আউটকে, পাঁচয়ে পদ নির্বাণ ॥ ৫৬ ॥

ধনের গৰ্ব্ব, স্থঠাম শরীর সৌন্দর্যের গৰ্ব্ব, রাজ্যের গৰ্ব্ব, বিজ্ঞার গৰ্ব্ব এবং আমিই সকলের প্রধান—আমার অপেক্ষা আর কেহ নাই—এইরূপ অভিমান বিসর্জন দিয়া তৃণাদপি স্তনীচ হইতে পারিলেই জীব নির্বাণ পদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে ।

কাহা কহৌ বিধিকি পতি, ভুলে পড়ে প্রবীণ ।

মুরখকে সম্পত্তি দেখি, পণ্ডিত সমপত্তি হীন ॥ ৫৭ ॥

ভগবানের বিচার বিধির গতি নির্ণয় করিতে গেলে অতি প্রবীণ বিচক্ষণ ব্যক্তিকেও ভ্রমে পতিত হইতে হয় । দেখ, তিনি মূর্খকে অজস্র ধন ধানের অধিপতি করিয়াছেন আর অশেষ শাস্ত্র-পাঠি পণ্ডিতকে কোনপ্রকার সম্পত্তি প্রদান করেন নাই—অতীক হীনাবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন ।

কোনু কাহু স্থখ দুখকর দাতা, নিজকৃত কর্মভোগ সব ভ্রাতা ।

জন্ম হেতু সব কহ পিতু মাতা, কর্ম শুভাশুভ দেহ বিধাতা ॥ ৫৮ ॥

হে ভ্রাতঃ ! জগতে স্থখ-দুঃখ দাতা কেহ নাই, জীব নিজকৃত কর্মফল ভোগ করিয়া থাকে, জন্ম হেতুই পিতামাতা নাম হই-
য়াছে—কিন্তু তাঁহারাও ইহার কারণ নহেন । কর্মফল দাতা ভগ-
বানই শুভাশুভ কর্মের ফলানুসারে জীবকে দুঃখ-স্থখের অধিকারী করেন ।

গোধন, গজধন, বাজীধন আউর রতন ধন খান ।

যব হাওত সন্তোষ ধন, সব ধন ধুরি সমান ॥ ৫৯ ॥

মনোমধ্যে যখন সন্তোষ ধনের উৎপত্তি হয়—তখন গো, গজ, বাজী, এমন কি অসীম ধনরত্নও তাহার তুল্য বলিয়া বোধ হয়

না; অভাব সন্তোষ ধনের তুলা ধন আর নাই—এই ধন ভগ-
বানের আশীর্বাদ ভিন্ন লাভ হয় না।

তনুকি ভুক তনক হৈয়, তিন পাওকে সেব।

মন কি ভুক অনেক হৈয়, নিগূলত মেক, সুমের ॥ ৬০ ॥

দেহের ক্ষুধা অতি অল্প—তিন পোয়া বা একসের পরিমিত
দ্রব্যেই তাহার নিবৃত্তি হয়—কিন্তু মনের ক্ষুধা এত বেশী যে
স্বমেক পাহাড় প্রমাণ দ্রব্য পাইলেও তাহার আশা মিটে না।

উদর ভরণ্কে কারণে, প্রাণী ন করতয়ি লাজ।

নাচে বাচে, রণ ভিঠৈ, বাচে ন কাজ অকাজ ॥ ৬১ ॥

মাহুষ উদর পোষণের জন্ত কোনপ্রকার লাজ লজ্জা করে না—
কেহ নানাপ্রকার হাসোদ্বিপক সাজসজ্জা করিয়া সভাস্থলে নৃত্য
করিতেছে, কেহ ভীষণ তরঙ্গ সঙ্কল সমুদ্রে নৌকা লৈইয়া বাইচ
খেলাইতেছে, কেহ বা দুর্বল হইয়াও রণক্ষেত্রে ধাবমান হইতেছে,
অতএব উদর পরিপোষণের জন্ত মাহুষ করিতে পারে, না—এমন
কাজ নাই।

যে প্রাণী পরবশ পরো, সো দুখ সহত অপার।

যুথপতি গজ হোই, সহে বন্ধন; অকুশ অপার ॥ ৬২ ॥

পরের অধীন হইলে তাহার দুঃখের আর অবধি থাকে না—
যেমন যুথপতি গজরাজ অসীম বলশালী হইয়াও সামান্ত মানবের
অধীনে থাকিয়া কত বন্ধন বাতনা—কত অকুশ আঘাত সহ করিয়া
দুঃখের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে।

যো যাকো পেয়ার লগে, সো তাকো করত বথান।

জায়মে বিধকো বিধমখী, মানত অমৃত সমান ॥ ৬৩ ॥

যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার গুণকীর্তন করিতে কিছুতেই

বিরত হয় না। যেমন বিষ-মক্ষিক। ছুরাস্ত হলাহলকেও অমৃত
তুল্য জ্ঞান করে—সেইরূপ।

জল বিচ কুমুদ বসে, চন্দা বসে আকাশ।

যো জন যাকে হৃদ বসে, সে জন্ন তাকো পাশ ॥ ৬৪ ॥

কুমুদিনী জলে বাস করে—চন্দ্র আকাশে থাকে, তথাপি উভ-
য়ের হৃদয় মধ্যে ভালবাসা যেমন বদ্ধমূল, কিছুতেই তাহার নড়চড়
হয় না; তেমনি যে যাহাকে ভালবাসে, সে বহু দূরবর্তি হইলেও
নিকটবর্তি বলিয়া অনুভব করে।

শ্রীত্ ন টুটে অন্মিলে, উত্তম মনকি লাগ।

সাত যুগ পাণীমে রহে, মিটে না চকমককে আগ্ ॥ ৬৫ ॥

চকমকির পাথর শত যুগ জগে নিমগ্ন থাকিলেও যেমন তাহা
হইতে অগ্নি বিচ্যুত হয় না, সেইরূপ সাধু ব্যক্তির সহিত সাধু
ব্যক্তির মনের মিলন হইলে তাহারা পরস্পর দূরদেশে থাকিলেও
তাহাদের ভালবাসা কিছুতেই নষ্ট হয় না।

বিপদ বরাবর স্থখ নহি, যো খোড়া দিন হোয়।

লোক বন্ধু মৈত্রতা, জ্ঞান পড়ে সব কোয় ॥ ৬৬ ॥

যদি সামান্য দিন মাত্র বিপদে পতিত থাকিতে হয়—তাহা
হইলে বিপদের মত স্থখের অবস্থা আর নাই; কারণ এই সময়
আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব এবং ভদ্র-অভদ্র বেশ চিনিতে পারা যায়—এই
বিপদের অবস্থা হইতেই কে বন্ধু কে শত্রু বেশ চিনিয়া লইতে
পারা যায়।

রাম ঝরোখে বয়েটকর, সব্ কো মজুরা লে।

জায়সা যাকে চাকুরী আয়্ সা উন্কো দে ॥ ৬৭ ॥

সর্বদর্শী ভগবান রামচন্দ্র ভগবৎরূপ গৃহের উচ্চ বাতায়নে বসিয়া

দিবারাত্র সকলের আচরিত কাজকর্ম দর্শন করত যে ঘেরূপ কাঁধা করিতেছে, তাহাকে সেইরূপ পুরস্কার প্রদান করিতেছেন।

সব তিথি স্মৃতিথি হ্যায়, সব বার স্খার।

ওস্কা লাগে ভদ্রা, যো বিহরে নন্দকুমার ॥ ৬৮ ॥

সকল তিথিই স্মৃতিথি এবং সকল বারই স্খার, নন্দকুমারকে স্মরণ করিলে তাহার পক্ষে কিছুই অশুভ নহে—কিন্তু যে তাহাকে ভুলিয়া কাজ করে, তাহার পক্ষে সমস্ত তিথি ও বার ভ্রাতা দোষে ছুট হইয়া থাকে—অর্থাৎ তাহার কোন সময়ই সুসময় নহে।

বহুং ভালানা বোলনা চলনা, বহুং ভাল না চূপ্।

বহুং ভালানা বর্ষা বাদর, বহুং ভালানা ধূপ্ ॥ ৬৯ ॥

বেশী কথা কহা এবং বেশীদূর চলাফেরা করা ভাল নহে, এবং জন সমাজে থাকিয়া একেবারে নীরব থাকাও উচিত নয়, বেশী বর্ষা-বাদল ও বেশী ধূপ যেমন জীবগণের পক্ষে অসহ্য। সেইরূপ অতিরিক্ত কিছুই করিবে না, আর একেবারে কিছুই ছাড়িয়া দেওয়া ভাল নয়।

পারু গায়ে সো বুড়িয়া, বুড় গায়ে সো পার।

সমান্ বে ডুবে মজধার, জিন্ শির ভারি ভার ॥ ৭০ ॥

পুণ্যাত্মা ব্যক্তি ভবসমুদ্র পার হইয়া থাকে, আর পাপী নরকে ডুবিয়া থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি সংসারভারাক্রান্ত, তাহার কোন উপায়ই নাই—সে মাঝখানে ডুবিয়া মরে।

আরব খরব লো বৃহ্মী, উদয় অন্ত লো রাজ।

যো জাগে নিজ মরণ ইয়, তো আবে কোওনে কাজ ॥ ৭১ ॥

যখন একদিন স্মৃতিশীল মরণ হইবে—ইহা সকলেরই জ্ঞান আছে, তখন অগণিত ধনে ধনবান হওয়া বা উদয়াস্ত কাল পর্য্যন্ত রাজা হইয়া লাভ কি?

তুলসী ইয়ে আয়কে জগ্, কোন্ ভয়ো সোমরত ।

এক কাঞ্চন ও কুচনকো, কিন্ন পদারি হত ॥ ৭২ ॥

হে তুলসী! এ জগতে এমন জ্বিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না, যে জীজ্ঞাতির কুচ যুগলে অথবা কাঞ্চনা-দির মোহে মুগ্ধ না হইয়াছে। অতএব কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করা সহজ সাধ্য নহে।

মক্ষী বয়ঠী সাহদ পরো, পংখা গয়ে লপ্টার ।

মক্ষী ঝটপটায় শির ধুনে, লালচ বুরি বালাই ॥ ৭৩ ॥

মধু পানাশায় মধুকরগণ ফুলে বসিয়া যখন মধু আহরণ করে—তখন মধুতে তাহাদের পক্ষধ্ব জড়াইয়া গিয়া সত্তর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, অতি লোভে তাহাদের এই দুর্গতী, এইজন্ত কোন বিষয়ে অতি লোভাভিভূত না হইয়া ভালমন্দ বিচার পূর্বক কাজ করা কর্তব্য—তাহা হইলে আর পতনের ভয় থাকে না।

মেয়ে লালোকে লালড়ি, মুহুমে গেরো রঙ ।

কালো মূৰ্খ যবতে ভেয়ো, তুলি নীচকে সঙ ॥ ৭৪ ॥

মাজুষ সং সংসর্গে সং এবং অসং সংসর্গে অসং হইয়া থাকে, সংসর্গের দোষ গুণ কিছুতেই যায় না। এইজন্ত কুঁচ লোহাকে বলিতেছে—আগে আমার সমস্ত গাত্রই লালবর্ণ ছিল। কিন্তু তোমার সংসর্গে আসিয়া, তোমার সহিত একত্র তৌলিত হইয়া আমার মুখ পুড়িয়া কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে।

সাণা কহে সোণার কো, উত্তম মেরি জাত ।

কাণে মুহুকি ঘুঙচি, তুলি হামারে সাথ ॥ ৭৫ ॥

একদিন সোণা স্বর্ণকারকে বলিতেছে যে—আমাদের জাতি জগতে অতি উত্তম, তুমি কখনও কৃষ্ণমুখ কুঁচের সহিত আমাকে

ওজন করিও না। সতের সহিত অসতের সম্মিলন সাধু ব্যক্তির
কখন করা উচিত নয়—ইহাই তাৎপর্য।

তন্ সমুদ্র মন লহর হেয়, রূপ কাছর দরিয়াও।

বেসর ভুজা সেকন্দরি, পস্থি ইহঁ না আও ॥ ৭৬ ॥

দেহ সাগর মন তাহার তরঙ্গ এবং রূপ তাহার সলিল ও বেসর
সেকেন্দরের বাহু সদৃশ—অতএব সাধু পাশ্চগণ এ পথে কখনও পদার্পণ
করিও না—সাবধান হও, অর্থাৎ দেহ-সাগরে রূপের সুন্দর সলিলে, মনের
তরঙ্গে নাচিয়া অস্থির হইও না—রূপ যৌবন তুচ্ছ জ্ঞান করিও।

তেরি বিরহ সাগর মে, জাহাজ ভয়ে একস্ত।

তন্ মন্ যৌবন ডুবিয়ে, প্রেম ধ্বজা যাহে রস্ত ॥ ৭৭ ॥

হে প্রাণকান্ত! তোমার বিরহ সাগরে আমি জাহাজ স্বরূপ
হইয়াছি, তাহাতে তোমার চিন্ত, শরীর, মন ও যৌবন নিমগ্ন
থাকিলেও প্রেম-পতাকা অদ্যাবধি মগ্ন হয় নাই।

প্রীত্ প্রীত্ সবকই কহত, কঠিন তাম্বুকি রীত।

আদি অন্ত নিব নাহি, বালুকি মি ভীত ॥ ৭৮ ॥

প্রেম প্রেম সকলেই মুখে বলিয়া থাকে—তাহা অতি কঠিন
ব্যাপার। বালির বানের জ্বাঘ ইহা একটু ধাক্কা পাইলে ভাঙ্গিয়া
যায়—অর্থাৎ প্রেম চিরদিন সমান থাকে না—প্রকৃত প্রেম সুহৃৎভ।

মধুকর, চাহত কমল কোঁকি, বনুকো চাহত মোর।

দীপক রটত পতঙ্গকোঁকি, চন্দ্রি রটত চকোর ॥ ৭৯ ॥

ভ্রমর ঘেরূপ পদ্মের প্রতি আসক্ত, ময়ূর ঘেরূপ বনের প্রতি
আসক্ত, পতঙ্গ ঘেরূপ দীপশিখার প্রতি আসক্ত, এবং চকোর
ঘেরূপ চন্দ্রের প্রতি আসক্ত, সাধু ব্যক্তিগণ সেইরূপ সংস্কারের প্রতি
আসক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন।

কো সুখ কো দুঃখ দেহে হৈয়, দেত করুম বাক য়োর ।

উর্জ্জ্বল স্বরূপা হৈয় আপহি, ধোজা পবন কি জোর ॥ ৮০ ॥

পতাকা যেমন পবনের জোরে এদিক ওদিক চালিত হইয়া থাকে—সেইরূপ মানুষ যে সুখ দুঃখের দ্বারা চালিত হইয়া থাকে—সে কেবল তাহার কর্মফলের জোরে ; নতুবা সুখ-দুঃখের কেহ দাতা নাই ।

তিন টুকু কপীনকো, আউর ভাঁজি বিন্ লোন্ ।

তুলসী রঘুবর উর বসেঁ, ইন্দ্র বাপূর কোন্ ॥ ৮১ ॥

হে তুলসীদাস ! যদি ভগবান রামচন্দ্র সদা সর্বদা হৃদয়ে বাস করেন, তাহা হইলে লবন হীন ভাঙ্গা খাইয়া এবং টুকুরা টুকুরা কোপিন পরিয়াও সুরপতি ইন্দ্রের অপেক্ষাও আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে করা যায়—অর্থাৎ ধর্মকে ধরিয়া অতি কষ্টে কালযাপন করিলেও আপনাকে মহাসুখী বলিতে হইবে ।

মাঘ পৌষকা দিনমে, আয়সে হো কবলাগি হৈ ।

তুলসীকে মন্ রাম, যেও গরীব কো থাম ॥ ৮২ ॥

মাঘ ও পৌষ মাসের রোজ যেমন দরিদ্র ব্যক্তিদিগের প্রীতিকর এবং বাঞ্ছনীয় হইয়া থাকে, তুলসীদাসের হৃদয়ে রামনাম ও সেই প্রকার প্রীতিকর ও সদা বাঞ্ছনীয় ।

তুলসী নবেসো আপকোঁ, পরকো নবেসা কোয় ।

টাক তরাজু তোলিয়ে, লবেসো গড়য়া হোয় ॥ ৮৩ ॥

তুলসীদেও যেমন বাটখারা আপনাকে নীচ করিয়াও অন্তরে উন্নত করে, হে তুলসী ! তুমি সেইরূপ পরকে শ্রেষ্ঠ করিয়া আপনাকে অবনত মনে করিবে । এইরূপ করিলে সকলে তোমাকে গুরু বলিয়া মান্ত করিবে ।

দণ্ডে কোশ হাজারো, বশে লহমী পাশ ।

বিনা দিয়ে রঘুনাথকো, মেলে না তুলসীদাস ॥ ৮৪ ॥

হাজার হাজার ক্রোশ পথ পর্যটন কর—লক্ষী সকলের কাছে
কাছেই রহিয়াছেন, কিন্তু প্রভু রামচন্দ্র ধন না দিলে হে তুলসি!
তুমি কেমন করিয়া ধন প্রাপ্ত হইবে—কমলা যে কমলা কান্তেরই
আজ্ঞাকারিণী ।

এক ঘড়ি, আধি ঘড়ি, আধি হয়ে আধ ।

তুলসী সঙ্গত সন্তকি, হবে কোটা অপরাধ ॥ ৮৫ ॥

একঘণ্টা, আধঘণ্টা, এমন কি অর্ধেকেরও অর্ধেক ঘণ্টা যদি
সাধুসঙ্গ করা যায়, তাহা হইলে হে তুলসি! তাহার দ্বারা অসংখ্য
অপরাধ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ।

সঙ্গত কি জিয়ে সাধুকি, হয়ে আউর কি ব্যাধ ।

সঙ্গত কি জিয়ে নীচকি, আঠো পহর উপবাস ॥ ৮৬ ॥

সাধু সংসর্গ সকল ব্যাধি হরণ করে—আর অসাধু সংসর্গে হুখে
বা নির্বাসী হইয়া থাকে ত দূরের কথা—অষ্টপ্রহর উপবাসী থাকিতে
হয় । অতএব সাধুসঙ্গ সর্বতোভাবে করা উচিত ।

রাম নাম আরাধি সে, তুলসী বৃথা ন যায় ।

নর কারিকো পয়ের সে, আগে হোতো সহায় ॥ ৮৭ ॥

হে তুলসী! রাম নাম করিলে সময় বৃথা নষ্ট হয় না তা—তুমি
যেদূরগেই তাহা সাধনা কর । যেহেতু পরকালে এইনাম সর্বাঙ্গে
বদ্ধুর মত সাহায্য করিয়া থাকে ।

তুলসী বেরোয়া বাগ্‌মে, সিচ্‌তে কুম্‌ লায়ে ।

রাম ভরোসে যো রহেঁ, সো পরবত পর হরি যায়ে ॥ ৮৮ ॥

হে তুলসীদাস! মনোহর সুরক্ষিত উদ্যোগের কুম্‌কুম ও হৃগন্ধি

জলসিক্ত পাদপ কখনও তেজোহীন হইলেও হইতে পারে কিন্তু দৈব
সহায় সম্পন্ন পর্বতস্থিত বৃক্ষ নিশ্চেষ্ট না হইয়া বরং বর্জিতই হইয়া থাকে।
ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কেবল পুরুষাকারে কোন কার্য্য হয় না—
দৈবের সাহায্য একান্ত আবশ্যিক, নতুবা কিছুতেই কিছু হয় না।

ভক্তি ভক্ত ভগবন্ত গুরু, চতুর নাম বপু এক।

ইনুকে পদরজ বন্দন কিয়ে, নাশত বিষ় অনেক ॥ ৮৯ ॥

ভক্তি ভক্ত, ভগবান ও গুরু এই চারি পদার্থ এক এই সকলের
মধ্যে যাহাকেই বন্দনা করিবে—তাহাতেই অনেকপ্রকার বিষ় বিনাশ
হইবে—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তুলসী জগ্‌মে আকর, করলে দেনো কাম।

দেনে কো টুকুরা ভালা, লেনেকো হরিনাম ॥ ৯০ ॥

হে তুলসীদাস! তুমি জগতে আসিয়া দুইটা কার্য্য অবশ্য প্রতি-
পালন করিবে—একটা দান, তাহা সামান্য হইলেও করিবে এবং
গ্রহণ করিবার সময় অতি অল্প হরিনাম সংকীৰ্ত্তন মঙ্গলকর জানিবে।

অগর না করে চাকুরী, পণ্ডথী না করে কাম।

তুলসীদাস কহ গয়ে, সবকো দাতা রাম ॥

অজগর সর্প কাহার দাসত্ব করে না, পক্ষীগণ ও কোনপ্রকার
ব্যবসা বাণিজ্যে রত নহে, তথাপি তাহাদের উদর পূর্ত্তির কোন
অভাব পরিলক্ষিত হয় না—এইজন্ম তুলসীদাস বলিতেছেন—ভগবান
রামচন্দ্রই সকলের উপায় বিধান করিয়া থাকেন।

তুলসী আপনা রামকো, রিজ ভজো চায় থিজ।

ক্ষেত পরেতে আমি হৈয়, উলটে নিধে বিজ ॥ ৯২ ॥

হে তুলসি! তুমি ভক্তি বা অভক্তির সহিত বা শত্রু-মিত্র যে
কোন ভাবেই হউক, দৈবের আরাধনা কর—তাহাতেই সকল প্রাপ্ত

হইবে ; ক্ষেত্রে যেরূপ ভাবেই বীজ পতিত হউক, তাহার অঙ্কুর নিশ্চয়ই উর্দ্ধমুখে উখিত হইবে ।

চিদানন্দ ঘটমে বসে, বৃদ্ধত তাঁহা নিবাস ।

সৌ মৃগমদ মৃগনাভি মে, চরত ফিরত স্ববাস ॥ ২৩ ॥

মৃগের নাভিতে মৃগনাভি বর্তমান থাকিলেও তাহারা বুঝিতে না পারিয়া যেমন চারিদিকে অন্বেষণ করে—সেইরূপ প্রত্যেক মনুষ্য হৃদয়ে চিদম্বন নিরঞ্জন ভগবান বাস করিলেও তাহারা ভ্রমাক্ষ হইয়া তাঁহার অন্বেষণে কত তীর্থ ভ্রমণ করে, কত দেব দেবীর মূর্তি গড়িয়া পূজা করে ।

স্বধমে ভষম পড়ে, যৌ হর হর হনসেঁ। যায় ।

বলিহারি উহ ছুঃখকি, যো পল্‌পল রাম কহায় ॥ ২৪ ॥

যে স্বধ-সম্পদে ভগবানকে ভুলিয়া যাইতে হয়—তেমন স্বধ-সম্পদে ছাই পড়ুক, আর যে ছুঃখ-দৈন্ত্রে সতত ঈশ্বরকে স্মরণ পথে রাখা যায়—সেইরূপ ছুঃখকষ্টে যে খুব প্রশংসনীয় এবং অতীব সুখের তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই ।

তুলসী মিঠে বচন সোঁ, স্বধ উপজত চহওর ।

বশীকরণ মন্ত্র হেঁয়, পরিহর বচন কঠোর ॥

হে তুলসীদাস ! বশীকরণ মন্ত্রের মত মিষ্ট কথায় আশাতীত আনন্দ পাওয়া যায়—এইজন্য তুমি কঠোর বাক্য পরিত্যাগ করিয়া স্নমধুর বাক্য প্রয়োগ করিতেই তৎপর হইবে ।

সবকো ব্যাকুল করত হেঁয়, এক জঠর কি আগ ।

পরৈ কিল্‌ কিলা জলধি, মধিলভ্‌ চরভর উত্তর ত্যাগ ॥ ২৫ ॥

জলে বাড়বানল প্রজ্জ্বলিত হইলে যেমন তাহার সমস্ত জলচর গণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে সেইরূপ জঠরায় প্রজ্জ্বলিত হইলে

সকলকেই বাকুল করিয়া থাকে, অতএব ক্ষুধার তুল্য মনকে চঞ্চল করিতে আর কেহ পারে না।

শোভে শোভে ব্যা করে ভাই, ওঠ ভজো মুরার।

আয়সে দিন আতে হেঁয়, লম্বা পা পসার ॥ ২৭ ॥

ভাই শুয়ে শুয়ে আর কতদিন কাটাবে, উঠ, মূবারি ভগবানের ভজনা কর, কারণ এমন একদিন আসিতেছে, যেদিন পদদ্বয় প্রসারিত করিয়া চির নিদ্রায় নিদ্রিত হইবে—সে দিনের ত আর বৈশি দিন বাকী নাই—অতএব ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া পরকালের পথ মুক্ত কর।

কাম, ক্রোধ, মদ, লোভ কি, যর লগ্ মনমে খান।

তব লগ্ পণ্ডিত, মুরদৌ, তুলসী এক সমান ॥ ২৮ ॥

হে তুলসী! যতদিন কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি রিপুগণ হৃদয় রাজ্যে বাস করিবে—ততদিন পণ্ডিত মূর্খ সবই সমান। অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই ষড় রিপুকে জয় করিয়াছে—সেই নরশ্রেষ্ঠ জানিবে।

জ্ঞান গরিবী হরি ভজন, কোমল বচন অদোষ।

তুলসী কতু না ছোড়িয়ে, ছমা শীল সন্তোষ ॥ ২৯ ॥

হে তুলসীদাস! তুমি কখনও জ্ঞান, দীনতা, হরিভজন, কমা, মধুর বচন, সংপ্রকৃতি এবং সন্তোষ—এসকল পরিত্যাগ করিও না; ঈশ্বরের প্রিয় হইতে হইলে এই সকলই প্রধান এবং একমাত্র সহায়।

ধনকো শোভা ধরম হেঁয়, কুলকো শোভা শীল।

জলকো শোভা কমল হেঁয়, দলকো শোভা শীল ॥ ১০০ ॥

ধনের শোভাই ধর্ম অর্থাৎ ধর্মকর্মে ধনের সন্ধান করিলেই তাহার শোভা বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সং স্বভাবই কুলের শোভা বর্দ্ধন করে, অর্থাৎ সংস্কার সম্পন্ন হইলেই তাহাকে সৎশ্রদ্ধাত বলিয়া

জানা যায়। পদ্ম সমূহ যেমন জলের শোভাবর্দ্ধন করে, এবং বালক বালিকা যেমন দলের শোভাবর্দ্ধন করে। অর্থাৎ ঘরে বহুলোক থাকিলেও যেমন ছেলেপীলে না থাকিলে তাহা শোভাহীন হয়।

আগম পনথ হেঁয় প্রেমকো, যাহা ঠাকুরারী নাহি।

গোপীনৃকৈ পাছে ফিরে, ত্রিভুবনপতি বনমাহি ॥ ১০১ ॥

যে প্রেমে চতুরালী নাই—সেই প্রেমই যথার্থ প্রেম—তাহাতে শ্রীভগবান বাধা পড়েন, বৃন্দাবনের গোপিনীদের প্রেমে ঠক চাচুয়ী কিছুই ছিল না বলিয়া ত্রিভুবনপতি ভগবান বনমালী সেখানে বাধা পড়িয়াছিলেন।

বড়ে বড়ে সোঁ রিশ করে, ছোটো সোঁ ন রিশায়।

তরু কোঠার তোরে পত্তন, কোমল তৃণ বাঁচি যায় ॥ ১০২ ॥

বড়লোকে বড়লোকের উপরই ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে—ছোটর প্রতি সে কিরিয়াও দেখে না। যেমন দুরন্ত পবন বড় বড় বৃক্ষ নিচয়ই ভগ্ন করে, ক্ষুদ্র তৃণদলের উপর কখনও কোন অত্যাচার করে না।

যেত্নে যাকে বুদ্ধি হেঁয়, ওতনি কহে বনায়।

ভালি বুরিকো বুরি ন মানিয়ে, লেন্ কাঁহা সো যায় ॥ ১০৩ ॥

যাহার বুদ্ধিশক্তি যতদূর সে ততদূর সত্য প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করে, ভগবানকে তত সে বুঝাবার জন্য যত্ন করে। কিন্তু সত্ত্বের অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপ বুঝান যায় না; তিনি বিজ্ঞাবুদ্ধি এবং বাক্যশক্তির অতীত বস্তু।

কাগা কাকোন্মোতে হেঁয়, কৈলি কাসো দে।

শীতল বোলি শুনায়কে, জগ্ আপনা করলে ॥ ১০৪ ॥

কাক সকল কর্কশ কাকা শব্দ করে কাহার কোন অনিষ্ট না করিলেও তাহার ঐ কঠোর স্বর সকলেরই অগ্রিয় কিন্তু কোকিসকুল কখন

কাহারও ইষ্ট করে না—তথাপি তাহার মধুরম্বর সকলেরই অগ্নির
বলিয়া সকলেই তাহার আদর করে।

চলনা ভলনা ক্রোশভোর, হুহিতা শালা না এক।

মাওনা ভালানা বাপসে, রাম যও রাখে টেক্‌। ১০৫ ॥

ভগবান যদি মানরক্ষা করেন, তাহা হইলে লাভের বশবর্তী
হইয়া কখন একক্রোশ যাওয়া উচিত নয়। সংসারে স্বীয় কন্যারও
হৃৎখের কারণ হইয়া থাকে, বিলাস-বাসনা পরিতৃপ্তি নিমিত্ত জগদীশ্বরের
কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করা ভাল নয়।

চতুরাই চুলাই পর, জ্ঞানী জম্‌কো ধায়।

তুলসী হরিভক্তি বিনে, জড়মূল নাশ না পায় ॥ ১০৬

যে ব্যক্তি জ্ঞানী এবং চতুর অথচ অন্তরে হরিভক্তির লেশমাত্র
নাই—হে তুলসি! তাহার জ্ঞানে ও চতুরতায় কোন ফল নাই।

সব্‌ বন্‌ তুলসী ভেয়ো, সব্‌ পাহাড় ভেয়ো শাল্‌গেরাম।

সব্‌ পাণি গঙ্গা ভেয়ো, সব্‌ ঘটমে বিরাজে রাম ॥ ১০৭ ॥

যাহার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে; যিনি সর্বভূতে ভগবানের অস্থিত
দর্শন করেন, তাহার কাছে সব বনই তুলসী কানন, সকল প্রস্তর
ঋণই শালগ্রাম শীলা এবং সকল জলই গঙ্গা জল বলিয়া অনুমিত
হয়—তাহার নিকট কিছুই ভেদভাবে ভাবিত হয় না।

চারি জাত্‌ মিলে হরি ভজিয়ে, এক বরণ হো যায়।

(জায়সা) অষ্টধাতুমে পরশ্‌ লাগায়ে, এক মূলকে বিকায় ॥ ১০৮ ॥

যেমন অষ্টধাতুতে স্পর্শ-পাথর লাগাইলে সব যেমন এক হইয়া
সমান মূল্যে বিক্রীত হয়, সেইরূপ চারিজাতি মিলিয়া ঈশ্বর আরা-
ধনা করিলে চতুর্কর্ণ এক হইয়া যায়—আর কোনও ভেদভেদ
থাকে না।

জাত পাত গণিয়ে যাঁহা, হো যায় বরণ বিচার ।

তুলসী কহে হরিভজন বিনে, চারিজাত চামার ॥ ১০৯ ॥

বেস্থানে লোকে সংসারী এবং ঈশ্বরাদনা বিহীন ও অভিমানী হইয়া পশুর মত সংসারে অবস্থান করত পুরুষ পরম্পরাগত জাতি লম্বহকে উত্তম ও অধমরূপে শ্রেণীভেদে তৎপর হয়, তাহাদের কাছে তাদৃশ জাতি বা শ্রেণীর আদর করায় কোন দোষ নাই। কিন্তু সাধু তুলসীদাস বলেন—এই চারি জাতির মধ্যে কেহ যদি হরি-ভক্তি বিহীন হয়, তাহা হইলে সে চামারেরও অধম বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

সবহি ঘটমে হরি বসে, যেও গিরিসুতমে জ্যোতি ।

জ্ঞানগুরু চক্ৰমক্ বিনা, কৈসে প্রকট হোতি ॥ ১১০ ॥

নকল প্রস্তরেই অগ্নি বিদ্যমান আছে এবং লৌহ দ্বারা আঘাত করিলে তাহা হইতে আগুণ বাহির হয়, সেইরূপ সব জীব-দেহেই জগদীশ্বর বর্তমান আছেন, হৃদয়রূপ চক্ৰমকিতে গুরু উপদেশরূপ লৌহের আঘাত বিনা তাহা প্রকাশ হওয়া অসম্ভব—অর্থাৎ গুরুর উপদেশ ভিন্ন ঈশ্বরাত্মগ্রহ লাভ হয় না।

অর্থ অনর্থ করহিঁ জগত যাহো, দেখহ মন সুখলেশ নাহি ।

যাকে ধন তাকে ভয় অধিক, ধন কারণ মারত পিতৃ লড়িক ॥

ধনতে পতিহিঁ বিঘাতহিঁ নারী, ধনতে মিত্র শত্রুতাকারী ।

ধনমদ নর অন্ধের জগ্ কয়সে, দেখ নমিনহিঁ রাতৌধি জয়সে ॥ ১১১ ॥

জগতে অর্থই অনর্থের মূল; যাহার অর্থ আছে—সে সর্বদা তাহার রক্ষার জন্তই ভীত হয়, কেননা ধনলোভে পুত্র পিতাকে, স্ত্রী স্বামীকে বিনাশ করিতেও কুণ্ঠিত নহে; অর্থের জন্তই বন্ধু শত্রু হয়। যেরূপ রাতকাণা ব্যক্তি চক্ষুর কোন পীড়া বোধ করিতে

পারে না—অথচ রাत्रিতে কিছু দেখিতেও পায় না; মানবগণ
সেইরূপ বিনা অস্থখ বোধে ধনমদে মত্ত হইয়া থাকে।

মহাকষ্ট সোঁ হোত ধনরাখে কষ্ট সদায়।

নাশ হয়তো দুঃখ করে, খরচ করে পছতায় ॥

তা সোঁ ধিক্ ধিক্ অর্থ হয় দুঃখ দেও জগমাহি।

অর্থ মহা অরি জানিয়ে করি বিচার মনমাহি ॥ ১১২ ॥

এ জগতে ধন মহাকষ্টের কারণ, প্রথমতঃ ইহার উপার্জনে বহু
কষ্ট, রক্ষা করিতে অশেষকৰ্ম্ম ভোগ করিতে হয়। কোন কারণে আবার
ধন ব্যয় হইলে শোকের অবধি থাকে না—অতএব ইহার কিছুতেই
যে স্থখ নাই—তাহা সৰ্ব্ববাদী সম্মত, এইজন্ত ধনকে শত শত
ধিকার দিতে হয় এইরূপ ধনাসক্তি পরিত্যাগ করা ধার্মিক ব্যক্তির
সৰ্ব্বদা কর্তব্য।

আত্মাকো নদ মানিয়ে সংযম তোয় সামান।

সত্যবচন হৃদ শীল তট, দয়া লহর করি জান ॥

অয়সে নদকো সলিলমে করহু স্নান স্থধিরাজ।

নহিলু এজন হোত হয় শুদ্ধ চপল মনরাজ। ১১৩ ॥

এই জগত সংসারে ধনামূল্যে তৎপর জ্ঞানী ব্যক্তিগণ চিত্তবৃত্তি
পরিশুদ্ধির জন্ত এবং নৈহিক পাপনাশের জন্ত নৃগাদির জলে স্নান করিয়া
থাকেন, কিন্তু তাহাতে স্নান করিলেই যে চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়—
তাহা কখনই নহে। যদি যথার্থ চিত্তশুদ্ধির ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে
যে ব্যক্তি আত্মাকে নদী জানিতে পারিয়াছে এবং সংযমকে জল,
সত্যবচন হৃদ, শীলতা তাহার তট এবং দয়া তাহার লহরী সদৃশ
জানিয়া সেই জলে অবগাহন করিবে—তাহাতেই চিত্তের মলিনতা
দূর হইবে—অন্ত উপায়ে নহে।

আহ জানি অজ্ঞরামর বিদ্যাধন করিলেহ ।

সমরথকো ধন হোত হয় লাগত যোকরি লেহ ॥

কর্ম করহ তব জানি মন কালগ্রাসিত বহ আপ ।

করহ ন করহ কালতে হোত কঠিন মনতাপ ॥ ১১৪ ॥

নিজেকে অজ্ঞর অমর এইরূপ চিন্তা করিয়া বিদ্যা ও ধন উপার্জন করিবে ; শরীর ক্ষণবিক্ষণী—ইহার স্থায়ীত্ব কিছুই নাই, এরূপ চিন্তা করিলে কখন ধন ও বিদ্যা অর্জন করা হইবে না ; কিন্তু ধর্মোপার্জনের সময় মনে করিবে যেন কাল শিয়রে বসিয়া রহিয়াছে, তাহার গ্রাসে পতিত হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই । তুমি কিছু কর আর না কর, কাল উপস্থিত হইলে—সে কখনই তোমাকে পরিত্যাগ করিবে না । এইরূপ চিন্তা করিলে ধর্ম উপার্জন হইবে ।

ধনতে হীন দেখি জন সখা শত্রু ইব হোত ।

শরদি অন্ত্রবিহীন ঘনপবন খণ্ড করিলেহ ॥ ১১৫ ॥

শরৎকালের নির্জল মেঘরাশিকে পবন যেমন খণ্ড খণ্ড করিয়া বিভাঙিত করিয়া দেয় । সেইরূপ ধনহীন হইলে আত্মীয় বন্ধুগণও তাহার প্রতি শত্রুতাচরণ করে—তাহাকে দেখিতে পারে না । তাহাকে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করে ।

ধনতে হোত ধর্ম প্রভু তাই ।

ধনতে হোত সুষম সযুদাই ॥

যো কুলহীন লভত ধন কুলতে ।

ধন বীহু রোওত রাতি দিন বীতে ॥ ১১৬ ॥

ধনে ধর্ম, প্রভুত্ব সুষম প্রভূতি লাভ হয় । কুলহীন হইলে ধনের দ্বারাই কুলপ্রাপ্ত হয় । লোক যদি ধনহীন হয়—তাহা হইলে তাহাকে জীবিকা-বর্জনের জন্ত অশেষ কষ্টভোগ করিয়া দিবারাত্র রোদনসার করিতে হয় ।

ধনতে কুলবৃদ্ধি ধনওস্তা, ধনতে হোত পণ্ডিত গুণবস্তা ।

ধনতে হীম পুরুষ হয় কয়সে, জীবহীন দেহ সব জয়সে ॥ ১১৭ ॥

ধনের দ্বারাই মাতুষ কুলশীল সম্পন্ন, পণ্ডিত, বুদ্ধিমান এবং
বহু গুণ সম্পন্ন করিয়া সকলের নিকট সমাদৃত হয় কিন্তু ধনহীন
পুরুষকে সকলে জীবনহীন মৃতদেহের জায় ঘৃণা করিয়া থাকে ।

মোটো বস্ত্র গৃহ ছোটো পঞ্চ ধেনু হর দোষ ।

যাকো হয় সে সুখী গৃহী, দুহিতা যদি নাহি হোয় ॥ ১১৮ ॥

মোটো কাপড়, ছোট ঘর এবং পাঁচটি দুগ্ধবতী গাভী যাহার আছে
অথচ যাহার কন্যা লাভ হয় নাই—এ জগতে তাহার তুল্য সুখী আর
কেহ নাই । কারণ মোটো কাপড় শীঘ্র ছিন্ন হয়—ছোট ঘর হইলে অন্ন-
ব্যয়ে সংস্কৃত হয়—আর দুগ্ধবতী গাভী থাকিলে কখন সুখাশ্রয়ের অভাব
হয়না কিন্তু কন্যা থাকিলে বিবাহের জন্ত তাহাকে অশ্রয়ের নিকট মাথা
হেঁট করিতে হয়—অজস্র অর্থ দিয়া কতলোকের তোষামোদ করিতে
হয় । এইজন্য দুহিতাই একমাত্র দুঃখের কারণ বলিয়া জানিবে ।

যেতে জীব চরাচর মাহি, মম মায়া কৃত জানই তাহি ।

সব জীবন কো জনক গোঁসাই, হম বি হু অতুর কোউ প্রভু নাহি ॥

যদ্যপি সবময় প্রিয়তম ছোঁরা, সবমে অধিক প্রিয় নরগণ মোরা ।

চারি বরণ নরগণকে মাহী, প্রিয়তম অধিক বিপ্রতেহি মাহী ।

ততো অধিক বেদজ্ঞ দ্বিজ মোরা, কৰ্ম চরহি সো অধিক ঘনেরা ।

ততো অধিক জ্ঞানী মম প্রিয়বর, বিজ্ঞানী তাতো শ্রেষ্ঠচর ॥

ততো অধিক প্রিয় ভক্ত মম ঘেই, বাকে হমবিহু আশন কই ।

হম বিহু স্বপনে অন্যানই হিজাকো, হম ই রহৌ বশ তাকো ॥

পুনি পুনি সত্য কহৌ তোহি পাহাঁ, মোহী সেবকসম প্রিয় কইনাই ।

ভক্তি কহু অতি নীচ প্রাণী, মোহি পরম প্রিয় শূনু মমবাণী ॥ ১১৯ ॥

ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—এই স্বাবর জলমাস্তক বিশেষ জীব সকল আমার মায়ায় উদ্ধৃত, সকল প্রাণীর জনকই আমি, অতএব জীবগণ আমার অত্যন্ত প্রিয়, জীবসমূহের মধ্যে মানুষ এবং চতুর্ভূজ মানবদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রিয়তম, তাহার মধ্যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আমার পরম প্রিয়, আবার বেদোক্ত ক্রিয়াক্ষরগণী বিপ্র তাহাদের অপেক্ষাও আমার প্রিয়। তদপেক্ষা জ্ঞানবান, তদপেক্ষা বিজ্ঞানবান কিন্তু এসকল অপেক্ষা আবার ভক্তই আমার অতীব প্রিয়পাত্র, কারণ যে আমার ভক্ত সে আমাকে ভিন্ন অণুকে জানে না বা অণু কাহারও প্রত্যাশা করে না; স্বপ্নেও আর কোন চিন্তা করে না, এইজন্য আমি ভক্তাধীন। ভগবান পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—ভক্তের তুল্য আমার প্রিয় এ জগতে কেহ নাই; ভক্ত যদি অতি নীচ হয়—তাহা হইলেও সে আমার প্রাণের ধন এবং আমি সর্বদা তার কাছে আছে থাকি।

প্রভু সেবক হি ন ব্যাপে অবিদ্যা,

প্রভু প্রেরিত তেহি ব্যাপে বিদ্যা,

তাতে নাশন হোই দাস কর,

ভেদ ভক্তি বাড়ে বিহঙ্গবর ॥ ১২০ ॥

তুলসীদাস কৃত রামায়ণে আছে—হে বিহঙ্গবর! যে ভগবানের সেবা-পরায়ণ ভক্ত, সে কখন অবিদ্যা আচ্ছন্ন হইতে পারে না, ভগবান দয়া করিয়া যে জ্ঞান দান করেন—তাহা সদা সর্বদা তাহার মনে দীপশিখার ত্রায় প্রজ্জ্বলিত থাকে—তজ্জনা তাহার কখনও কোন কাঙ্ক্ষে ভুল হয় না। অর্থাৎ সে কেবল সংসার পঙ্কে নিমজ্জিত না থাকিয়া ভগবানে চিত্ত দৃঢ় করিয়া রাখিতে সমর্থ হয়।

রাক্ষা শশী ষোড়শ উর্গাই তারণ সমুদায়।

সকল গিরিনদী বলাইয়ে রচি বিহু রাতি ন যায় ॥

অয় সই বিহু হরি ভজন খগেশা ।

মিটে ন জীবন কের কলেশা ॥ ১২১ ॥

ইহাও রামায়ণের কথা—হে খগপতে ! পূর্ণিমা রজনীতে রাক্ষসী ও নক্ষত্র সমুদয় উদ্ভিত হইয়া থাকে । পবিত্র নদী প্রভৃতি পূর্ণ চন্দ্রের কিরণ নিকর দর্শনে সমুৎসাহিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে । কিন্তু ঐ পূর্ণ চন্দ্রকে সূর্য্য ব্যতীত কেহ উদ্ভিত হইতে নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না । সেইরূপ হরিভজন ব্যতীত জীবগণের কষ্ট নিবারণে অন্য উপায় নাই ।

যদ্যপি প্রথম দুখ পাওয় রোত্র বাল অধীর ।

ব্যাধি নাশ হিত জননীগণে সোশিশু পীর ॥

তিমি রঘুপতি নিজ দাস কর হরহি মানহিত লাগি ।

দেহ গেহ অভিমান গয়ে, ভজত সদা দৃঢ় লাগি ॥

সংসৃতি মূল শূলপ্রদ নানা, সকল শোক দায়ক অভিমানা ।

জিমি শিশুতন ব্রণ হোহি গোসাঞী,

মাতৃ চিরাও কঠিন কি নাঞী ॥ ১২২ ॥

তুলসীদাস কৃত রামায়ণে আছে—নিজের দেহে, পরিজনবর্গে এবং গৃহাদিতে যে আমার আমার ভাব—উহা সংসার বন্ধনের মূল কারণ এবং উহা হইতেই নানাপ্রকার কষ্ট ও শোক সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । যেমন জননী পুত্রের ব্যাধি নাশের জন্য অতিশয় যত্নপূর্ব্বক তাহার ব্যথা নষ্ট করিবার জন্ত ব্রণাদি কাটিয়া দেন, কিন্তু ব্রণ কাটার জন্ত কষ্ট হইবে—ইহা যেমন মনে করেন না—রোগনাশ হইলে পুত্রের কুশল হইবে—ইহা যেমন তাঁহার স্থির বিশ্বাস, সেইরূপ পরমেশ্বর ভক্তগণের মঙ্গলের জন্ত প্রথমে তাহাদের অভিমান নষ্ট করিয়া থাকেন । সংসার ভাব অর্থাৎ আমার গৃহ, আমার পুত্র, আমার ধন—

ইত্যাদি ভাব নষ্ট হইলে ভক্ত যখন ভগবানে অহরন্তর হয়—তখন এই
হৃদয় ভবসাগর পারের জগৎ আর তাহাদের ভাবনা থাকে না।

নিজ দাসনকে ওরু প্রভু করত রূপা অতি ভূরি।

ভক্ত রূপা বংশল হরি জানত হয় কবি গুরি ॥ ১২৩ ॥

ভগবান ভক্তগণের প্রতি সদাই রূপা প্রকাশ করিয়া থাকেন—
তিনি চিরদিন যে ভক্তের প্রতি প্রসন্ন—তাহা পণ্ডিত এবং কবিগণ
বিশেষরূপে বিদিত আছেন।

নিগুণ রূপ স্থলভ অতি, সগুণ জানে কোই।

স্বগম আগম নানা চরিত গুনি মুনি মন ভ্রম হোই ॥ ১২৪ ॥

নিগুণ ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করা অতি সহজ, কারণ তাহার
ত ঐ এক ভিন্ন অগ্ন স্বরূপ নাই। কিন্তু সগুণ ব্রহ্মের তত্ত্ব নির্ণয়
করা কাহারও সাধ্য নহে; তিনি কখন কিরূপ রূপ ধারণ করেন
তাহা কে নিষ্কারণ করিতে পারে? ইহাতে মুনিগণেরও যখন মতিভ্রম
হয়—তখন অগ্ন পরে কা কথা!

ভক্ত হেতু ভগবান প্রভু রাম ধরে তহু ভূপ।

কিয়ে চরিত্র পাওল পরম প্রকৃত নর অমুরূপ ॥

যথা অনেক ভেকধরি নৃত্য করে নট কোই।

যোই সোই ভাও দেখাওয় আপন হোয় সোই ॥ ১২৫ ॥

যেমন রাজীকর নানাপ্রকার রূপ ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ
ভূতভাবন ভগবান ভক্তগণের মনোভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্ত নানা-
প্রকার মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া লীলাখেলায় মত্ত হন—কিন্তু সেই ধৃত
রূপ তাহার একটীও প্রকৃত নহে, সকলেই কল্পনা মাত্র জানিবে।

‘ব্যাপি রহো সংসার মহামায়া কটক প্রচণ্ড।

সেনাপতি কামাদি ভট দস্তক পট পাখণ্ড ॥

সোদাসী রঘুবীর কি সম্মুখে মিথ্যা সোপি ।

ছুটেন রাম কৃপা বিম্ব নাথ কহৌ পুনরোপি ॥ ১২৬ ॥

মহামায়া রূপ প্রচণ্ড বানর কটক এই সংসার বেরিয়া রহিয়াছে, এবং কামদম্বাদি পাষণ্ডগণ তাহার চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু এই মহামায়া রামচন্দ্রের দাসী, জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা তাহাকে বিদিত হওয়া যায়। সেই অঘটন ঘটন পটীয়াসী মায়াকে কেহ কখন বশ করিতে পারেনা; তাহার প্রতাপ এতই দোর্দণ্ড কিন্তু ভগবান কৃপা করিলে সহজেই তাহাকে বশীভূত করিতে পারা যায়।

চিন্তা সাপিনী কাহিন খাওয়া, কো জগ যাহিন ব্যাপী মায়া ।

শিব চতুরানন যাহি ডেরাহৌ, অপর জীব কোহি লিখে মাহৌ ॥ ১২৭ ॥

এ জগতে চিন্তা ভুজঙ্গিনীর দ্বারা দংশিত হইয়া কষ্ট না পাইয়াছে, এমন কেহ নাই, আর মায়ার দ্বারা মোহিত না হইয়াছে এমন লোক পাওয়াও দুষ্কর। যখন শিব ব্রহ্ম প্রভৃতি দেবগণ তাহাতে মুগ্ধ—তখন অস্ত্রের কথা আর কি বলিব?

শ্রীমদ বক্রন কীহু কোহি প্রভূতা বধিরণ কাহি ।

মুগ নয়নীকে নয় শরকো অসলা গুণ যাহি ॥ ১২৮ ॥

পৃথিবীতে ধনমদে কাহার চিত্ত না মত্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ ধনের লালসা কে ত্যাগ করিতে পারিয়াছে, প্রভুশালী নরগণ ধনের অহংকারে বধির হইয়া হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়া পড়ে, যন্দ বিষয়েই তাহাদের মন ধাবিত হয়—মুগনয়না রমণীর নয়নবাণে কেনা বিদ্ধ হইয়া আত্মহারা হইয়াছে?

জানী তাপস শূর কোবির গুণ আগার ।

কোহিকে লোভ বিড়ম্বনা কিহু ন হই সংসার ॥ ১২৯ ॥

যখন জ্ঞানী, গুণী, তাপস, বলবান, গুণশালী এবং কবিগণ লোভ

ছাড়িতে পারেন না—তখন সামান্য ব্যক্তির সাধ্য কি যে ইহাও
হস্ত হইতে পরিজ্ঞান লাভ করে?

বিহু বিশ্বাস ভক্তি নহি তৌহি বিহু জবাই ন রাম ।

রাম কৃপা বিনা স্বপনোই মনকি নহে বিশ্বাস ॥ ১৩০ ॥

বিশ্বাস ব্যতীত কখন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি হয় না এবং
ভক্তি না পাইলে ভক্তবৎসল কখন ভক্তের প্রতি সদয় হন না, তাহাকে
দয়া করেন না ! করুণাময়ের করুণা কণা ব্যতীত মন স্থস্থির হয় না—
অর্থাৎ ভগবানের কৃপা হইলে জীব অতুলানন্দ উপভোগ করিতে পারে ।

কোউ বিশ্বাস কি পাও তাত সহজ সন্তোষ বিহু ।

চলে কি জল বিহু নাও, কোটী যতন পচি পচি মরে ॥ ১৩১ ॥

সন্তোষই স্থখের মূল, সন্তোষ ব্যতীত কেহ শান্তি অন্বেষ
করিতে পারে না, সকল বিষয়ে যে সন্তুষ্টচিত্ত, তাহার আনন্দের
অবধি নাই । যেমন অশেষ যত্ন করিলেও জল ছাড়া নৌকা চলে
না, সেইরূপ সন্তোষ ব্যতীত মন স্থস্থির হইতে পারে না ।

সগুণ উপাসক পরম হিত নিরত নীতি দৃঢ় নেম ।

তে নর প্রাণ সমান মোহি জিনকে দ্বিজপদ প্রেম ॥ ১৩২ ॥

ভগবান বলিয়াছেন—সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা পরম হিতকর বলিয়া
যে তাহাতে দৃঢ়ভাবে রত থাকে এবং ব্রাহ্মণ চরণে যাহার অচলা
ভক্তি বর্তমান আছে—আমি তাহাকেই অত্যন্ত ভালবাসি ।

বিন সংসঙ্গ ন হরিকথা তঁহি বিনমোহন ভাগ ।

মোহগয়ে বিধু রামপদহে ইন্ দৃঢ় অমুরাগ ॥ ১৩৩ ॥

সাধু সঙ্গ ব্যতীত হরিকথা শ্রবণ করা হয়না এবং হরিকথা
ব্যতীত সংসার-মোহ কিছুতেই কাটে না এবং তৎকৃত ভগবান
রামচন্দ্রের প্রতি ঐকান্তিক অমুরাগও বন্ধমূল হইতে পারে না ।

জননী জনক বহু স্নেহাত্মক হইবেন না ।

স্বাক মমতা ভাগ বটোয়ারী, মমপর মনহি বাঙ্কো বাণী ভোরী ।

সমনরশী ইচ্ছা কহু নাহা, 'হর্ষ শোক ভয় নাহি মন মানী,

অসজ্জন মন উর বসে কয়সে ।

লোভী হৃদয় বসত ধন বেয়সে ॥ ১৩৪ ॥

পিতামাতা, বহু পুত্র-কলত্র, তহু ধন স্বহৃৎ পরিবারবর্গ এই সকলের মায়া পরিত্যাগ করত মনোরঞ্জু দ্বারা ভগবানের পাদপদ্ম বন্ধন করিয়া সর্বত্র সমদর্শী হও এবং ভগবানের চরণ ব্যতীত অন্য বস্তুর আশা ত্যাগ কর । ভগবান বলিয়াছেন—স্বধ, শোক, ভয় প্রভৃতি যাহার মনে উদয় হয় না, সেইরূপ ভক্তকে আমি নিরন্তর হৃদয়ে স্থানদান করিয়া সুখী হইয়া থাকি, অর্থাৎ তাহার চিন্তা আমার মনে সদাই জাগিয়া থাকে ।

পন্নগারি অসনীতি শ্রুতি সম্মত সজ্জন কহিহি ।

অতি নীচ হুঁসন প্রীতি করিয়ে জানি নিজ পরম হিত ॥

পাট কীটতে হোয় তাতে পাগধর কধির ।

ক্রিমিপালে সবকোয় পরম অপাণ্ডন প্রাণসম ॥ ১৩৫ ॥

ভূষণ্ডি কাক একদিন গরুড়কে সন্মোদন করিয়া বলিতেছেন—
যে হে পন্নগারে ! সুধীজন বলিয়া থাকেন,—অতি নীচজনের সহিত বহুত্ব করাও নিজের পক্ষে গঙ্গলজ্ঞনক বলিয়া বিবেচনা করিবে । যেমন পাট কীট অতি ক্ষুদ্র হইলেও তাহার দ্বারা বহু মূল্য পট্টিবস্ত্র নির্মাণ করিয়া লোকে ব্যবহার করে । অতি নীচ লোক হইলেও সময়ে তাহার দ্বারা উত্তম ফল লাভ হয় বলিয়া তাহাদের সহিত সম্প্রীতি রাখা উচিত । তুলসীদাস কৃত রামায়ণে ইহা লিখিত হইয়াছে ।

দয়া ধরমকা মূল হায়, নৃগকা মূল অপমান ।

তুলসী দয়া মৎ ছোড়িয়ে, যেৎনা ঘটবে পরাণ ॥ ১৩৬ ॥

দয়াই ধর্মের মূল ভিত্তি জানিবে, নির্দয়তা ও হিংসা অপমানের একমাত্র কারণ । অতএব হে তুলসী, যতদিন দেহে প্রাণ থাকিবে ততদিন দয়া পরিত্যাগ করিও না, দয়াই পরম ধর্ম ।

গোউয়া দোকে কুত্তা পালে ওস্কি বাছুর ভুকা ।

শালেকে উত্তম খিলাওয়ে বাপনা পাওয়ে রুখা ॥

ঘরকা বহরি পিরীত না পাওয়ে চিত চোরারে দাসী ।

ধন্য কলিযুগ তেরি তামাসা, দুখ লাগে আর হাসি ॥ ১৩৭ ॥

হে কলি ! ধন্য তুমি, তোমার তামাসা দেখে হাসিও পায়—
দুঃখও ধরে। কারণ লোকে তোমার মোহে মত্ত হইয়া গাভী
দোহন করত কুকুরকে প্রাতিপালন করে, কিন্তু তাহার বৎস দুগ্ধ-
পান করিতে পায় না । পরম পূজনীয়, সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ পিতাকে
উপবাসী রাখিয়া শ্রীমন্মথকে চূষাচূষা আহার প্রদান করে। এবং
নিজ বিবাহিত পত্নীকে প্রেমদান না করিয়া বারাক্ষর প্রেমে লোক
মোহিত হইয়া কত রজা করে। তুলসী কৃত রামায়ণের উপদেশ ।

সাম্ভা কহে ত মারে লাট্টা, ঝুট্টা জগৎ তুলাই ।

গোরস গলি গলি কিরে, সুরা বৈঠল বিকাই ॥

চোরকো ছাড়ে সাধকো বাঁধে, পথিককো লাগাওয়ে ফাঁসি ।

ধন্য কলিযুগ তেরি তামাসা দুঃখ লাগে আর হাসি ॥ ১৩৮ ॥

যে সত্যকথা কহে—এ কলিযুগে তাহার মাথায় লাঠি পড়ে, কিন্তু
যে মিথ্যাকথা কহে—লোকে তাহার জয় ঘোষণা করে—লোকে তাহার
প্রভাষণ বাক্যে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। গোহৃগ্ন গলি গলি কিরি করিয়াও
বিক্রয় হয় না কিন্তু অস্পর্শীয় সুরা একস্থানে বসিয়াই কত বিক্রয়

হইতেছে—তাহার স্থিরতা নাই। এ যুগ চোরকে ছাড়িয়া সাধুকেই বন্ধন করে, এবং নির্দোষী পাথককে ধরিয়া ফাঁসি দেয়; অতএব হে কলি! তোমার গুণের কথা আর কত কহিব—এই সকল দেখিয়া শুনিয়া হাসি পায়, সময়ে দুঃখেও প্রাণ কাটিয়া যায়।

কোউ নহি চৌহুত রামকো জগতি মন্ত নর নারী।

অন্ত্যামী রূপ মে, রাজত মহিমা ভারী।

ঘটকি সৃষ্টকো কাম যশ, কুস্তকার বিহু নহি।

কর্তা এক কোউ চাহিয়ে, রচত অপূর্ব জগমাহি ॥ ১৬৯ ॥

এই মায়াময় সংসারের নরনারী আমোদ প্রমোদে মন্ত হইয়া বিপুল মহিমায ভগবান রামচন্দ্রকে চিনিতে পারে না—তাহাতে যে কত মহিমা মণ্ডিত রহিয়াছে—তাহা দেখিয়াও দেখে না। যেমন ঘটের সৃষ্টিকর্তা কুস্তকার, তাহাকে কেহ দেখে না—সেইরূপ এই জগতের যে একজন সৃষ্টিকর্তা বর্তমান আছেন, কেহ তাহার প্রতি একবার লক্ষ্যও করে না।

দিবস রজনী নিত জাত হায়, ক্ষীণ হোত পরমাই।

নানা কারজ হোহি রত, কাল বিগত হিয় নাই ॥

দেখত শোক রোগ সব নরকো।

মরত দেখি কিছু ভর নাই হিয়কো ॥

সেহরূপ মদ করি জলপানা।

নাই শোচত সব ভয়ে দেওয়ানা ॥ ১৭০ ॥

দিবাযামিনী নিজাগত হইয়া পরমাধু ক্রমশঃ ক্ষয় হইতেছে, নানাবিধ সংসার কার্যে মন্ত হইয়া দিনে দিনে যে দিন গত হইতেছে—ইহা কেহই দেখিতেছে না। মাহুকের শোক রোগ দেখিয়া এবং

নবরত লোকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে দেখিয়াও কেহ কালভয়ে
গীত নহে। মোহ মদিরা পানে মত্ত হইয়া জীব এই জগৎকেই চির
বাসস্থান এবং অতীব রমণীয় স্থান বলিয়া মনে করিতেছে, কিন্তু একদিন
যে এসকল নিশ্চয় ছাড়িতে হইবে—সে বিষয়ে কাহার চৈতন্য নাই।

হম থাকে চিন্তন করে, সো মোহি মানত নাহি।

সো চাহতো জন অন্ধকা, সো নাহি মানত তাহি ॥

হমকো চিন্তত হয় অরু নারী।

ধিক হয় কাম ধিক ধিক নরনারী ॥ ১৪১ ॥

আমি যাহাকে চিন্তা করি, যাহার জন্ত প্রাণ উৎসর্গ করিতেছি,
সে আমাকে মানে না—আমার জন্ত চিন্তা করে না। সে অন্ধ
লোককে চাহে—অন্ধ জনের চিন্তা করে—কিন্তু সেও আবার তাহাকে
চাহে না, তাহাকে মানে না। আমার স্ত্রী আমার প্রতি আসক্তা
নহে—অন্ধের স্ত্রী আমার প্রতি আসক্তা; অতএব এরূপ কামকে
ধিক, এবং এইরূপ কামের অধিকারী নরনারীকেও শতধিক।

যো নর নষ্ট হোত জগমাহী, তাকো আট দোখ উরমাহী।

হোয় নিমিত্ত শুচা ওহিঁ তাকো, দুষণকো গুণ মানত হিত কো ॥

কহত বিদুর ধৃতরাষ্ট্র নরেশা, কছু যামে নাহি সংশয় লেশা।

প্রথম করত দ্বিজ দ্বেষ গোসাঁই, জানত হীন করি মানত নাহি ॥

ব্রাহ্মণ সঙ্গ বিরুদ্ধ তব করহি, নাহি লাভ কহ লেখত নাহি।

দ্বিজকো বিস্ত হরত হঠ করিকে, কটু উচ্চারি লেহিঁ শঠ করিকে ॥

ব্রাহ্মণ ঘাত করাহিঁ মনহি তে, সংশয় ভীতি নাহি হোত মনাইঁ তে।

জানহি দ্বিজগণ বঞ্চক হোতে, আপ বড় পন্ন আপন মুখেতে ॥

করহি বিপ্র লিখি বেদ পুরাণা, তাতে ঘাঁতহি করি অপমানা।

নিম্ন দ্বিজকো করহিঁ সদাই, গারি দেত হিত ছাড়ি বেড়াই ॥

যো কোউ দ্বিজকো করহি প্রশংসা, তা মে দ্বেষ করত নহি সংশা ।
 যো কুছ কাম করতো শুভ তাকো, গৃহ ঔচিত্য কার্য্য সো জগকো ॥
 তা মে নহিঁ বোলও হিঁ দ্বিজকো, জানত দ্বিজ অতি হিন জগৎকো ।
 যো ষাচক দ্বিজ মাগন গয়েউ, করত দ্বেষ হঠি ভগাওত ভয়েউ ।

মাক্ততা দ্বিজ কহি করত অতি দ্বেষা,
 করত অনুয়া নহি দেন কছু লেশা,
 অয়সে যো পর হোত ভগমাহি ।

তুরত নাশ সো হোত গোসাঁই ॥ ১৪২ ॥

একদিন পরম বৈষ্ণব বিহর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন,
 যে যে ব্যক্তি দেব দ্বিজের প্রতি অভক্তি প্রকাশ করে, বিপ্রগণের
 সহিত কলহ করে, ব্রাহ্মণের ধন হরণ করে, ব্রাহ্মণের হিংসা করে
 এবং তাহাদের নিন্দা করিয়া সুখ বোধ করে ও প্রশংসা শ্রবণ
 করিলে দুঃখ বোধ করে, নিত্য নৈমিত্তিক—কাম্যকর্মে তাহাদিগকে
 আহ্বান করে না, ব্রাহ্মণ কিছু চাহিলে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত
 করে—একপয়সাও দেয় না,—যাহার বুদ্ধি এইরূপ হইয়াছে—
 তাহাকে অচিরে নাশপ্রাপ্ত হইতে হয় ।

নিত্য হোয় ধন রোগ হত, প্রিয়বাদিনী গৃহমাহী ।
 তাকো প্রিয় অতি করত হয়, শোচ করহঁ হিয় নহি ॥,
 অহুগামী স্ত্রুত সর্বদা, পিতৃভক্তি যুক্ত হোত,
 অয়সে বিদ্যা পড়ত হয়, জামে অর্থ নিত হোত ।
 হই বড়গুণ হইলোকমে, সুখ কারণ নূপ হোত ।
 তাকো জীবন ধন্ত হয়, পুণ্যবস্ত নরপোত ॥ ১৪৩ ॥

এই সংসারে যাহার ধনবাসনা রূপ রোগ নিরাময় হইয়াছে,
 এবং যাহার দেহ সর্বদা রোগশূন্য ও যাহার ভার্য্য প্রিয়বাদিনী,—তাহার

কোন চিন্তা নাই। পুত্র যদি পিতৃভক্ত এবং বিত্তা অর্থকরী হয়, তাহা হইলে আর অশুখ কোথায়? এই ছয়টি যাহার বর্তমান আছে—এ জগতে সেই পরম সুখী—তাহাতে সন্দেহ নাই।

পুরুষণ কো গুণ যষ্ট হয়, নহি ছোড়াহি হিত জাপ।

অনালস্ত, অশুশ্রী ক্ষমা, ধৃতি অরু সত্য সুদান ॥ ১৪৪ ॥

কোন পুরুষের এই ছয়টি গুণ কখন পরিত্যাগ করা উচিত নয়—যথা অনালস্ত, অশুশ্রী, ক্ষমা, ধৈর্য্য সত্য ও দানশীলতা।

ছোড়হুঁ ছয় দোষ সদা যো চাহ কল্যাণ।

নিজ্রা তজ্রা ক্রোধ ভয় অলস দীর্ঘ গুমান । ১৪৫ ॥

যে ব্যক্তি নিজের কল্যাণ কামনা করেন—তাহাকে নিজ্রা, তজ্রা, রাগ, ভয়, অলস এবং দীর্ঘমুদ্রতা এই ছয়টি দোষ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে—নতুবা মঙ্গলের আশা নাই।

শুচি শ্রীল বহুমতী কহুঁ প্রিয় কাহিন লাগ।

শ্রুতি পুরাণ কহ নীতি যশ, সাবধান শূন্য কাপ ॥

এক পিতা কহ বিপুল কুমার, হোই পৃথক গুণশীল আচার।

কেউ পণ্ডিত কেউ তাপসজ্ঞাতা, কেউ ধনবন্ত শূর কেউ দাতা ॥

কেউ সর্কজ ধর্ম্মরত কোই, সব পর পিতাই প্রীতিসম হোই।

কোউ পিতৃভক্ত বচন মনকর্ম্ম, স্বপনেহুঁ জানেনা ছুসর ধর্ম্ম।

সো প্রিয় সূত পিতৃ প্রাণ সমানা, যদ্যপি সো সমভাতি অয়ানা ॥ ১৪৬ ॥

শুদ্ধমতি, ধীর, সেবক, বুদ্ধিমান লোক জগতে কাহার না প্রিয় হয়? এক পিতার অনেক পুত্র জন্মে, কিন্তু সকলে সমান গুণ সম্পন্ন হয় না; কেহ পণ্ডিত, কেহ জ্ঞানী, কেহ তপস্বী, কেহ ধনবান, কেহ বলবান, কেহ সর্কজ, কেহ ধর্ম্মজ হইয়া থাকে; কিন্তু যে বেশী পিতৃভক্ত হয়, ইহার মধ্যে সেই পিতার প্রাণ তুল্য

প্রিয় হইয়া থাকে। সেইরূপ যে জগদীশ্বরের প্রতি ভক্তিমান—
সেই তাহার একান্ত প্রিয়। (রামায়ণ)

জয়সে পুতলী কাঠকো, পুতলী মাসময় নারী।

অস্থি নাড়ী মলমূত্রময় যন্ত্রিত নিন্দিত তারী ॥ ১৪৭ ॥

যেমন কাঠের পুতুল, নারীগণও সেইরূপ অস্থি, নাড়ী, মলমূত্র,
মাংসময় কাঠের পুতুলের মত, কোন শোভা নাই—বিবেকশালী
ব্যক্তিগণ এইজন্য রমণী সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হয়েন।

মেয়ে মায়া প্রবল হয়, যুবতী রূপ জগমাহী।

দেখহুঁ তাকো অপূর্ণ বল, তোহিঁ কোও পাওত নাহি ॥

দ্বিধিজ্ঞয়া যো শূর হয়, বহু গুণ সাগর তাহিঁ।

ক্রকটাক্ষ নো করত হয়, তাকো পদতল মাহি ॥ ১৪৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান বলিয়াছেন—আমার মায়ার ক্ষমতা কতদূর
দেখ : অতি বড় বলশালী পুরুষকেও আমার মায়ার আধার রমণীগণ
অনায়াসে পদানত করিয়া রাখিতে পারে।

নারী সংসৃতি মূলিকা, অর্গল স্বরপুরকের।

চিত্রিত মপি নহি দেখহিঁ, বুদ্ধিমন্তজনের ॥ ১৪৯ ॥

সংসারধর্ম্মে নারী জাতিই মূল কিন্তু মোক্ষপথের কণ্টক ; চিত্রের
সুচিত্রিত নারীমূর্ত্তিও পুরুষের চিত্র চাকল্য আনয়ন করিতে
পারে। এইজন্য জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত
করিবে না।

পুত্র লিয়ে পিতৃ মাতৃ সদা তলফৎ হই জগমাহী।

পুত্র মহা রিপুরুপ হয় কারু বিচার মনমাহি ॥

জব নহি হোত পুত্র নরকেরে, মাতৃ পিতৃ মনদুঃখ মনেরে।

যো পুত্র গর্ত মধ্যগত হেরা, গর্তপাত স্মৃতিকা কেরা ॥

জায়ে গ্রহ ভয় মুক কুমারা, হোয় জনেউ মুরখর জোরা ।
 যো স্তত পণ্ডিত হোয় স্বাবী, পাছে বিহাস্তন হোয়ে পছতানি ॥
 যুবা রূপ স্তত হোতহি অবহি, পর নারী দুঃখ ঘেরহি তবহি ।
 বহু কুটুম্ব পরিবার সমেতা, হোয় দরিদ্র পিতা পছিতাতা ॥
 যো গুণবস্ত্র হোত স্তত, ধন কুটুম্ব পরিবার ।
 নহি কিছু দুঃখ স্বপনেউ সহ মৃত্যু শক অনিবার ॥
 মাতু পিতা পছিতান কভু, ন মিটে জগবীচ মহ ।
 জানহঁ সর সুশায়ন, দুঃখরূপ স্তত জগৎকে ॥ ১৫০ ॥

জনক জননীর পক্ষে সম্ভানই তাহাদের দুঃখের প্রধান কারণ—
 এই হেতু পুত্র তাহাদের শত্রু ভিন্ন আর কিছু নহে। প্রথমে
 পুত্র না হইলেও পিতামাতার কষ্ট, জননীর গর্ভসঞ্চার হইলে পাছে
 তাহা নাশ হয় এবং প্রসব সময়ে ষাহাতে পুত্র কষ্ট না পায়—এই
 ভয়ে তাঁহারা ভীত হন। তারপর জননী সম্ভান প্রসব করিলে
 তাহাতে কোন গ্রহদোষ আছে কিনা সন্দেহ করিয়া কত কষ্ট
 পান, তারপর পুত্র বোবা হইল কিনা—ইত্যাদির ভয়; উপনয়নাদির
 পর বিদ্যারম্ভে পুত্র শিক্ষিত না হইলেও মনে বিষম দুঃখ; তারপর বিদ্যান
 হইলে বিবাহ হয় কিনা, যৌবনকালে পরদার আশঙ্ক হইবার ভয়
 রহিয়াছে। পুত্র যদি ঐ সকল দোষে দুষিত না হয়—তাহা হইলে যদি
 দরিদ্র হয়—তবে সংসার কেমন করিয়া চালাইবে—বহু গুণশালী
 হইলেও বেশীদিন বাঁচিবে কিনা, তাহারও ভয় আছে। ভাবিয়া
 দেখিতে গেলে, পুত্র পিতামাতার কিছুতেই স্ত্রের কারণ নহে—
 বরং দুঃখেরই আশ্রয়।

যো নর ধর্ম করে নহি, মাতৃখ পাই শরীর ।

জরা ভয়ে নহি হোত কভু, চিন্ত হোত অধীর ॥ ১৫১ ॥

অন্তিমকালে জীবের ধর্মই একমাত্র সহায়—যে ব্যক্তি মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া ধর্ম উপার্জন না করে, সে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মৃত্যু ভয়ে ভীত হইতে থাকে, এবং অহুতাপে অহরহঃ পুড়িয়া ছারখার হয়।

অর্থ যথা পদধূলি হয়, যৌবন নদী কর বেগ।

মামুখ জলথে বিন্দু হয়, জীবন কেন করি লেখ ॥ ১৫২ ॥

ধন অতি তুচ্ছ পদার্থ, পদরঞ্জের ত্রায় অতি অকিঞ্চিৎকর, যৌবন জুয়ারের জলের মত এই আছে—এই নাই, শরীর ক্ষণভঙ্গুর, সত্যএব এই অচিরস্থায়ী পাঞ্চভৌতিক দেহের জন্ত সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দে মত্ত হইয়া মোক্ষলাভের উপায় স্বরূপ ধর্মোপার্জনে বিরত থাকা কোন ক্রমেই উচিত নয়।

রামনাম মণি দীপ ধরু, জীহ দেহরি দ্বার।

তুলসী ভিতর বাহিরো যো, চাহসী উজী আর ॥ ১৫৩ ॥

ঘরের মাঝখানে প্রদীপ রাখিলে যেমন ভিতর-বাহিরের অন্ধকার তিরোহিত হইয়া আলোকজ্বল হয়। ভক্তবীর তুলসীদাস বলিতেছেন—দেহের দ্বার সদৃশ জিহ্বাতে সেইরূপ রামনাম—বাতি জালিয়া রাখিলে বাহ্যাস্তরের দারুণ অজ্ঞানান্দকার বিদূরিত হইয়া জ্ঞানালোকে দেহ-প্রাঙ্গণ আলোকিত হয়।

যাকো মন হরিচরণ মে হোত লীন দিন বাতি,

করত কাম বিষয়াদি সদা তদপি ন হোত বিঘাতি।

বয়সে নারী হোত হয় ব্যভিচারী মনমাহি,

ভজত কই পর পুরুষকো যদপি কাম গৃহমাহি।

গৃহ কারজ ক্রিয়মানপি চিস্তত নাগর লেহ।

ছুটন্ত নহি গুণ মাত্র অপি নর নাগর পর স্নেহ।

নটনারী শির কুস্ত ধরি চড়ি বিমান চলি যাহি,

যয়সে মন শির কুস্ত পর রহিয়ে কটক মাহি ।

• তরসে কারজ করহিঁ সর ছাড়ত নহি প্রভু লেহ ।

অর্পণ করত মনবাসনা হরিচরণ পর দেহ ॥ ১৫৪ ॥

যাহার মন ভুজ দিবারাত্র হরিচরণ পদ্যের মধুপানে রত, সংসারে কার্যে বিভ্রান্ত থাকিলেও তাহার হরি আরাধনার ব্যাঘাত হয় না। যেমন ব্যাভিচারিনী সংসারের কাজকর্মের মধ্যে ব্যাপ্তা থাকিয়াও পর পুরুষের প্রতি মনটা নিবিষ্ট রাখিয়া দেয়, অথবা নর্তকী মন্তকের উপর কুস্ত স্থাপন করিয়া উর্দ্ধনেত্রে চাহিয়া চলিয়া যাইলেও যেমন তাহার কুস্ত পতিত হয় না—সেই একাগ্রচিত্ত হইলে তুমি যেখানে থাকে এবং যাহাই কর—কিছুতেই তোমার সাধনার ব্যাঘাত হইবে না।

যো নর ভজহিঁ সগুণকো অতি প্রসন্ন মনমাহি ।

নিষ্কামী ভজমান পর করহিঁ রূপা প্রভু তাহিঁ ॥

অনুভব রূপ ভক্তি বৈরাগ্য, দেত রূপা করি সো মহাভাগা

তিনপ্রকার চিত উপজত তাকো,

বিহু প্রয়াস সহজহিঁ উর ওয়াকো ॥

• জয়সে ভোজন করতহিঁ, হোত তিন গুণ তাহি ।

বল সন্তোষ অরু মিটই, ক্ষুধা গ্রাস গ্রাস পরমাহি ॥ ১৫৫ ॥

যে রূপ ক্ষুধাতুর ব্যক্তির প্রতি গ্রাসে গ্রাসে ক্ষুধার নিবৃত্তি হইয়া সন্তোষ ও বলের উৎপত্তি হয়—সেইরূপ একান্তমনে যে ব্যক্তি সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করে—ভগবানের রূপায় অনায়াসে তাহার চিন্তে জ্ঞান ভক্তি ও বিবেক বৈরাগ্য আপনি উপজিত হইয়া থাকে।

যো করি জ্ঞান গুমান ভজন করহি জগদীশকো ।

সো হয় অতি অজ্ঞান অন্তর কলুষ করি মানিয়ে ॥ •

করি কলেশ বহু ভাঁতিতে ছোড়ি বিমান পর যাই।

চড়ত পরমপদ পায়কে সগুণ নিরাপদ তাই ॥

বিলু আশ্রয় গির পরহিঁ তব টুটিয়াই পণ দেহ।

অধঃ পরহিঁ নহি নহিঁ স্থখ পছিতাওহিঁ ত্যজিলেহ ॥ ১৫৬ ॥

যে ব্যক্তি অহঙ্কারের বশবর্তী হইয়া আমি জ্ঞানী জীবমুক্ত পুরুষ, আমি আবার কাহার ভজনা করিব বলিয়া সগুণ ব্রহ্মের নিন্দা করে—সে কলুষ কালিমায় মলিন হইয়া পরমপদারূঢ় হইলেও পতিত হইয়া থাকে। যেমন কোন ব্যক্তি বহুকষ্টে বিমানে উঠিয়া বিঘ্নবশে নিম্নে পতিত হইয়া আঘাত বশতঃ বহু দুঃখভোগ করে, সগুণ ব্রহ্মের নিন্দাকারী জনকেও সেইরূপ সংসারে বহু কষ্টভোগ করিতে হয়।

সগুণ উপাসকগণ স্থখ পাই, নিগুণমে তলফত দিন যাই।

মহাকষ্ট নিগুণ ভজি নাহি, কেওল করমী যত পছ তাই।

যো পুণি সগুণ ভক্তি নহি করহিঁ, কেবল ব্রহ্ম স্বরূপকো ভজহিঁ।

ওয়াকো হোতি কলেশ সদাই, তুষ কুটি কোউ চাউল পাই ॥ ১৫৭ ॥

সাধকশ্রেষ্ঠ তুলসীদাস সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা সম্বন্ধে কত উচ্চমত প্রদান করিয়াছেন—দেখুন। তিনি বলেন—নিগুণ ব্রহ্মের উপাসন করা কষ্টপ্রদ, সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাতেই সাধক স্থখলাভ করিয়া থাকেন যেমন তুষ কুটিয়া কেহ তণ্ডুল প্রাপ্ত হইতে পারে না, সেইরূপ সগুণ ফেলিয়া নিগুণে মজিলে কোনই ফল হয় না—অতএব সগুণের উপাসনাই মনোরম ও স্থখপ্রদ জানিবে।

যদ্যপি নিগুণ ব্রহ্ম কি নাহি স্বরূপ কো লৈশ।

অয়সে রূপ কায় জানি, কোনহিঁ প্রবিশত মনলৈশ ॥

ভানক কেউ মনবুদ্ধিকো বিদ্যমান করি মান।

ছাড় মন অবিবেকতা অহমাদিক ত্যজি মান ॥

লক্ষ্যরূপ মনগহত হয়, চিদানন্দ স্বরূপ ।

নেতি নেতি করি ত্যজছ জড় অপর হত অশরূপ ॥

মেরে সহমেজীহ নহি আশনহি জানত কোই ।

তয়সে নিজকোরূপ চিত ছাড়ি শকে নাহি কোই ॥ ১৫৮ ॥

নিগুণ ব্রহ্মের কোন রূপ নাই, এইজন্ত আমাদের মন তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না, তবে বেদবাণী, গুরু উপদেশ ও যুক্তি-সতর্ক দ্বারা চিত্ত প্রকাশক চৈতন্য স্বরূপ কোন বস্তু যে আমাদের হৃদয়ে রহিয়াছেন—এটা ঠিক, তাহাতে বাসনারূপ বৃত্তিকে প্রকাশিত করে। সর্বসাক্ষী স্বরূপ জগৎ প্রকাশক চিরদন ব্রহ্ম বিচক্ষণ আছেন, বিচার করিলে এই পাঞ্চভৌতিক দেহ নশ্বর হইলেও নিষেধ কর্তার অভাব কি জ্ঞানিতে পারা যায়? আমার জিহ্বা নাই বলাও যা, আর আমি নাই বলাও তাই—অতএব নিষেধ বিষয়ে কেহই আপনাকে ত্যাগ করিতে সক্ষম হয় না। স্তত্রাং নিখিল প্রকাশক চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্ম স্থিরীকৃত হইলে বেদোক্ত উপাসনাও একান্ত কর্তব্য।

যো কহ নিগুণ ব্রহ্ম হয় ভজন করত শকতাহি ।

আলম্বন বিমূ মানসিক ধ্যান করে নর নাহি ॥

নিগুণ ব্রহ্ম ভজহি নর কয়সে, নামরূপ নহি আলজ তয়সে ।

মন অবলম্বত রূপ লোভাই, নিগুণ রূপ রহিত সদাই ॥

বুদ্ধিবৃত্তি অবলম্বত কাকো, যো নহি হোত আবয়ব তাকো ।

নিগুণকো ভজহিঁ যো জ্ঞানী, তাকোভি ভ্রম করি মন মানী ॥

বেদান্তিগণ কহত ইঁদ্র, শব্দাদি ভ্রম তাহি ।

মণিকে জ্যোতিমে মণি মিলে, যদ্যপি ভ্রম জগমাহি ॥

দীপ শিখাকো জ্যোতিমে মণি ভ্রম মানত যোই ।

যায় জায় নহি পাত মণি বিসম্বাদি ভ্রম সোই ॥

দোউ যদ্যপি হয় ভ্রমরূপা, প্রিয়বর শুনই হই যুক্তি অতুপা ॥১৫৯॥

ব্রহ্মের উপাসনা ভ্রমরূপক হইলেও ফলপ্রদ। মণির প্রভাকে দেখিয়া যেমন দূরস্থিত ব্যক্তি তাহাকে বিদিত হইবার জন্য নিকটে আসিয়া তাহাকে লাভ করে। সেইরূপ ব্রহ্মের স্বরূপ না জানিয়া গুরুর উপদেশে প্রবণবাদের উপাসনায়ও ব্রহ্মলাভ করিতে পারা যায়। কিন্তু যুক্তিকা কিস্বা প্রস্তরাদির উপাসনা করিলে ব্রহ্মলাভ করিতে পারা যায় না। প্রদীপের শিখা দেখিয়া যদি মণি মনে করা যায় এবং মণির আশায় নিকটে যাওয়া যায়—তাহা হইলে মণিলাভ হয় কি? এইজন্য এইরূপ উপাসনাকে শাস্ত্র বিসম্বাদি দোষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

* পর ইচ্ছা যো করত হয় কারজ দুখকো যোই।

কর্মরূপ বলবন্তু হয় ইষ্ট করি ভোগত সোই ॥ ১৬০ ॥

আপনার ইচ্ছা ব্যতীত পরের কাজ করিয়া যে কষ্টভোগ করে, তাহাকে পরেছাপ্রারক বলা যায়।

রোগভোগ যো করত হয় নহি ইচ্ছা হয় তাহি।

হোত মহা অনরথ সদা বিগত হোত কভু নাহি ॥ ১৬১ ॥

জগৎ সংসারে কাহারও পীড়াভোগ করিতে ইচ্ছা হয় না—অথচ রোগ-ভোগ সকলকেই করিতে হয়। এইরূপ ভোগকে অনিচ্ছা প্রারক বলা যায়

জয়সে অনরথ জানিকে রাজদারগত হোয়া।

ইচ্ছারূপী কর্ম হয় মিটে শকে নহি কোয় ॥ ১৬২ ॥

কৃষ্ণের ফল মন্দ জানিয়াও বাহারা নৃশ পত্নীর অতুগমন করে, অথচ তাহাকে নিবারণ করিতে কেহ সমর্থ হয় না—তাহাকে ইচ্ছা প্রারক কহে।

কর্মরূপ প্রারব্ধ বোনো হয় তিনপ্রকার ।

ইচ্ছা অনিচ্ছা পরেচ্ছা কহত শাস্ত্রমত সার ॥ ১৬৩ ॥

শাস্ত্র বলিতেছেন—কর্মরূপ প্রারব্ধ তিনপ্রকার যথা—ইচ্ছা, অনিচ্ছা
আর পরেচ্ছা ।

জ্ঞানী যা জগ বীচমে মহাপুরুষ করি জান ।

প্রেম ভক্তি হয় যাকো জ্ঞানী ভূল্য সো জন ॥

শ্রবণাদিক সাধন। করি ছাড়ি সকল সংসার ।

তিন সাধন রত অনুভূত হয় ব্রহ্ম পরম বিচার ॥

নিজানন্দ অনুভব করে, ব্রহ্মরূপ নিত হোয় ।

দেহন নাশে স কহি কভু কর্ম কঠিন অতিশোয় ॥

কুন্ত কারকো চক্র য়েও ঘুমত আপহি আপ ।

কর্ম চক্র তেঁও জানিয়ে ভোগ বিনা নাহি যাত ॥ ১৬৪ ॥ ১৬৫ ॥

জ্ঞানী লোককে এই সংসারের মহাপুরুষ বলিয়া মান্য করিবে ।
তাঁহাকে দর্শন করিলে প্রেম ও ভক্তির উদয় হয় । তিনি পরম-
ব্রহ্মে বিচরণ করেন, এবং নিত্য সাধন রত থাকিয়া সংসারের মায়া
মোহ পরিত্যাগ করত নিত্য ব্রহ্মময় হইয়া চিদানন্দ উপভোগ করিয়া
থাকেন এবং তিনিই পবন জ্ঞানী বলিয়া অভিহিত হন । কুন্তকারের
চক্র যেমন একবার ঘুরাইয়া দিলে আপনাপনি বহুক্ষণ ঘুরিতে
থাকে, কর্মচক্র সেইরূপ জানিবে । অতএব কর্মফল ভোগ শেষ
না হইলে মোক্ষলাভের আশা স্ফূর্ত পরাহত ।

ত্রিবিধ হোহি কর্ম সর নরকো ।

সন্ধিৎ আরব্ধ ক্রিয়মাণ করিকো ॥

তাসে সন্ধিত ক্রিয়মাণ যো হোহি ।

ভক্তি জ্ঞান প্রায়শ্চিত্ত যো করহি ॥

তাসে নাশ হৌহিঁ দেউ কর্ম্ম।

নিশ্চয় ইহ জানহ শুভ ধর্ম্মা ॥

প্রারব্ধ কর্ম্ম কঠিন জগমাহী।

ভোগ বিনা ক্ষয় হোত কভু নাহি ॥ ১৬৫ ॥

কর্ম্ম ত্রিবিধ—সঞ্চিত, ক্রিয়মাণ ও প্রারব্ধ, ইহার মধ্যে সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ-কর্ম্ম ভক্তি, জ্ঞান ও প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা ক্ষয় হইয়া থাকে। প্রারব্ধ-কর্ম্ম ভোগ ব্যতীত কখনই ক্ষয় হইতে পারে না।

হো ন্দার সো হোত হয়, তন্মোচক কোই নাহি।

ব্রহ্মা হরিহর নিয়ত কো, নহি মেটত জগমাহী ॥

তকো ভেদ শুনহ মন লাই, বৈজ্ঞ পুরোহিত কো প্রভু তাই।

কোউ রোগী কোহী জগমাহী, ভোগত রোগ সদা তনমাহি ॥

দোষজ কর্ম্মজ গ্রহগণ জনিতা, তিনপ্রকার রুজ সবকো হোতা।

করম হোহিঁ মত তিন সবনকো,

যা মে সংশয় নাহিঁ কছু তনিকো ॥ ১৬৬ ॥

যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইবে—তাহার রোধ করিতে কেহ পারে না। অপরের কথা দূরে থাকুক—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও ইহার হস্ত অতিক্রম করিতে অসমর্থ। মানবগণ কর্ম্মজ, গ্রহজ ও দোষজ এই তিনপ্রকারে জগতে কষ্টভোগ করিয়া থাকে। তন্মধ্যে গ্রহজ দোষ পুরোহিত দ্বারা শাস্তি করাইলে নষ্ট হয়; দোষজ রোগ বৈজ্ঞাদির দ্বারা চিকিৎসা করা হইলে আরোগ্য হয় কিন্তু যাহা এইরূপ কোন উপায় দ্বারা প্রশমিত না হয়—তাহাকে কর্ম্মজ দোষ জানিবে—ভোগ ব্যতীত ইহা নষ্ট হইবার নহে।

পরো কোই নদী বীচমে জলতরঙ্গ মই যাহিঁ।

বুড়ো জানি পয়রত তঁহঁ, যো কছু খাশ্রয় নাহি ॥

নাও পাই আশ্রয় করে, সো সূচতুর মতিমস্ত ।

যত্ন করে বঠি বেগতে, সমবাহ ভেও স্মধীমস্ত ॥ ১৬৭ ॥

নদীর প্রবল তরঙ্গে পড়িয়া যদি কেহ সন্তরণ দেয়—অথবা যদি গমনশীল কোন জলযানের সাহায্য অবলম্বন করে—তাহা হইলে সে যেমন ভীষণ তরঙ্গ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়—সেইরূপ এই ভীষণ সংসার সমুদ্রে যত্ন করিলে কিনা হইতে পারে? চেষ্টা ও যত্ন করিলে ঐহিক ও পারত্রিক উভয় বিধ কষ্ট হইতে জীব অনায়াসে মুক্তিলাভ করিতে পারে।

যো নহি হোত কৰ্ম বলবস্তা,
নল আকু রামচন্দ্র বলবস্তা,
করু কুলরাজা যুধিষ্ঠির নৃপহি,
দুঃখভোগ কো দিহু নিত নিতহি ।
যো নহি মিটে কৰ্ম নিত ভাই ।
বৃথা হোত নরকো প্রভু তাই ।
ভব কারজ সব করহি বৃথাহি ।
বেদ পুরাণ উপদেশ কভু নাহি ।
হোয় আদৃষ্ট সো হোই হঠ করিকে ।
করহি কাম নর বৃথা শ্রম করিকে ।
বৃথা হোহি ঋষিগণকো রচিতা ।
বৃথা হোহি তও ভাগবত গীতা ।
যাকো ভেদ শুনহ মন লাই ।
যতপি হয় কৰ্মণ কো প্রভু তাই ॥
কৰ্ম হোত অদৃষ্ট জগমাহী ।
যতন বিনা সমরকে কছু নাহি ॥

জীব যত্ন সব করহি, তব কৰ্ম দেত ফল তাহি,

জীব সাধ্য কারজ সব, যামে সংশয় নাহি ॥ ১৬৭ ॥

কৰ্মফল সকলের মূল না হইলে মহারাজ নল, প্রভু রামচন্দ্র ও পাণ্ডবরাজ ধার্মিকপ্রবর রাজা যুধিষ্ঠিরকে এত ক্লেশভোগ করিতে হইত না। এইপ্রকার সন্দেহে বশবর্তী হইয়া যদি বল—মানবও মানবশরীরের প্রভু কিছু নয়, বেদ পুরাণ কিছু নয়, ঋষিবাক্য কিছু নয়, ভাগবত গীতাদির পাঠও বৃথা—যখন কৰ্মই প্রবল তখন এসকল মানিবার আবশ্যক কি? ইহার উত্তর—কৰ্মই প্রধান বটে কিন্তু সেই কৰ্ম অদৃগরূপ জড়, মানবের যত্ন ভিন্ন কোনপ্রকার ফল প্রদানের ক্ষমতা তাহার নাই। যেমন যত্ন করিয়া কৃষিকৰ্ম না করিলে তাহাতে চাষ-আবাদ ভাল হয় না; অথবা যেমন তাহা নষ্ট হইয়া যায়। সেইরূপ যত্ন করিয়া কাজ করিলে তাহার ফল অনিবার্য।

সব জীবনকো কৰ্ম হয়, অতি প্রচণ্ড জগমাহী।

নর কিল্লর দেবতাদিকে, ছাড়ত কহ নাহি ॥

ব্রহ্মাকো জিহ্বকা রজ দিল্লা, বিষ সৃষ্টিকর্তা জিন বিহ্লা।

বিষ্ণুকো পরিপালকো কিল্লা, দশ অবতার রূপ হরি লিল্লা ॥

শিবকো নাশক কিল্ল জগমাহী, ভিক্ষাসন কপাল কর মাহী।

সূর্য্য নিতহি ব্রহ্মত গগনমে, তথৈ নিত্যং নমই কৰ্ম্মণে ॥

দেবনকো সেহ কিল্ল বস, গন্তি জীব কভু নাহি।

কৰ্ম্মণকো যো মিটত হয়কো, মর সশ জগমাহী ॥ ১৬৮ ॥

কৰ্মই সকলের প্রবল নিয়ামক—সকলের পক্ষে কৰ্মই প্রধান। এই কৰ্মশক্তির দ্বারা ব্রহ্মাও রচনা কার্যে ব্রহ্মা নিয়োজিত, বিষ্ণু পালনকার্যে রত হইয়া সময়ে সময়ে নানা অবতার গ্রহণ করিয়া

থাকেন। এবং অবশেষে সকলের নিধনকার্য্যে কপালগুণে ভিক্ষুক
বেশে রুদ্রদেব নিযুক্ত, আকাশপটে আলোক প্রদানের জন্ত রবি-
শশী নিয়োজিত,—অতএব এই প্রবল কৰ্ম্মরূপী নারায়ণকে প্রণাম
করি। যে কৰ্ম্মে সুবাসনা রক্ষা করিয়া, সেই সকল ফল হইতে আপনাকে
নিবৃত্ত করে, একপক্ষী মানবের কথা আর কি বলিব ?

শুনহ ভারত ভাবী প্রবল, বিলখি কহে উ মুনিনাথ।

হানিলাভ জীবন মরণ যশ অপযশ বিধি হাথ ॥ ১৭০ ॥

মহামুনি বশিষ্ঠদেব রাজা ভারতকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—
হে রাজন! আমার কথা শ্রবণ কর। আমি সবিশেষ বিচার
করিয়া তোমাকে বলিতেছি যে কৰ্ম্মই জীবকুলের ভাবী ফলদান
করিয়া থাকে। যাহা অদৃষ্টে ঘটবে বলিয়া লিখিত হইয়াছে—তাহা
অবশ্যই ঘটবে—কেহই তাহাকে লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। জীবন,
মরণ, যশ, অপযশ সকলেই সেই নিয়ন্তার নিয়ম, কৰ্ম্মফল অনুসারে
তিনি সকলকে উহার ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

কৰ্ম্ম বচন মন ছাড়ি ছল, জন্মলাগি জনম ওদ্ধার।

তব লগি সুখ স্বপনেছ, নহি কিয়ে কোটি উপচার ॥ ১৭১ ॥

মানুষ যতদিন না কপটতা ত্যাগ করিয়া কৰ্ম্মদ্বারা, মনদ্বারা এবং
বাক্যদ্বারা স্রীভগবানের পদাশ্রয়ে আশ্রয়গ্রহণ না করিবে—ততদিন কোটি
কোটি উপায় অবলম্বন করিলেও কোন প্রকার সুখলাভের আশা নাই।
ঐক্লপ না করিলে ইহকাল ও পরকালের উভয়রূপ সুখ বিনষ্ট হইবে।

পতিপ্রিয় নারী পতিব্রতা, ছাড়ত নহি পতিলেহ।

সেও ত মন বচ কৰ্ম্মতে, পতিচরণ ন অতি স্নেহ ॥

জয়সে তহু ত্যজি ছায় নহি, প্রভাতজহি নহি ভায়।

চন্দ্র ত্যজহি নহি চন্দ্রিকা, পতিব্রতা তিয় জলু ॥ ১৭২ ॥

পতিব্রতা নারী কায়মনোবাক্যে অকপটে স্বামীর সেবা-সুশ্রীষা করিয়া থাকেন, এবং স্বামীপদে একান্তমতি হইয়া অবস্থিতি করেন। তাঁহারা স্বামীকে একমুহূর্ত্ত পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন না। যেরূপ দেহ ছাড়া ছায়া থাকেনা, সূর্য্য ছাড়া প্রভা থাকে না, চন্দ্র ছাড়া চন্দ্রিকা থাকে না, সেই পতিব্রতা নারী কখন স্বামী ছাড়া থাকিতে পারে না।

সম্ভাবিতজন নিকরকে, অবশ কঠিন ভূবি মাহ।

তাতে কোটি দুঃখ মর্ম্মমহ, মরণ শ্রেষ্ঠ হুর নাহ ॥ ১৭৩ ॥

মাননীয় ব্যক্তিগণের মান নাশ অতীব দুঃখদায়ক—এই দুঃখ তাহাদের হৃদয়ভেদী যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে—এইজন্ত সকলে বলিয়া থাকেন—“যাক প্রাণ থাক মান;—মান না থাকিলে প্রাণ লইয়া ফল কি? মানই ত প্রাণীর পক্ষে প্রাণোপম দ্রব্য—মানক্ষয়ে প্রাণক্ষয় হওয়াও ভাল।

মোহনিশা সব সো অনিহারা।

দেখহি স্বপ্ন অনেক প্রকারা ॥

ইহি জগয়ামিনী জাগহি যোগী।

পরমারথ পর পঞ্চ বিয়োগী ॥

জানিয়ে তবহি জীব জগজাগা।

যব সব বিষয় বিলাস বিরাগা ॥

হোই বিবেক মোহ ভ্রম ভাগা।

তব রঘুবীর চরণ অমুরাগা ॥ ১৭৪ ॥

ইহ সংসারের জীবগণ মোহঘোরে শয়ন করিয়া নানাপ্রকার স্বপ্ন-স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। আর যোগী বিবেকী ঈশ্বরান্বেষণ এই সংসারনিশায় জাগিয়া কাল কাটান। যখন জীবসকল বিষয়বাসনা

পরিভ্যাগ করিয়া বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন—তখন তাহার।
সংসারনিশায় জাগিয়া কাল কাটান। এইজন্য যখন মানব হৃদয়ে
বিবেক-বৈরাগ্যের উদয় হইয়া মোহজাল বিদূরিত হয়—সেই সময়
তাহাদের হৃদয়ে অমুরাগ ও ভক্তির উদয় হয়—অন্য সময় মন
ঈশ্বরমুখী হয় না।

স্বপ্নে হোই ভিখারী নৃপ, রত্ন লোকপতি হোই।

জাগে লাভ ন নাহি কিছু, তিমি প্রবঞ্চজিয় সোই ॥ ১৭৫ ॥

সংসার অনিত্য—ইহার সকলেই ভ্রমমাত্র। স্বপ্নাবস্থায় যেমন
ভিখারী ভূপতি হয় এবং ভূপতি ভিখারী সাজেন কিন্তু স্বপ্ন অবসান
হইলে যেমন কাহার কোন লাভ বা ক্ষতি হয় না, যিনি যেমন তেমনি
থাকেন। সংসারও সেইরূপ জানিবে—ইহার সমস্ত মায়াময় অসত্য।

কেউ না কাহে দুঃখ স্থখ করদাতা।

নিজ কৃত কর্মভোগ সব ভ্রাতা ॥

যোগ বিয়োগ ভোগ ভালমন্দা।

হিত অনহিতা মধ্যম ভ্রমকন্দা ॥ •

জন্ম মরণ জহ লাগি জগজাহু।

সম্পত্তি বিপত্তি কর্ম অরু কাহু ॥

ধরণি ধাম ধন পুর পরিবার।

স্বর্গ নরক জগ লাগি ব্যবহার ॥

দেখিয়া শুনিয়া গুনিয় মনমাহী।

মোহমূল পরমারথ নাহী ॥ ১৭৬ ॥

জগতে কেহ কাহাকে স্থখ বা দুঃখ দিতে পারে না। মানব
নিজকৃত কর্মকলে এ সমস্ত ভোগ করে। প্রিয়ব্যক্তি সংযোগ বিয়োগ,
ভালমন্দ ভোগ, হিতাহিত কর্ম, উদাসীণ্য—এ সমস্তই ভ্রম হইতে

উৎপন্ন। জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার, ধন-সম্পত্তি, কার্যকাল গৃহাদি, ভূমি, গ্রাম, পরিবার, স্বর্গ, নরক যাহা কিছু দেখা যায়, শুনা যায় এবং মনে করা যায়—এ সমস্তই ভ্রমাত্মক—পারমার্থিক সত্য ইহার একটিও নহে।

সহজ সরল সাধুর বচন, কুমতি কুটিল করি জ্ঞান।

চলে জোক জিমি বক্রগতি, যদ্যপি সলিল সমান ॥ ১৭৭ ॥

সাধু ব্যক্তিগণের বাক্য স্বভাবতই সরল ও সহজ বোধ্য কিন্তু কুটিল ব্যক্তি সে সকল বাক্য কিছুতেই সহজ বলিয়া বোধ করে না। যেমন সলিল সরলভাবে থাকিলেও জোকের গতি বক্র হয়—কুটিল লোকের মনও তদ্রূপ।

তৃষিত বারি বিহু জেও তনুত্যাগ।

মূত্র করে কা স্থা তড়াগা ॥

কা নর্ঘা যব কৃষী স্থানে।

সময় চুকি পুনি কা পুছতানে ॥ ১৭৮ ॥

ঠিক সময়ে কার্য্য করিতে ভুল হইলে যেমন অহুতাপ করিলে কোন ফল হয় না—এবং তাহা সমাধা করাও কঠিন হইয়া পড়ে। পিপাসাতুর ব্যক্তির পিপাসায় দেহত্যাগ হইলে, পরে তাহাকে যেমন অমৃত-সাগরে ডুবাইলেও কোন ফল হয় না, বারিবর্ষণ বিনা শস্তাদি ধ্বংস হইলে যেমন পরে জলবর্ষণে কোন উপকার হয় না; সেইরূপ যথাসময়ে কার্য্য সম্পন্ন না করিয়া অসময়ে কার্য্য সম্পাদনে কোন ফল নাই। এইজন্য যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনে বিন্ধিত হওয়া কাহার উচিত নহে।

মস্ত্র পুরম লঘু যাশু বশ, বিধি হরি হর স্থব সর্ব্ব।

মহামন্ত গজরাজ কঁহ, রক্ষা কর অঙ্কুশ ধর্ম্ম ॥ ১৭৯ ॥

বাক্যের যুক্ত রাম ও কৃষ্ণ মন্ত্র অতি ক্ষুদ্র কিন্তু তাহার দ্বারা

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এবং ইন্দ্রাদি দেবগণও বাঁধা রহিয়াছেন—
বাস্তবিক ইহা বেশী আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যখন অতি ক্ষুদ্র লোহের
অক্ষুশ দ্বারা মদমত্ত হস্তী বশীভূত হয়, তখন এই ক্ষুদ্র মস্ত্র দুইটীর
দ্বারা ব্রহ্মাদি দেবগণ যে বশীভূত হইবেন—ইহার আর অশ্চর্য্য কি ?

উদিত উদয়গিরি মঞ্চপর ।

রঘুপতি বাল পতঙ্গ ॥

বিকশে সন্ত সরোজ সব ।

হেরথে লোচন ভুঙ্গ ॥ ১৮০ ॥

জনক নন্দিনী জানকীর পরিণয় সভায় শ্রীরাম লক্ষণ দিব্য মঞ্চ-
পরি উপবেশন করিয়াছিলেন। ভক্ত কবি তুলসীদাস সেই শোভা
বর্ণনা করিবার ছলে বলিতেছেন—উদয়াচলে সূর্য্য উদয় হইলে
যেমন পদ্ম সকল বিকশিত হইয়া বিহার করে এবং তাহার চারিধারে
ভ্রমর সকল গুণগুণস্বরে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়—সেইরূপ সেই উচ্চমঞ্চের
উপরে রামরূপ দেখিয়া ভক্ত সাধুগণ প্রফুল্লানন হওয়ায় তাহাদের প্রফুল্ল
নয়ন সকল ভ্রমরের স্তায় সেই অপরূপ রূপ মাধুরী দেখিবার জন্য বিব্রত
হইয়াছিল। ভক্ত কবি নিজকৃত রামায়ণে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

রিপু তেজস্বী অকালে অপি, লঘু করি গনিযে না তাহ ।

অজহ দেত ভূখ রবি শশির্হি, শির অব শোষিত রাহ ॥ ১৮১ ॥

শত্রুকে যদি একাকী এবং হীনবল দেখ এবং নিজেকে তাহার
অপেক্ষা তেজস্বী এবং ক্ষমতাশালী বলিয়া মনে কর—তথাপি তাহাকে
উপেক্ষা করা উচিত নহে। যেমন রাহ অতি ক্ষুদ্র হইলেও গ্রহণ
কালে চন্দ্র-সূর্য্যকেও যন্ত্রণা প্রদান করে। রাহ কত ক্ষুদ্র এবং
চন্দ্র-সূর্য্য কত বৃহৎ এবং তেজস্বী তথাপি রাহ সময়ে সময়ে—
তাহাদের শত্রু হয়। এজন্য শত্রু ক্ষুদ্র হইলেও উপেক্ষার বস্তু নহে।

সুখ হাড় লে ভাঙ শঠ,
 স্থান নিরখী মুগরাজ ॥
 ছিনি লেই জিনি জ্ঞান বড় ।
 তিমি সুর পতিহি ন লাজ ॥ ১৮২ ॥

দেবরাজ ইন্দ্র সর্বদাই সাম্রাজ্য লোভে ব্যস্ত—এইজন্য তুলসীদাস বলিতেছেন—কেহ যদি কখন তপস্তা করিতে অগ্রসর হয়—ইন্দ্র অমনি মনে বুঝেন সেই তপস্বী তাঁহারই ইন্দ্রত্ব লইবার জন্য তপস্তা করিতেছে। এইভাবে তিনি সেই তপস্বীর তপস্যায় বিঘ্ন উৎপাদনের চেষ্টা করেন। কিন্তু তপস্বীরা যে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বকে কাকবিষ্টার গ্রাঘ জ্ঞান করে—তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না। যেমন একটা কুকুর সিংহ দর্শনে ভীত চিত্ত হইয়া আপনার মুখের শুষ্ক মাংস লইয়া পলায়ন করে—মনে করে, বুঝি সে তাহার মুখের এই মাংস কাড়িয়া লইবে। বিষয়ী ব্যক্তি বিষয়ের জন্য এইরূপই করিয়া থাকে—বিষয় ছাড়া তাহার আর কিছুই চায় না—কিন্তু যাহারা ভগবানে চিত্ত দৃঢ় করিয়াছে, তাহার কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে গ্রাহ্য করে ?

ইহি বিধি জগ হরি আশ্রিত রহই ।

যদপি অসত্য দেত দুঃখ অহই ॥

যো স্বপনে শির কাটে কোই ।

বিনু জাগে দুঃখ দুঃখ ন হোই ॥

যাসু কৃপা অস জম মিটায়াই ।

গিরিজা সোই কৃপালু রঘুরাই ॥

আদি অন্ত কোউ যাহন পাত্তা ।

মতি অহুমান নিগম আস গাত্তা ॥ ১৮৩ ॥

ভগবানের সত্যতা লইয়াই এই জগতের সত্যতা উপলব্ধি হয়,

তাহাকে অবলম্বন করিয়াই এই চরাত্র অবস্থিত। যদি এই জগৎ অসত্য এবং দুঃখদায়ক হয়। যেমন স্বপ্নাবস্থায় কেহ কাহার মাথা কাটিলে তাহার কষ্ট হয়, কিন্তু স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে যেমন সে দুঃখ আর থাকে না। সেইরূপ জ্ঞানের উদয় হইলে জগৎ সম্বন্ধে জীবের সকল ভ্রান্তি দূরীভূত হয়। ভগবানের রূপা না হইলে জীবের এই জ্ঞানলাভ হয় না—তিনি রূপা করিয়া জ্ঞানদান করিলে তখন স্বপ্ন দূর হয়—জাগরণ আসিয়া জীবকে জ্ঞানী করে এবং সেইসময় সে সংসার দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। ভগবানের আদি অস্ত কেহই নিরাকরণ করিতে পারে না, তবে সসীম মানব নিজের বুদ্ধি অল্পসারে সেই অসীমের একটা রূপ নিদ্বারণ করে মাত্র।

রজত শীপ পল ভাষয়িশি যথা ভানু করবারি।

যদপি মুখা তিহঁ কাল, সোই ভ্রমণ সকে কোউটারি ॥ ১৮৪ ॥

শুভ্রিতে যেমন রজত ভ্রম, সূর্য্য কিরণে বা মক্কভূমে যেমন জলভ্রান্তি—ইহা যেমন ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান চিরদিন চলিয়া আসিতেছে; মিথ্যা হইলেও যেমন তাহা নিরাকরণে কেহ সমর্থ হয় না, সেইরূপ এই জগৎ বাস্তবিক মিথ্যা হইলেও ভ্রম বশত সকলেই সত্য বলিয়া মনে করে।

জগত প্রকাশ প্রকাশক রামু, মায়াধীস জ্ঞান গুণধামু।

বাহু সত্যতাতে জড় মায়া, ভাস সত্য ইব মোহসহায় ॥ ১৮৫ ॥

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রই এই জগৎ প্রপঞ্চের প্রকাশক—তাহারই মায়ায় এই জগৎ প্রকাশ হইয়াছে; তাহারই আদেশে মহামায়া এই জগত কার্য পরিচালনায় ব্যাপ্তা রহিয়াছেন। সেই রামচন্দ্র জ্ঞানস্বরূপ, সত্যাদি গুণ সমূহের আশ্রয়—তাহারই সত্যতায় এই মিথ্যায় জগৎ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

বিবসই জাহ্নু নাম নরক রহী,
জন্ম অনেক সঞ্চিত অঘ দহহী ।
সাদর স্মিরণ যো নর করহী,
ভববারিধি গোপদ ইব তরহী ॥১৮৬॥

অনিচ্ছা বশে রামনাম উচ্চারণ করিলেও যখন বহু জন্মার্জিত
পাপরাশির ধ্বংস হয়—তখন যে ব্যক্তি পরমানন্দে সেই রামনাম
উচ্চারণ করিবে—সে যে এই ভব জলধী গোম্পদের ত্রায় অবহেলে
উত্তীর্ণ হইবে—তার আর বিচিত্র কি ?

রামনাম কর অমিত প্রভাবা ।
সন্ত পুরাণ উপনিষৎ গাওয়া ॥
সন্তত জপত শঙ্কু অবিনাশী ।
শিব ভগবান-জ্ঞান গুণরাশি ॥
আকরচারী জীবজগ অহ হাঁ ।
কাশী মরত পরমপদ লহ হাঁ ॥ ১৮৭ ॥

সকল সাধুগণ, পুরাণ, বেদ, উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্রে রামনামের
প্রবল প্রভাব কীর্তন করিয়াছেন। অবিনাশী শিবশঙ্কু এই নামের
গুণকীর্তন করিয়া সকল গুণের আদারস্বরূপ হইয়াছেন। ৮কাশীধামে
জরায়ুজ, অণুজ, শ্বেদজ যে কোনপ্রকার জীবই পঞ্চপ্রাপ্ত* হউক না
কেন, শিব তাহার কর্ণে এই তারকব্রহ্ম রামনাম শুনাইয়া দেন—
তাহাতেই জীব মোক্ষপদপ্রাপ্ত হয়।

কুপথ কুতর্ক, কুচালি, কপটদম্ব পাষণ্ড ।

দহন রাম গুণগ্রাম ইমি ইচ্ছন অনল প্রচণ্ড ॥ ১৮৮ ॥

কলিকালের মানব অতীব অনাচারী, দাস্তিক, কপট, পাষণ্ড,
অপথ ছাড়িয়া তাহার অহরহ কুপথে গমন করে। কিন্তু তাহার

এত কুর্কর্ম করিয়াও যদি প্রাণ ভরিয়া রামনাম উচ্চারণ করে—
তাহা হইলে অগ্নিতে যেমন শুষ্ককাষ্ঠ দগ্ধ হইয়া যায়—তাহাদের
পাপও তদ্রূপ এই রামনাম আশ্রমে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া থাকে,
তাহাতে আর সন্দেহ নাই :

ব্রহ্মরামতে নাম বড় বরদায়ক বরদানী ।

রামচরিত শতকোটি মহলিয় মহেশজীয় জানি ॥ ১৮২ ৥

ব্রহ্ম হইতে রামনাম বড় এবং বরাভয় প্রদায়ক, এইজন্য ভগবান
সদাশিব শতকোটি রামায়ণ অপেক্ষাও রামনামের মহিমা বড় বলিয়া
পঞ্চমুখে গান করিয়া থাকেন ।

রাম এক তাপস তিয়তারী ।

নাম কোটি ধল কুমতি সুধারী ॥

ভঞ্জেউ রাম আপ ভববাপু ।

ভব ভয় ভঞ্জন নাম প্রতাপু ॥

নিশিচর নিকর-দলে রঘুনন্দন

নাম সকল কলিকলুষ নিকন্দন ।

নামলেত ভবসিদ্ধ সুখাহী ।

করছঁ গুজন বিচারী মনমাহি ॥ ১৮৩ ॥

ভগবান রামচন্দ্র পদধূলি দান করিয়া তাপস প্রবর গোতমের পত্নী
পাৰাশরময়ী অহল্যাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন । রামনাম অনেক কুর্কর্মী
জীবকেও দুষ্কার সংসার সমুদ্রে হইতে উদ্ধার করিয়াছে । তিনি
শিব-ধনু ভঙ্গ করিয়াছিলেন—তাঁহার নামে জীবের ভব বন্ধনমোচন
হয় ; রামচন্দ্র রাক্ষসকুল ধ্বংস করিয়াছিলেন—তাঁহার নাম করিলে
ষাবতীয় পাপনাশ হইয়া থাকে । ভগবান রামচন্দ্র যদিও অনেক বানর
কটক সহায় করিয়া সাগর বন্ধন করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার নাম

করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ এই ছুত্তর ভবসাগর পার হওয়া যায়।

(তুলসীকৃত রামায়ণ)

নিগুণেতে হই জ্ঞাতি বর্তনাম প্রভাব অপার।

কহউ নাম বড় রামতে নিজ বিচার অমুসার ॥ ১১১ ॥

রামনামের প্রভাব অত্যন্ত অধিক, এবং তাহা নিগুণ ব্রহ্ম হইতেও বড়, সাধককবি তুলসীদাস ইহা নিজকৃত রামায়ণে বহু বিচার দ্বারা স্থিরীকৃত করিয়াছেন।

গ্রহভেদজ জল পতন, পট পাই সুযোগ সুযোগ।

হোই কুবজ সুবজ জগ, দেখিহি সুলক্ষণ লোগ ॥ ১১২ ॥

কুসংসর্গে সুও কু হয়। পাপগ্রহের সংসর্গে সুগ্রহও পাপগ্রহ হয়, ভাল ঔষধও কু-দ্রব্যের সংযোগে গুণহীন হইয়া উঠে, কুবজের মিলনে ভাল জলও নিন্দনীয় হয়, আবার ভালবস্তুর মিলনে ভাল হয় কাপড় উৎকৃষ্ট বর্ণে রঞ্জিত হইলে উত্তম হয়—নিকৃষ্ট বর্ণের সহিত মিলিত হইলে তাহা একেবারে অব্যবহার্য্য হইয়া থাকে—বাতাসও ঐরূপ হইয়া থাকে জড় চেতন গুণ দোষময়, বিশ্ব কিহু করতায়।

সস্ত হংস গুণ গহহি পয়, পরিহরি বারি বিকার ॥ ১১৩ ॥

এই জগতে জীবমাত্রেই দোষ-গুণযুক্ত কিন্তু রাজহংস যেমন জলীম অংশ পরিত্যাগ করিয়া শুষ্কের সারভাগটুকু গ্রহণ করে। সাধু-গণও তেমনি জীবগণের অসার ভাগ পরিত্যাগ করিয়া সারভাগ যে গুণ, তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

অতি মঙ্গলময় জানিয়ে সাধুসমূহ সমাজ।

জয়সে জগকে বীচমে তীরথ তীরথরাজ ॥

রামভক্তি ইহ স্বধুনী বাণী ব্রহ্ম বিচার।

বিধি নিবেদনময় কলিমলহরণী যমুনা কর্মপ্রচার ॥

(২৭)

জ্ঞান অক্ষয় বট হুভগজন অচল ধর্ম বিশ্বাস ।

পরহিতকারী সাধু জন অটল ভক্তি নির্ধার্স ॥

শুনি সমুঝহি জনমুদিত মন মজ্জহি অমুরাগ

লাহিহি চারিফল আচ্ছ তমু সাধু সমাজ প্রয়াগ ॥ ১২৪ ॥

সাধু সমাজ অতি মঙ্গলময় জানিবে, যেমন জগৎ মধ্যে তীর্থরাজ বর্তমান—উহাও সেইরূপ। রামভক্তিই সাধু সমাজের গঙ্গাধারা ব্রহ্ম-বিচার, সরস্বতী এবং নিকাম কর্মকাণ্ডের কথাই যমুনা নামে অভিহিত, এবং সাধুগণের বিচাররূপ অমর বৃক্ষই অক্ষয়-বটবৃক্ষরূপ। যে ব্যক্তি এই সাধুসমাজে গমনপূর্বক ভক্তিভাবে হরিকথা শ্রবণ করিয়া দৃঢ়চিত্তে তাহাতে নিমগ্ন হয়—তাহাই প্রয়াগক্ষেত্রের স্নান বলিয়া মনে করিবে। মাহুষ প্রয়াগে চতুর্কর্গ ফল লাভের আশায় ছুটাছুটি করে কিন্তু একমাত্র সাধুসঙ্গ করিলেই যে ঐ ফললাভ হইয়া থাকে। এইজন্ত ভক্ত সাধক তুলসীদাস বলিতেছেন—সাধুসমাজ প্রয়াগ তীর্থ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

কাম আদি মদ দত্ত নহি যাক উরমে আই ।

যত নিরন্তর হোত হয় বসতাকে রঘুরাই ॥ ১২৫ ॥

যে সকল ব্যক্তির হৃদয়ে কামাদি বাসনা, মদ, অহংকার প্রভৃতির উদয় না হইয়া চিত্ত অহরহঃ জগদৌশরের অমুরাগী থাকে; তাহার নিকট ভগবান সদা সর্বদা বর্তমান থাকিয়া তাহার হিত সাধনা করিয়া থাকেন।

শ্রবণাদি নবভক্তি তব্ উপজত হয় উর আই ।

হরলীলা রতি হোত হয়, ভক্ত সঙ্গ মন ভাই ॥ ১২৬ ॥

ভগবানের প্রতি অমুরাগ বন্ধমূল হইলে চিত্তে স্বভাবতই নবধা-ভক্তির উদ্ভেক হইয়া থাকে। তাহাতে ভগবানে বিশ্বাস অটল হয়

এবং সর্বদা ভক্তসঙ্গে বাস করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে। নবধাত্তিক
যথা—শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণু চিন্তয়া, পাদসেবনং অৰ্চনং বন্দনং দাস্যং
সখ্যমাশ্রয় নিবেদনং।

সাধন ভক্তিকে শুনছঁ অব কহৌ বখানি বিধান।

প্রথম বিপ্রগুরু সন্ত রতি শ্রীয ধর্ম বিধি মান ॥

তাতে যব্ জন জানিএ উপজে বিষয়-বিরাগ।

তব্ হরিচরণ কমলপর উপজত হয় অমুরাগ ॥ ১২৭ ॥

তুলসীদাস বলিতেছেন—সাধন ভক্তির গুণ বর্ণনা করিতেছি
শ্রবণ কর—প্রথমে ব্রাহ্মণ, গুরু এবং সাধু ব্যক্তি প্রতি অমুরাগ
দেখাইবে, তারপর আপনার আশ্রমোচিত বেদবিহীত ক্রিয়া কাণ্ডের
অনুষ্ঠান করতঃ যখন হৃদয়ে বিষয় বৈরাগ্যের উদয় হইবে—তখন
বুঝিতে হইবে—হরি পাদপদ্মে রতিমতি স্থির হইয়াছে।

সন্ত সঙ্গতে হোত হয় ভক্তি মুক্তিকর মূল।

তাহি স্থলভ বারি মানিয়ে মিলে যা সাধু অমুকুল ॥ ১২৮ ॥

“সকলের মূল ভক্তি মুক্তি হয় মন তার দাসী,” সাধুসঙ্গ হইতেই ভক্তি
ভাব জাগিয়া উঠে। প্রথমে সাধুসঙ্গ করিলে তাহাদের হৃদয়ে দয়ার
সঞ্চার হয়, তারপর তাহাদের কার্যো শ্রদ্ধা জন্মিলে ভগবানে অমুরাগ
আসিয়া উপস্থিত হয়। এই জন্য সাধুসঙ্গই হরিভক্তিলাভের এক-
মাত্র উপায় জানিবে।

ঈশ ভক্তিতে হোত হয় স্থলভ জ্ঞান বিজ্ঞান।

ভক্তি মহৎগুণ ধরত হয়, অনুপম সুখ স্থানিদান ॥ ১২৯ ॥

ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির উদয় হইলেই জ্ঞান-বিজ্ঞান আপনি-
প্রকাশ পাইয়া থাকে, ভক্তি মহৎগুণ ধারণ করিলে তাহাই জীবের
স্বখের নিদান হইয়া থাকে।

জাতে বেগি প্রভু দ্রবত ইয় সো প্রভুভক্তি প্রভাউ ।

ভক্তি স্বতন্ত্র করি জানিয়ে অবলম্বন নহি কাউ ॥ ২০০ ॥

যাহাতে অতি সত্ত্ব ভগবানের দয়া লাভ করিতে পারা যায়—সে উপায় ভক্তি ভিন্ন আর কিছুতে নাই । ভক্তিবলে ভগবান দ্রবীভূত হন এবং ভক্তকে রূপা করিয়া থাকেন ; ভক্তি এক স্বতন্ত্র জিনিষ—ভক্তি ভিন্ন মুক্তির আর অন্য উপায় নাই ।

বিরতি ধর্ম্মেতে হোত হয় জ্ঞানযোগেতে হোয় ।

মোক্ষ জ্ঞানেতে হোত হয় বেদ প্রমাণ ন গোয় ॥ ২০১ ॥

যাবতীয় কর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ করত জ্ঞানযোগ দ্বারা কর্ম্মাহুষ্ঠান করিলে সংসার-বিরাগ জন্মে এবং তাহা হইতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে, ইহা কেবল মুখের কথা নহে—বেদবাক্য ।

মায়া ঈশন আপু কই জানি কহে সেহ জীব ।

বহু মোক্ষপ্রদ সর্ব্বপর মানা প্রেরক শিব ॥ ২০২ ॥

যে ব্যক্তি মায়া, ঈশ্বর ও আপনাকে জানিতে পারিয়াছে—তাহাকে জীব বলে । মায়া-বন্ধন ছিন্নকারী মোক্ষপদপ্রার্থী পুরুষই ঈশ্বর-স্বরূপ ।

গো গোচর জইলগি মন যাই ।

সো সব মায়া জ্ঞানহুঁ ভাই ॥

তেহিকর ভেদ শুনহুঁ তুম্ সোউ ।

বিছা অপর অবিছা দোউ ॥

এক কষ্ট অতিশয় দুঃখরূপা ।

সা বশ জীব পরাভব কুপা ॥

এক রচয় জগ গুণ বশ যাকে ।

প্রভু প্রেরিত নহি নিজ বল তাকে ॥

জ্ঞানমান জহঁ একো নাহি ।

দেখত স্বাক্ষরূপ সব মাহী ॥

কহিয়ে তাতে সো পরম বিবাগী ।

তৃণময় সিদ্ধি তিনগুণ ত্যাগী ॥ ২০৩ ॥

শব্দও তাহার বিষয়ীভূত বস্তুকেই মায়া বলে । ঐ মায়ার মাত্রা ভেদে নামভেদ হইয়াছে—একবিদ্যা অপর অবিদ্যা, অবিদ্যা দুঃখের নিদান—জীব ঐ অবিদ্যামুগ্ধ হইয়া কুপপতিতের ন্যায় অন্ধ হইয়া থাকে ; ঐ অবিদ্যা এই জগৎকে আপনার বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু জীবগণ যদি ঈশ্বররূপায় একবার উহার মায়াপাশ ছেদন করিয়া বিচার আশ্রয়গ্রহণ করে—তাহা হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ মান-অভিমান ও বিষয়জ্ঞান দূরে ফেলিয়া সর্বত্র ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করিয়া থাকে । যোগীগণ সত্ব, রজঃ ও তমোগুণকে তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করত কামনাবিহীনচিত্তে প্রত্যেক বস্তুতে ব্রহ্মদর্শন করিয়া থা ন ।

ময় অরু মোয় তোয় তঁয় মায়া কহিয়ে তাহি ।

মোহ বিনা কিহো জীব সব ভ্রমত চরাচর মাহি ॥ ২০৪ ॥

জাগতিক বস্তুতে আমি—আমার ইত্যাদি জ্ঞানই মায়ার কারণ, যাবতীয় জীব এই মায়ার বশে বশীভূত হইয়া জগতে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে ।

সচীব বৈদ্য গুরু তিন যো প্রিয় বোলহি ভয় আশা ।

রাজধর্ম তন তিনকর হোই কাহি নাশা ॥ ২০৫ ॥

মন্ত্রী, বৈদ্য ও গুরু এই তিনজনই রাজধর্মের স্বরূপধারী—যাহারা এই তিনজনের প্রতি ভীত না হইয়া বিরুদ্ধ উপদেশ প্রদান করেন, তাহারা রাজ্যধ্বংসকারী বলিয়া গণ্য হইবার উপযুক্ত জানিবে ।

তবত স্বর্গ অপবর্গ সুখধরী তুলা এক অঙ্গ ।

তুলয়ন তাহি সকল মিলি যো সুখ নর সংসঙ্গ ॥ ২০৬ ॥

তুলাদণ্ডের একদিকে স্বর্গ ও অপবর্গ আর একদিকে সংসঙ্গ দিয়া
যদি ওজন করা যায়—তাহা হইলে সংসঙ্গ ভারি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হইয়া
যাইবে। অতএব সংসঙ্গের সুখ অতুলনীয়।

জনপদহিত করহি যো ভূপতি কোন সোহায় ।

নরগতি হিত করহি যো নিন্দহি নরগণ তায় ॥

দোনোকো হিত করহি যো, মুদ্রীবর গুণমান ।

অবশে সচিবন মিলহি, জগ দুর্ভাগ করিসো মান্ ॥ ২০৭ ॥

যে মন্ত্রী প্রজাবর্গের হিতসাধন করিয়া থাকেন—তিনি রাজার
অপ্রিয় হইয়া থাকেন—কারণ প্রজাপীড়ন না করিলে ধনলাভ হয়
কই? আবার প্রজাপীড়ন করিলেও মন্ত্রী প্রজাগণের বিবনয়নে
পড়েন কিন্তু যে মন্ত্রী এই উভয়ের হিতকর কার্য্য করিতে পারেন—
তিনিই যশস্বী হন কিন্তু এমন মন্ত্রী পাওয়া কঠিন।

বিনা মাঞ্জে যশ হোত হয়, দুঃখ জগত নরমাহি ।

তথা হোত হয় সুখ নরনকো, আপ দৈববল তাহি ॥ ২০৮ ॥

রাত্রি-দিবা যেমন পর্যায়ক্রমে যাতায়াত করে—যেমন তাহাদের
উপাসনা করিতে হয় না—সেইরূপ কেহ দুঃখকে প্রার্থনা করে
না কিন্তু সে আপনা হইতে আসে, সুখও সেইরূপ প্রার্থনা করিলেই
পাওয়া যায় না—যখন আসিবার সময় হয়—আপনি আসে।
এইজন্ম মানিতে হইবে—ইহাদের প্রেরণকর্তা নিশ্চয়ই কোন দেবতা
আছেন।

জয়সে রবিকর তুলাতা, নীচোত্তম জগমাহি ।

পেচক সো কর গহত নহী, বিচরত নিশিত মমাহি ॥

তয়সে নীচ গুণ গহত নহি, যদ্যপি পাত সমীপ ।

যো উত্তম সো নহত হয়, সদৃশ্য পায় সমীপ ॥ ২০৯ ॥

সূর্যের কিরণ যেমন ছোট বড় মানে না—সর্বত্রই সমানভাবে পড়িয়া থাকে—এবং ঐ কিরণ দ্বারা জীবগণ স্থখী হয় কিন্তু পেচকেরা উহার তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া অন্ধকারে গমন করে। সেইরূপ নীচ লোকসকল নিকটে সদৃশ্য পাইলেও পেচকের মত তাহা গ্রহণ করে না কিন্তু উত্তম ব্যক্তিগণ তাহা লাভ করিয়া ধন্য হয় ।

জয়সে জব সরবীচমে রহত ভেক অরু ভৃঙ্গ ।

ভেক ন পায়ে ভেদ কছু, ভৃঙ্গ পিওত সারঙ্গ ॥

যদ্যপি সাধু অসাধুজন, রহত একহী ঠাই ।

সম্মান গহত সারাংশতম নীচ গহত কছু নাই ॥ ২১০ ॥

যেমন ভেক ও ভৃঙ্গ সরোবরের কাছেই থাকে ; অথচ কমলের মধু কেবল ভৃঙ্গই পান করে—ভেক পান করেনা, সেইরূপ সাধু-অসাধু একত্র থাকিলেও সাধু সকলের সারভাগ গ্রহণ করে—অসাধু তাহা গ্রহণ করিতে পারে না ।

অগমুক্ত বনমাঝে মহ দেখি কোলকে নারি ।

শুভ্র কঠিন তম পেথিকে, দিহু ছুরমে ডারি ॥

তয়সে নীচ গৃহ জায়তে, শাস্ত নিরাদর হোয় ।

সন্তনকে গুণ নীচ নরকা, জানে প্রভু কোয় ॥ ২১১ ॥

কিরাত রমণীগণ বনমাঝে গজমুক্ত পতিত দেখিলে যেমন ভাহার আদর করে না, শুভ্র কঠিনতম পদার্থ বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করে, তাহার চিনিতেও পারে না যে ইহা অতি মূল্যবান দ্রব্য । সেইরূপ ভাল লোক নীচ লোকের গৃহে যাইলেও তাহাদের দুর্গতির একশেষ হইয়া থাকে—তাহাকে কেহ চিনিতে না পারায় অতি হেয়

জ্ঞান করে, এইজন্ত হীন ব্যক্তির নিকট সাধুজনের গমন করা উচিত নহে ।

মমতা তিমির তরুণ আধিয়ারী ।

রাগ ঘেগে উলুক খুখকারী ॥

তব্ লাগী বসত জীব উরমাহী ।

যব্ লাগি প্রভু প্রতাপ বরি নাহি ॥ ২১২ ॥

যতদিন মাহুষের হৃদয়ে হরিভক্তি-যোগ ঘারা হরির প্রভাবরূপ তপন উদয় না হয়—ততদিন তাহাদের হৃদয় মমতারূপ ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকে—এবং সেই অন্ধকার রূপ রজনীতে রাগ ঘেগে প্রভৃতি পেচকগণ সাদানন্দ মনে প্রভু হৃদয় বিস্তার করিয়া থাকে ।

ঘোর বিনিন মহ দেখি খল, গুহুহি পথিক চকাই ।

কাহে বসহ বনমাঝ তুম, কহহ মোহি সমুঝাই ॥

খল কহে মোর দেহ কো, লোম বাঘ সব খাই ।

আহু জ্ঞানি তব উঁথহি সব, জগকে নর সমুদাই ॥

সবকে অনহিত কারণ হম, বসহি ঘোর বনমাহি ।

করি নিজ হানি করহি খল, পরকে বুঝ সদাহি ॥ ২১৩ ॥

কোন বনমাঝে একজন দুরন্ত খল ব্যক্তিকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া একজন পথিক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—মহাশয় ! আপনি এই নিবিড় ব্যাঘ্র সমুদয় বনে একাকী অবস্থান করিতেছেন কেন ? তখন সেই খল ব্যক্তি বলিল—আমার স্বভাব অত্যন্ত ক্রুর—সর্বদা পরের মন্দ চেষ্টা করি—সেইজন্ত নিবিড় বনমধ্যে দাঁড়াইয়া ব্যাঘ্রের মুখে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছি, কারণ তাহা হইলে বাঘ নরমাংসের আশ্বাদ পাইয়া সমস্ত মাহুষকে ভক্ষণ করিবে । ইহাতে পথিক বুঝিল—যে খলোয়া নিজের অনিষ্ট করিয়াও পরকে জ্ঞান করিতে চেষ্টা করে ।

যাহা স্মৃতি তাহা জানিয়ে সম্পত্তি আপুহি আই।

যাহা কুমতি তাহা জানিয়ে, বিপত্তি হোত সদাই ॥ ২১৪ ॥

যেখানে স্মৃতি—সেখানে ধন সম্পত্তি আপনি আসিয়া উপস্থিত
হয়—আর যেখানে কুমতি থাকে—সেখানে অনবরত বিপৎপাতই
হইয়া থাকে।

যাকো মান মান হয়, মানীমানে সোই।

মানহীন জন মানকো কা, জানে প্রভু কোই ॥

শিবধৃত মঞ্চক চন্দ্রমা, গ্রাসে রাহ অজ্ঞান।

নীচ নীচতা গহত হয়, লঘু গুরুতা নহি ভান ॥ ২১৫ ॥

বাহার মান আছে—সেই মানীর মান বুঝে—বাহার তাহা
নাই—সে কেমন করিয়া বুঝিবে? মহাদেব চন্দ্রকে কপালে ধারণ
করেন—কিন্তু রাহ তাহাকে গ্রাস করে। রাহ অহর জাতি,—
তাহার নিজের কোন মান নাই—সেইজন্য সে কাহারও মান
রাখিতে জানে না, চন্দ্রের মান সে কি জানিবে?

যাই নিকট পহি চানিতরু, হাঁহ শমন সব শোচ।

মাংগত অভিমত পাত কল, রাউরক ভল পোচ ॥ ২১৬ ॥

সাধুগণের কাছে গেলে রাজারও যেমন আদর, দীন দরিদ্রেরও
তেমনি আদর; তাঁহারা কাহাকেও ভিন্নভাবে দেখেন না, যেমন
বৃক্ষ সকলকেই সমানভাবে আদর করে—কল-ছায়া প্রদান করে—
কাহাকেও ভিন্নভাবে ভাবে না।

এহ গ্রাসিত পুনি বাতবশ তেহি পুনি বীছি সার।

তাহি পিয়ায়ে বারুণী কহছ কোন উপচার ॥ ২১৭ ॥

যে লোক এহদোষ দুষিত অথবা পাগল এবং বুদ্ধিক দংশনে
কাতর হইয়াছে; তাহাকে পুনর্বার মদ খাওয়াইলে ফল কি?

এই সংসার মদমত্ত জীবগণের পক্ষে রাজ্য, ধন বিদ্যাদি এবং মন্থপান করা কি অনিষ্টকর নহে? / এসকলই বিষয় অনিষ্টকর।

কারণতে কারজ কঠিন বিদিত বিশ্ব হই সোরে।

কুলিশ অস্থিতে উপলতে লোহ করাল কঠোরে ॥ ২১৮ ॥

কারণ অপেক্ষা কার্য্য কঠিন—ইহা সকলেই জানে। যেমন বজ্রের কারণ অস্থি, বজ্র অস্থির কার্য্য কিন্তু এই বজ্র অস্থি অপেক্ষা কত কঠিন, আর প্রস্তর লৌহের কারণ, লৌহ তাহার কার্য্য—ইহা প্রস্তর অপেক্ষা অত্যন্ত কঠিন। এই বিশ্বসংসার ভগবানের কার্য্য এবং তিনিই ইহার কারণ হইলেও—ঈশ্বর হইতে এই সংসার বড় কঠিন—ইহার হাত এড়ান বড় সহজ কথা নহে।

রোগী শরীর মে ভোগ বহ্বাদী করিকে জান।

বিহু হরিভক্তি যোগজপ বাদী কিয়ে হুষ্ঠান ॥ ২১৯ ॥

যেমন ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির দেহে নানা প্রকার পোষাক পরিচ্ছদ ধারণ কেবল কষ্টের কারণ, সেইরূপ মানব হৃদয় ভক্তি-বিহীন হইলে যোগ-বাগ জপ-তপ কিছুই স্বকলদায়ক নহে—তাহাতে কেবল কষ্টই লাভ হয়—ইষ্টসিদ্ধি হয় না।

বাদী বসন বিহু ভূষণ বিদিত সকল সংসার।

বাদী বিস্মৃত বিহু মানিয়ে নিগুণ ব্রহ্ম বিচার ॥ ২২০ ॥

কাপড় পরিধান না করিয়া যেমন বহুমূল্য অলঙ্কার পরিধান করিলে তাহার কোন শোভা হয় না, বরং অশোভাই হইয়া থাকে। সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানে মন অভিনিবিষ্ট হইলে—আশ্রয় ধর্ম্মে মন আর তত মজিতে চায় না—কিন্তু বৈরাগ্য না জন্মিলে বিষয়-বাসনা বলবতী থাকে—সুতরাং স্বধর্ম্ম বিসর্জন দিয়া সে সময় ব্রহ্ম বস্তুর অন্বেষণ করিলে—তাহার দ্বারা নরকের দ্বারা মুক্ত করা ভিন্ন আর কিছুই হয় না।

ধনী হোয় দাতা নহি তপন করে অতিরিক্ত ।

শিলা বান্ধি পর ডারিয়ে উদষি বীচ নিঃশব্দ ॥ ২২১ ॥

যে ব্যক্তি ধনবান হইয়া দানশীল না হয়—যেক্ষের মত কেবল ধন রক্ষা করে, আর যে ব্যক্তি গরীব হইয়াও সংসার সুখে সুখী না হইয়া অশেষ যন্ত্রণাভোগ করে, অথচ তাহা পাইবার জন্য তপস্তা করে না—ইহাদের দুইজনকেই গলায় পাথর বাঁধিয়া সাগরে ডুবাইয়া দেওয়া উচিত । ইহার অর্থ এই যে কুপণ ধনীর এবং তপস্তা বিহীন দরিদ্র-জীবন কোনও কাজের নহে ।

ইচ্ছাচারী কুটিল অতি কলহ কারিণী ঘোই ।

সোতির শোচনীয় অতি পতি বঞ্চক যো হোই ॥ ২২২ ॥

যে জীলোক স্বামী সোহাগ অবহেলা করিয়া পরের সহিত আসক্তা এবং কুটিলা ও কলহপ্রিয় হয়—সে নারী সমাজে অতীব নিম্ননীয় হইয়া থাকে ; তাহার কারণ জীজাতি কখনই স্বাধীন হইতে পারে না, বাল্যে পিতামাতার অধীনা, যৌবনে স্বামীর অধীনা এবং বৃদ্ধকালে পুত্রের অধীন হইয়া তাহাদের থাকিতেই হইবে ।

দ্বিজ অপমানী শূদ্রগণ জ্ঞান গুমানী ঘোই ।

শোচনীয় যো সর্বদা মুখর মান প্রিয় হোই ॥ ২২৩ ॥

শূদ্র হইয়া যে ব্রাহ্মণের অপমান করে—সে জ্ঞানী, গুণী এবং মানী হইলেও সর্বদা নিম্ননীয় ।

নীতি হীন নৃপ শোচিয়ে প্রজাপাল মতীহীন ।

বেদ বিহীন দ্বিজ শোচিয়ে কুমতি কু কারজ লীন ॥ ২২৪ ॥

যে রাজা রাজনীতি জানেন না এবং প্রজা পালনে অক্ষয় হইয়া কেবল কুবুদ্ধি অমুসারে কার্য করেন—তিনি লোক সমাজে যেমন

অতিশয় নিন্দনীয় হইয়া থাকেন, সেইরূপ বেদজ্ঞানহীন—কুকার্য্যে রত ব্রাহ্মণগণও সমাজে হেয় হইয়া থাকেন।

শোচিয়ে গৃহী যো মোহবশ করে ধর্ম্মপথ ত্যাগ।

শোচিয়ে যোতি প্রপঞ্চরত বিগত বিবেক বিরাগ ॥ ২২৫ ॥

সংসারীর সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করা উচিত কিন্তু যে তাহা না করে—অজ্ঞানবশত যে তাহাতে জলাঞ্জলি দিয়া—কেবল বৃথা কাজে মত্ত থাকে। সে সকলের নিকট নিন্দনীয় হইয়া থাকে। কারণ কর্তব্যকর্ম্ম এবং স্বধর্ম্মাচরণ না করিলে গৃহীকে অশেষ দুঃখভোগ করিতে হয়। আর সন্ন্যাসী সকল সংসারধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া—সন্ন্যাসী হইয়া যদি তাহার আশ্রোমোচিত কার্য্য না করিয়া পুনরায় সংসারের কাজে মত্ত হয়—সে সন্ন্যাসীও নিন্দনীয়। কারণ সে ইতোনষ্ট ততো ভ্রষ্ট হইয়া কাহারও নিকট আদর পায় না—পরকাল নষ্ট করে এবং ভ্রষ্টাচারী হইয়া অবশেষে সে নরক যন্ত্রণাভোগ করিয়া থাকে।

মেরা মুজ্জকো কুছ নহি, যো কুছ হৈ সো তোর।

তোরা তুজ্জকো সোঁপতা, ক্যা লাগে হৈ মোর ॥ ২২৬ ॥

হে দীনবন্ধো! এ জগতে আমার কিছুই নাই—এই চরাচরে বাহ্য কিছু বিদ্যমান—এ সমস্তই তোমার—তোমারই জব্য তোমাকে প্রদান করিব—ইহাতে আমার কষ্ট কি প্রভু!

সাহিব তুম ন বিসারিয়ে লাখ লোগ মিলি জাঁহি।

হমসে তুম্‌কো বহু হৈ তুমসে হামকো নাহি ॥ ২২৭ ॥

হে ভক্তাধীন—হে জগন্নাথ প্রভু! তুমি এ দাসকে ভুলিও না, ঠাকুর! তোমার অনেক ভক্ত আছে—কোটি কোটি ব্যক্তি তোমাকে ডাকিতেছে—তোমার চারিদিকে কত ভক্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু হে অনাথতারণ! তোমা ব্যতীত আমার যে আর কেহ নাই—আমি

যে আর তোমা ভিন্ন কাহাকেও জানি না। অতএব আমাকে
ভুলো না দয়াময়!

প্রকৃতি মিলে মন মিলত হৈ, অনুমিলিতে ন মিলায়।

দুধ দহীতে জমত হৈ, কাঁজাতে ফট যায় ॥ ২২৮ ॥

উভয়ের সমান স্বভাব হইলেই মিলন সংঘটন হয়—নতুবা হয়
না—যেমন দধীর সহিত দুধ দিলে তাহা মিলিয়া দধী হইয়া যায়,
কিন্তু কাঁজির সহিত মিলাইলে মিলে না—কাটায়া ছানা হইয়া যায়।

উত্তম বিজ্ঞা লিজিয়ে যতপি নীচ পৈ হোয়।

পসৌ অপায়ন ঠোরমে, কংচন তজতন কোয় ॥ ২২৯ ॥

উত্তম শিক্ষালাভ নীচ ব্যক্তির নিকট হইতেও করা উচিত—কেমনা
শোণা অপবিত্র স্থলে পতিত হইলেও তাহা পরিত্যাগ করা ভাল নহে।

সজ্জন কৌ দুখহ দিয়ে, দুঃজন পুরে আশ।

জৈসে চন্দন কৌ ঘিসে, স্তম্বর দেত স্ববাস ॥ ২৩০ ॥

সজ্জনকে কষ্ট দিয়া দুঃজন ব্যক্তি আপনাদের সুখের আশা পূর্ণ
করিয়া থাকে, যেমন চন্দন কাষ্টকে ঘর্ষণ করিয়া লোকে স্তম্বর স্ববাস
গ্রহণ করে।

খুদনতো ধরণী সহে, কাঠ সহে বনরায়।

কুবচন তো সাধু সহে, ও তেঁ সমৌ ন যায় ॥ ২৩১ ॥

পৃথিবী যেমন খনন কষ্টসহ করে, ছেদনকষ্ট যেমন বনরাজী সহ করে ;
সেইরূপ কুবচন সাধুব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ সহ করিতে পারে না।

এসী বাণী বলিয়ে, মনকা আপা ধোয়।

ওরস কো শীতল করে, আপৌ শীতল হোয় ॥ ২৩২ ॥

যে রূপ স্তম্বর বাক্য দ্বারা নিজের এবং পরের হৃদয় শীতল করা যায়,
অতএব মনের মালিন্য বিসর্জন দিয়া ঐরূপ বাক্য প্রয়োগে ধৃত হইবে।

যো তুঁকুঁ কাঁটা বুয়ে, তাকি যোই তু ফুল ।

তো কোঁ ফুলকেঁ ফুল হৈ, তারোঁ হৈ তিরশূল ॥ ২৩৩ ॥

তোমার জন্য ঘে কণ্টক বপন করিবে, তুমি তাহার প্রতি ফুলের
মত ব্যবহার করিবে ; তাহা হইলে কণ্টক বপনকারীর পক্ষে তোমার
ঐ ব্যবহার ত্রিশূল স্বরূপ বোধ হইবে ।

সাঁচ বরাবর তপ নহা হৈ, ঝুট বরোবর পাপ ।

জাকো হিরদৈ সাঁচ হৈ, তাকো হিরদৈ আপ ॥ ২৩৪ ॥

সত্যের মতন তপস্যা আর অসত্যের মত পাপ আর নাই ;
যাহার হৃদয়ে সত্য বর্তমান আছে, তাহার হৃদয়ে ভগবানের আসন
পাতা রহিয়াছে জানিবে ।

জহঁ দয়া, তহঁ ধর্ম্য হৈ, লোভ জাহাঁ হৈ পাপ ।

জাহাঁ ক্রোধ তাহাঁ কলি হৈ, জাহাঁ ছমা তহাঁ আপ ॥ ২৩৫ ॥

যেখানে দয়া সেইখানে ধর্ম্য বিরাজিত, যেখানে লোভ সেই-
খানে পাপের আসন বিস্তৃত ; সেখানে ক্রোধ সেইখানেই নাশ
অবশ্যজ্ঞাবী আর যেখানে ক্ষমা, সেইখানেই ভগবান সদা সর্বদা
বিরাজ করেন ।

যাহ ঘটী চিন্তা সই মনুয়াঁ তে তরলাই ।

জিন্কে কছু ন চাহিয়ে, সোঁ সহন পতি সাই ॥ ২৩৬ ॥

মানুষ ইচ্ছার অধীন হইয়া পরাধীন ভাবে অবস্থান করিয়া
থাকে । কিন্তু এই পৃথিবীতে যাহারা কোন ইচ্ছার বশবর্তী না
হইয়া থাকে, তাহাদের জীবনই ধন্য ।

গুরু বিচারী ক্যা করে যো হিরদা ভরা কঠোর ।

নৌনেজে পানী চড়ে তউ ন ভেজে কোর ॥ ২৩৭ ॥

যেমন নদীটা বাঁশের উচ্চতার মত জল উঠিলেও পুকুরের পাক

ভিজেনা, সেইরূপ বাহাদের দ্বায় অতিশয় কঠোর—গুরু শত শত উপদেশ বাক্যও তাহাতে নম্রতা আনয়ন করিতে পারে না—অর্থাৎ সে হৃদয়ে কিছুতেই জ্ঞানের উদয় হয় না।

জিন্ খোজা তিন পাইয়া, গহরে পানী পৈঠ।

হৌবেরী ডুঁডন লই রহো কিনারে বৈঠ ॥ ২৩৮ ॥

গভীর জলাশয়ে ডুবিয়া যে রত্ন অন্বেষণ করে, সেই ব্যক্তিই রত্নলাভ করে, যেখানে সেখানে খুঁজিলে তাহা পাইবে কি প্রকারে! যে ব্যক্তি কায়মনে সাধনা করিয়া থাকে, সেই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। যে সাধনা করে না, সে প্রাপ্ত হইতে পারে না।

সুখ দুঃখ এক সমান হৈ, হরখ শোকে নাহি ব্যাপ।

পর উপকার নিহ কামতা, উপজে ছোইন তাপ ॥ ২৩৯ ॥

সুখ ও দুঃখ একই জিনিষ জানিবে—শোক সকল সময়ে থাকে না। জগতে যত প্রকার কার্য আছে, তাহাতে সময়ে সময়ে সুখ ও দুঃখ উদয় হইয়া থাকে; কিন্তু কেবল পরোপকার কার্যে কখন দুঃখ উপস্থিত হয় না—ইহা চিরকালই সুখদায়ক।

সাঁচে সাপ ন লাগই, সাঁচে কাল ন খাই।

সাঁচে কো সাঁচা মিলে, সাঁচে বাহি সমাই ॥ ২৪০ ॥

সত্যে কখন অভিযাপ লাগে না, সত্যে কখন নষ্ট হয়না, সত্যের বদলে সত্যই লাভ হয় এবং সত্য সত্যেই লব্ধপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কলিকা ব্রাহ্মণ মস্করা, তাহি ন দীজে দান।

কুটব সহিত নরকে চলা নাথ লিয়ে জিজমান ॥ ২৪১ ॥

কলির ব্রাহ্মণ অতিশয় পাপী—ইহাদিগকে কখনও দান করিবে না; বাহার এই কলির ব্রাহ্মণকে দান করে—সেই ব্রাহ্মণ তাহাদের লইয়া নরকে গমন করিয়া থাকে।

কাল করে মো আজ কর, আজ কর মো আব।

পলমে পরলে হোয় গো, বহরি করে গো কব্ ॥ ২৪২ ॥

যে কাজ কাল করিবার জন্ম আছে—তাহা আজই সম্পন্ন করিবে—আর যাহা আজ সম্পন্ন করবার আছে, তাহা এখনি সম্পন্ন করিবে। কারণ সংসারে কালের কটাক্ষ মাত্রেই বিপ্লব উপস্থিত হইতে পারে—এইজন্য শুভকার্য্য সত্ত্বর সম্পন্ন করিবে ?

নারী স্বভাব সত্য করি কহঁই, অবগুণ আট সদাউ রহঁই ।

সাহস অনীত চপলতা মায়া ভয়, অবিবেক অশোচ সদাই ॥ ২৪৩ ॥

গ্রন্থকারগণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে নারীর চরিত্রে সাহস, অনীতি, চাপল্য, স্নেহ, ভয়, অবিবেকিতা, অশুচি এবং নিষ্ঠুরতা এই আটটি খারাপ গুণ সর্বদা বিরাজ করিতেছে।

ফুলে ফলেন বেঁত যদ্যপি, সুধাবর্ষহিঁ জলদ ।

মুরখ হৃদয় নাচেত ঘো, গুরু মিলহি বিরিকি সম ॥ ২৪৪ ॥

যেহ সকল সুধাবৃষ্টি বর্ষণ করিলেও যেমন বেতগাছের ফল ও ফুল হয় না; সেইরূপ ব্রহ্মার মত গুরুর উপদেশ বাক্যেও অজ্ঞানীর জ্ঞানোদয় হয় না।

কাটোপে বদরী ফলে কোটি যতন কোউ নীচ ।

বিনয় ন মানে নীচ কতু ভয় বিহু নরে ন নীচ ॥ ২৪৫ ॥

ফুলগাছকে খুব যত্ন করিয়া জলসেচন করিলে এবং তাহার শাখাদি কর্তন না করিয়া বিশেষ যত্ন করিলেও যেমন তাহার ফল ভাল হয় না এবং গাছ ক্রমশঃ কলহীন হইয়া যায়—অতএব এই বৃক্ষকে বেশী যত্ন না করিয়া কেবল শাখাদি কর্তন করিলে—বেশী ফল পাওয়া যায় এবং বৃক্ষও খুব সতেজ হয়। সেইরূপ নীচ জাতিকে বেশী অহীন-বিনয় করিয়া কোন কাজ করিতে বলিলে, তাহার দ্বারা কাজ

পাওয়া যায় না—তাহাকে ভয় দেখাইয়া কোন কাজ করিতে বলিলেই সহজে তাহার নিকট হইতে কার্যোদ্ধার করিয়া লওয়া যায়।

বিনা সাধন হরি দেও হয়, পুরুষারথ সো চারি।

যো শরণাগত হোত হয়, হরিপদ নেহকবারি ॥ ২৪৬ ॥

যে ব্যক্তির শ্রীহরির পদকমলে একান্ত ভক্তি ও অমুরাগ থাকে—ভগবান হরি তাহাকে বিনা আরাধনাতেই পুরুষার্থ চতুষ্টয় প্রদান করিয়া থাকেন। অর্থাৎ যাহারা ভগবানের একান্ত ভক্ত, শ্রমসাধ্য সাধনা ব্যতীরেকেই তাহারা ঐ সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ধর্ম অর্থ অরু কাম-মোক্ষ পুরুষারথ চারি কহি।

যো চাহে পদনির্ধারণ সাধন যাকো বহুত হই ॥

যো জন হরিপদ ভজত হয়, ছাড়ি সকল জঞ্জাল।

সো সাধন নাহি চাহিয়ে, প্রভু হয় পরম দয়াল ॥ ২৪৭ ॥

ভক্তকে ভগবানের অদেয় কিছু নাই। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বিধ পুরুষার্থ পাওয়া বড়ই শ্রমসাধ্য কিন্তু যে হরির চরণ কমলে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহাতে সমস্ত ভারাপণ করিয়াছে; সংসারের সকল জঞ্জাল জাল দূরে ফেলিয়া কেবল তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়াছে। তাহাকে আর কোন সাধন-অমুষ্ঠান করিতে হয় না, দয়াময় নিজগুণে তাঁহার ভক্তকে ঐ সকল পুরুষার্থ প্রদান করিয়া থাকেন।

বিহু গুরু হোই কি জ্ঞান, জ্ঞান কি হোই বিরাগ বিহু।

গাওহি পুরাণ বেদ স্মৃতি, লহহি ভরি ভক্তি বিহু ॥ ২৪৮ ॥

সাধক তুলসীদাস গোস্বামী বলেন—বিরাগ, জ্ঞান এবং দয়া ভিন্ন অতি উত্তম গতিলাভ হয় না। সাংসারিক ক্রিয়া-কলাপে, আত্মীয় কুটুম্ব ভরচিন্তনে এবং কায়িক ও মানসিক সুখাদিতে বৈরাগ্য না জন্মিলে, তাহার পর গুরুদেবের কৃপালাভ না করিলে জ্ঞানলাভ হয়

না। অর্থাৎ প্রথমতঃ নিজের ধর্মকর্ম করিতে করিতে বৈরাগ্যভাব আসিয়া পড়িবে—এইভাব হইলেই ঐহিক-পারত্রিক সকল বিষয়েই মানব ইচ্ছাশূন্য হইয়া পড়িবে। কেশহীন ব্যক্তি ভয়ানক রোদ্র তাপে তাপিত হইয়া যেমন শীতল বারিপানের আশায় বিব্রত হয়—সেইরূপ সংসার-আতপক্লিষ্ট ব্যক্তি ভব-সমুদ্র পার হইবার জন্য যখন গুরু শরণাপন্ন হয়—যখন তাঁহার উপদেশে হৃদয়ে অচলা ভক্তির উদয় হয়, তখন শ্রীহরি তাহাকে অবশ্যই রূপা করেন। গুরু ছাড়া জ্ঞানলাভ হয় না এবং হরিভক্তি ছাড়া আর কিছুতেই পরমানন্দ লাভের আশা নাই।

কবছ দিবসমহ নিবিড়তম, কবছক প্রগট পতঙ্গ ।

উপজে বিনশে জ্ঞানজিমি, পাই সুসঙ্গ কুসঙ্গ ॥ ২৪৯ ॥

যেমন বর্ষাকালে এক এক দিন অতিশয় মেঘ হইয়া চারিদিক নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, আবার এক এক সময় সূর্য্যদেব প্রকাশ পাইলে যেমন সেই মেঘ সকল অসারিত হয়, সেইরূপ সাধুসঙ্গ হইলে লোকের জ্ঞানোদয় হয় এবং অসাধু লোকের সঙ্গ হইলে মানুষ্য জ্ঞানভ্রষ্ট হইয়া থাকে।

কবছ প্রবল চল যারুত যহঁ তহঁ মেঘবিনাহী ।

জিমিক পুত কুল উপজে সম্পতি ধর্ম্যনাশহী ॥ ২৫০ ॥

প্রবল বায়ু সস্তাড়িত হইয়া যেমন বর্ষাকালের মেঘ সকল স্তানা-স্তরিত হইয়া নষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ বংশে কুপুল জন্মিলেও তাহার দ্বারা সঞ্চিত অর্থত নাশ হয়ই, অধিকন্তু বংশের ধর্ম্মও উহার দ্বারা নাশপ্রাপ্ত হয়।

বিবিধ জন্ত-সকুল মহী ভ্রামত হয় সমুদাই ।

বাঢ়ত প্রজা যশ নগরমে ধর্ম্মরাজকো পাই ॥ ২৫১ ॥

বর্ষাকালে পৃথিবী যেমন নানাবিধ জৌক জন্তু অর্থাৎ ভেক, মীন, সর্প, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, সেইরূপ স্বধর্মনিষ্ঠ রাজার রাজত্ব ও প্রজাগণে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে ।

উষর ভূমিহ দেবগণ যদ্যপি বর্ষাই যাম ।

উপজত নহি কামাদি যশসন্তনকে মন ॥

সাধন বলতে বিগত হোয়, জাতবাসনা সদাহি ।

তৃণ নহিয়মত সো ভূমিপর, যদ্যপি কৃষক সৃজন ॥ ২৫২ ॥

উষর ভূমিতে অতিশয় বৃষ্টিপাত হইলে কৃষকগণ তাহাতে যত্নপূর্বক বীজ বপন করিয়াও যেমন শস্তাদি উৎপন্ন করিতে পারে না, এমন কি একটি তৃণও যেমন তাহাতে জন্মায় না—সেইরূপ সাধু ব্যক্তির উষর ক্ষেত্রসম হৃদয়ে অতিশয় চেষ্টা করিলেও কামাদি মোহ জন্মায় না; সাধনবলে তাহারা ঐ সকল প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিয়া থাকেন ।

কষীনিরাওঁহি ধাত্ত তৃণ যো হয় চতুর কৃষাণ ।

জিমি বৃধ জ্ঞানবন্তমহ তজ্জিঁ মোহমর মান ॥ ২৫৩ ॥

চতুর কৃষক বর্ষাকালে ধাত্ত ক্ষেত্র হইতে ঘাস-তৃণ প্রভৃতি আগাছা সকল তুলিয়া ফেলিয়া দিলে যেমন তাহারা আর জন্মাইতে পারে না, সেইরূপ জ্ঞানী মহাত্মারা দেহরূপ ক্ষেত্র হইতে লোভ, মদ, মোহ প্রভৃতি আগাছা তুলিয়া ফেলিয়া দেন ?

মহাবৃষ্টি চলি ফুটি কেয়ারা ।

জিমি স্বতন্ত্র হোয় বিগরিঁ নারী ॥ ২৫৪ ॥

বর্ষাকালে প্রবল জলবর্ষণ হইলে যেমন ক্ষেত্রের আলিসমূহ ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া জলরাশি যথেষ্ট প্রবাহিত হয়—সেইরূপ জীজাতি আধীন্য হইলে, তাহারা নিজগৃহ, কুলগান, বিদর্ভন দিয়া যথা ইচ্ছা

তথা গ্রহান করে। এইজন্য শাস্ত্র স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা প্রদান করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

অর্কজ্য বাস পতি বিমু ভয়েউ।

জিমি সুরাজ্য খল উদ্যম গয়েউ ॥

খোক্তত পম্ব মিলে নহি ধুরি।

করে ক্রোধ জিমি ধর্মহি ছুরি ॥ ২৫৫ ॥

বর্ষা সমাগমে যেমন আকন্দ ও যবাশ নামক বৃক্ষের পাতা ঝরিয়া পড়ে, সেইরূপ ধার্মিক রাজার রাজ্যে দস্তা তস্করাদির উপদ্রব থাকে না। অর্থাৎ তাহারা প্রজাগণের প্রতি কোনপ্রকার অত্যাচার করে না। এইসময় যেমন পথের ধূলা সমস্তও নষ্ট হইয়া থাকে; সেইরূপ ক্রোধিত ব্যক্তির হৃদয়ের সমস্ত ধর্ম নষ্ট হইয়া থাকে, অর্থাৎ ক্রোধের উদয় হইলে ধর্ম আর তথায় অবস্থান করিতে পারে না।

হরিত ভূমি তৃণ সঙ্কুল সমুদ্রাপরে নহি পম্ব।

জিমি পাষণ্ড বিবাদতে লুপ্ত ভয়ে সদগ্রন্থ ॥ ২৫৬ ॥

যেমন পথ সকল বর্ষাসময়ে নবতৃণ বিমণ্ডিত হইয়া লোক লোচনের অদৃশ্য হয়, সেইরূপ পাষণ্ডগণের বিবাদদ্বারা উৎকৃষ্ট গ্রন্থরাজি নষ্ট হইয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

বুদ আঘাত সহত গিরি কয়সে।

খল্কে বচন সন্ত সহে জয়সে ॥

ক্ষুদ্র নদী ভরি চলি উতরাই।

জয়সে থোরে ধন খল বওরাই ॥ ২৫৭ ॥

পূর্বতে অতিরিক্ত বর্ষা বারিবর্ষণ হইলে তাহারা যেমন সেই কষ্ট অবাধে সহ্য করে, সাধু ব্যক্তিরাজ্যে খলের কু ব্যবহার সেইরূপ সহ্য করিয়া থাকেন। বর্ষাবারিতে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীসমূহ ভরিয়া বেগে

প্রবাহিত হয়—সেইরূপ নিধনীর সামান্যমাত্র ধন হইলেই সে অহংকারে
মত্ত হয়। বেঙের আধূলি প্রাপ্তির মত সে রাজ হত্যাকেও পদাঘাত
করিতে যায়।

দামিনী দমকি রহে ঘনমাহী।

খলকি প্রীতি যথা থির নাহি ॥

বরখাই জলদ ভূমি নিরবায়ে।

যথা লওহি বুধ বিদ্যা পায়ে ॥ ২৬৮ ॥

বর্ষাকালে মেঘের কোলে সোদামিনী প্রকাশিত হইয়া যেমন
তৎক্ষণাৎ তাহাতে লয় প্রাপ্ত হয়—ক্ষণিক স্থির থাকিতে পারে না।
সেইরূপ খেলের সহিত প্রীতি বন্ধন বেশীদিন থাকে না। আর
বর্ষাকালে মেঘমালা ভূমির সম্বিহিত হইয়া অর্থাৎ নত হইয়া বর্ষণ
করে—পণ্ডিত ব্যক্তি তেমনি বিজ্ঞানাভ করিয়া নত হয়।

রাক্ষস রজনী ভক্তি তব রামনাম সোই সোম।

অপর নাম উদ্ভুগণ বিমল বসই ভক্ত উরু ব্যোম ॥ ২৬৯ ॥

কবিবর তুলসীদাস রূপকচ্ছলে পূর্ণিমার নিশাকে রামনাম মাহাত্ম্য
বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নারদ বলিয়াছিলেন—পূর্ণিমার রজনীই
ভগবানের ভক্তি, উহাতে যে রামনাম তাহাই পূর্ণচন্দ্র, আর অপর
রামের বিভূতি সকল তারাদল এবং ভক্ত কুলের হৃদয়ই আকাশ
স্বরূপ। এইরূপ পূর্ণিমার রজনীতে পূর্ণচন্দ্রের উদয় স্বরূপ ভগবানের
নাম ভক্তজনের হৃদয়ে সর্বদা বিরাজিত থাকুক।

তাতে তিন অতি প্রবল খল, কাম ক্রোধ অরু লোভ।

মুনি বিজ্ঞান ধাম মন করাই নিমিষিমহ ক্ষোভ ॥

লোভকে ইচ্ছা দম্ব বল, কামকে কেবল নারী।

ক্রোধকে পরুখবচন বল মুনিবর কহিহি বিচারি ॥ ২৭০ ॥

কাম ক্রোধ ও লোভ এই সকল মানবের পরম শত্রু ; কেননা ইহারা অতি বড় জ্ঞানবান ব্যক্তিকেও তিলোকের মধ্যে চঞ্চল করিতে পারে। ইচ্ছা ও দাস্তিকতাই লোভের বল—কেননা লোভ থাকিলেই মানবের মনে নানাপ্রকার ইচ্ছা প্রবল হয়—সেই ইচ্ছা পূরণের জন্ত দাস্তিকতা প্রকাশ পায়। কামের বল—বিষয়াদি ভোগ ও রমণী-লাভের আশা, ক্রোধের বল পুরুষ বচন—অর্থাৎ ক্রোধ হইতেই পুরুষ বচন প্রকাশ পায়।

বচন কৰ্ম্ম মন মোর গতি ভজন করে নিষ্কাম।

তিনকে হৃদয় কমল সই করোঁ সদা বিশ্রাম ॥ ২৭১ ॥

অগতির গতি ভগবান রামচন্দ্র বলিতেছেন—যে ব্যক্তি কায়মন-বাক্যে আমার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, আমি ব্যতীত যে আর কিছুই জানে না, যে কেবল নিষ্কাম ভাবে কেবল আমারই উপাসনা করে—আমি সেই মহাত্মার হৃদয়ে সর্বদা বিশ্রাম স্থাখ্যুভব করি।

মনক্রম বচন নেম করি, ভজন করত অতি প্রীত।

তবে বাড়ত হরিভক্তি দৃঢ়, উপজত প্রেম পুণীত ॥

পুলক দেহ তব হোত হয় হরিগুণ গাওত গান।

গদগদ হিয়া তব হোত হয় বহুত নীর নিদান ॥

তব হরিভক্তি সো জানিয়ে হোত কৃতারথ নেম।

এহি বিধি যাকো হোত হয়—উর অন্তর দৃঢ় প্রেম ॥ ২৭২ ॥

নিয়মাধীন হইয়া মনে প্রাণে ভগবানের আরাধনা করিতে, করিতে ভক্তির দৃঢ়তা জন্মিয়া হৃদয়ে বিশুদ্ধ প্রেমের সঞ্চার হইয়া সাধকের হৃদয় পুলকিত, শরীর রোমাঞ্চিত ও গদগদ ভাবে হরি গুণগান করিতে করিতে নয়নে বারিধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। সাধক তখন তদগতচিত্ত হইয়া আপনানাহারা হয়—এইরূপ অবস্থা হইলে সেই

সাধক প্রকৃত হরিভক্ত এবং এই জগতীতলে তাহার জন্মই সার্থক হইয়াছে ।

সর্বৈ সহায়ক সবলকে, কোহি ন নিবল সহায় ।

পবন জগায়ত আগ কো, দীপছি দেত বুজায় ॥ ২৭৩ ॥

প্রবল পবন যেমন অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করিয়া দীপকে নিভাইয়া দেয়, সেইরূপ এ জগতে সকলেই বলবানের সহায় হইয়া থাকে, দুর্ব্বলের কেহ সহায় হয় না ।

ভরে ন কাছ দুষ্ট সোঁ জাহি প্রেমকাকী বন ।

ভৌর ন ছাড়ে কেতকী তীথে কণ্টক জান ॥ ২৭৪ ॥

যাহার হৃদয়ে প্রেমবল্লি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, সে আর কাহাকেও ভয় করে না । যেমন কেতকী পুষ্পে তীক্ষ্ণ কণ্টক থাকিলেও ভ্রমর তাহাতে দুকপাত করে না ।

পণ্ডিত জনকো শ্রম মরম জানত বে অতি ধীর ।

কবুঁ বাঁ কন জানহী তন প্রসুতিকা পীর ॥ ২৭৫ ॥

বক্ষ্য। নাবী যেমন প্রসব বেদনা বৃষ্টিতে পারে না, সেইরূপ পণ্ডিতের পরিশ্রমের মর্ষ পণ্ডিত ব্যতীত অপরে বৃষ্টিতে পারে না ।

সহজ রসীলে হোয়সে করৈ অহিত পর হেত ।

জৈসে পীড়িত কীজিয়ে ইথ তউরস দেত ॥ ২৭৬ ॥

ইক্ষু দণ্ডকে নিষ্পিড়ন করিলেও সে যেমন স্তম্ভিত রসদানে বিরত হয় না । সেইরূপ সাধু ব্যক্তিকে কষ্ট দিলেও তিনি কাহারও অহিত সাধন করেন না ।

সুধরী বিগঠৈ বেগহি বিগরী ফির সুধরেন ।

দুধ ফটে কাঁজী পঠৈ সো ফির দুধ বঠেন ॥ ২৭৭ ॥

ভাল লোক মন্দ হইলে বা ভাল দ্রব্য খারাপ হইলে যেমন

আর তাহা ভাল হইবার সম্ভাবনা থাকে না ; সেইরূপ দুগ্ধ মধ্যে কাঁজী পড়িলে পুনরায় আর তাহাকে দুধ করা যায় না ।

কৌ কীর্জৈ ঐ দৌ যতন জাঁতে কাজ ন হোয় ।

পরবত পৈখোদৈ কুয়া কৈসে নিকসৈ তোয় ॥ ২৭০ ॥

যত্ন করিলে অসিদ্ধ থাকে, জগতে এরূপ কোন কাজ নাই ; নিরন্তর খনন করিলে পর্বত হইতেও জলধারা প্রবাহিত হয় ।

কারজ ধীরে হোতু হৈ কাহে হোত অধীর ।

সময় গায় তরবর কঠৈ কৈতক সীচৌ নীর ॥ ২৭১ ॥

বৃক্ষে যতই জল সেচন কর—উপযুক্ত সময় উপস্থিত না হইলে যেমন তাহা হইতে ফলের আশা করা যায় না, সেইরূপ অধীর হইয়া যত কস্মই কর না কেন—তাহা হইতে ফললাভ হইবে না, এইজন্ত ধীরভাবে কার্য্য করাই বিধেয় ।

দোখাইকৌ উমঠৈ গঠৈ গুণন গঠৈ খললোক ।

পিঠৈ কুধির পয় না পিঠৈ লগী পয়োধর জোক ॥ ২৮০ ॥

পিয়ুষ পুরিত মাতৃস্তন্থে জলোকা বসিলে সে যেমন রক্ত ব্যতীত দুগ্ধ পান করে না, সেইরূপ মন্দ ব্যক্তির গুণবানের গুণের ভাগ না দেখিয়া কেবল দোষের ভাগই দেখিয়া থাকে ।

পাঁচ ঝুট নিরনয় কঠৈ নীতি নিপুন ঘো হোয় ।

রাজহংস বিহুকো কঠৈ স্থীরনীরকো দোয় ॥ ২৮১ ॥

জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে জলীয় ভাগ পরিত্যাগ করত দুগ্ধ গ্রহণ করিতে যেমন রাজহংস ব্যতীত কেহ পারে না, সেইরূপ নীতি-বিশারদ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহ সত্য-মিথ্যা নিরূপণে সমর্থ হয় না ।

নিপট অবুধ সমুঝে কহা পুনজন বচন বিলাশ ।

কবছ ভেক ন জানহী অমল কমলকী বাস ॥ ২৮২ ॥

নির্মল কমলের গুণাগুণ যেমন ভেঁকেবা বঝিতে সক্ষম হয় না,
সেইরূপ মূর্থ ব্যক্তি পণ্ডিতের গুণ বুঝিতে পারে না ।

মৃত তঁাহী মানিয়ে জঁই ন পড়িত হোয় ।

দীপক কী রবিকে উদৈ বাত ন বুঝে কোয় ॥ ২৮৩ ॥

সূর্য্যোদয়ের পূর্বে যেমন প্রদীপের শোভা হয়—সেইরূপ পণ্ডিতের
অভাবে মৃত ব্যক্তির শোভা হইয়া থাকে ।

মূর্থ গুণ সমুঝে নহী তৌ ন গুণীমে চুক ।

কহা ভরৌ দিনকো বিভৌ-দেখীজৌ ন উলুক ॥ ২৮৪ ॥

গুণবানের গুণ মুখে বুঝিতে পারেনা বলিয়া কি তাঁহাদের
কোন ক্ষতি হয়? সূর্য্যের আলোকে পেচকেরা দেখিতে পায় না,
তজ্জন্ম দিবাকরের কোন দোষ হইতে পারে না ।

অরিকে করমে দী জ্রৈয় অবসর কৌ অধিকার ।

জো জো দ্রব্য লুটায়হৈ তৌ তৌ যশ বিস্তার ॥ ২৮৫ ॥

সময়ে সময়ে শত্রুর হস্তেও দ্রব্যাদির কত্বভার প্রদান করিবে,
কেননা, শত্রু যে পরিমাণে ঐ সকল বস্তু অপরকে দান করিবে—
তোমার কীর্ত্তিও সেই পরিমাণে বদ্ধিত হইয়া পড়িবে ।

জানবুঝ অজুগত কঠৈ তাসো কহা বসায় ।

জগত হী সোবত রহৈ তোকেঁ কহা জগায় ॥ ২৮৬ ॥

যে ব্যক্তি বুঝিয়াও বুঝে না—তাহাকে বুঝান যারপর নাই কঠিন ;
জাগিয়া ঘুমাইলে কে তাহার ঘুম ভাঙ্গাইতে পারে ?

জাহিমিলে স্নখ হোতুহৈ তিহি বিছুরে দুঃখ হোয় ।

স্বর উদৈ ফুলৈ কমল তা কিন সফুটৈ সোয় ॥ ২৮৭ ॥

যাহার সহবাসে বিমল স্থথের উদয় হয়—তাহার বিরহেও
তরুণ মহাদুঃখ পাইতে হয় । স্বর্ঘ্য উদিত হইলে কমল

বিকশিত হয়—আবার তাঁহার অন্তঃগমনে মহা বিরহে মুদিত হইয়া থাকে ।

কারজ তাহী কো সঠৈ কঠৈ ঘো সময় বিচার ।

কবছ ন হারে চখল জেউ খেলৈ দার বিচার ॥ ২৮৮ ॥

উপযুক্ত সময় বুঝিয়া কাজ আরম্ভ করিলে তাহাতে কৃতকার্যতা নিশ্চয়ই লাভ করা যায় । যিনি ভাল বিবেচনা করিয়া খেলা আরম্ভ করেন—তাহাকে কখন পরাভূত হইতে হয় না ।

কোউ দূর ন কর সঠৈ উলটে বিধিকে অংক ।

উদনি পিতা তউ চন্দকৌ ধোয়ন শোকা কলংক ॥ ২৮৯ ॥

ভাগ্যফল দূর করিতে বা তাহার অগ্রাধা করিতে কেহই পারে না, যেমন সাগর চন্দ্রের পিতা হইয়া, তাঁহার অগাধ বারিরাশি থাকিতেও চন্দ্রের কলঙ্ক বিধোত করিতে পারেন নাই ।

বীর পরাক্রম না করে তামো ডরত ন কোয়ে ।

বালক ই কো চিত্র কেউ বাঘ খিলৌ না হোয়া ॥ ২৯০ ॥

বালকগণ* যেমন কাঠের বাহু লইয়া খেলা করে—কোন ভয় করে না, সেইরূপ বলিষ্ঠ ব্যক্তি যদি বল প্রকাশ না করে—তাহা হইলে তাহার সহিত খেলা করিতে কেহ ভয় পায় না ।

*নূপ প্রতাপ যে দেশম্ রহৈ দুষ্ট নহি কোয় ।

প্রগটে তেজ দিনেশ কো তহঁ। তিমির নহি হোয় ॥ ২৯১ ॥

সূর্যের আলোক প্রকাশিত হইলে যেমন সেখানে আর অন্ধকার থাকিতে পারে না—সেইরূপ প্রতাপশালী রাজা যে দেশে বাদ করেন—তথায় দুষ্ট লোক কদাচ আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না ।

বিনা কহেই সৎপুরুষ পরকো পুরে আশ ।

কৌন কহত হৈ সুর কোঁ ঘর ঘর করত প্রকাশ ॥ ২৯২ ॥

স্বর্গ্যদেবকে ঘরে ঘরে আলো দান করিতে যেমন কেঁহ বলিয়া
দেয় না—সেইরূপ সাধুগণকে পরের আশা পূর্ণ করিতে বলিয়া দিতে
হয় না।

সজ্জন বচায়ৈ কষ্ট তেঁ রহৈ নিরন্তর সাথ ।

নৈন সহাই জেঁ। পলকে দেহ সহাই হাত ॥ ২৯৩ ॥

হস্ত যেমন শরীরকে রক্ষা করে—চক্ষুর পাতা যেমন চক্ষুকে
সতত রক্ষা করিয়া থাকে, সেইরূপ যে ব্যক্তি সতত সাধুগণের
সঙ্গে থাকে—সাধুগণ তাহার সকল কষ্ট নিবারণ করিয়া থাকেন।

সজ্জন চিত্ত কবই ন ধরত দুরজন জনকে বোল ।

পাহন মারে আম কেউ তউ ফল দেত অমোল ॥ ২৯৪ ॥

সজ্জন ব্যক্তি সহস্র কষ্ট পাইলেও কাহারও প্রতি অন্ত্রায় আচ-
রণে প্রবৃত্ত হয় না; আত্ম বৃক্ষের উপর লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে
যেমন অনিষ্টকারীকে স্তম্ভুর ফলদানে তৃপ্ত করে। সাধু ব্যক্তিও তদ্রূপ
শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ করেন না।

যা হুনিয়ামে আইকে ছাড় দেহ তু ঐঠ ।

লেনা হৈ সো লেহলে উঠা জাত হৈ পৈঠ ॥ ২৯৫ ॥

হুনিয়ায় আসিয়া আসক্তি বিসর্জন দিয়া যাহা গ্রহণ করিতে
হয়, তাহা সম্বরণ গ্রহণ কর—কারণ সময় গত হইলে আর তাহা
ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না।

শোয়ান ক্রিয়াকৌ সঙ্গমে রহত ঘড়ী আকুঝায় ।

জগপ্রাণী তাঁকো হাঁসে আপনা কাজ বিহায় ॥ ২৯৬ ॥

কুকুর কুকুরী কিম্বৎকণের জন্ত উভয়ে সঙ্গমে প্রবৃত্ত হয়—
জগতের লোক—তাহা দেখিয়া হাস্য করিয়া থাকে, কিন্তু আপনার
বিষয় তাহার একবার মাত্রও ভাবিয়া দেখে না।

বুঁদ সমানা সমুদ্রমে যো মানে স্ফুটায় ।

সমুদ্র সমানা বুঁদমে বুঝে বিরলা কোয় ॥ ২২৭ ॥

বিন্দুমাত্র জল সাগরে মিশিয়া যাইতে পারে—কিন্তু বিন্দুমাত্র
জলে বৃহৎ সাগর মিশিয়া যাইবে—এ কথা কে বিশ্বাস করিতে পারে ?
নহি মে সব ছয়া ফিন নহি হোয় যায় ।

নহি হোয়ে রহ দাছু সাহেব সে লওয়ায় ॥ ২২৮ ॥

“নাই” হইতেই অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্ম হইতেই সকল হইয়াছে—
আবার তাহাতেই পুনরায় সমস্ত লয় হইবে—অতএব তুমি নাই
হইয়া অর্থাৎ নিকাম থাকিয়া ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ কর । জগতে কিছুই
চিরস্থায়ী নহে, ধন জনের অহঙ্কারে মত্ত না হইয়া ঈশ্বর প্রণিধান
কর—ইহাই তাৎপর্য্য ।

বুঝা ছোঁ দেখনমে চলা বুঝা ন দীসে কোয় ।

জো দিল খোঁজে আপনা তো মুঝসা বুঝান কোয় ॥ ২২৯ ॥

কোন ব্যক্তি একজন খারাপ লোকের অনুসন্ধান করিতে গিয়া
কাহাকেও মন্দ দেখিতে পাইল না ; তারপর সেইব্যক্তি নিজের বিষয়
চিন্তা করিয়া এবং নিজের হৃদয় অনুসন্ধান করিয়া দেখিল—তাহার মত
খারাপ লোক আর কেহ নাই ।

খুদ নতো ধরতী সহে কাট সহে বনবরায় ।

কুবচন তো সাধু সহে ওঁতে সমৌ ন যায় ॥ ৩০০ ॥

পৃথিবী খনন সহ্য করে, বনরাজিন ছেদন সহ্য করে—আর
সাধু ব্যক্তি কুবচন সহ্য করে—তাহা ছাড়া আর কেহ এসকল সহ্য
করিতে পারে না ।

জাহীতেঁ কিছু পাইয়ে করিই তাকো আস ।

রীতে সরোবর পৈ গয়ে কৈসে বুঝত পিয়াস ॥ ৩০১ ॥

যাহার কাছে কিছু পাওয়া যায়, লোকে, তাহার কাছেই কিছু
পাইবার আশা করিয়া গমন করে। নতুবা পিপাসাতুর ব্যক্তি কি
কখন শুষ্ক সরোবরের নিকট পিপাসা নিবারণের জন্য গমন করে?

চোকী পৈ নিকী লগে কহিয়ে সউর্ম বিচার।

সবকে মন হর্ষিত করে জো বিবাহমে গার ॥ ৩০২ ॥

যেমন বিবাহ সময়ের গালাগালিও প্রাণে আনন্দ দানে সমর্থ
হয়—সেইরূপ সময় বিশেষে মন্দ কথাও মিষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

নীকী পৈ চোকী লগে বিন্ ঔসর কো বাৎ।

জৈসে বরনত যুদ্ধমে রশা সংভার ন স্হাত ॥ ৩০৩ ॥

যুদ্ধে গমনোদ্ভূত যুবা পুরুষের পক্ষে যেমন স্ত্রীর রমণীর স্তম্ভন
নহে। সেইরূপ সত্যবাক্যও সময় বুঝিয়া বলিতে না পারিলে মিষ্ট
লাগে না।

বালু জৈসী করকরী উজ্জল জৈনী ধূপ।

ঐসী মাবী কুচ্ছ নহী জৈসী মাবী চূপ ॥ ৩০৪ ॥

করকরী জ্বরের মধ্যে যেমন বালুকা আর উজ্জল বস্তুর মধ্যে যেমন
রৌদ্র, তদ্রূপ একগতে চূপ করিয়া থাকার তুল্য স্মৃতিষ্ট জব্য আর
কিছুই নাই।

পোথি পড়ি পড়ি জগমুয়া পণ্ডিত ভয়া ন কোয়।

একৈ আচ্ছড় শ্রেমকা পড়ে সো পণ্ডিত হোয় ॥ ৩০৫ ॥

আজীবন পুস্তক পাঠে পাণ্ডিত্য জন্মিল না কিন্তু যিনি শ্রেমের
সহিত পুস্তক পাঠ করেন—তিনিই পণ্ডিত হইয়া থাকেন। মনো-
যোগ না দিলে কোন কাজেই সাফল্যলাভ হয়না—ইহাই তাৎপর্য।

চলন্ চলন্ সব্ কোই কহে পহঁছে বিরমা কোই।

এক কনক অরুণামিনী দুর্লভ ঘাটী দোই ॥ ৩০৬ ॥

ঈশ্বরের কাছে যাইতে সকলেই ইচ্ছা করে। কিন্তু কামিনীকাঞ্চন রূপ দুইটি ঘাটীর দ্বারপালকে লজ্জন করিয়া খুব কম ব্যক্তিই তাহার সমীপে উপস্থিত হইতে পারে। অর্থাৎ কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি শূন্য না হইলে ঈশ্বরলাভ সম্ভব হইতে পারে না।

মাটি কহে কুস্তারকোঁ তু ক্যা রুধে মোহি।

একদিন ঐশা হোইগা মে রুধোগে তোহি ॥ ৩০৭ ॥

মাটি কুস্তকারকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে—যে হে কুস্তকার! তুমি আমাকে যেমন এইপ্রকার চটকাইতেছ—আমিও তোমাকে একদিন ঐরকম করিয়া চটকাইব। অর্থাৎ একদিন তোমাকেও আমার আশ্রয় লইতে হইবে—তোমার দেহও আমাতে এইরূপ একদিন ওতপ্লোত হইবে।

দুরবলকো ন সতাইয়ে জাকো মোটি হায়।

মুই খালকো শ্বাস লোঁসার ভস্ম হো যায় ॥ ৩০৮ ॥

যে ব্যক্তি বিনা সহায়ে কষ্ট পাইয়া “হায় আমার কি হইল” বলিয়া কাদে, যে রূপ হীনবল ব্যক্তিকে কখন কষ্ট দেওয়া উচিত নয়—কেননা কর্তৃকারের জাঁতার নিশ্বাসে কঠিন লৌহ পর্য্যন্ত যখন গলিয়া যায়—তখন তোমার মত কঠিন যে একদিন দুর্ব্বলের দ্বারা প্রণীড়িত না হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

চলি পুতরি লোন্‌কী আসমুদ্রকো লেন।

আপ্ আপো ভই পল্ট কাহেকো বয়েন ॥ ৩০৯ ॥

একটা লবণের পুতুল সাগর মাপিতে গিয়া আপনি জল হইয়া গেল, সুতরাং সে আর তাহার গভীরতা মাপিবে কেমন করিয়া? ইহার অর্থ এই, যে ব্যক্তি ওদগতচিত্তে ঈশ্বরোপাসনা করিয়া ঈশ্বরভ্যক্ত লাভ করে—সে আর কেমন করিয়া পুনরাবর্তন করিয়া লোকসমাজে

ঈশ্বরের রূপ-গুণাদির উপদেশ প্রদান করিবে? ঈশ্বর সাক্ষাৎকার লাভ হইলে, সাধক ব্রহ্মজ্ঞানে জ্ঞানবান হইলে, সে আর ভাষার দ্বারা স্বমুখে সেই অবাঙ মনসগোচর ভগবানের বিষয় বলিতে পারে না—তখন সে তত্ত্ব হইয়া কেবল ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে থাকে।

দার ধনীকো পরিরহে ধকা ধনীকা খাই।

কবু ধনী নিয়াজ্জহী বো দার ছাড়ি না যাই ॥ ৩১০ ॥

সহস্র সহস্র ধাক্কা খাইয়াও ধনীর দ্বারে পড়িয়া থাকিবে; যদি এই প্রকারে অহরহঃ পড়িয়া থাকিতে পার, তাহা হইলে কোন না কোনদিন তিনি বাহির হইলে, সাক্ষাতে তোমার আশা মিটিবে।

দেহ ঘরকো ডাডহৈ সব্ কাইকোঁ হোয়।

জ্ঞানী ভুগ্তে জ্ঞানসে মুরথ ভুগতে রোয় ॥ ৩১১ ॥

জ্ঞানী-অজ্ঞানী সমস্ত লোকই সংসারে জন্মিয়া থাকে, এবং কষ্টভোগ করে কিন্তু তাহার মধ্যে জ্ঞানীব্যক্তি বিপদে অধৈর্য্য বা কষ্টে মুহমান না হইয়া তাহা ভোগ করেন, আর মূর্থ ব্যক্তি তাহাকে অসহ্য বোধে কেবল রোদন করিয়া তাহা সহ করিয়া থাকে।

মালা ফেরত যুগ গয়া পায়া ন মনকা ফের।

করকা মনকা ছাড়িকে মনকা মনকা ফের ॥ ৩১২ ॥

মালা ফেরাইয়া যুগযুগান্তর গত করিলে—তথাপি তোমার মনের মলিনতা দূর করিতে পারিলে না; অতএব মালা ঘুরান ছাড়িয়া বাহাতে মনের মালিগ্র দূর হয়—বাহাতে হিংসা ঘেঁষ বিসর্জন দিয়া সরলতা অবলম্বন করিতে পার—হে মানব! তাহার চেষ্টা কর।

বকরী পাতী খাত হৈ তাবো কাড়ো খাল।

ঘো বকরীকো খাতহৈ তিন্কে কোন্ হাওয়াল ॥ ৩১৩ ॥

ছাগাদি পশু পাতালতা খাইয়া জীবন ধারণ করে, তুমি সেই

ছাগাদি বধ করিয়া তাহার চামড়া ব্যবহার কর। বল দেখি, যে ব্যক্তি সেই ছাগাদির মাংস ভোজন করে, তাহার কীদৃশ অবস্থা হওয়া উচিত ?

মালী আয়ত দেখি কৈ কলিয়াঁ করো পুকার।

ফুলে ফুলে চুলি লিয়ে কালি হামারো বার ॥ ৩১৪ ॥

একটা বাগানে মালীকে পুষ্পচয়ন করিতে দেখিয়া কুসুমের আধ-কোটা কলিকারা এই বলিয়া রোদন আরম্ভ করিল যে, হায় ! আজি মালী বিকসিত কুসুম চয়ন করিতেছে, আগামী কল্য সে আমাদিগকেও চয়ন করিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মানবগণ সম্বন্ধে মৃত্যুও এইরূপ কৃতান্ত কেশে ধরিয়া বসিয়া আছে।

দুঃখমে স্থমিরন্ সব করে সুখমে করে ন কোয়।

সুখমে যো স্থামিঃ করে তো দুঃখ কাহে কোঁ হোয় ॥ ৩১৫ ॥

মানবগণ দুঃখের দশা ঘটিলে নিরন্তর নিজ নিজ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু সুখের অবস্থা হইলে ভ্রমেও কেহ তাহার প্রতি লক্ষ্য করে না, যদি সুখের দশা ঘটিলে মানব নিজ অদৃষ্ট-চক্রের কথা মনে রাখে, তাহা হইলে কি সংসারে কখনও দুঃখ উপস্থিত হয় ?

একহি সাধে সব সাধে সব সাধে সব যায়।

জ্যোতু সীচে মূলকো ফুলে ফলে অঘায় ॥ ৩১৬ ॥

এই সংসারে একমাত্র ঈশ্বরের আরাধনা করিলে ধরনীস্থ সমস্ত বিষয়েরই সাধনা করা হয়। যে ব্যক্তি একেবারে নানা বিষয়ের সাধনায় নিরত হন, তাহার সকল সাধনাই ধ্বংস হয়, অর্থাৎ যিনি তরুণুলে সেচনে রত, তিনি কেবল ঐ তরুর ফল ফুল প্রভৃতি ভোগ করিতেই সক্ষম হইবেন।

বৈরাগ্য নাম ইয়ায় ত্যাগকা পাঁচ পঁচিশো মাহি ।

জবলগ্ সংশয় সর্প হায় তব্ লগ্ ত্যাগী নাহি ॥ ৩১৭ ॥

সম্পূর্ণ ত্যাগকেই বৈরাগ্য কহে। পঞ্চতত্ত্ব বা চতুর্বিংশতিতত্ত্ব ও জীবের যতক্ষণ অভিমান থাকে, ততক্ষণ তাহা প্রকৃত বৈরাগ্য নহে। স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরে বা পঞ্চকোষ মধ্যে যতক্ষণ অভিমান থাকিবে, ততক্ষণ তাহা বৈরাগ্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। যেমন গর্ভমধ্যে লুকায়িত সর্পকে, মৃত্তিকাদি দ্বারা বদ্ধ করিলে কোন ফল হয় না, সর্প একদিন না একদিন বাহির হইয়া তোমাকে দংশন করিলেও করিতে পারে, সেইরূপ সংশয়রূপী সর্প যতক্ষণ তোমার অন্তঃকরণে অবস্থিতি করিবে, ততক্ষণ তোমার কল্যাণের আশা নাই হুতরাং সংশয় বিনষ্ট না হইলে হৃদয়ে 'পূর্ণ বৈরাগ্য' আসিতে পারে না।

বৈরাগ্য নাম ইয়ায় ত্যাগ কা পাঁচ পঁচিশো সঙ্গ ।

উপরকী. কাঞ্চলি ত্যজি অন্তর বিষয় ভবঙ্গ ॥ ৩১৮ ॥

কেবল পঞ্চতত্ত্ব আদিতে অভিমান ত্যাগের নামই যে বৈরাগ্য, তাহা নহে, অহং জ্ঞান অর্থাৎ আমার ঘর, আমার বিষয় ইত্যাদি বুদ্ধি যতদিন মন হইতে নির্মূল না হইবে ততদিন প্রকৃত বৈরাগ্য জন্মিবে না। সর্প মধ্যে মধ্যে আপনাকে খোলস ত্যাগ করিলেও সে যেমন হলাহল পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ জীবহৃদয়ে আমার আমার ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধ যতদিন থাকিবে ততদিন প্রকৃত বৈরাগ্য লাভ হইবে না।

অশন বসন সব ত্যজ্ গয়ে ত্যজ্ গয়ে গাম্ গরেহ ।

মাহে সংশয় শূল হায় দুঃখ ত্যজনা য়েহ ॥ ৩১৯ ॥

বৈরাগ্যের বশীভূত হইয়া অশন, বসন, শয়ন এমন কি গ্রাম ও আপনাদি গৃহ ত্যাগ করিয়া বিদেশে গমন করিলেই যে প্রকৃত

বৈরাগ্য হয়, তাহা নহে। সংশয়রূপী শূল বেদনাকে, অশান্ত হৃদয় হইতে একেবারে উচ্ছেদ করিতে না পারিলে পূর্ণ বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় না; কারণ, আমি ধনী, আমি মানী, আমি জ্ঞানী, আমি সুখী, আমি দুঃখী, ইত্যাদি ভাব হৃদয় হইতে দূর করা অতিশয় কঠিন।

বাজ্র কুহি গতী জ্ঞানকী গগন গরজ গর্জন্ত ।

পুটে শূন্য আকাশতে সংশয় সর্প ভাচ্ছন্ত ॥ ৩২০ ॥

পূর্ণ বৈরাগ্যের উদয় হইলে জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। যেমন বাজ্রপক্ষী ও কুহী (সর্পভোজী পক্ষী বিশেষ) আকাশে উড্ডীন হইয়া কলরব করিতে করিতে অপর কোন ক্ষুদ্র পক্ষী বা সর্পকে আক্রমণ ও ভোজন করে, সেইরূপ বৈরাগ্য সঞ্চার হইবামাত্র জ্ঞান তৎক্ষণাৎ সংশয়রূপ সর্পকে উদরস্থ করে।

জ্ঞান ধ্যান দো সার হ্যায় তীজ্ঞে তত্ত্ব অতুপ ।

চোখে মন লাগা রহে সো ভূপন সির ভূপ ॥ ৩২১ ॥

প্রকৃত বিচার করিয়া আত্মবোধ এবং আত্মচিন্তের অভিনিবেশ এই দুইটা প্রধান, জীব ও ব্রহ্মে অভেদজ্ঞান করিয়া আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি করা বড় কঠিন, কারণ, ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যায় না। যে চিনির আত্মাদ জ্ঞানে না, সে যেমন তাহা কাহাকেও বুঝাইতে পারে না, সেইরূপ যাহার আত্মতত্ত্ব বোধ হয় নাই, সে কদাচ আত্মতত্ত্ব বুঝাইয়া দিতে পারে না, এবং যাহার মন তন্ময় হইয়া গিয়াছে, তিনি রাজ্যের অপেক্ষাও প্রধান।

কেহ কেহ এ শ্লোকের এরূপও অর্থ করেন—যখন সকল বস্তু সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, তাহাকে জাগ্রদবস্থা বলে, যে অবস্থায় বাহ্যিক ইন্দ্রিয় ব্যাপার বদ্ধ হইয়া যায়, তাহাকে স্বপ্নাবস্থা বলে, আর যে অবস্থায় মনের চেতনা দূর হইয়া আত্মাতে বিলীন

হয়; তাহাকে সুষুপ্তাবস্থা বলে, এই তিন অবস্থা অতিক্রম করিয়া বাহার চিত্ত তুষ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে—তিনিই শ্রেষ্ঠ; তিনিই মহাপুরুষ, তাঁহার পক্ষে ত্রিলোকের রাষ্ট্রাশ্রয় অকিঞ্চিৎকর বলিয়া ধারণা হইয়াছে।

কাশী করবত্ লেত্ ছায় আন্ কাটাওয়ে শীস্ ।

বন বন ভট্কা খাওত ছায় পাবত ন্ জগদীশ ॥ ৩২২ ॥

ঈশ্বরকে পাইবার জন্ত লোকে কত কার্যেরই অহুষ্ঠান করে। কেহ ভগবৎ প্রাপ্তির জন্ত কাশীতে মৃত্যুর আশা করিয়া থাকে, কেহ বা আপনার প্রাণ দেবতার সমক্ষে বলি দেয়, কেহ বা দেশ বিদেশের গভীর অরণ্যে গমন করিয়া ঈশ্বরাদিনায় নিযুক্ত হয়, কিন্তু উহাতে ভগবানকে লাভ করিতে পারা যায় না; মৃগ যেমন আপনার নাভির সৌগন্ধে উন্মত্ত হইয়া বনের চারিদিকে ছুটিয়া বেড়ায়, কিন্তু তাহার নিজ শরীর মধ্যস্থ নাভির সৌগন্ধ বলিয়া বুদ্ধিতে পারে না, সেইরূপ ভগবানকে হৃদয়ের মধ্যস্থ, ইহা একেবারে ভুলিয়া দেশ বিদেশে বা বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইলে কোন ফল পাওয়া যায় না।

রাম বামদিশি জাহুকী লক্ষণ দাহিনী ওর ।

খ্যান সকল কল্যাণময়, স্বরত্ন তুলসী তোর ॥ ৩২৩ ॥

তুলসীদাস বলিতেছেন—হে মন! তুমি শ্রীরামের বামদিকে মা জানকী এবং দক্ষিণে ঠাকুর লক্ষণ বিরাজিত রহিয়াছেন—এইরূপ খ্যান করিলে তোমার সকল মঙ্গল ও কামনা সাধিত হইবে।

পয় আহায় ফল খাই, যো রাম নাম ঘটমাস ।

সকল স্তম্ভল সিদ্ধি, সব করতল তুলসীদাস ॥ ৩২৪ ॥

হে তুলসীদাস। যদি তুমি ছয়মাস কাল জলপান ও কল ভোজন করিয়া ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নাম জপ করিতে পার—তাঁহা হইলে তুমি সর্বমঙ্গল এবং সর্বসিদ্ধি লাভ করিয়া ধন্ত হইবে।

হিয় নিগুণ নয়নন সগুণ, রসনা রাম স্তনাম ।

মনহঁ পুরট সংপুট লসত, তুলসী ললিত ললাম ॥ ৩২৫ ॥

হে তুলসীদাস ! যদি তুমি নিগুণ রামচন্দ্রকে মনমন্দিরে বসাইয়া ধ্যান কর, সগুণরূপে তাঁহাকে নয়নে দর্শন কর এবং অহরহঃ রসনায় তাঁহার নাম জপ কর, তাহা হইলে সেই ললিত ললাম রামচন্দ্র তোমার হৃদয়-মন্দিরে চির অধিষ্ঠিত থাকিবেন ।

সগুণ ধ্যান রুচি সরস, নহি নিগুণ মনতে ছুরি ।

তুলসী স্মিরছ রামকো নাম সজীবন মুরি ॥ ৩২৬ ॥

হে তুলসীদাস ! সগুণরূপে ভগবানকে ধ্যান করিলে, তাঁহার প্রতি তোমার সরস রুচি হইবে, এবং নিগুণভাবে ধ্যান করিতেও কখন বিরত হইও না—মৃত্যুঞ্জয় রামনাম এইরূপে স্মরণ করাই একান্ত কর্তব্য ।

রাম নামকো অঙ্ক হৈ সব সাধন হৈ শূন ।

অঙ্ক গয়ে কছু হাত নহি, অঙ্ক রহে দশগুণ ॥ ৩২৭ ॥

সব সাধনা শূন্যময় হইলেও রামনাম তাহার অঙ্কস্বরূপ ; যেমন অঙ্ক শেষ হইলে হাতে কিছুই থাকেনা—কেবল শূন্য পড়িয়া থাকে । কিন্তু অঙ্ক থাকিলে দশগুণ হয়—তেমনি অঙ্কস্বরূপ যে রামনাম, তাহা ছাড়িয়া ভজন-সাধন করিলে—তাহা কোন কাজেরই হয় না ।

রামনাম জপি জোহজন ভয়ে স্বকৃত স্থখশালী ।

তুলসী ইহাঁ যো আলসী গয়ো আজু কি কালী ॥ ৩২৮ ॥

ভগবান রামচন্দ্রের নাম জপ করিলে লোকে—স্বকৃতিশালী এবং সুখভোগী হয়—হে তুলসীদাস ! এমন রামনাম জপে ঔদাস্ত প্রকাশ করিলে তোমার ইহকালও নাই—পরকালও নাই ; অর্থাৎ মোরত একুল ওকুল দুকুল নষ্ট হইল ।

কাশী বিধি বসি তনু ত্যজি হউত ন ত্যজি প্রয়াগ ।

তুলসী যো কল সো হুলভ, রামনাম-অনুরাগ ॥ ৩২৯ ॥

সাধককবি তুলসীদাস বলিতেছেন—কাশীবাস কিম্বা সেইখানে ও
প্রয়াগে দেহত্যাগ করিলে যেরূপ সদগতি হয়—এক রামনামের বলে
সেই কল সহজে লাভ করিতে পারা যায় ।

হম লখু হমহিঁ হমার লখু হম হমারকে বিচ ।

তুলসী অলখহি কা লখহি রাম-নাম জপ নীচ ॥ ৩৩০ ॥

আমি আপনার হৃদয়মধ্যে আপনাকেই দেখিয়া থাকি ; যিনি দৃশ্যবস্ত
নহেন—তঁাহার দর্শন পাওয়া অসম্ভব, এই হেতু হে নীচ তুলসীদাস !
তুমি অতি দীনভাবে আত্মাস্বরূপ আত্মারামকে জপ করিবে ।

রামনাম অবলম্বন বিহু পরমার্থ কি আশ ।

বর্ষত বারিদ বুঁদগহি চাহত চড়ন আকাশ ॥ ৩৩১ ॥

বর্ষাকালে মেঘের বারিধারা অবলম্বন করত আকাশে
উঠিবার চেষ্টা করার জায় রামনাম ব্যতীত পরমার্থলাভের আশা
করা বুধা ।

তুলসী হঠি হঠি কহত, নিত চিত সন হিত কর মান ।

লাভ রাম সমিরণ বড়ী, বড়ী বিসারে হান ॥ ৩৩২ ॥

হে তুলসীদাস ! আমি তোমাকে নিত্য নিয়মিত ঐ উপদেশ
প্রদান করি, তাহা তোমার পক্ষে মঙ্গলজনক বলিয়া হৃদয়ে স্থানদান
করিও—এবং ইহা নিশ্চয় জানিও, রাম স্মরণই পরমলাভ এবং তঁাহাকে
বিস্মরণ হওয়াই পরম অমঙ্গলজনক ।

বিগরী জনম অনেককি হৃদয়ে অবহি আজু ।

হোহি রামকি নাম জপু তুলসী ত্যজি কুসমাজু ॥ ৩৩৩ ॥

হে তুলসীদাস ! তুমি অসৎলব্ধ পরিত্যাগ করিয়া কেবল রামনাম

অপ কর—এই পতিতপাবন রামনামের গুণে অনেক বার্থ জীবন সার্থক হইয়াছে।

বর্ষাঋতু রঘুপতি ভগতি তুলসীশালি স্তদাস।

রাম-নাম বরবরণ জগ সাবন ভাদো মাস ॥ ৩৩৪ ॥

হে তুলসীদাস! ভগবান রঘুপতি বর্ষাঋতুর মত এবং শালী ধানের মত! এ জগতে রামনামই শ্রেষ্ঠ এবং শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসের মত স্বজল বর্ষণ করিয়া থাকে।

রামনাম নরকেশরী, কনককশিপু কলিকাল।

আপক জন প্রহ্লাদ জিমি পালহাঁদল সুরসাল ॥ ৩৩৫ ॥

নৃসিংহ অবতারস্বরূপ এই রামনাম এবং হিরণ্যকশিপু স্বরূপ এই ঘোর কলিকাল; রসময় সাধকবৃন্দ তাহাতে প্রহ্লাদের ন্যায় ভক্তস্বরূপ হইয়াছেন।

যথা ভূমিবস বীজ মে নথত নিবাস আকাশ।

রামনাম সব ধরমময় জ্ঞানত তুলসীদাস ॥ ৩৩৬ ॥

হে তুলসীদাস! তুমি নিশ্চয় জ্ঞানিও, পৃথিবী যেমন সমস্ত বীজ ধারণ করেন এবং আকাশ যেমন নক্ষত্রসমূহের বাসস্থান—রামনামও তেমনি সকল ধর্মের উৎপত্তি স্থান—ইহা সাধুজন সম্পাদিত।

বক:বিভীষণ রাজ কপিপতি মারুত খগমীচ।

লহী রামসো নাম রতি চাহত তুলসী নীচ ॥ ৩৩৭ ॥

লঙ্কাধিপতি ভীষণ রাবণরাজা কপিরাজ হনুমান এবং জটায়ুপক্ষী মরণ সময়ে যেমন রামের প্রতি প্রীতিপ্রদর্শন করিয়াছিলেন, নীচ তুলসীদাসও তদ্রূপ রামনামে ভক্তি-প্রীতি স্থাপন করিয়া ধন্ত হইতে ইচ্ছা করিতেছেন।
হরণ অমঙ্গল অথ অখিল, করণ সকল কল্যাণ।

রামনাম নিত কহত হয়, গাওত বেদ পুরাণ ॥ ৩৩৮ ॥

সকল অমঙ্গলনাশক, সর্বসম্ভাপ সংহারক, সর্ব কল্যাণপ্রদ রামনাম দেবাদিদেব মহাদেব নিত্য জপ করিয়া থাকেন এবং বেদ ও পুরাণে তাঁহারই মঙ্গলগাথা গ্রথিত হইয়াছে।

জল থল নভগতি অমিত অতি অঙ্গগঙ্গ জীব অনেক।

তুলসী তৌহি সে দীনকো রামনাম গত এক ॥ ৩৩৯ ॥

এই চরাচর জগৎ জলচর, স্থলচর, ক্ষেচর প্রভৃতি বহুসংখ্যক জীবের পরিপূর্ণ রহিয়াছে; তুলসীদাসের মত দীনহীনের তাহার মধ্যে একমাত্র রামনামই ভরশাস্থল।

রসনা সাপিনী বদনবিল, যে ন পজ্জি হরিনাম।

তুলসী প্রেম ন রামসোঁ, তাহি বিধাতা বাম ॥ ৩৪০ ॥

তুলসীদাস বলিতেছেন—রামনামে প্রেম যাহার নাই—বিধাতা তার প্রতি প্রসন্ন হন না, যে হরিনাম জপ না করে—তাহার জিহ্বা সর্পের মত এবং মুখবিবর তাহার গর্ভের মত অসুস্থিত হয়।

হিয় ফাটছঁ ফুটছঁ নয়নজরও তে তন কেহি কাম।

দ্রবহি শ্রবহঁ প্লকহঁ নহঁ তুলসী স্মিরত রাম ॥ ৩৪১ ॥

যে দেহ রামনাম স্মরণ এবং শ্রবণ করত প্রেমাশ্রুপুলকে পুলকিত না হয়—তাহা হইলে সে দেহের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই; সেই দেহ পুড়িয়া ছাই হউক, চক্ষু অন্ধ হউক, এবং হৃদয় বিদীর্ণ হউক—ভক্ত-চুড়ামণী তুলসীদাসের ইহা মনের বাসনা।

হৃদয় সো কুশিল-সমান, যো ন দ্রবহি হরিগুণ শুনত।

করে ন রাম গুণগান, জীহসো দাছুর জীহসম ॥ ৩৪২ ॥

হরিগুণ গান শ্রবণ করিয়া যাহার হৃদয় গলিয়া না যায়, তাহা বজ্রের সমান কঠিন। আর যে জিহ্বা রাম গুণগান না করে, তাহা ভেক-জিহ্বাসদৃশ অলস।

তুলসী রামহি আপুতে সেবককি রুচি মিঠ ।

সীতাপতি সে সাহিব হি, কৈসে দীর্ঘ পীঠ ॥ ৩৪৩ ॥

তুলসীদাস বলিতেছেন, রাম নিজেই সেবকের পক্ষে অতি রুচিকর মিষ্টার-স্বরূপ। অতএব এরূপ সীতাপতি প্রভু রামচন্দ্রের প্রতি (ভক্ত-বৃত্ত) কিরূপে বিরূপ হইবে? অর্থাৎ তাঁহার শরণাপন্ন না হইয়া কেমন করিয়া থাকিবে?

প্রভু তরু তরু কপি ডার পর সোঁ। কিয়ো আপু সমান ।

তুলসী কহঁন রাম সোঁ সাহিব শীল নিধান ॥ ৩৪৪ ॥

তুলসীদাস বলিতেছেন,—প্রভু রামচন্দ্রের মত দয়াময় আর কেহ নাই। তিনি স্বয়ং তরুতল বাসী হইয়াও বৃক্ষাকৃৎ বানরকে আত্মসম্মানে সম্মানিত করিয়াছেন।

রাম সনেহি রামগতি রামচরণ রতি জাহি ।

তুলসী ফল জগজ্জন্ম কো দিয়ো বিধাতা তাহি ॥ ৩৪৫ ॥

তুলসীদাস বলিতেছেন, রামের প্রতি যাহার মতি গতি এবং রাম চরণে যাহার চিত্ত স্থির হইয়াছে, ভগবান তাহার নরজন্ম সার্থক করিয়াছেন।

আপু আপুনেতে অধিক জেহি প্রিয় সীতারাম ।

তেহি কো পগকি পানহী তুলসী তনকী চাম ॥ ৩৪৬ ॥

যিনি আপনার অপেক্ষা রামসীতাকে অধিক প্রিয়জন মনে করেন, তুলসীদাস বলেন, তাঁহার পায়ের জুতাকে আমি আমার অঙ্গের চর্খ স্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করি।

স্বারথ পরমারথ রহিত সীতারাম সনেহ ।

তুলসী শোফল চারি, কো ফল হমার মত এহ ॥ ৩৪৭ ॥

ভগবানের প্রতি স্বার্থ ও পরমার্থহীন যে স্নেহ, গৌসাইজী বলিতে-

ছেন—আমার মতে তাহার ফল (ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ) চতুর্ভুজ সদৃশ
হইয়া থাকে ।

যে জন রুখে বিষয় রস চিকুনে রাম সনেহ ।

তুলসীতে প্রিয় রামকো কানন বসাই কি গেহ ॥ ৩৪৮ ॥

তুলসীদাস কহিতেছেন,—যিনি বিষয় রসে না মজিয়া কেবল রাম-
রসে বিগলিত হইয়াছেন, তিনি রামের পরম প্রিয়পাত্র । তাঁহার
গৃহবাস আর কানন বাস উভয়ই সমান ।

যথালভ সন্তোষ স্থখ রঘুবর চরণ সনেহ ।

তুলসী জেঁ। মন মূঢ় সোঁ। জস্ কানন তস্ গেহ ॥ ৩৪৯ ॥

হে মূঢ়মতি তুলসীদাস ! জগতে সামান্য লাভে সন্তোষ ও স্থখ বোধ
করিয়া শ্রীরামচরণে স্নেহ প্রদর্শন কর, এক্রপ করিলে তোমার গৃহবাসই
বা কি আর বনবাসই বা কি সমস্ত এক বলিয়া অনুমান হইবে ।

তুলসী জো পৈ রাম সোঁ। নাহিন সহজ সনেহ ।

মূঢ় মূঢ়ায়ে বাদিহী ভাঁড় ভয়ো ত্যজি গেহ ॥ ৩৫০ ॥

হে তুলসীদাস ! শ্রীরামের প্রতি বাহার একান্ত স্নেহ-মমতা নাই,
সে সন্ন্যাসী হইলেও তাহাকে বৃথা মন্তক মৃগনকারী ভণ্ড গৃহত্যাগী
বলিয়া বিবেচনা করিও ।

তুলসী শ্রীরঘুবর ত্যজি করৈ ভরোসা আওর ।

স্থখ সম্পত্তিকো কা চলী নরক ছঁ নাহি ঠোর ॥ ৩৫১ ॥

তুলসীদাস বলিতেছেন—যিনি রামের ভরসা ত্যাগ করিয়া অন্যের
আশায় আশাবিত্ত হন, তাহার স্থখ সম্পত্তির আশা বৃথা; নরকেও
তাহার স্থান হইবে না ।

তুলসী পরিহরি হরহরিহি পাঁথর পুজাই ভূত ।

অস্তযাজী হতহি হোকে জোঁও গণিকা পুত ॥ ৩৫২ ॥

হে তুলসীদাস! যে মূঢ়মতি হরিহরকে পরিত্যাগ করত পাখর ও
ভূতগণের পূজা করে, সে পরিণামে বেশ্যাপুত্রের মত নিন্দার পাত্র হয়।

সবৈ সীতারাম নহি ভজে ন শঙ্কর গৌরী।

অন্ন গবায়ো বাদিহৌ রটত পরাহি পৌরী ॥ ৩৫৩ ॥

যে মানব ইহজন্মে সীতারাম বা হরগৌরীর সেবা-অর্চনা না
করিয়া কেবল পরের প্রংশসা করিয়া কটাইল, সে নরাধমের মানবজন্ম
বিফল হইল, বুঝিতে হইবে।

তুলসী হরি অপমানতে হোই অকাজ সমাজ।

রাজ করত রজ মিল গয়ে সদল সকুল কুরুরাজ ॥ ৩৫৪ ॥

তুলসীদাস বলিতেছেন—হরির অপমান জনক যে কার্য তাহা
ততীক কুকার্যরূপে গণিত হইয়া থাকে। এইজন্য কুরুকুলপতি দুর্যোধন,
রাজা হইয়াও সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল।

রাম ছুরি মায়া বাড়তি ঘটতি জান মনমাহি।

ছুরি হোতি বরি ছুরি দেখি শিরিপরি গমতরছাহি ॥ ৩৫৫ ॥

যেমন সূর্য্য দূরে থাকিলে নিজের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়, মাথার
উপর থাকিলে আর ছায়া দেখা যায় না, সেইরূপ রাম দূরে থাকিলে
মায়ামোহে অভিভূত হইতে হয়, কাছে থাকিলে আর মায়া থাকে না।

সাহিব সীতানাথ সোঁ জব ঘটি হৈ অমুরাগ।

লসি তুতবাহঁ ভালতে ভভরি ভাগি হৈ ভাগ ॥ ৩৫৬ ॥

যে দিন হইতে দয়াময় রামসীতার প্রতি তোমার অমুরাগ জন্মিবে,
হে তুলসীদাস! সেইদিন হইতেই তোমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন জানিবে।

করি হৌ কমলনাথ ত্যজি যবহিঁ দুসুরি আশ।

জঁহাঁ উঁহাঁ দুখ পাই হেউ তবহিঁ তুলসীদাস ॥ ৩৫৭ ॥

হে তুলসীদাস! রামচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া যখনই তুমি পরের

আশা করিবে—সেই সময় হইতে তোমার সেখানে সেখানে দুঃখ-
লাভ অনিবার্য্য ।

জঙ্গল যুড়ে না লকড়ী সায়ের যুড়ে না নীর ।

পড়ে উপাস কুবের ঘর জর বিপক্ষ রঘুবীর ॥ ৩৫৮ ॥

প্রভু ঐরামচন্দ্র বিরূপ হইলে কুবের গৃহেও অন্ন পাওয়া যায় না
বনে কাট আর সরোবরে জল মেলাও দুষ্কর ।

বর্ষাকো গোবর ভয়ো কীচ হৈকো করৈঃপ্রীতি ।

তুলসী তু অমুভবহি অব রাম বিমুখ কি রীতি ॥ ৩৫৯ ॥

বর্ষাকালের কর্দম ও গোময়কে ঘেমন কেহ আদর করে না,
হে তুলসীদাস! রামচন্দ্রের প্রতি ভক্তিহীন ব্যক্তির ও বিরূপ দুর্দশা
হয়—তাহা তুমি বুঝিয়া দেখ ।

প্রেম কামতরু পরিহরত সেবত কলিতরু ঠুঠ ।

স্বারাধ পরমারাধ চাহত সকল মনোরথ বুট ॥ ৩৬০ ॥

ভগবানের পাদপদ্মরূপ প্রেম কলিতরু ছাড়িয়া যাহারা স্বার্থ ও পরমার্থ
প্রার্থনায় কলিকালরূপ বৃক্ষের শুষ্ক বৃক্ষের সেবা করে—অর্থাৎ যাহারা
প্রেমময় রামনাম সাধন না করিয়া কলিকালের অভিশ্লীষিত বিষয় স্থখে
প্রমত্ত হয়—তাহাদের কোন মনোবাসনাই সিদ্ধ হয় না ।

নিজ দুষণ গুণ রামকে সমুখে তুলসীদাস ।

হোয় ভালো কলিকালই উচয় লোক অনায়াস ॥ ৩৬১ ॥

তুলসীদাস বলিতেছেন—নিজের দোষ ও রামচন্দ্রের গুণের
বিষয় প্রণিধান করিতে পারিলে, এই কলিকালেও জীব ঐহিক
পারত্রিক মঙ্গল লাভে সমর্থ হয় ।

কৈতো হি লাইগে রাম প্রিয় কৈতু প্রভু প্রিয় হোহি ।

বৈ মই রুচৈ জে অগম সো কী বৈ তুলসী তোহি ॥ ৩৬২ ॥

হে সাধু তুলসীদাস ! রামকে তুমিই প্রিয় জ্ঞান কর বা তিনিই তোমাকে প্রিয় জ্ঞান করুন—এই দুইটির মধ্যে যেটা সহজ—তুমি তাহারই উপায় উদ্ভাবন কর :

তুলসী দৈ মই এক হি খেল ছাড়ি ছল খেলু ।

কৈ করু মমতা রাম সো কৈ মমতা পর হেলু ॥ ৩৬৩ ॥

হয় রামের প্রতি, না হয় সংসারের প্রতি, এই দুইয়ের মধ্যে একটির প্রতি হে তুলসি ! তুমি ছল-কপটতা ছাড়িয়া আকৃষ্ট হও ।

হৈ তুলসীকে একগুণ অব গুণনিধি কই লোগ ।

ভলো ভরোসো রাওরো রামরীষি বে যোগ ॥ ৩৬৪ ॥

হে তুলসীদাস ! তোমাকে সকলে অগুণের সমুদ্র বলিয়া থাকে কিন্তু শ্রীরামের প্রতি তোমার উত্তম ভরসাই কেবল একটীমাত্র গুণ উহার দ্বারাই তুমি তাঁহার প্রসন্নতা লাভে সমর্থ হইবে ।

সত্য বচন মানস বিমল কপট রহিত করতুতি ।

তুলসী রঘুবর সেবকহি সকে ন কলিষুগ ধৃতি ॥ ৩৬৫ ॥

হে তুলসীদাস ! ভগবান রামচন্দ্রের সেবকগণ বিমলচিত্ত এবং কপটতা রহিত হইয়া ধর্মকর্ম করেন বলিয়া তাঁহাদিগকে কলিকলুষ স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না ।

তুলসী স্বথ জো রাম সো দুঃখী সো নিজ করতুতি ।

করম বচন মন ঠিক জেহি তেহি ন সঠৈ কলিধৃতি ॥ ৩৬৬ ॥

শ্রীরাম হইতেই স্বখলাভ হয়—অভিমান পরায়ণ ব্যক্তিগণ স্বকৃত কর্মকলেই দুঃখভোগ করিয়া থাকে, হে তুলসী ! যাহার মন, কাজ ও কথা ঠিক, ধূর্ত কলি হইতে তাহার ভয় কোথায় ?

নাতো নাতে রামকে রাম সনে সনেছ ।

তুলসী মাদ্রত জেরি, কর জন্ম জন্ম বুধি দেহ ॥ ৩৬৭ ॥

তুলসীদাস ঘোড়হস্তে ভগবানের কাছে এই ভিক্ষা করিতেছেন যে
হে প্রভো! আমাকে জন্ম জন্ম এইরূপ বুদ্ধি প্রদান করুন—
যাহাতে আমি তোমাতেই আমার সকল ভক্তি-প্রীতি এবং সকল
সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়া ধন্য হই।

সব সাধনকো এক কল জেহি জানই সোই জান।

জ্যো তৌ মন মন্দির বসহি রাম ধরি ধনুবার্ন ॥ ৩৬৮ ॥

সকলেই জানেন যে সকল সাধনার ফল একইপ্রকার, ভগবান
শ্রীরামচন্দ্র সাধকের হৃদয়-মন্দিরে ধনুর্ধ্বাণ ধরিয়া বসিয়া আছেন।

জ্যো জগদীশভৌ অতিভলো জ্যো মহীশ তৌ ভাগ।

তুলসী চাহত জন্মভরি রামচরণ অমুরাগ ॥ ৩৬৯ ॥

তুলসীদাস বলিতেছেন—যিনি জগৎ শাসন করেন—তাঁহার অতি
সৌভাগ্য বলিতে হইবে, পৃথিবীর রাজা বড় বটে কিন্তু আমার মন
যেন আজীবন রামচরণের সেবামুরক্ত থাকে—আমার ইহাই কেবল
প্রার্থনীয় বিষয়।

হিত সো হিত রতি রাম সো রিপু সো বৈরতি হোউ।

উদাসীন সব সো সরস তুলসী সহজ স্বভাউ ॥ ৩৭০ ॥

হে তুলসীদাস! শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি রতিমতি রাখা, হিতকারীর
হিত সাধন করা, বৈরীর সহিত উদাসীন ভাব দেখানই ষষ্ঠার্থসহজ
ও সরল স্বভাব হইতেছে।

তুলসী মমতা রাম সো সমতা সব সংসার।

রাগন রোষন দোষ দুখ দান ভয়ে ভব ভার ॥ ৩৭১ ॥

হে তুলসীদাস! রামের প্রতি মমতা জন্মিলেই সংসারে মমতা
লাভ হইয়া থাকে। সংসারভাব—রোষ ও দুঃখ এবং দোষসকল
তাহার কাছে দাসরূপে নত হইয়া পড়ে।

রাম হি উক্ক বক সোঁ মমতা প্রীত প্রতীত ।

তুলসী নিরুপধি রামকে ডয়ে হারিছ জীত ॥ ৩৭২ ॥

হে তুলসীদাস! তুমি ভগবান রামকে মনে মনে ভজনা কর, তাহা হইলে তাহার প্রতি সাতিশয় ভালবাসা জন্মিলে আর তোমাকে কোন বিষয়ে পরাজিত হইতে হইবে না, তখন জয়লক্ষ্মী তোমার অঙ্কশায়িনী হইবেন।

তুলসী রাম কুপাল সোকহি স্নাহ গুণদোষ ।

হেয় দুবরী দীনতা পরম পীন সন্তোষ ॥ ৩৭৩ ॥

হে সাধক কবি তুলসীদাস! ভগবান রামচন্দ্র পরম দয়ালু, তাঁহাকে তোমার দোষগুণ শ্রবণ করাও, ইহাতে তোমার সমস্ত দুঃখদৈন্য দূরীভূত হইয়া প্রাণে অপার আনন্দলাভ হইবে ॥ ৩৭৪ ॥

কর মঠ কঠ মলিয়া কহে জ্ঞানী জ্ঞান বিহীন ।

তুলসী ত্রিপথ বিহায় গো রাম দুয়ারে দীন ॥ ৩৭৪ ॥

তুলসী বলিতেছেন—যে সকল ব্যক্তি করাঙ্গুলির দ্বারা কাঠোর মালা জপ করত নিজেকে পরম জ্ঞানী বলিয়া ধারণা করে কিন্তু তাহারাই আবার ত্রিপথ হারাইয়া ভগবানের কাছে আপনাকে দীন ভিখারী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া থাকে।

কাম ক্রোধ লোভাদি মদ প্রবল মোহকে ধরি ।

তিন মই অতি দারুণ দুখদ মায়া রূপী নারী ॥ ৩৭৫ ॥

কাম ক্রোধ লোভাদি মদই বল আর প্রবল মোহই বল—সকলের অপেক্ষা মায়ারূপিণী জীজ্ঞাতাই সাতিশয় সন্তাপদায়িনী।

তুলসী দেবলা দেবকী লাগে লাখ করোরি ।

কাক অভাগে হগি ভর্যো মহিমা ভৈকিয়োরী ॥ ৩৭৬ ॥

সাধককবি তুলসীদাস বলিতেছেন—দেবতার মন্দির নির্মাণার্থ

লক্ষ বা কোটি টাকা ব্যয় হয় কিন্তু সেই মন্দির উপরে হতভাগ্য কাক
সকল বিষ্ঠামুজ্জ্বল ত্যাগ করে, ভগবানের এ কোন মহিমা বল দেখি ?

ভলো কহে বিন জানি হুঁবিহু জানে অপবাদ ।

তে নর গাড়ুর জানি জিয় কবিয়েন হর্ষ বিষাদ ॥ ৩৭৭ ॥

না জানিয়া শুনিয়া যে লোক কাহার সুখ্যাতি বা অখ্যাতি
প্রচার করে, সুখ-দুঃখে তাহার জীবন জর্জরিত হয় ।

পরসুখ সম্পত্তি দেখি সুখ জরাই যে অক্লবিহু আগি ।

তুলসী তিন কো ভাগ্‌তে চলে ভলা হি ভাগি ॥ ৩৭৮ ॥

পরের সুখ দেখিয়া যে ব্যক্তি দুঃখপ্রকাশ করে—সে নিতান্ত
অপদার্থ, বিনা আগুণে সে পুড়িয়া মরে এবং তাহার সৌভাগ্য-
সূর্য্য অন্তর্মিত হয় ।

তহু গুণ ধন মহিমা ধরম তেঁহি বিহু যো অভিমান ।

তুলসী জিয়ত বিড়ঘনা পরিণাম হি গন্ত জান ॥ ৩৭৯ ॥

যে সকল ব্যক্তি আপনাদের দেহের, ধনের, গুণের এবং ধর্মের
অভিমান করিয়া থাকে । হে তুলসীদাস ! তাহাদের জীবন ধারণ
বিড়ঘনা ভিন্ন আর কিছু নয় ! পরিণাম ফল তাহাদের কিছুতেই
ভাল হয় না ।

শান্ত শান্তর গুরু মাতৃ পিতৃ প্রভু ভয়ো চাইই সব কোই ।

হেনো দুজী আউরকো সজ্জন সরাহিয় সোই ॥ ৩৮০ ॥

শান্ত শান্তী, গুরু, পিতা ও মাতা ইহারা সকলেই প্রভু পদবাচ্য
হইতে চাহেন কিন্তু যিনি অপর পক্ষে অর্থাৎ ঈশ্বর বিষয়ে পথ দেখাইবার
অন্য প্রভুত্ব করিতে পারেন—তিনিই পরমাত্মীয় এবং গৌরবের পাত্র
উত্তম মধ্যম নীচ গতি পান শিকতা পানি ।

প্ৰীতি পরীক্ষা তিহঁনি কো বৈয় ব্যতিক্রম জানি ॥ ৩৮১ ॥

শিলা, বালী ও জলরেখার স্থায় উত্তম, মধ্যম ও অধম মানবের আনন্দদায়ক কিন্তু উহার বিপরীত ভাব বৈরতা আনয়ন করিয়া থাকে।

পূণ্য প্রীতিপতি প্রাপতি পরমার্থ পথ পাঁচ।

লখাছ সৃজন পরিহর হিঁবল শুনছ শিখাবন সাঁচ ॥ ৩৮২ ॥

পূণ্য, প্রীতি, পতি, প্রাপ্তি ও পরমার্থ এই পাঁচটি পথকে দেখিয়া, তাহা অবলম্বন করিবার জন্য ভাল লোকে খেলের সজ্জা ত্যাগ করত সত্য শিক্ষালাভে যত্নবান হয়।

নীচ নিরাদর উচকে আদর সৃখদ বিশাল।

কদলী বদলী বিটপগতি পেথছ পনস রসাল ॥ ৩৮৩ ॥

ভাল লোকের আদর এবং খারাপ লোকের অনাদর আনন্দপ্রদ, যেমন আম-কাঁঠাল ছাড়িয়া ফুল ও কদলীর আদর কেহ করে না।

তুলসী আপনে আচরণ ভালো ন লাগত কাহ্ন।

তহিঁ নরসাত জো খাত নিত লহ শুনছ কো বাহ্ন ॥ ৩৮৪ ॥

হে তুলসীদাস! জাতীয় আচার-ব্যবহার কাহার না ভাল লাগিয়া থাকে? নিত্য মিষ্ট রস ভঞ্জে অভ্যস্ত ব্যক্তি কি কাহার কথা শুনিয়া তাহাতে ক্ষান্ত হয়?

রুধ সোঁ বিবেকী বিমলমতি জেহিকে রোষ ন রাগ।

সুহঁত সবাহত সাধু জেহি তুলসী তাকে ভাগ ॥ ৩৮৫ ॥

হে তুলসীদাস! পণ্ডিত অপেক্ষা নির্মলচিত্ত, বিবেকশালী ব্যক্তিই প্রধান, কারণ তাহার কোনপ্রকার রাগ-দ্বेष নাই আর হৃদয়বান প্রশংসনীয় সাধুগণ অতীব সৌভাগ্যশালী।

আপু আপু কই সবভলো আপন কই কোই কোই।

তুলসী সব কই জো ভালো সৃজন সরাহিয় সোই ॥ ৩৮৬ ॥

হে তুলসি ! আপন আপন বিষয়কে সকলেই ভাল বলিয়া থাকে
কিন্তু যাহা সকলের পক্ষে ভাল—সেই প্রশংসা পাইবার যোগ্য ।

তুলসী ভালো সুসঙ্গতে পোচ কুসঙ্গতি হোই ।

নাউকি নীর তীর আসলাহ বিলোকহ লোই ॥ ৩৮৭ ॥

হে সাধু তুলসী ! সংসঙ্গে লোকে সং হয় এবং অসংসঙ্গে লোকে
অসং হইয়া থাকে—নৌকার শোভা নীরেই হইয়া থাকে—তীরে নহে ।

গুণ সঙ্গতি গুরু হোই সো লঘু সঙ্গতি লঘু নাম ।

চার পদার্থ সে গণৈ নরক দ্বারহঁ কাম ॥ ৩৮৮ ॥

সংসঙ্গে স্বর্গবাস—গুণীর সঙ্গে থাকিলে শ্রেষ্ঠত্ব ও চতুর্ভুজলাভ হইয়া
থাকে এবং নীচ লোকের সঙ্গে থাকিলে নীচত্ব ও নরকভোগ হইয়া
থাকে—সে বিষয় সন্দেহ নাই ।

নাম ললিত লীলা ললিত ললিতরূপ রঘুনাথ ।

ললিতবসন ললিতভূষণ ললিতাহুজ শিশু-সাথ ॥ ৩৮৯ ॥

ললিত ললামরূপধারী রঘুনাথ, ললিত বসন-ভূষণে সুসজ্জিত হইয়া
আপনার ললিত অহুজ ক্ষুদ্র ভ্রাতাগণের সহিত লীলাখেলায় মত্ত
হইয়াছিলেন ।

রাম ভরত লক্ষ্মণ ললিত শত্রুশমন শুভ নাগ ।

সুমিরত দশরথ হুতন সব পুরহঁ সব মনোকাম ॥ ৩৯০ ॥

রাজা দশরথের রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও ললিত ললাম শত্রুঘ্ন এই
চারিটি পুত্রের নাম স্মরণ কর—তাহা হইলে হে তুলসি ! তোমার
মনের সকল বাসনা সিদ্ধ হইবে ।

নিজ ইচ্ছা প্রভু অবতরই স্থর গো দ্বিজহিত লাগি ।

সগুণ উপাসক সঙ্গ হৈঁ রহে মোক্ষ সব ত্যাগী ॥ ৩৯১ ॥

ভগবান রামচন্দ্র গো-ব্রাহ্মণ এবং দেবগণের মঙ্গল সাধনাথ

ব-ইচ্ছায় ভুতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—সেই সময় তাঁহার সত্ত্ব উপাসকগণ মোক্ষলাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া ছিলেন।

বাধক সব সবকে ভয়ে সাধক ভয়ে ন কোই।

তুলসী রাম রূপালতে ভলী হোয় সো হোই ॥ ৩২২ ॥

ভগবান রামচন্দ্রের রূপালতেই লোকের মঙ্গল সংসাধিত হইয়া থাকে নতুবা হে তুলসীদাস! জগতে সকলেই সকলের বাধক হইয়াছে—সাধক কেহই নাই। অর্থাৎ ভাল কাজে বাধা দিবার লোক অনেক, উৎসাহ দিবার কেহ নাই।

শঙ্কর প্রিয় মম দ্রোহী শিবদ্রোহী মম দাস।

তে নর করহি কল্পতরি ঘোর নরক মই বাস ॥ ৩২৩ ॥

ভগবান বলিয়াছেন—শিবের সেবক যদি আমার বিপক্ষ হয় এবং আমার সেবক যদি শিবের বিপক্ষ হয়—তাঁহার তাহাকে চারুগ্ন নরকে পচিয়া মরিতে হয়।

বিগল বিগল স্তম্ভসঙ্গ দুখ জ্বিয়ন মরণ সোই রীতি।

রহেতে রাখে রামকে গয়েতে উচিতি অনীতি ॥ ৩২৪ ॥

স্তম্ভ-দুঃখ যেমন পর্য্যায়ক্রমে জীবকে ভোগ করিতে হয়—জীবন মরণও তদ্রূপ ভোগ হইয়া থাকে। ভগবান যদি রক্ষা করেন—তবে জীব এ জগতে জীবিত থাকে—নতুবা সে আচারবিহীন হইয়া মৃত্যুর অঙ্কশায়ী হইয়া পড়ে।

কুশধন সধহীন দেবদুঃখ মুয় হেন মাদব নীচ।

তুলসী মজ্জনকী রহনি পাবক পানি বীচ ॥ ৩২৫ ॥

ধনের অভাব, বন্ধু-বান্ধবের অভাব এবং দৈবকর্তৃক দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও কখন নীচজনের নিকট প্রার্থনা

করিবে না। সজ্জনগণ জল ও অগ্নির মত বাস করেন—অর্থাৎ তাহারা চির পবিত্র—চাহিতে হইলে তাঁহাদের নিকটই প্রার্থনা করিবে।

নীচ নীচাই নহি তাজে সজ্জনহকে সঙ্গ।

তুলসী চন্দন বিটপি বসি বিনবিষ ভয়ে ন ভুজঙ্গ ॥ ৩২৬ ॥

চন্দন বনে বাস করিলেও যেমন সর্প কখন বিষহীন হয় না—সেইরূপ হে তুলসি! নীচলোকে সজ্জনসঙ্গ করিলেও কখন নীচত্ব হইতে মুক্তিলাভ করে না।

ভলো ভলাই পৈ লঠৈ লঠৈ নীচাই নীচ।

সুধা সরাহী অমরতা গরল সরাহী মীচ ॥ ৩২৭ ॥

ভাললোকে ভাল পথ এবং খারাপ লোক খারাপ পথই অবলম্বন করে, যেমন দেবগণ অমৃতের এবং অসুরগণ মদের প্রশংসা করিয়া থাকে।

মিথ্যা মাহুর সজ্জনহি খলহি গরলসম সাঁচ।

তুলসী ছুবত পরায়. জ্যাও পারদ পাবক আঁচ ॥ ৩২৮ ॥

সজ্জনের নিকট মিথ্যা বিষবৎ এবং সত্য খলের নিকট গরল-তুল্য—হে তুলসীদাস! যেমন আগুনের উদ্ভাপ লাগিবারাত্র পারদ গলিয়া ভস্মসাৎ হয়। অর্থাৎ সজ্জন মিথ্যা চায় না, খল সত্য চায় না।

সন্তসঙ্গ অববর্গকর কামী ভবকর পঙ্গ।

কহহি সাধু কবি কোবিদ শ্রুতি পুরাণ সব গ্রন্থ ॥ ৩২৯ ॥

পণ্ডিত, সাধু, কবি এবং বেদ পুরাণাদি গ্রন্থসমূহ যুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন—সাধুসঙ্গ মোক্ষমূলক এবং কামীজন সঙ্গ সকল বন্ধনের হেতু বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়াছেন।

শুকৃত ন শ্রুতি পরিহরৈ কপট ন কপটী নীচ।

মরত সিধাবন সাদিঘো গীধরাজ মারীচ ॥ ৪০০ ॥

শ্রুতিশালী ব্যক্তি কখন শ্রুতি পরিত্যাগ করিতে পারে না;

এবং নীচজন কখন কপটতা ছাড়িতে সক্ষম হয় না। যেমন পক্ষীরা ক
জটায়ু পক্ষী হইয়াও আপনার সাধুতা এবং মারীচ নিশাচর হইয়াও
আপনার কপটতা বিশেষভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন।

পিয়হি স্মন-রস অলি বিটপ কাটি কীর ফল খাত।

তুলসী তরুজীব যুগল স্মৃতি কুমতি কি বাত ॥ ৪০১ ॥

তুলসীদাস গৌসাই বলেন—ভ্রমর ও শুক উভয়ে তরুজীব হইলেও
ভ্রমর পুষ্প হইতে মধুপান করে আর শুক বুদ্ধিদোষে শাখা কাটিয়া
তাহার ফল ভক্ষণ করে।

অবসর কোড়ী জো চুটক বহরি দিইয়কা লাখ।

হুহজন চন্দ্রা দেখিয়ে উদয় কহ ভরি পাখ ॥ ৪০২ ॥

সময়ে কাণাকড়ি দ্বারা যে কাজ হয়—অসময়ে লক্ষ টাকাতোও সে
কাজ হয় না। দ্বিতীয়র চাঁদ দেখিলেই যখন পূণ্য হয়—তখন একপক্ষ
ভরিয়া চাঁদ দেখিলে আরও কত পূণ্য হয়—তাহা কে বলিতে পারে।

তুলসী জগজীবন অহিত কতছঁ কোউ হিতজানি।

শোষক ভাঙ্গু কুশাঙ্গু মহি পবন এক ঘনদানি ॥ ৪০৩ ॥

হে তুলসীদাস! কেহ কেহ মনুষ্য জীবনকে ভাল এবং কেহ কেহ মন্দ
বলিয়া বিবেচনা করেন, যেমন সূর্য্য এবং অগ্নি পৃথিবীর রসশোষণ করেন
—আর পবন ও মেঘ তাহাতে বারিবর্ষণ করিয়া তাহাকে সরস করে।

জলচর থলচর গগনচর দেব দহুজ নর নাগ।

উত্তম অধম মধ্যম থল দশগুণ বড়ত বিভাগ ॥ ৪০৪ ॥

জলচর, ভূচর, ক্ষেচর এবং দেব, মানব, দানব ও নাগগণের মধ্যেও
উত্তম, মধ্যম, অধম ও খলস্বভাব অনেক জীব রহিয়াছে। দেখিতে
গেলে উত্তম মধ্যমাদি বিভাগ না বাড়িয়া কেবল মন্দেবভাগই দশগুণ
বুঝি হইতেছে।

হৃদয় কপট বরবেশ ধর বচন কঠৈ গড়ি ছোলি ।

অবকে লোগ ময়ুর জেঁয়া কোঁ মিলিয়ে মনখোলি ॥ ৪০৫ ॥

এ যুগের লোক সকল ময়ুরের ভ্রায় হৃদয়ের রমণীয় বেশ ধরিয়া
কপটহৃদয়ে কত ভাল কথা কয় কিন্তু প্রাণ খুলিয়া কাহার সহিত
সরল ভাবে কথা কহিতে বা মিশিতে পারে না ।

চরণ চৌচ লোচন রঙ্গো চলি মরালী চাল ।

ছিন্ন নীর বিবরণ সঠৈ বক উৎসরত ভেহি কাল ॥ ৪০৬ ॥

বকের বর্ণ, চালচলন, পদ, চক্ষু, চক্ষু সমস্তই হাঁসের মত দেখা যায়
কিন্তু জলমিশ্রিত দুগ্ধপানের সময়ই তাহার কৃতীত্বের পরিচয় পাওয়া যায় ।

লোভে ইচ্ছা দস্ত বল, কামকে কেবল নারী ।

ক্রোধকে পক্ষ বচন বল, মুনিবর কহিঁ বিচারী ॥ ৪০৭ ॥

মুণিগণ বিচার করিয়া বলিয়াছেন—লোভের বল ইচ্ছা ও অহঙ্কার
এবং কামের বল নারী এবং ক্রোধের বল কঠোর বচন ।

জাঁয় কহব করতুতি বিহু জায় যোগ বিহু ক্ষেম ।

তুলসী জাই উপায় সব বিনা রামপদ প্রেম ॥ ৪০৮ ॥

হে তুলসীদাস! রামপদে প্রেমভক্তি ভিন্ন যোগ ধ্যান, স্তব স্তুতি
সাহায্য কর—কোন উপায়ই সিদ্ধিলাভ হয় না ।

লোগ মজ তু সব যোগ যৌ যোগ জয়া বিহু ক্ষেম ।

তৌ তুলসীকে ভবগতু রাম প্রেম বিহু নেম ॥ ৪০৯ ॥

লোকে যোগধর্ম প্রার্থনা করিয়া থাকেন—ঐ যোগধর্ম সৃষ্টি
বিনা কখনও সিদ্ধ হয় না কিন্তু তুলসীদাসের ভবের সখল রাম—
প্রেমের কোন নিয়ম নাই । অর্থাৎ রাম প্রেম লাভ করিতে হইলে
যোগ-যোগের তত বাধাবাদি নিয়ম করিতে হয় না—কেবল ভক্তি
সহকারে সাধনা করিলেই হইল ।

তুলসী রাম জ্ঞো আদরো খাঠো ধরো ধরোই ।

দীপক কাজর শিরে ধরো ধরো অধ বোধ রাই ॥ ৪১০ ॥

হে তুলসি ! কাজলের টিপ্ যেমন শিরোধারী, তেমনি ভাল করেই হউক—আর মন্দ করেই হউক—রামচন্দ্রকে আদর করিতে পারিলে তিনি উজ্জল দীপের মত হন—অর্থাৎ হেলায়-অশ্রদ্ধায় ভগবানের নাম করিলেও সে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হয় ।

তন বিচিত্র কায়র বচন অহি আহার মন ঘোর ।

তুলসী হরি ভয়ে পক্ষধর তাতে কহ সব মোর ॥ ৪১১ ॥

গৌসাই তুলসীদাস বলিয়াছেন—নানা বিচিত্র বর্ণরঞ্জিত ময়ূর কঠোর ভাবী এবং সর্পাহারী হইলেও শ্রীকৃষ্ণ তাহার গুচ্ছ আপন মাথার চুড়ায় ধারণ করেন । যতই মন্দ হউক না কেন ভগবানের নিকট ভক্তের আদর এইরূপ ।

ঘর ঘর মাংগে টুকপুনি ভূপতি পূজে পায় ।

হে তুলসী সব রাম বিনে তু অব রাম সহায় ॥ ৪১২ ॥

হে তুলসীদাস ! শ্রীরামচন্দ্রজী যাহার সহায় সম্বল—সে কোপীন পরিত্যাগ করে ঘরে ভিক্ষা করিয়া খাইলেও রাজা-মহারাজা তাঁহার পদ পূজা করিয়া ধন্য হইবে ।

তুলসী রাম স্মৃতিতে নিবল হোত বলবান ।

বালি বৈর অগ্রীবকে কহা কিয়ো হুম্মান ॥ ৪১৩ ॥

হে তুলসীদাস ! শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি যাহার ভক্তি আছে—সে দুর্বল হইলেও বলবান । যেমন মহাবলী বালিরাজ রামসখা অগ্রীবের শত্রু হইয়া দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং হুম্মান অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া অসম সাহসিক কার্য সম্বল সম্পন্ন করিয়াছিলেন ।

তুলসী রামহি তে অধিক রামভক্ত জিয় জান ।

অনিৰ্ণী রাজা রাম সো ধন ভয়ে হুমান ॥ ৪১৪ ॥

হে তুলসীদাস ! ভক্তজন ভগবান হইতে বড় । রামভক্তি, অতাব-
গ্রস্ত ঋণী ব্যক্তিকেও রাজা করিতে পারেন—সেইজন্ত বনের বানর
হুমান রামভক্তি বলে শ্রীরামচন্দ্র হইতেও বড় হইয়াছেন ।

কিয়ে সো সেবকধর্ম কপি প্রভু কৃতজ্ঞ জিয়জান ।

জোরি হাত ঠাঢ়ে ভয়ে বরদায়ক বরদান ॥ ৪১৫ ॥

বানররাজ হুমানের রামের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও দাস্ত ভাবের তুলনা
নাই । তিনি বরদাতা প্রভু রামচন্দ্রের কাছে সতত করধোড়ে
দাঁড়াইয়া থাকেন ।

ভক্ত হেত ভগবান প্রভু রাম ধরো তনু ভূপ ।

কিয় চরিত্র পাবন পরম প্রাকৃত-নর অহরূপ ॥ ৪১৬ ॥

ভক্তের জন্ত ভগবান রামচন্দ্রের অবতার গ্রহণ, তিনি রাজার
দেহ ধারণ করত ঠিক মানবের মত অতি পবিত্র আদর্শ চরিত্র লইয়া
মানবের আচরণীয় কার্য সকল সুন্দরভাবে সম্পন্ন করিয়াছিলেন ।

শুদ্ধ সচ্চিদানন্দময় কন্দ!ভাহুকুল কেতু ।

চরিত করত নর অন্ত হরত সংসৃত সাগর সেতু ॥ ৪১৭ ॥

প্রাতঃস্মরণীয় সূর্য্যবংশাবতঃশ বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দময় পুরুষ ভগবান
রামচন্দ্র নর-কলেবর ধারণ করিয়া সাগর বন্ধন করত রাক্ষসকুল
নিশ্চূল করিয়াছিলেন ।

বাল বিভূষণ বসন বর ধূরি ধূসরিত অঙ্গ ।

বালকেলি রঘুবর করত বালবন্ধু সব সঙ্গ ॥ ৪১৮ ॥

ভগবান রামচন্দ্র ধূলি-ধূসরিত অঙ্গ হইয়া বাল্যকালের বসন ভূষণ
পরিধান, পূর্ব্বক বাল্যবন্ধুগণের সহিত বাল্যক্রীড়া করিয়াছিলেন ।

অহুদিন অবধর ধাবনে নিত নব মঙ্গল মোদ ।

মুদিত মাতৃ পিতৃ লোগ লখি রঘুবর বাল বিনোদ ॥ ৪১৯ ॥

প্রতিদিন বালবিনোদ রঘুনাথ রামচন্দ্র নূতন নূতন মঙ্গলময়
লীলাখেলার অবতারণা করিতেন—তাহা দেখিয়া পিতামাতা ও অগ্নাত
লোক সকল প্রফুল্লিত হইতেন ।

কৌশল্যা কল্যাণময় মুরতি করত প্রণাম ।

সকল সুমঙ্গল কাজ শুভ কৃপা করিহঁ সীয়া রাম ॥ ৪২০ ॥

কল্যাণময়ী কৌশল্যা মূর্তিকে প্রণাম করিলে, কৃপা নিধান সীতারাম
সকলের সকল প্রকার মঙ্গল ও আনন্দ বিধান করিয়া থাকেন ।

সুমিরি সুমিত্রা নাম জপ জ্যোতির লেহি স্নেনেম ।

স্বর্ণ লষণ রিপুদমন সে পাওহঁ পতিপদ প্রেম ॥ ৪২১ ॥

দেবী সুমিত্রার নাম স্মরণপূর্বক নিয়মিত জপ করিলে নারী-
জাতির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিও রিপুদমন ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় এবং পতিপদে প্রেম-
ভক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

সীতা চরণ প্রণাম কর সুমিরি স্ননাম স্নেনেম ।

সোতিয় হোহি পতি দেবতা প্রাণনাথ প্রিয় প্রেম ॥ ৪২২ ॥

যে স্ত্রী সীতার চরণে প্রণাম করিয়া নিয়মিত তাহার পবিত্র
নাম স্মরণ করে, তিনি স্বামীর অতীব আনন্দদায়িনী হন এবং
তাঁহার স্বামী দেবতার ন্যায় পূজা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।

বসি কু-সঙ্গ গহ সজ্জনতা তাকী আশা নিরাশ ।

তীরথহকো নাম ভো গয়া মাহকে পাস ॥ ৪২৩ ॥

কু-সংসর্গে ভ্রমণ করিলে সজ্জনেরও সকল শোভা নষ্ট হইয়া থাকে,
তাঁহার আশা ভরসা সমস্ত নষ্ট হয়, গয়ার নিকটবর্তী স্থান যেমন গয়া
নামে অভিহীত হয়, দুর্জনের নিকটে থাকিলে সেও দুর্জন হইয়া থাকে ।

রাম কৃপা তুলসী স্থলভ গজ সুসজ্জ সমান ।

যোজন পরে যোজন মিলে কিঞ্চে আপু সমান ॥ ৪২৪ ॥

হে তুলসীদাস ! শ্রীরামচন্দ্রের কৃপালাভ করা অতি সহজ, গজা ও সাধুসজ্জের সমান সহজ সাধ্য। যোজন হইতে যোজন দূরে থাকিলেও ভগবান ভক্তকে পদাশ্রয়ে আশ্রয় দেন ও আপনার করিয়া লয়েন।

করু বিচার চলু সুপথ ভল আদি মধ্য পরিণাম ।

উল্টে জপে যে রাম রাল সিধে রাজা রাম ॥ ৪২৫ ॥

বালা যৌবন ও বৃদ্ধ অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া সৎপথে বিচরণ করিতে অভ্যাস কর। যে ব্যক্তি উল্টাভাবে অর্থাৎ মরা মরা করিয়া রামনাম জপ করে সে সোজাভাবেও রাজা রামচন্দ্রকে স্মরণ করিতে পারে—যে রূপ বাগ্ম্যিক মুনি করিয়াছিলেন।

হোই ভালেকে অনভলো হোয় দানিকে স্তম ।

হোই কুপুত সুপুতকে জ্যাও পাবককে ধুম ॥ ৪২৬ ॥

অগ্নি হইতে যে রূপ ধুম বহির্গত হয়, তেমনি সংলোক হইতেও মন্দ এবং দাতা হইতেও কৃপণতা দোষ বাহির হইয়া পড়ে—যেমন সুপুত্র হইতে কুপুত্রের উদ্ভব সম্ভব হয়।

যো যো যেহি যে হি রস মগন তই সোঁ মুনি মানি ।

রস গুণ দোষ বিচারিও রসিক রীতি পহি চানী ॥ ৪২৭ ॥

যিনি যে রসে নিমগ্ন আছেন, তিনি সেই রসই ভালবাসেন—এইজন্য স্বরসিক জনের নিয়মানুসারে রসের ভালমন্দ বিচার করা উচিত।

বিকৃতি পরখিহু স্তজন জনরাখি পরখিয়হি মন্দ ।

বাড়বানল শোষত উদধি হর্ব বড়াবত চন্দ ॥ ৪২৮ ॥

বাড়বানল যেমন সমুদ্রের সলিল শোষণ করিয়া থাকে এবং চন্দ্র যেমন

তাহার হর্ববর্জন করে; সেইরূপ দুর্জন লোক পরের দোষ এবং সজ্জন লোক অপরের গুণ বিচার করিয়া থাকেন।

প্রভু সম্মুখে ভয় নীচনর নিপট ভয়ে বিকরাল।

রবিরূথ লখি দর্পণ ফটিক উগিলত জালা জাল ॥ ৪২২ ॥

রৌদ্রতাপে যেমন দর্পণ এবং ফটিকমণি কখন কখন বিদীর্ণ হইয়া যায়, তেমনি প্রভু বামচন্দ্রের সম্মুখে নীচলোক ভয়ে জড়সড় হইয়া বিকট-মূর্তি ধারণ করে।

প্রভু সমীপগত সজ্জন হোত সুখদ সো বিচারি।

লবণ জলধি জীবন জলদ বারত সুধা সম বারি ॥ ৪৩০ ॥

সজ্জনগণ ভগবানের মূর্তি সম্মুখে দেখিলে অতিশয় সুখবোধ করে, আর মেঘসকল লবণ সমুদ্র হইতে বারি গ্রহণ করত সুধা-বারি বরিষণ করিয়া থাকে।

নীচ নীরা বঁহি নীরস তরু তুলসি নীচহি রূথ।

পেষিত পয়দ সমান সব বিষ পিষুস কি সুখ ॥ ৪৩১ ॥

কবি তুলসীদাস কহেন—নীচজন কেবল শুষ্ক তরুতে উত্তপ্তবারি প্রদান করে, কিন্তু জলদ সকল শীতল জলদানে কি বিষবৃক্ষ কি পিষুবৃক্ষ সকলকেই পোষণ করিয়া থাকে।

বরষি বির্ষ হাষিত করত হরত তাপ অঘ পিয়াস।

তুলসী দোষণ জলন কো জো জল জারৈজ বাস ॥ ৪৩২ ॥

গৌসাই তুলসীদাস বলেন—মেঘ সকলকে কেমন করিয়া দোষী করিতে পারা যায়, যখন তাহারা বারিবর্ষণ করিয়া বিশ্ববাসীর আনন্দোৎপাদন, পাপতাপ দূর এবং পিপাসা নষ্ট করিতেছে।

লাভ সময় কো পালিয়ো হানি সময়কি চুক।

সদা বিচারহি চাক্রমতি সুদিন কুদিন দিন চুক ॥ ৪৩৩ ॥

সময়ের সদ্যবহার করাই পরমলাভ এবং অপব্যবহার করাই অত্যন্ত
হানিজনক, এইজন্য বুদ্ধিমান জনগণ সুদিন কুদিন বিচার করিয়া তাহার
সদ্যয় করিবেন।

সিন্ধু তরণ কপি গিরিহরণ কাজ সাহসিত দোউ।

তুলসী সময় হি সম বড় বুকত কছ কোউ কোউ ॥ ৪৩৪ ॥

হে তুলসীদাস! সময় সকলের অপেক্ষা বড়—ইহা সকলে বুঝুক
আর নাই বুঝুক, কেহ কেহ ইহা বুঝিয়াছে, এইজন্য সময় বুঝিয়া
হুম্মান সাগর লঙ্ঘন ও গন্ধমাদন গিরি আনিয়াছিলেন।

তুলসী মীঠা অমোতে সজা মিলে জো মীচু।

সুখা সুখাকর সময় বিদ্ধ কালকূটে মিচু ॥ ৪৩৫ ॥

হে তুলসীদাস! অসময়ে সুমিষ্ট অমৃত হইতেও মৃত্যু হইতে পারে
এবং সুখাকর চন্দ্র হইতে কালকূট বিব উৎপন্ন হইতে পারে।

তুলসী অসময়কো সখা ধীরজ ধর্ম বিবেক।

সাহিত সাহস সত্যব্রত রাম ভরোসো এক ॥ ৪৩৬ ॥

হে কবি তুলসীদাস! অসময় অর্থাৎ বিপদকাল সমুপস্থিত হইলে বিবেক
বুদ্ধির সাহায্যে ধৈর্য্য ধারণ ও ধর্ম্যাবলম্বন করিবে—কারণ উচাই
অসময়ে বন্ধুস্বরূপ এবং সেইকালে অতীব সাহসের সহিত সত্যব্রত ধারণ
করত একমাত্র প্রভু রামের প্রতি আশা-ভরসা স্থাপন করিয়া থাকিবে।

সাহের তে সেবক বড়ো জো নিজধর্ম্য সজ্ঞান।

রাম বাঁধি উতরে উদধি নাজ্যো গয়ো হুম্মান ॥ ৪৩৭ ॥

স্বধর্ম্য পরায়ণ সাধককে প্রভু রামচন্দ্র হইতেও বড় বলিয়া ধারণা
করিতে হইবে—যেহেতু রামচন্দ্র সেতু বাঁধিয়া সাগর পার হইয়া-
ছিলেন আর হুম্মান ভক্তি বলে লক্ষ প্রদান করিয়া সিন্ধুর পরপারে
উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

তুলসী নিজ করতুতি বিন মুক্ত জানো জব কোই ।

গয়ো অজামিল লোক হরিনাম সকে । নহি খেয়ই ॥ ৪৩৮ ॥

হে তুলসীদাস ! লোক যত ধর্ম করুক, নিজ স্মৃতি ভিন্ন কেহই মুক্ত হইতে পারে না । দেখ, অজামিল নিজ স্মৃতিবলে মৃত্যুসময়ে হরিনাম করিয়া মোক্ষপাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

বড়ো গহেতে হোত বড় জ্যোত বামন কর দণ্ড ।

শ্রীপ্রভুকে সঙ্গ সোঁ বড়ী গয়ে অখিল ব্রহ্মাণ্ড ॥ ৪৩৯ ॥

মহতের সঙ্গে মহত লাভ অনিবার্ধা, যেমন বামনদেব বলিরাজার দণ্ড বিধান করিলেও তিনি তাঁহার সঙ্গলাভ জনিত পুণ্যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মহৎ পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

দম্ব সহিত কলিধর্ম সব চল সমেত ব্যবহার ।

স্বারথ সহিত সনেহ সব রুচি অমুহরত আচার । ৪৪০ ॥

কলির লোক অতীব দাস্তিকতার সহিত ধর্মকর্মের অমুষ্ঠান করিয়া থাকে ; ব্যবহারে ছলনা করিয়া থাকে, পবিত্র প্রণয়ে স্বার্থের পরাকাষ্ঠা দেখায় এবং যাহার যেমন ইচ্ছা সেইরূপ আচরণ করে— শাস্ত্রের শাসন আর তত কেহ গ্রাহ্য করে না ।

চোর চতুর বটপার ভট প্রভুপ্রিয় ভক হা ভণ্ড ।

সর্বভক্ষক পরমার্থী কলি সুপস্থ পাষণ্ড । ৪৪১ ॥

কলিযুগে সকল সম্প্রদায়ের লোক ছবৃত্ত হইয়া পড়িবে, শাস্ত্র ব্যবসায়ী তত্ত্বজ্ঞানী মানবগণ সর্বভুক হইবে, চোরগণ চতুর হইবে, যোদ্ধাগণ বাটপাড় হইবে, আর প্রভুভক্তগণ অতিশয় ভণ্ড হইয়া পড়িবে ।

অন্তভ বেশভূষণ ধরৈঁ ভক্ষ অভক্ষ জে খাহি ।

তে যোগী সে সিদ্ধ নরপূজিত কলিযুগে মাছি ॥ ৪৪২ ॥

এই কলিযুগে যাহারা খাচ্চাখাচ্ছের বিচার করিবে না এবং

ইচ্ছামত পোষাকপরিচ্ছদন পরিধান করিবে—তাহারাই যোগ-সিদ্ধ এবং নরপূজিত বলিয়া সম্মানিত হইবে।

জে অপকারী চার তিনকর গোরব মানতেই।

মন বচ কৰ্ম লবায় তে বক্তা কলিকাল মই ॥ ৪৪৩ ॥

পরের মন্দকারী জনগণই কলিকালে সম্মানাপন্ন হইবে; এবং কায়মনে মিথ্যাকথা বলিয়া যে দিগন্ত কাঁপাইতে পারিবে—সেই পরমবক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিবে।

ব্রহ্মজ্ঞান বিহু নারীনর কহিঁ ন দুসরি বাত।

কোড়ী লগিতে মোহবশ করিঁ বিপ্রগুরু ধাত ॥ ৪৪৪ ॥

ব্রহ্মজ্ঞান অতুল্য কিন্তু এই কলিকালে সামান্য জ্ঞাপ্রকবেও ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কহিবে। এ-কালের মনুষ্য সকল অর্থলোভ ব্রহ্মহত্যা; গুরুহত্যা প্রভৃতি করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না।

বাদহিঁ শূদ্র দ্বিজনসম হমতুমতে কছু ঘাটি।

জানহি ব্রহ্ম সো বিপ্রবর আঁখি দিখাবহি ভাটি ॥ ৪৪৫ ॥

কলিকালে শূদ্রগণ ব্রাহ্মণগণকে চক্ষু রাঙ্গাইয়া বলিবে—“আমি তোমাদের চেয়ে নীচ কিসে” যে ব্রহ্মকে জানে—সেই ব্রাহ্মণ তোমরা তাঁহাকে জান কি? ইত্যাদি অস্পষ্টা সূচক কথায় অপমান করিবে।

ঋতিসম্মত হরিভক্তি পথ সংযুত বিরতি বিবেক।

তেহিঁ পরিহরহিঁ বিমোহবশ করহিঁপছ অনেক ॥ ৪৪৬ ॥

ঋতিসম্মত উদ্ধারের পথই বিবেক বৈরাগ্যযুক্ত হরিভক্তি; কিন্তু এই কলিকালের লোকে ঐ পথ পরিত্যাগ করিয়া অনেক কাপনিকপন্থা আবিষ্কার করিতেছে।

সর্ব ধর্ম বিপরীত কলিকল্পিত কোটা কুণ্ঠ।

পুণ্য পরায়ণহারবন দূর পুরাণ শুভ গ্রন্থ ॥ ৪৪৭ ॥

ধর্ম সকল বিপরীতভাব ধারণ করিয়া এই কলিকালে কোটা কোটা
কলিত কু-ভাবে পরিচালিত হইবে; পুণ্যময় পৌরাণিক গ্রন্থ সকল
অগ্রাহ্য করিয়া সকলে দূরে কেলিয়া দিবে।

তুলসী পাষনকো সময় ধরিকো কলন মোন ।

অবতৈ দাদুর বোলিহৈ হমৈ পুঁছিহৈ কোন ॥ ৪৪৮ ॥

তুলসীদাস গোসাই বলিতেছেন—কলিতে ধার্মিকের আদর থাকিবে
না; সে কেমন না—বর্ধাকালে ডেক সকল সমস্বরে কলরব করিলে
যেমন কোকিলগণ নীরব হইয়া থাকে—তাহারা ভাবে এখন তাহাদের
স্বর সকলেই অগ্রাহ্য করিবে। এ যুগে ধার্মিকের ভাবও তেমন।

কুপথ কুতর্ক কুবাণী কলি কপট দম্ব পাষণ্ড ।

দহন রাম গুণগ্রাম জিমিই ধন অনল প্রচণ্ড ॥ ৪৪৯ ॥

কুতর্ক, কুপথ, পরনিন্দা, দম্বিকতা প্রভৃতি কলির জীবের অজ্ঞানভরণ
হইবে; রাম গুণগানরূপ অনলে উহা ভস্মীভূত হইলে আবার পবিত্রতা
লাভ হইবে—যেমন আগুনে ধনরাশি দগ্ধ হইয়া মাছুষের পবিত্রতা
আনয়ন করে।

কলি পাষণ্ড প্রচার, প্রবল পাপ পামর পতিত ।

তুলসী উঠৈ অধার রামনাম হরসরি সলিল ॥ ৪৫০ ॥

কলিতে পাষণ্ড জনগণের মত প্রবলরূপে প্রচারিত হইবে এবং পাপ-
মতি জনগণ সর্বদা পাপে মগ্ন হইয়া থাকিবে। হে তুলসীদাস!
তুমি এই সকল নানাকল্পে রামনাম হরনদীর জল পান করিয়া
ধন্য হও।

রামচন্দ্র মুখচন্দ্রমা চিত চকোর জব হোই ।

রাম কাজ সবকাম শুভ সময় হুহাবন সোই ॥ ৪৫১ ॥

তুলসীদাস বলেন—ভগবান রামচন্দ্রের মুখচন্দ্রমার স্থাপানে

বাহার চিত্ত-চকোর সদাই প্রমত্ত হইয়া থাকে ; তাহার যাবতীর কাজকর্মই মঙ্গলময় সন্তোষদায়ক হইয়া থাকে ।

বীজ রামগুণগণ নয়ন জল অঙ্গুর পুলকালি ।

স্বকৃতি স্থলভ স্থখত বর বিলসত তুলসী শালি ॥ ৪৫২ ॥

গোঁসাই কবি তুলসীদাস বলেন—স্বকৃতিরূপ উর্কর কুমিতে রামনাম
থরূপ বীজ বপন করতঃ নয়নের জল ছড়াইলে, তাহা হইতে পুলকরূপ
অঙ্গুর উদগম হইয়া সাধককে অতীষ্ট ফলদানে সন্তুষ্ট করে ।

তুলসী সহিত সনেহ নিত স্থমিরহ সীতারাম ।

সগুণ স্থমঙ্গল শুভ সদা আদি মধ্য পরিণাম ॥ ৪৫৩ ॥

বালা, যৌবন ও বৃদ্ধকালে সতত—হে তুলসীদাস ! তুমি সর্ব
শুভময় ও স্থমঙ্গলপ্রদ সীতারামকে ভক্তি-প্রীতির সহিত প্রত্যহ হৃদয়মধ্যে
ধারণা করিবে ।

পুরুষার্থ আরথ সকল পরমার্থ পরিণাম ।

স্থলভ সিদ্ধি সব সাহিবী স্থমিরত সীতারাম ॥ ৪৫৪ ॥

ভগবান রাম ও সীতাকে স্মরণ করিলে পরকালে সকলপ্রকার
স্বার্থ, পুরুষার্থ, পরমার্থ এবং নানাপ্রকার সিদ্ধি অতি সহজে করতল-
গত করিতে পারা যায় ।

কা ভাষা কা সংস্কৃত প্রেম চাহিয়ে সাঁচ ।

কাম ছো আঁবে কামরী কালৈ কঠৈ কুমাচ ॥ ৪৫৫ ॥

যাহার যে ভাষা, সেই ভাষাতেই হউক বা সংস্কৃত ভাষাতেই
হউক, ভগবানের প্রতি সত্য প্রেম স্থাপন করা আবশ্যিক ; আর কর্তব্য
কর্ম সকল উপস্থিত হইলেই তৎক্ষণাৎ পালন করিবে, কারণ কাল
কি হইবে—তাহা ত কেহ বলিতে পারে না । রাবণ রামচন্দ্রকে
ইহাই উপদেশ দিয়াছিলেন ।

পরমানন্দ কৃপায়তন মন পরিপূরণ কাম ।

প্রেম ভক্তি অনপাবনী হমাই দেখ শ্রীরাম ॥ ৪৫৬ ॥

হে দয়াল রামচন্দ্র ! তুমি কৃপাময় পরমানন্দ স্বরূপ এবং ভক্ত-
গণের অভীষ্ট কলদাতা, ঠাকুর ! আমার মত পতিত জনকে তুমি
প্রেমভক্তি দানে ধন্য কর ।

বারিভয়ে ঘৃত হোয় বরু সিকতাতে বরু তেল ।

বিহু হরিভজন ন ভব তরৈ চহ সিদ্ধান্ত অপেল ॥ ৪৫৭ ॥

বারি হইতে বরং ঘৃত উৎপন্ন হওয়া সম্ভব এবং বালুকা হইতে
বরং তৈলের উৎপত্তি সম্ভবপর হইতে পারে কিন্তু ইহা স্থির নিশ্চয় যে
শ্রীহরির ভজন বিনা ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার আর কোন উপায় নাই ।

জো চেতন কই জড় করৈ জড়ৈ কর হি চেতন ।

অসু সমর্থ রঘুনাথ কহি ভজাই জীব তে ধন্য ॥ ৪৫৮ ॥

যিনি অচেতনকে চৈতন্যময় এবং চৈতন্যময়কে অচেতন করিতে
পারেন—সেই সর্বশক্তিময় পরম পুরুষ ভগবান রামচন্দ্রকে যাহারা
ভজনা করেন—এ জগতে তাহারাই ধন্য ।

শ্রীরঘুবীর প্রতাপেতে সিদ্ধ পয়ে পাষণ ।

তে মতিমন্ড যো রাম ত্যজি ভজাই যায় প্রভু আন ॥ ৪৫৯ ॥

রঘুবীর শ্রীরামচন্দ্রের প্রবল প্রতাপে সমুদ্রও পাষণ গলে ধারণ
করিয়াছিল—এমন রামচন্দ্রকে ছাড়িয়া যাহারা অস্ত্র দেবতার ভজনা
করিতে যায়—তাহারা যে অতীব মন্দমতি, তাহার আর সন্দেহ কি ?

বলকল ভূষণ কল অশন বিন শয্যা দ্রুম প্রীতি ।

তেহি সময় লক্ষা নহি হই রঘুবীরকি রীতি ॥ ৪৬০ ॥

বলিহারী যাই ভগবান রামচন্দ্রের ইচ্ছায়, যখন তিনি বঙ্কল পরিধান
করিয়া, বনের ফলমূল আহার করিয়া, বিনা শয্যায় তরুমূলে আন-

নের সহিত বাস করিতেন—সেই সময় তিনি সোণার লঙ্কা পুড়াইয়া ছারখার করিয়াছিলেন।

কৃপণ সেই পাই ন পরো বিহু সাধন সিধি হোয়।

সীতাপতি সম্মুখ সমুঝি সো কিজৈ শুভ সোই ॥ ৪৬১ ॥

কৃপণ যেমন পরকে একপয়সা দেয় না, সেইরূপ বিনা সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না। সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রকে প্রত্যক্ষ ভাবিয়া যে কাজ করা যায়—তাহাতেই শুভ লাভ হইয়া থাকে।

শিলা সো তির ভই গিরি তরে মৃতক জিয়ে জগজন।

রাম অহুগ্রহ সন্তগ শুভ স্থলভ সকল কল্যাণ ॥ ৪৬২ ॥

যে রামচন্দ্রের অহুপম অহুকম্পায় পাষণ মানবী হয়—জলে শিলা ভাষে এবং মৃত ব্যক্তি পুনর্জীবনলাভ করে; সেই রামচন্দ্রের কৃপা হইলে যে মানুষ অনায়াসে মঙ্গল এবং কল্যাণ লাভে সমর্থ হয়—তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কি আছে?

অতুলিত মহিমা বেদ কি তুলসী কিয়ে বিচার।

যো নিন্দিত নিন্দিত ভয়ে বিদিত বুদ্ধ অবতার ॥ ৪৬৩ ॥

ভগবৎ মুখনিঃসৃত বেদের মহিমা অতুলনীয়—হে তুলসীদাস! যিনি অহরহঃ বেদের নিন্দা করেন, তিনি নিজেই নিন্দিত হইয়া থাকেন—যেমন বুদ্ধদেব হইয়াছিলেন।

অনহিত ভয় পরিহিত কিয়ে, পর অনহিত হিত হানি।

তুলসী চাক বিচারু ভল, করিয় কাজ শুনি জানি ॥ ৪৬৪ ॥

পরের ভাল করিলে আপনার মন্দ হইবে, এবং পরের মন্দ করিলে আপনার ভাল হইবে, মনে করিয়া হে তুলসীদাস! তুমি নিজের হিতের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া বিশেষ বিচার পূর্বক জানিয়া শুনিয়া কার্য্য করিও। আপনার মন্দ করিয়াও পরের ভাল করিবে, ইহাই তাৎপর্য্য।

অরুঁ ধরুঁ লো লাছমি উদয় অন্ত লো রাজ ।

তুলসী যো নিজ মরণ হায় আওয়ে কেহি কাজ ॥ ৪৬৫ ॥

অসংখ্য ধন থাকিলে এবং উদয়ান্ত পর্যন্ত রাজ্যাধিকার লাভকারী রাজারই বা অর্থ কোথায় ? এইজন্য গোস্বামী তুলসীদাস বলিতেছেন—যখন জন্মাইলে মৃত্যু স্থনিশ্চিত, তখন রাজ্য ও ঐশ্বর্যের কোন আবশ্যকই নাই ।

প্রেম বরাবর যোগ নহি, প্রেম বরাবর জ্ঞান ।

প্রেম ভক্তিহীন সাধবা সবহি খোখা ধ্যান ॥ ৪৬৬ ॥

প্রেমের তুল্য যোগ এবং প্রেমের তুল্য জ্ঞান আর নাই ; যে সকল সাধু প্রেমভক্তি বিহীন হইয়াছে—তাহাদের ধ্যান জ্ঞান কোন কাজেরই নয় ।

হায় হায় পতি কব মিলিয়ে ছাত ফাটি যায় ।

যাযাগ দিন কব হোগা দর্শন কঁক অখায় ॥ ৪৬৭ ॥

পতির সহিত আমার মিলন কবে হবে—এমন শুভদিনের আর বিলম্ব কত—সে শুভদিন আসিলে আমি তাহাকে নয়ন ভরিয়া দেখিয়া প্রাণে শান্তিলাভ করিব ; এক্ষণে তাহার অদর্শনে আমার প্রাণ কাটিয়া যাইতেছে ।

আজ্ঞাকারী পিউকি রহেল পিয়াকে সজ ।

তনমন সে সেবা করে আওর ন ছুজা রজ ॥ ৪৬৮ ॥

সকল ভাবনা ছাড়িয়া সর্বদা পিয়ার আজ্ঞাধীন হইয়া সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান করত কায়মনে তাহার সেবায় নিযুক্ত হও, তাহা হইলে যে তোমার জীবন সার্থক হইবে—সে বিষয়ে সন্দেহ কি ?

পহিলে বুঝা কমান কর বাধি বিষ কি পোট ।

কোটা করম পলমে কাঁটে যব আওয়ে গুরুকি ওট ॥ ৪৬৯ ॥

প্রথমে অজস্র অপকর্ম করিয়া পাপে ভরা বাধিলেও পরে যদি
শ্রীগুরুর পদাশ্রয়ে আশ্রয় লওয়া যায়—তাহা হইলে কোটি কোটি
কর্মকল হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

স্বথ সম্পত্তি পরবার ধন স্তম্বর বরনারী ।

স্থপনে ইচ্ছা না উঠে গুর আনু তুম্হারী ॥ ৪৭০ ॥

হে গুরু ! তোমার পাদপদ্ম ভিন্ন আমার মনে যেন আর কোন
বাসনা না জাগে, আমি স্থপনেও যেন স্বথ, সম্পত্তি, স্ত্রী-পুত্র, ধন-জন
এবং স্তম্বরী স্ত্রীর আকাঙ্ক্ষা না করি।

ফুলমাহি যেও বাস, কাটমে অগ্নি হিপানী ।

খোদ বিন নাহি মিলে ধরতী মে পানি ॥ ৪৭১ ॥

ফুলের মধ্যে যেমন গন্ধ এবং কাঠের মধ্যে যেমন আগুন লুকান
রহিয়াছে; ভগবান তেমনি মানবদেহের মণিকোটায় বিরাজ কচ্ছেন,
মাটি না খুঁড়িলে যেমন জল পাওয়া যায় না—সেইরূপ ভজন-সাধন
বিনা তাঁহার দর্শন অসম্ভব।

দিনা চারকা খেল হ্যায় বুঠা জগৎ-পসার ।

ঘিন বিচারপতি না লখা বুড়ে ভোজল ধার ॥ ৪৭২ ॥

এ জগতের সকলই অসার—জীব সকল দুই ঠারিদিনের জন্ত এখানে
আসিয়া খেলা করে। যাহারা বিবেক বৈরাগ্যলাভ করিয়া শ্রিয়তম পতি-
দর্শনের বাসনা না করে তাহারা নিশ্চয়ই এই সংসারসাগরে ডুবিয়া যায়।

ভক্তি দান গুরু দিজিয়ে দেবন কি দেবা ।

জনম পায় না বিসর্বা করিছ পদসেবা ॥ ৪৭৩ ॥

হে দেবের দেব শ্রীগুরু ! তুমি দয়া করিয়া আমাকে ভক্তি-ধন
প্রদান কর। আমাকে যদিও পুনর্বার এই ধরাতলে জন্ম লইতে
হয়—তথাপি যেন তোমার পাদপদ্ম বিন্ধিত না হই।

তীরথ বরত মাই না করু দেবন পূজা ।

মনসা বাচা কর্ণণা মেরে আউর না হুজা ॥ ৪৭৪ ॥

তীর্থভ্রমণ, বার-ব্রত বা অল্প কোন দেবতার পূজায় যেন আমার
মন না যায়—আমি যেন কায়মনে তোমার সেবা করিতে পারি—
হে প্রভু ! আমাকে সেই বরদান করুন ।

সোণা কাই নাহি লাগে, লোহা ঘুণ নাহি খায় ।

বুয়া ভালা যো গুরু ভগত করছ নক না যায় ॥ ৪৭৫ ॥

সোণায় যেমন দাগ লাগে না, লোহায় যেমন কখন ঘুণ ধরে
না—সেইরূপ গুরুভক্তি পরায়ণ ব্যক্তি যেমনি হউক—তাহার কখন
নরক হয় না ।

কোইত তনমন দুঃখী কেহু বিত উদাস ।

এক এক দুখ সবনকো সুখী সন্তকা দাস ॥ ৪৭৬ ॥

অগতে সকলের একটা না একটা দুঃখ আছে—কেহ রোগে, কেহ
শোকে নানাপ্রকার মনঃকষ্ট ভোগ করে কিন্তু যিনি সং সাধুর দাস—
তিনি নিরন্তরই সুখী—কারণ তিনি নিজের চিত্তকে বশে আনিয়াছেন ।

পতিকো ওর নিহারিয়ে আওরন সে ক্যা কাম ।

সতি দেবতা ছোড় কর জপিয়ে গুরুকা নাম ॥ ৪৭৭ ॥

পতির প্রতি কেবল চাহিয়ে থাক—অল্প দেবতার সহিত তোমার
কোন সম্বন্ধ নাই ; সকল দেবতা ছাড়িয়া গুরুদেবের নাম জপিলেই
সকল সিদ্ধিলাভ হইবে ।

ইন্ডিন কে বশ মনরহে মনকে বশ রহে বুধ ।

কহ ধ্যান কারসে লাগে যাহা যায়সা বিকধ ॥ ৪৭৮ ॥

ইন্ডিয়ের বশীকৃত মন, মনের বশীভূত আবার বুদ্ধি যখন পরম্পর
এরূপ বিরুদ্ধতাব—তখন ধ্যান ধারণা কিরূপে সম্ভব হয় ।

মোহমদ দুখরূপ হায় তাকো মাঝ নিকার ।

প্ৰীত জগৎ কি ছোড় দে সব হোয় নিরবায় ॥ ৪৭৯ ॥

মোহ আর মদ দুঃখরূপ—ইহাকে সংহার করিতে হইবে—অর্থাৎ
মায়ামোহের অতীত হইয়া সংসার-সুখকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারিলে,
তোমার উদ্ধারের আর কোন ভাবনা থাকিবে না ।

হাতী ঘোড়া ধনঘনা চন্দ্রমুখী বহু নার ।

নাম বিনা যমলোক মে পাওত দুখ অপার ॥ ৪৮০ ॥

হাতী, ঘোড়া, ধন, ঐশ্বর্য এবং চন্দ্রমুখী বহু রমণী থাকিলে পরিণামে
কোন উপকার হয় না ; যমদ্বারে উত্তীর্ণ হইতে হইলে ভগবানের
নাম সাধনা ভিন্ন কোন উপায় নাই ?

ব্রাহ্মণ ভয়া তো ক্যা ভায়া গলে লাপেটে সূত ।

ভাও ভক্তি কা মরম না জানে যায়সে জঙ্গলী ভূত ॥ ৪৮১ ॥

গলায় যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া কেবল ব্রাহ্মণ বলিয়া আশ্বালন করিলে
কি হইবে—যদি তোমার ভগবানে প্ৰীতি-ভক্তি না থাকে—তবে ত
তুমি বনের ভূত ভিন্ন আর কিছু নও ।

যাকো রাখে সাইয়া মাঝ ন শকে কোয় ।

বালন বাঁকা কর সকে যো জগ বৈরী হোয় ॥ ৪৮২ ॥

গুরু যাহাকে রক্ষা করেন—তাহাকে কে মারিতে পারে। শ্রী
গুরু সহায় হইলে জগৎ গুরু লোক বিপক্ষ হইলেও কেহ তাহার
একগাছী কেশও স্পর্শ করিতে পারে না ।

পড়ি পড়ি কেসব জগ মৃত্যা, পণ্ডিত ভয়া ন কোয় ।

চাই অক্ষয় প্রেমকা পড়ে সো পণ্ডিত হোয় ॥ ৪৮৩ ॥

জগতের লোক আজীবন লেখাপড়া করিয়া মরিতেছে—তথাপি
একজনও পণ্ডিত হইতে পারিতেছে না—কিন্তু প্রেমের আড়াই

অকর যিনি পড়িয়াছেন—যেম কি পদার্থ যিনি উপলব্ধি করিয়া-
ছেন—তিনি যথার্থ পণ্ডিত পদবাচ্য হইয়াছেন।

জ্যো। তিরিয়া পীহর বসে স্বরত রহে পিউ মাহি।

যায়সে জন জগ মেরহে গুরু কো ভুলি নহি ॥ ৪৮৪ ॥

শ্রী যেমন বাপেরবাড়ী গমন করিলেও মনতার পতিরনিকট পড়িয়া থাকে
যে ব্যক্তি দূরে থাকিয়া কণকাল গুরুর স্মরণ করে, সেইব্যক্তি পরমভক্ত।

স্বধা সাধু স্বর তরু স্বমন স্বফল স্বহাব নিবাত।

তুলসি সীতা পতি ভগতি সগুণ স্বমঙ্গল সাত ॥ ৪৮৫ ॥

হে তুলসীদাস! স্বধা, সাধু, স্বর, তরু, স্বমন, স্বফল ও স্বমধুর
কথা এই সাতটি হইতেও সীতানাথ রামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি ভালবাসা
অশেষ মঙ্গলের নিদান জানিবে।

বিহু সত সঙ্গ হরিকথা তাহি বিহু মোহন ভাগ।

মোহ গয়ে বিহু রামপদ হোয়ে দৃঢ় অহুরাগ ॥ ৪৮৬ ॥

সংসঙ্গ ব্যতীত হরিকথা পাওয়া যায় না—আর হরিকথা ব্যতীত
মোহও যায় না, মোহ না ভাঙ্গিলে হরিপদে হৃদৃঢ় অহুরাগ হয় না।

বিহু বিশ্বাসে ভক্তি নহি, তাহি বিহু জবহি রাম।

রাম কৃপা বিহু সপন্থহ জীবন নহ বিশ্বাস ॥ ৪৮৭ ॥

বিনা বিশ্বাসে ভক্তি পাওয়া যায় না—এবং ভক্তি না হইলে
রামচন্দ্রের কৃপালাভ করা অসম্ভব, ভগবান রামচন্দ্রের কৃপা বিনা
জীবনে স্বপ্নেও স্মৃতির আশা করা বুধা।

অস বিচারী মন ধীর, ত্যজি কুতর্ক সংশয় সকল।

ভজহ রাম রঘুবীর, করুণাকর হৃন্দর স্বধদ ॥ ৪৮৮ ॥

হে ধীর মন! তুমি সকলপ্রকার যুক্তি তর্ক ত্যাগ করিয়া
করুণাময় হৃন্দর স্বধদাতা রঘুবীর রামচন্দ্রের ভজনা কর।

ভাব বশ্য ভগবান্ সুখ নিদান করুণা ভবন ।

ত্যাগিমমতা মদমান ভজিয় সদা সীতারমণ ॥ ৪৮৯ ॥

মায়া মমতা এবং গর্ষ অভিমান ত্যাগ করিয়া হে মন !
তুমি করুণা সাগর—সুখের নিদান ভগবান সীতাপতি রামচন্দ্রকে
নিরন্তর ভজনা কর ।

কহিঁ বিমল মত সন্ত, বেদ পুরাণ বিচারি সব ।

দ্রষ্টে জ্ঞানকী কাস্ত ছুটে সংসার দুঃখ তব্ ॥ ৪৯০ ॥

বেদপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র সমুদ্র মন্বন করিয়া সাধুবর্গ এই
বিমল মত প্রদান করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ভগবান জ্ঞানকীকান্তে
প্রেমদানে আর্জ হইবে—তাহারাই ভবদুঃখ দূর হইবে ।

বিহু গুরু হোইন জ্ঞান, জ্ঞান কি হোই বিরাগ বিহু ।

গাবহিঁ বেদপুরাণ সুখ কি লভিয় হরিভক্তি বিহু ॥ ৪৯১ ॥

বিনা গুরুর উপদেশে জ্ঞানলাভ হয় না—এবং বিবেক
বৈরাগ্য বিনা ও জ্ঞানলাভ সম্ভবপর নহে । আর বেদপুরাণে বর্ণিত
হরিভক্তি বিনা কখনও স্ত্রলভের সম্ভাবনা নাই ।

রামচন্দ্রকে ভজন বিহু যো চহ পদ নির্মাণ ।

জ্ঞানবস্ত্র অপি সো নর পশু বিন পছ বিধান ॥ ৪৯২ ॥

রামচন্দ্রের ভজন বিনা যে লোক নির্মাণ পদ প্রার্থনা করে,
সে ব্যক্তি লাস্কুল ও শূন্যহীন পশুর মধ্যে গণনীয় হইয়া থাকে ।

সোই সাধ শুনি সমুঝি কর রামভক্তি থিরতাই ।

লড়ি কাই কো পৈরিবো তুলসী বিসরণ যাই ॥ ৪৯৩ ॥

যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া রামপদে ভক্তি অচলা রাখেন—
তিনিই সাধু—আর যাহারা তাঁহাকে তুলিয়া থাকে তাহারাই নিতান্তই
বালক ।

সবৈ কহাবত রামকে সবহি রামকী আশ।

রাম কহৈ জ্যাহি আপনো তাহি তজ্জ তুলসীদাস ॥ ৪২৪ ॥

হে তুলসীদাস! তুমি রামকে আপনার প্রাণের সকল কথা
ব্যক্ত কর, সকল সময়ে তাঁহারই আশা কর, তুমি তাঁহাকে যেরূপ
ভাবে দেখিবে—তিনিও তোমাকে সেরূপভাবে দেখিবেন।

জ্যাহি শরীর রতি রাম সোঁ সেই আদরে স্তজন।

রুদ্র দেহ ত্যজ নেহ বশ বানর ভৈ হহুমান ॥ ৪২৫ ॥

যে শরীরে রামচন্দ্রের প্রতি রতির উদয় হয়—সেই শরীরই
আদরনীয় জানিবে, কারণ শিব রুদ্রদেহ পরিত্যাগ করিয়া আদরের
সহিত হহুমান দেহ ধরিয়াছিলেন।

জান রাম সেবা সরস সমুঝি করব অহুমান।

গুরু ষ্টে সেবক ভয়ে, হরতে ভয়ে হহুমান ॥ ৪২৬ ॥

রামচন্দ্রের সেবা পরম রসময় ভগবান শঙ্কর তাই বুঝিয়া ভুঝিয়া
হহুমান রূপ ধারণ করিয়া তাহার সেবক হইয়াছিলেন।

রাবণ রিপুকে দাস সোঁ কায়র করহি কুচল।

ধর দূষণ মারীচ জ্যো নীচ জাহিসে কাল ॥ ৪২৭ ॥

রাবণ রিপুপর তন্ত্র অতি ভীকু এবং কুকর্মান্বিত আর ধরদূষণ ও মারীচ
তাহারই অহুরূপ এইজন্ত ইহারা সকলেই কালকবলে কবলিত হইয়াছে।

পুণ্য পাপ যশ অযশকে ভাজন? ভারী ভুরী।

শঙ্কট তুলসীদাসকো রাম করাহ সব ছুরী ॥ ৪২৮ ॥

যশ অযশ ও পাপ পুণ্যের অধিকারী, অনেকেই হইয়া থাকে,
কিন্তু তুলসীদাসকে রাম এই সকল বিপদ হইতে দূরে রাখা করেন।

খেলত বালক ব্যাল সহ মেলত পাবক হাথ।

তুলসী শিশু পিতৃ মাতৃ জ্যো রাখত সিয় রঘুবর নাথ ॥ ৪২৯ ॥

বালকগণ খেলা করিবার সময় সপ্নের মুখে এবং আগুনে হাত দিতে বাইলে তার পিতামাতা যেমন তাকে বাধা প্রদান করে।

হে সাধু তুলসি! সীতারামও তেমনি তাহার অহুগত ভক্তগণকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করেন।

তুলসি দিন ভল সব কহ ভলো চোর কহ রাত।

নিশি বাসরতা কহং ভলো মার্নৈ রামহি তাত ॥ ৫০০ ॥

হে তুলসি, চোর রাতকে ভাল বলে এবং ভাল লোকে দিনকেই ভাল বলে, কিন্তু রামভক্ত গণের পক্ষে দিন রাত উভয়ই সমান।

সেবানীল সনেহ বশ স্তখদ স্তযোগ বিয়োগ।

তুলসি তে সব রাম সোঁ স্তখদ স্তযোগ বিয়োগ ॥ ৫০১ ॥

হে তুলসীদাস! সংযোগ বিয়োগের কর্তা স্তখদাতা প্রভু রামচন্দ্র সেবানীল ব্যক্তিগণের সেবায় বশীভূত হইয়া থাকেন। এবং সকল-প্রকার সংযোগ বিয়োগে স্তখদান করিয়া থাকেন।

স্তধে মন স্তধে বচন স্তধী সব করতুতি।

তুলসী স্তধী সকল বিধি রঘুবর প্রেম প্রস্তুতি ॥ ৫০২ ॥

হে তুলসীদাস! হৃদয়ে রামচন্দ্রের প্রেম উদয় হইলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়—বাক্যশুদ্ধ হয়—এবং তাহার কর্তব্য কর্ম সকল শুদ্ধ হইয়া থাকে।

বচন ভেষ তে জো বরৈন সো বিগরৈ পরিণাম।

তুলসি মনতে জো বরৈন বনীবনাই রাম ॥ ৫০৩ ॥

হে তুলসীদাস! কথার বশে যে কাজ হয়—তাহা বেশীদিন স্থায়ী হয় না—কিন্তু মনবশে যে কাজ হয় এবং তাহা যদি রাম ভক্তি যুক্ত হয়—তাহা হইলে সে কার্য চিরস্থায়ী হইয়া পড়ে।

কহঁ বিভীষণ লৈ মিল্যো কহঁ সিধো রঘুনাথ।

তুলসী ইহজানে বিনা মুঢ় মিজি হৈ হাথ ॥ ৫০৪ ॥

হে তুলসীদাস! ভগবান রামচন্দ্র নারায়ণ হইয়া রাক্ষস বিভী-
ষণের সহিত সখ্যতা করিয়াছিলেন বলিয়া মুক্ত লোক ঈরামচন্দ্রকে
দোষ দেয়—তাহারা ভগবানের মহিমা কি বুঝিবে?

বালি বলি বলশালিদলন সখা কৌনই কপিরাঙ্গ ।

তুলসি রাম কুপালকো বিরল গরীব নিবাজ ॥ ৫০৫ ॥

বলবান বালীরাঙ্গ এবং বলিদমন ভগবান ঈরামচন্দ্র সূত্রীষের
সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন। দেখ হে তুলসীদাস! দয়া-
ময় ঈরামের মত ভক্তবৎসল আর কে আছে?

স্থখ জীবন সবকো চৈহত স্থখ জীবন হরিহাথ ।

তুলসি দাতা মাংগ ছো লখিয়ত অবুধ অনাথ ॥ ৫০৬ ॥

জগতে আসিয়া স্থখে কালযাপন করিব—ইহা সকলেই আশা
করে—কিন্তু ইহা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন, অবোধ অনাথ লোক
দাতা দেখিয়া প্রার্থনা করে না ইহাই দুঃখ।

বৈরি বন্ধু নিশিচর অধম ত্যজো ন অকরক ।

ঝুঠে অথ সিয় পরিহরী তুলসি ভই কলক ॥ ৫০৭ ॥

ভগবান রামচন্দ্র বৈরী বন্ধু নিশাচর অধম ও দুঃখী কাহাকেও
পরিত্যাগ করেন নাই—সকলের সহিত বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া-
ছিলেন, কেবল তুলসী! প্রজাদের মিথ্যাকথা শুনিয়া স্বীয় পত্নী
সীতাকে ত্যাগ করিয়া কলঙ্ক অর্জন করিয়াছিলেন।

সভা সভাসদ নিরখি পট পকরি উঠায়ে হাথ ।

তুলসি কিয় ইপারহৌ বনমালী যদুনাথ ॥ ৫০৮ ॥

দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণের জন্ত ভগবান যদুপতি, বনমালী
শ্রীকৃষ্ণ বসনরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। সভাসদবর্গ তাহা দেখিয়া
করবোড়ে দাঁড়াইয়া ছিল।

আহি দীন কহি জ্যোপদী তুলসি রাজ সমাজ ।

প্রথমে বড়ে পটচিত্ত বিকল চহত চকিত নিজ কাজ ॥ ৫০৯ ॥

রাজস্বর্গের সম্মুখে জ্যোপদীর বস্ত্রহরণ করিতে গিয়া ছুঁধোদধন-
নিষের কার্যের জন্য জন সমাজে বড়ই লজ্জিত হইয়াছিলেন, দীন-
বন্ধু ভগবানও বস্ত্র বাড়াইয়া তাহার লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন ।

মরে জিহায়ে ভাল অবধি বিপ্রকো পুত ।

সমিরহ তুলসী সিহি তু জাকো মারু ত দুত ॥ ৫১০ ॥

হে তুলসীদাস ! পবননন্দন মারুতী যাহার দূত, তিনি অবোধ
বিপ্র-সন্তান ও ভল্লুকাদি মৃত বানরগণের প্রাণদান করিয়াছিলেন—তুমি
সেই শ্রীরামচন্দ্রকে মনে মনে স্মরণ করিতে থাক ।

কাল করম গুণ দোষ জগজীবিত হারে হাথ ।

তুলসি রঘুবর রাবরো জ্ঞান জ্ঞানকীনাথ ॥ ৫১১ ॥

কাল, কর্ম, গুণ, দোষ এবং জীব ও জগৎ যে সীতাপতি রামচন্দ্রের
করতলগত হে তুলসীদাস ! তুমি তাঁহাকে জ্ঞাত হও ।

মোসম দীন নহি দয়াবন্ত নহি সমান রঘুবীর ।

অসবিচারী রঘুবংশমণি হরহ বিষম ভবভীর ॥ ৫১২ ॥

হে ভগবান রামচন্দ্র ! আমরা দরিদ্র আর কেই নাই এবং
তোমার তুল্য দয়াবানও কেহ নাই—টহা বিচার করিয়া হে প্রভু !
তুমি জীবের বিষম ভবভয় নিবারণ কর ।

ভব ভুজঙ্গ তুলসি নকুল উৎসত জ্ঞান হরি লেত ।

চিত্রকূট এক ঔষধী চিতবত হোত সচেত ॥ ৫১৩ ॥

হে তুলসীদাস ! ভবরূপ সর্পের দংশনে তোমার জ্ঞান বিনষ্ট
হইয়াছে ; এইজন্ত চিত্রকূটবাসী নকুলশ্বরূপ রামচন্দ্রের চরণামৃত রূপ
মহৌষধী পান করিয়া তুমি চেতনালান্ড কর ।

রামরাজ রাজত সকল ধরম নিরত নরনারী ।

রাগন রোষন দোষ দুঃখ স্থলভ পদারথ চারি ॥ ৫১৪ ॥

রাজা রামচন্দ্রের রাজত্বে স্ত্রীপুরুষ সকলেই ধর্মকর্মে আসক্ত ছিল ।
রাগ, দ্বেষ, দোষ, দুঃখ, তাহার রাজ্যে স্থান পাইত না এবং চতুর্দর্শ
তথায় স্থলভ ছিল ।

হৌঁছ কহাবত সব কহত রাম সহত উপহাস ।

সাহব সীতারাম সোঁ সেবক তুলসীদাস ॥ ৫১৫ ॥

আমি আমি সকলেই বলে কিন্তু এই আমিই অতিশয় উপহাস-
স্পদ, ভগবান রামচন্দ্র তাহা সহ করেন । ফলে তুলসীদাস তাহার
দাসাঙ্গদাস এবং রামচন্দ্র তার প্রভু ।

রামপদ সন্তোষ স্থখ ঘর বন সকল সুপাস ।

স্বরতরু স্বরধেনু সবহি অভিমত ভোগ-বিলাস ॥ ৫১৬ ॥

ঘরে বা বনে রামরাজ্যের সকল প্রজাই সন্তোষ—স্থখে বাস
করিতেন এবং কল্পতরু বা কামধেনুর আশ্রয়ে থাকার মত ভোগ-
বিলাসে মত্ত হইতেন । তাহার কারণ রামচন্দ্রের পদে মন থাকিলে
আর কোন অভাব থাকে না ।

রামচরিত রাকেশকর সরস স্থখদ সব কাছ ।

• সজ্জন কুমুদ চকোরচিত হিত বিশেষ বড় নাছ ॥ ৫১৭ ॥

শ্রীরামচন্দ্র মহাপ্রভুর পবিত্র চরিত্ররূপ পূর্ণ শশধর সকল জীবকেই
অমৃতোপম স্থখ-সম্পদ প্রদান করিয়া থাকে । এইজন্য কুমুদ সদৃশ
সাদু ব্যক্তির চিত্তচকোর সর্বদা উক্ত অমৃত পানে বিত্তোর হইয়া
থাকেন ।

খেতি বণিজবিদ্যা সেবা শিল্প সোঁ কাজ ।

তুলসি স্বরতরু সরিস সব স্থকল রামকে রাজ ॥ ৫১৮ ॥

হে তুলসীদাস! রামরাজ্যে কৃষি, বাণিজ্য, সেবা ও শিল্পবিজ্ঞান-
কল্পতরু ত্রায় সুখদ সুফলপ্রসূ ছিল।

রঘুপতি কীরতি কাহিনী কোঁ কই তুলসীদাস।

শরদ প্রকাশ অকাশ ছবি চারু মলিনতা ভাস ॥ ৫১৯ ॥

হে তুলসি! রঘুপতি রাগচন্দ্রের কীর্তিকাহিনী কি প্রকাশ করিব। শার-
দীয়া রজনীর হৃদয় আকাশ—শোভাও তাহার কাছে মলিন হইয়া যায়।

প্রভু গুণ ভূষণ-বসনবিশদা বিশেষ সুদেশ।

রাম সুকীরতি কামিনী তুলসি করবত কেশ ॥ ৫২০ ॥

হে তুলসি! প্রভু রামচন্দ্রে সংকীর্ণরূপ রমণীর রমণীয় কেশ
শোভা বর্ণনাতীত; তাহার গুণাবলী ও বসন-ভূষণের সৌন্দর্য্য বর্ণনা
করে এমন সাধ্য কার আছে?

কলিযুগ সমযুগ আনু নহি জো নরকর বিশ্বাস।

গাই রাম গুণগান বিমল ভবতর বিনহি প্রয়াস ॥ ৫২১ ॥

কলিযুগের সমান যুগ আর নাই। এই যুগে বিশ্বাসী মানবগণ
বিমল রাম গুণগান করিয়া অবহেলায় ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে।

প্রকট চারিপদ ধর্ম্মকে কলিমহ একপ্রধান।

জেনকেন বিধি দীক্ষা দান করৈ কল্যাণ ॥ ৫২২ ॥

ধর্ম্মের চারিপদের মধ্যে কলিতে একটাই প্রধানরূপে বর্ত্তমান।
যে কোন প্রকারে জীবগণ দান করিতে পারিলেই এই যুগে মঙ্গল
সাধন হইয়া থাকে।

শরণাগত কই জে তাজহি নিজ অনহিত অহুমানি।

তে নর পামর পাপময় তিন্হে বিলোকত হানি ॥ ৫২৩ ॥

আপনার অমঙ্গল হইবে ভাবিয়া যে লোক শরণাগত ব্যক্তিকে
ত্যাগ করে—সেই পামরজনের মুখদর্শন করিলেও পাপ হয়।

সহজ অপাবনী নারী পতি সেবক শুভগতি লইে ।

যশ গাওত শ্রুতি চারি অঙ্গু তুলসীক। হরিহি শ্রিয় ॥ ৫২৪ ॥

রমণীজাতি স্বভাবতঃই অপবিদ্রা, কেবল পতিসেবা কলে তাঁহার।
শুভগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন—চতুর্বেদ সেইজন্য একরূপ পতিব্রতা।
রমণীর স্নেহ ঘোষণা করেন কিন্তু তুলসীদাসের মন হরিকেই শ্রিয়
বলিয়া ঘোষণা করেন ।

অনুচিত উচিত বিচার ত্যজিয়ে পালহি পিতৃ বৈন ।

তে ভাজন স্নেহ সঙ্গকে বসহি অমরপতি ঐন ॥ ৫২৫ ॥

অনুচিত বা উচিত বিচার না করিয়া যে পুত্র পিতার আদেশ
প্রতিপালন করেন—তিনি ইহ জীবনে অশেষ স্নেহ ও যশ লাভ
করিয়া অস্তে ইন্দ্রের সহিত স্বর্গবাস করিতে অধিকারী হন ।

আসন ছোড়ো সাথ জব তাদিনহি তুণ কেই ।

তুলসি অমুজ অমুবিন তরগি তান্ন রিপু হোই ॥ ৫২৬ ॥

হে তুলসীদাস ! স্থানচ্যুত হইলেই মান সম্মান নষ্ট এমন কি প্রাণ
পর্যন্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে যেমন পদ্ম যতক্ষণ জলে থাকে ততক্ষণ সূর্য্য
তাপে শুকাই না, অলব্ধ হইয়া জমিতে পড়িলেই উত্তাপে শুকাইয়া যায় ।

তুলসিদান জো দেত হৈ জলমে হাত উঠায় ।

প্রতিগ্রাহী জীবৈ নহি দাতা নরকৈ যায় ॥ ৫২৭ ॥

হে তুলসীদাস ! যে লোক জলে হাত দিয়া দান করে সে
নীরয়গামী হয়—সঙ্গে সঙ্গে গৃহীতাও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে ।

প্রভু সমীপ ছোটো বড়ে নিবল হোত বলবান ।

তুলসি একট বিলোকিয়ে কর অঙ্গুলি অঙ্গমান ॥ ৫২৮ ॥

হে তুলসীদাস ! প্রভু রামচন্দ্রের কাছে হাতের ছোট বড় পাঁচ
অঙ্গুলির মত দুর্বল সেবক ও বলশালী হইয়া থাকে ।

মালো ভাহু কিসান সম নীতি নিপুণ নরপাল ।

প্রজা ভাগবশ হৌহিগে কবছ কবছ কলিকাল ॥ ৫২৯ ॥

এই কলিযুগের প্রজা সকল অদৃষ্টক্রমে কখন কখন মালী,
ভাহু ও কৃষাগতুল্য নীতি কুশল নরপাল প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

কারণ সে ক্লারজ কঠিন হৌই দোষ নহি যোর ।

কুলীণ অস্থিতে উপলতে লোহ করাল কঠোর ॥ ৫৩০ ॥

কারণ অপেক্ষা কাজ খুব কঠিন ! দধৌচি মূনির হাড় বজ্র নির্মিত
হইলেও তাহার কার্য্য ভয়ানক জলন্ত লৌহ অপেক্ষাও ভীষণ ।

ব্যালহুতে বিকরাল বড় ব্যালফেন জ্বিয়জান ।

ওহকে খায়ে মরতই উহ খায়ে বিহু প্রাণ ॥ ৫৩১ ॥

সর্পের অপেক্ষা তাহার বিষ বড় ভয়ানক সর্পের দংশনে বরং
জীবনের আশা করা যায় কিন্তু বিষ খাইলে প্রাণনাশ নিশ্চয় ।

বহু মুখ বহু রুচি বচন বহু বহু আচার ব্যবহার ।

ইনুকে ভলো মনাইবো ইহ অজ্ঞান অপার ॥ ৫৩২ ॥

যে লোক বহুরুচি বহু প্রকার বচন প্রয়োগ করে এবং বহু-
প্রকার আচার ব্যবহার সম্পন্ন—সেই বোর অজ্ঞানী ব্যক্তির হিতের
জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা উচিত ।

জো শুনি সমুঝি অনীতিরত জাগতর হৈছু সোই ।

উপদেশ বীজ গাইবো তুলসি উচিত ন হৌই ॥ ৫৩৩ ॥

হে তুলসীদাস যে ব্যক্তি জাগিয়া ঘুমায় এবং জানিয়া শুনিয়া
কুনীতি পরায়ণ হয় তাহাকে উপদেশ দেওয়া বুঝা ।

ফুলে ফরৈ ন বেত যদগিহুধা বর্ষাহ জলদ ।

মুখ হৃদয় ন চেত জো গুরু মিলৈ বিরিকিত শিব ॥ ৫৩৪ ॥

জলদ সকল সুখা বর্ষণ করিলেও যেমন ক্ষেত্রে ল ফুল ফল

হয় না সেইরূপ মূৰ্খকে ব্রহ্মা কিম্বা স্বয়ং শিব আসিয়া গুরু হইলেও
তাহার চৈতন্য হয় না ।

দীর্ঘ রোগী দারিদ্র্য কটু বচ লোলূপ লোগ ।

তুলসি প্রাণ সমানতে হোই নিরদার যোগ ॥ ৫৩৫ ॥

হে তুলসিদাস ! চিররোগী, দরিদ্র, কটুভাষী এবং লোভী ব্যক্তি
কদাচ ভাল নয় । হে তুলসি ! কিন্তু আদর বিহীন যোগ প্রাণবৎ প্রিয় ।

টুটহি নিজ রুচি কাজ করি রুটহি কাজ বিগারী ।

তীষ তনয় সেবক সখা মনকে কণ্টক চারি ॥ ৫৩৬ ॥

পুত্র, কলত্র, সেবক ও সখা এই চারিজন মনে কর কণ্টকস্বরূপ ইহারা
সকল প্রকার কাজ নষ্ট করিয়া দেয় ও রুচির পরিবর্তন করিয়া দেয় ।

নারী নগর ভোজন সচিব সেবক সখা অগার ।

সরস পরিহরে রঙ্গরস নিরস বিষাদ বিকার ॥ ৫৩৭ ॥

রমণী, নগর, ভোজন, সচিব, সেবক, সখা ও ঘর প্রভৃতির
রঙ্গরস সকল ত্যাগ করিয়া রসিকজন বিষাদ ও বিকার গ্রস্ত হইয়া থাকে ।

শিষ্য সখা সেবক সচিব স্তুতি য় সিংখবন সাঁচ ।

শুনি সমঝুছ পুনি পরিহরছ পরম নিরঞ্জন পাঁচ ॥ ৫৩৮ ॥

শিষ্য, সখা, সেবক, সচিব এবং সংপত্তী এই পঞ্চজন সত্য শিক্ষা
পাইলেও জানিয়া শুনিয়া পুনরায় পরম নিরঞ্জনকে অবজ্ঞা করে ।

বড়ি প্রতীত গঠি বন্ধতে বড়ো যোগতে ক্ষেম ।

বড়ো হুসেবক সাঁইতে বড়ো নেমতে প্রেম ॥ ৫৩৯ ॥

যোগ অপেক্ষা ক্ষেম বড়, প্রভু অপেক্ষা হুসেবক বড়, এবং
নিয়ম হইতে প্রেম শ্রেষ্ঠ ।

চাক বিচারু চলু পরিহরি বাদ বিবাদ ।

স্বকৃত নীব আরথ অবধি পরমাথ মর্যাদ ॥ ৫৪০ ॥

বাদ বিশেষ্যাদ পারিত্যাগ করিয়া সুন্দর ধর্মপথ অবলম্বন করা উচিত। আর স্বার্থ হইতে পরমার্থ তত্ত্বের মর্যাদা রক্ষা করিয়া সংকল্পের অল্পাধিক্য করা কর্তব্য।

গাড়ি বন্ধিতে পর তোতি বড়ি জেহি সবকো সব কাজ।

কহব সমুঝব বহুত গাড়ে বড়ত আনাজ ॥ ৫৪১ ॥

প্রতীতি দৃঢ়বিশ্বাস অপেক্ষা বড়, যাহার দ্বারা সকলের সকল কর্ম সিদ্ধি হয়। এ বিষয় বলিয়া কহিয়া বুঝাইবার কিছু নাই।

সমগথকো উনরাম সোঁ স্বীয় হরণ অপরাধু।

সময় হিসাবে কাজ সব সময় সরাহ হি সাধু ॥ ৫৪২ ॥

সকল কাজ সময়ে সংসাধিত হয়। সময়ে সাধু অসাধু হয়—এবং অসাধু সাধু হয়। আর সময় পাইয়াই রাবণ রামের সীতাহরণ করিয়াছিল।

ছিছোন তরুণী কটাক্ষশর করেওন কঠিন সনেহ।

তুলসি তিনকী দেহকী জগত কবচ করি লেহ ॥ ৫৪৩ ॥

হে তুলসীদাস! তরুণী যুবতীর কটাক্ষবাণ যাহার চিত্তকে চঞ্চল করিতে পারে না, তাহার দেহকে এ জগতের কবচ স্বরূপ জ্ঞান করা উচিত।

সহজ সুহৃদ গুরু স্বামী শিখ জো ন করৈ শিরমাণি।

যো পছতায় ঘায় ডর অবহিঁ হোই হিত হানি ॥ ৫৪৪ ॥

সহজ বন্ধু, স্বামীও গুরুকে যে শিষ্য অবনত মস্তকে মাগ্ন না করে—তাহার অমঙ্গল হইয়া থাকে, এবং তাহাকে পাপে অমুতাপে দগ্ধ হইতে হয়।

হিতপর বড়ি বিরোধ যব অনহিত পর অহুরাগ।

রাম বিমুখ বিধি বামগতি সগুণ অঘার অভাগ ॥ ৫৪৫ ॥

বিধি যাহার প্রতি বাম এবং রামচন্দ্র বিমুখ হন—সেই ব্যক্তি

হিতকর কাজ করে না, বরং অমঙ্গল কার্যে অমুরাগী হইয়া পাপ পক্ষে নিমগ্ন হয়।

সভা দুয়োধন কি শকুনি স্মৃতি সরাহন যোগ।

দ্রোণ বিদুর ভীষ্ম হরিহি কহে প্রপঙ্কী লোগ ॥ ৫৪৬ ॥

যে দুয়োধনের সভাতে শকুনি স্মৃতি বলিয়া মাত্র প্রাপ্ত হয়—সে সভায় ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর এবং শ্রীকৃষ্ণকে যে প্রবঞ্চক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে—ইহার আর বিচিত্র কি?

রাজ করত বিহু কাজহি কঠৈ কুচালি কুসাজ।

তুলসি তে দশস্কন্ধ জ্যৈষ্ঠা জ্যৈষ্ঠে সহিত সমাজ ॥ ৫৪৭ ॥

ধর্মসঙ্গত রাজকার্য সম্পাদন করাই রাজার উচিত এবং তাহাই রাজধর্ম; যে রাজা তাহা না করিয়া কদাচারী এবং কুবেশধারী হন, তাঁহাকে দশস্কন্ধ রাবণের মত সবংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে হয়।

দেশ-কাল করতা করম বচন বিচার বিহীন।

তে সুরতরু তরদারিদী সুরসরী তাঁর মলিন ॥ ৫৪৮ ॥

দেশ-কাল-পাত্র-কর্ম-বিচারবিহীন ব্যক্তি যদি কল্লতরুমূলে বাস করে—তাহা হইলে সে দরিদ্র এবং স্বর্গের মন্দাকিনী তটে অবস্থিতি করিলে সে পবিত্র হইতে পারে না।

বচন বিচার আচার তনয়ন কর তব ছলছুতি।

তুলসি কৌণ্ড সূখ পাইয়ে অন্তর্যামিহি ধৃতি ॥ ৫৪৯ ॥

ভগবান সকলের অন্তরে বাস করিয়া সকলের মনের ভাব অবগত হইতেছেন। যাহারা কায়মনোবাক্যে আচার-বিচারে চতুরতা ও বঞ্চনা করে—তাহারা কখনও সূখের আশা করিতে পারেনা।

কপট সারসুচী সহস বাধি বচন পররাস।

কিযোদুরা উচঠেঁ চাতুরী সো শঠ তুলসীদাস ॥ ৫৫০ ॥

যাহারা কপটাচারী, পরদেশবাসী এবং সকলের নিকট প্রতারণা করিয়া থাকে—হে তুলসীদাস ! তাহারা অতিশয় শঠ জানিবে ।

রচন বেশ কোঁ জানিয়ে মনমলিন নরনারী ।

হৃর্ণনখা, মুগ, পুতনা, দশমুখ প্রমুখ বিচারী ॥ ৫৫১ ॥

কেবল বাক্য ও পোষাক পারিপাট্যে মলিন-মন বিশিষ্ট লোককে জানা যায় না ; হৃর্ণনখা, মায়ামুগ, ও পুতনা ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণস্থল ।

পরদোহী পরদার রত পরধন পর অপরাধ ।

তেন নর পামর পাপময় দেহ ধরে মনুজাদ ॥ ৫৫২ ॥

মনুজের মধ্যে পরদোহী, পরদার রত, পরধনহরণকারী এবং অত্যাচারী পামরগণ অত্যন্ত অধম ।

জানু ভয়োসে সোইয়ে বাধি গোদপরশীষট্টি ।

তুলসি তানু কুচালতে রথবারী জগদীশ ॥ ৫৫৩ ॥

যাহার আশা-ভরসা করিয়া থাকা যায়—সে লোক যদি অগ্নায় আচরণ করে—তবে ভগবান তাহাকে সে অগ্নায় হইতে উদ্ধার করেন ।

সহবাসী কা চোগিলহি পুরজন পাকপ্রবীণ ।

কালক্ষেপকেহি মিলক রাহি তুলসি খগমুগ মীণ ॥ ৫৫৪ ॥

প্রবীণ-পবিত্র-চরিত্র পুরজনবর্গ যখন প্রতিবাসীর নিন্দা করিয়া একত্র বাসে অরাজী হয়—তখন জলচর, খেচর, বনচর জন্তুগণ কেমন করিয়া একত্র বাস করিবে ?

পেরত কোলহু মলিতীল তিলি সনেহো জানি ।

দেখি প্রীতিকি রীতি হই অবদেখি বরসানি ॥ ৫৫৫ ॥

তিলের মধ্যে স্নেহরূপ তৈল আছে জানিয়া তৈলিক তাহাকে পেষণ করে, কিন্তু স্নেহের কেমন গুণ যে তাহাকে অত্যধিক পীড়ন করিলেও সে স্নেহদান অর্থাৎ তৈল প্রদান না করিয়া থাকিতে পারে না ।

বিবুধ কাজ বামন বলিহি ছলো ভলো জিয়জানি ।

প্রভু তাত জিবংশভে তদপি মনকী গইন গ্রানি ॥ ৫৫৬ ॥

কৃষ্ণনন্দন বামনদেব বলিরাজাকে ছলনা করিয়া তাঁহার মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন কিন্তু ভক্তকে ছলনা করিয়া তাহার নিজ অন্তঃকরণের গ্রানি দূর করিতে পারেন নাই ।

ভলো ভলেসে ছলকিয়ে জন্মকনোড়ো হোই ।

ঈপতি শির তুলসী লসতি বলি-বামন গতি সোই ॥ ৫৫৭ ॥

ভগবানের ছলনাও সময়ে জীবের মঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে । যেমন ভগবান ছলনা করিয়া বলিরাজের মন্তকে গদপ্রদান করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন ।

বিহু প্রপঞ্চ ছলভীখভলি লহিয়ন কিয়ে কলেশ ।

বামন বলি সোঁ ছলকিয়ে দিও উচিত উপদেশ ॥ ৫৫৮ ॥

শারীরিক ক্লেশ এবং ছলনা-চাতুরী ভিন্ন ভিক্ষালাভ হয়না বলিয়া ভগবান বলিরাজের নিকট বামনরূপে ছলনার দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি করিয়াছিলেন ।

অমরদানি যাচক মরহি মরি মরি ফিরি ফিরি লেঁহি ।

তুলসি যাচক পাতকী দাতহি ছুষণ দেহি ॥ ৫৫৯ ॥

হে তুলসীদাস ! দানশীল ব্যক্তি অমরত্বলাভ করে কিন্তু অতি বড় পাতকী, দাতার অপমানকারী যাচক পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ বহুগণ ভোগ করিয়া চিরকাল ভিক্ষা করিয়াই জীবনযাত্রা নির্বাহ করে ।

মাখী কাক উলুক বক দাহুরসে ভয়ে লোগ ।

তলেতে শুক পিক মোরসে কো উন প্রেমপথ যোগ ॥ ৫৬০ ॥

অসৎ মনুষ্যগণ, মাছি, কাক, পেচক, বক ও ভেকের মত : এবং সংলোকগণ শুক, কোকিল ও ময়ূরের মত—এইজন্ত কেনা তাহাদিগকে আদর করিবে ?

মান্তমীতসেঁ। স্থখচই সোনছুয়ে ছল ছাঁহ।

শশী ত্রিশঙ্কুকেকই গতি লখি তুলসী মনমোঁহ ॥ ৫৬১ ॥

মান্ত মিত্র হইতে স্থখের আশা করা যায় কিন্তু স্থখ পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। চন্দ্রেরও ত্রিশঙ্কুর গতিবিধি দেখিয়া ভক্তকবি তুলসীদাস স্নাতিশয় দুঃখ অনুভব করিয়াছেন।

কৈ লঘু কৈ বড় মীতভল সন সনেহ দুখ সোই।

তুলসি জঁও ঘৃত মধু সরিস মিলে মহাবিষ হোই ॥ ৫৬২ ॥

ধনী ও দরিদ্রলোক বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইলে দরিদ্রেরই কষ্টের একশেষ হয়—হে তুলসী! যেমন ঘৃত মধু ও সুরা একত্র মিলিতহইলে মহা বিষের উৎপত্তি হয়, ধনী দরিদ্রের মিলনেও তদ্রূপ হয় জানিবে।

কুদিনহি তুসোহিত সুদিনহিত অনহিত কিন হোই।

শশীছবি হররবি সদনতউ মিত্র কহত সব কোই ॥ ৫৬৩ ॥

ভাল মন্দ সুদিন কুদিন কেমন করিয়া উল্লেখ করা যায়। যেমন সর্বদা সূর্য্যদেব চন্দ্রের শোভা হরণ করিলেও, সকলে তাহাকে তাহার বন্ধু বলিয়া স্থির করেন।

তুলসি জপ তপনেম ব্রত সব সবহীতে হোই।

লটৈ বড়াই দেবতা ইষ্টদেব জব হোই ॥ ৫৬৪ ॥

জপ তপ ব্রতনিয়ম সকলের দ্বারা সমাহিত হইতে পারে কিন্তু হে তুলসীদাস! অভীষ্টদেব যাহার সহায় হন তাহার তুল্য আর ভাগ্যবান কে আছে?

স্বলভ প্রীতি প্রীতমসবৈ কহত করত সবকৈ।

তুলসীমীন পুনীতত ত্রিভুবন বড়েন কোই ॥ ৫৬৫ ॥

যেব্যক্তি যতই আনন্দ উপভোগ করুন মৎসরে 'মত' সহজ এবং স্বলভ প্রীতিভোগ আর কাহার হয় না। হে তুলসীদাস!

দেখ, জল তাহাদের জীবন, জল তাহাদের গৃহ—মৎস্য সকলকে জল হইতে তুলিলেই মৃত হইয়া থাকে ।

তুলসি মিটেইন মরি মিটেছ সাঁচো সহজ সনেছ ।

মোর শিখাবন মুহুঁ গজরতপলুহতমেছ ॥ ৫৬৬ ॥

বথার্থ ভালবাসা সহজে কেহ তুলিতে পারে না—হে তুলসি, দেখ মেঘসকল গগনে ভীষণ গর্জন করিলেও ময়ূরসকল পুলকিতচিত্তে পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নাচিতে থাকে ।

মকর উরগদাতুর কমট জলজীবন জলগেহ ।

তুলসি এঁকে মীনকে হৈ সাঁচিলো সনেহ ॥ ৫৬৭ ॥

মকর, সর্প, ভেক ও কৃষ্ণ সকলের জলই জীবন, জলই গৃহ হইলেও মৎস্যের ন্যায় জলের প্রতি ভালবাসা আর কাহার নাই । কারণ জল ব্যতীত মকর, সর্প, ভেক প্রভৃতি জীবন ধারণ করিতে পারে, কিন্তু মৎস্য একদণ্ডই বারিহীন হইয়া থাকিতে পারে না ।

দেউ আপনে হাথজল মীনহি মহুরষোরি ।

তুলসি জ্বিয় জো বারি বিহু তৌ তু দেহি করিষোরি । ৫৬৮ ॥

মৎস্য জলবিহীন হইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না বটে জলই তাহাদের জীবন কিন্তু তাহাকে তীরে তুলিয়া জল সেচন করিলে তাহার তাহাতে জীবন রক্ষা হয় না ।

আপু ব্যাধকো রূপধরি কুহৌ কুরঙ্গ হিরাণ্ড ।

তুলসি জো মুগ মনমুরৈ পটৈ প্রেমদ দাণ্ড ॥ ৫৬৯ ॥

প্রভু আপনি ব্যাধরূপ ধারণ করত মুগ সকলের প্রতি রোষ প্রকাশ করিতেছেন কিন্তু তুলসী ! তুমি মুগবেশ ধারণ করিয়া এই সময় তাঁহার প্রেম-পদাঙ্ক ধরিয়া গমন কর তাহা হইলে আর কোনও ভাবনা থাকিবে না ।

এক অঙ্গ জ্ঞো সনেহতা নিশিদিন চাতিক নেহ ।

তুলসী জামেঁ। গিতলগৈ বহি অগারজে। দেহ ॥ ৫৭০ ॥

হে তুলসী! দিবানিশি কেবল প্রেম সেবাই চাতক পাখীর
কুলধর্ম। সে নিজের শরীর নষ্ট করিয়াও প্রেমের সেবা করিয়া থাকে।

অন জল সীচৈরুখকি ছায়া তৈবরু ঘাম ।

তুলসি চাতিক বহত হৈ ইহ প্রবীণকো কাম ॥ ৫৭১ ॥

হে তুলসি! চাতককে অন্য জল দিলেও তাহার ভাল ল'গে
না; সে কেবল স্বাতীনক্ষত্রের জলপান করিতেই ভালবাসে—ইহা
ভিন্ন তাহার প্রীতির উদ্ভেক হয় না।

আলবাল মুকাহল নিহিয সনেহ তরুমুল ।

হোড় হেতু চিত চাতকহি স্বাতি সলিল। অহুকুল ॥ ৫৭২ ॥

চাতক পাখীর ভালবাসারূপ-তরুমূলে স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়ি-
লেই তাহা অতি সুখদায়ক হইয়া থাকে।

সুনহে তুলসীদাস পিয়াস পপীহহি প্রেমকো ।

পরিহরি চারি উমাস জ্ঞো অচবৈজল স্বাতিকো ॥ ৫৭৩ ॥

হে তুলসীদাস! তুমি পিপাসাতুর পাপিয়ার প্রেমের বার্তা
শ্রবণ কর। তাহার। চারিমাস ধরিয়া পিপাসায় কাতর থাকিবে
সেও ভাল, তথাপি স্বাতী ভিন্ন অন্য জল পান করিবে না।

জিয়ত ননাহি নারি, চাতক ঘন ত্যজি দূসরহি ।

সরসরিহঁ কি বারি, মরত মাদ্ধেউ অরধজল ॥ ৫৭৪ ॥

চাতক পাখী জীজাতি স্বরূপ, তাহার। জলধররূপী প্রিয় পতিকে
ত্যাগ করিয়া আর কাহারও রূপাভিন্দা কখন করে না।

তুলসি চাতিক দেত শিখ সূতহি বারহিবার ।

তাঁতন তর্পণ কিজিয়ে বিনা বারিধর ধার ॥ ৫৭৫ ॥

হে তুলসীদাস ! চাতক পক্ষী অহরহ কেবল মেঘের কাছে জল প্রার্থনা করে—কারণ মেঘের জল ভিন্ন তাহারা জীবিত থাকিতে পারে না।

জীব চরাচর জহঁলগে হৈ সবকো হিত মেহ।

তুলসি চাতক মন বর্যো মনসো সহজ সনেহ ॥ ৫৭৬ ॥

হে তুলসীদাস ! মেঘের দ্বারা বারিবর্ষণ হইয়া এই বিশ্ব-সংসারে উপকার হইয়া থাকে। কিন্তু মেঘের প্রতি চাতকের সরল ভালবাসা আর কাহার হয় না।

বাপী রহউ সংসার মছঁ মায়া প্রকট প্রচণ্ড।

সেনাপতি কামাদি ভট কপট দস্ত পাষণ্ড ॥ ৫৭৭ ॥

মহামায়ার সৈন্তবল দ্বারা এই জগত সংসার সমাচ্ছন্ন। সেনাপতি কামদেব কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, কপটতা, দস্ত প্রভৃতি সেনা লইয়া সন্তত পরিলম্বন করিতেছে।

পরজ্ঞ আপনি সবনকো গরজ করত উর আনি।

তুলসি চাতক চতুর ভোয়া চকজনি স্তদানি ॥ ৫৭৮ ॥

হে তুলসি ! মেঘ তর্জ্জনগর্জ্জন করিয়া ভয় দেখাইলেও চাতক একান্তমনে তাহারই শরণাপন্ন হইয়া থাকে।

হোন ইন চাতিক পাতকী জারন দানিন মূঢ়।

তুলসি গতি প্রহ্লাদকি সমুঝি প্রেমপথ গূঢ় ॥ ৫৭৯ ॥

হে তুলসীদাস ! প্রেমের পথ অতি কঠিন ও দুর্গম বলিয়া বিবেচনা করিবে—সহজে ইহা পাইবার নয়—প্রেমদাতা ভগবানের প্রেমদান প্রহ্লাদের প্রতি কেমন হইয়াছিল এবং চাতকের প্রতি কেমন হইয়া থাকে—তাহা বুঝ।

প্রেমন পরধিয় পুরুষমন পয়দ সিধাবন এহ।

জগ কহৈ চাতক পাতকী উসর বরষৈ সেহ ॥ ৫৮০ ॥

চাতকের প্রণয় পরীক্ষা করিবার জন্য পুরুষরূপী পয়োধ্যগণ
শিলায়ুষ্টি বর্ষণাদি দ্বারা জগতকে শিক্ষা প্রদান করিতেছে।

বাসাবেশ বোলনি চলনি গানস মজ্জুমরাল।

তুলসি চাতক প্রেমিক কীরতি বিশদ বিশাল ॥ ৫০১ ॥

বেশভূষা ও গতি বিধিতে হংসের শোভা অতি রমণীয়, কিন্তু
হে তুলসীদাস! চাতকের প্রেম যশ তুল্য শোভা তাহাদের নাই।

নহি যাচত জলসংগৃহী নীষ না হমহিলেই।

এসে মানিহি মাঙ্গনে হিকো বারিদ বিনদেই ॥ ৫০২ ॥

জলদের মত দানশীল জগতে আর কেহ নাই। সে একবিন্দু
জল চাহিতে না চাহিতেই চাতকে অজস্র বারি প্রদান করিয়া থাকে।

তীন লোক তিহঁ কালমে চাতকহিকে সাথ।

তুলসি জ্ঞান দানতা স্থণী দুস্মরে নাথ ॥ ৫০৩ ॥

এই তিন লোকে তিনকালের মধ্যে চাতক পাখীর মত দীন
দরিদ্র আর কেহ নাই, হে তুলসি, দেখ, তাহার এক মেঘ ব্যতীত
অন্য কোন সখা দেখিয়াছ কি?

সাধন সাংসাত সব সহত সবহঁ সুখদ ফল লাহ।

তুলসি চাতক জলধিকী রীতি বুঝি বুধ কাছ ॥ ৫০৪ ॥

হে তুলসি! সুখজনক সাধনার ফল পাইতে সাধকগণ, সকলই
সহ করে কিন্তু চাতক ও সাগরের রীতি কোন্ সুধীব্যক্তি বুঝিবে?

চাতক জীবন দায়কহি জীবন সময় সরীতি।

তুলসি অলখ নলখি পঠৈ চাতক প্রীতি প্রতীতি ॥ ৫০৫ ॥

চাতক পক্ষীর ভালবাসার ব্যাপার অতি বৈচিত্রময়। হে
তুলসীদাস! সে আপনার প্রাণরক্ষা করিবার জন্য কেবল মেঘের
প্রতি মন প্রাণ অর্পণ করিয়াছে।

ভোলত বিপুলবিহঙ্গবন বিয়ত পোষরিণকরি ।

স্বশশধবল চাতক নবল তুঁহি ভুবন দশচারি ॥ ৫৮৬ ॥

পৃথিবীতে মেঘের বর্ষিত বারি কোন্ পক্ষী পান না করিয়া থাকে, কিন্তু মেঘের প্রতি চাতক পাখীর স্নেহ যেমন ভুবন বিদিত, তেমন কি আর কাহার আছে ?

বটত রটত রসনালটী তুষ শুধিগই অঙ্গ ।

তুলসি চাতক প্রেমকো নিত নূতন রুচিরঙ্গ ॥ ৫৮৭ ॥

হে তুলসীদাস ! মেঘের কাছে প্রার্থনা করিতে করিতে চাতক পাখীর জিহ্বা জড়িত এবং পিপাসায় দেহ শুখাইয়া গেল, তথাপি তাহার ভালবাসার রুচি নিত্য নবভাব ধারণ করিল ।

উপলবরষি গরজ্জত তরজি ভারত কুলিশ কঠোর ।

চিঠৌ কি চাতক মেঘ ত্যজি কবইঁ দুসরী ওর ॥ ৫৮৮ ॥

বিষম গর্জনে মেঘসকল কঠোর বজ্রাঘাত এবং শিলাবৃষ্টি করিলেও চাতকের মন মেঘের প্রতি ভালবাসা ছাড়িয়া অন্য কাহারও প্রতি আসক্ত হয় না ।

জ্ঞানী তাপস শূর কবি কোবিদ গুণ আগার ।

কেহিকে লোভ বিড়ম্বনা কিন্হন যহি সংসার ॥ ৫৮৯ ॥

জ্ঞানী, তাপস, বীর, কবি ও পণ্ডিত সকল গুণের আগার হইলেও সময়ে সময়ে সংসার মোহে মুগ্ধ হইয়া লোভের বশে সাতিশয় বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া থাকে ।

করতন সমুঝত বুঁট গুণ শুনত হোতমতিরঙ্গ ।

পারদ প্রকট প্রপঞ্চময় সিদ্ধিহিনাউ কলঙ্ক ॥ ৫৯০ ॥

মানবদেহের ধ্রুততা নাই—ইহা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিলে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহজেই নম্রভাব ধারণ করিয়া থাকে । এমত অবস্থায়

তাহারা যদি সাধনার দ্বারা সুসিদ্ধ হইতে না পারেন তাহা হইলে
তাহাদের কলঙ্কের কালিমা ভোগ করিতে হয়।

সেই সের্ৱরটে সুবা বেবত সদা বসন্ত।

তুলসি মহিমা মোহকি গুনত সরাহত সন্ত ॥ ৫৯১ ॥

হে তুলসীদাস! মোহের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা দুঃসাধ্য, মোহমত্ত
লোক সকল অহরহঃ বসন্ত সমাগম সুখের জগ্ন লালায়িত হইয়া
থাকে, তবে যাহারা সাধনায় চিত্ত স্থির করিয়াছে—তাহাদের নিকট
মোহের প্রভুত্ব খাটে না।

তুলসী অদ্ভুত দেবতা আশা দেবী নাম।

সেয়ে শোক সমর্পই বিমুখ ভয়ে অভিরাম ॥ ৫৯২ ॥

হে তুলসীদাস! আশাদেবী নামে এক অদ্ভুত দেবতা আছেন,
তিনি প্রথমে সর্কষ দান করিয়া শেষে বিমুখ হইয়া জীবকে একেবারে
শোকসাগরে ডুবাইয়া দেন।

দিয়ে পীঠি পাছে লগৈ সম্মুখ হো তপরায়।

তুলসি সম্পতি ছাঁহ জোঁ লখি দিন বৈঠি গবায় ॥ ৫৯৩ ॥

প্রদীপ জালিলে যেমন তাহার সম্মুখে আলোক কিন্তু পশ্চাতে
অন্ধকার থাকিয়া যায়—হে তুলসীদাস! ধন সম্পত্তিও তেমনি
প্রথমে খুব ভাল কিন্তু পরে নিতান্ত দুঃখদায়ক।

কহবে কই রসনা রচী গুনবে কই কিয় কান।

ধরি কেচিত হিত সহিত গুনি পরমার্থ হি স্জ্ঞান ॥ ৫৯৪ ॥

পরমার্থতত্ত্ব রসযুক্ত কথা কাহার রসনা হইতে নির্গত হইবে
আর কাহারই কর্ণ তাহা শুনিবে। অর্থাৎ ভগবৎ বিষয়ের
আপোচনা সহজে কেহ করে না—এবং শুনিতেও কেহ সহজে
চায় না।

তুলসি দেখতা অমৃতবত শুনত ন সমুদ্রত নীচ ।

চপরি চপেটে দেতনিত কেশগহে করমীচ ॥ ৫২৫ ॥

হে তুলসীদাস ! নীচলোক কখনও দেখে না, অমৃতব করেনা বা বুঝে না যে মৃত্যু নিত্য তাহাদের কেশাকর্ষণ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে ।

জীব শিব সম সুখ মগন সপনে কছু করতুতি ।

জাগত দীন মলিন সোই বিকল বিষাদ বিভূতি ॥ ৫২৬ ॥

জীব মায়ামত্ত হইয়া স্বপ্নে যেমন সুখ ঐশ্বর্য ভোগ করে কিন্তু জাগ্রত হইয়া মায়ামুক্ত হইলেই তাহার সেই স্বপ্ন ঘোর বিষম বিষাদে পরিণত হয় । অর্থাৎ মায়ামুক্ত অবস্থায় জীব সুখী আর মায়ামুক্ত অবস্থায় জীব দুঃখভোগ করে—ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য ।

সুখসাগর সুখনীদবশ সপনে সব করতার ।

মায়া মায়ানাথ কি কো জগজ্ঞানন হার ॥ ৫২৭ ॥

মায়া সাগরের পারে কাহার যাইবার ক্ষমতা নাই ; জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন—যে সংসারের যাবতীয় সুখ সম্পদ স্বপ্ন ঘোরের মত অস্থায়ী ।

কাহিমগ প্রবিশত জাতিকেহি জ্যাও দপর্গসে ছাই ।

তুলসিষ্ঠ্যাও জগজীব গতি করী জীহঁকে নাহ ॥ ৫২৮ ॥

দর্পণে পতিত ছায়া যেমন ক্ষণকাল অবস্থিতি করে, করীগণের স্নান যেমন কোন কাজের নয়—অল্পসময়ে আবার ধূলা ধূসরিত হয় । হে তুলসীদাস ! এই জগত প্রপঞ্চের জীবগতিও তেমনি ক্ষণভঙ্গুর জানিবে ।

প্রেম স্ৱাপর পঞ্চরূপ উপজো অধিক উপাধি ।

তুলসি ভলো সুবেদই দেগী বাধিয়ে ব্যাধি ॥ ৫২৯ ॥

হে তুলসীদাস ! প্রেম স্ৱাপর উপর মায়া প্রপঞ্চ বিষম ক

